মীর মশাররফ হোসেন
ও
বাংলা সাহিত্য

মোহাম্মদ শামসুল হক

[redacted] Bengali University
Library
[redacted]

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. (বাংলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ
২০০২

Ref
80·01
শাম/মীর

STOCK TAKING - 2011

149649
13 MAR 2003

সূচিপত্র

ভূমিকা	এক
প্রথম অধ্যায় উনিশ শতকের নবজাগরণ ও বাঙালী মুসলমান সমাজ	১-৪১
দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখক ঃ প্রসঙ্গ উনিশ শতক	৪২-৭৮
তৃতীয় অধ্যায় মীর মশাররফ হোসেন ঃ মানুষ ও লেখক	৭৯-১১৯
চতুর্থ অধ্যায় মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য বিশ্লেষণ	১২০-৩২৯
পঞ্চম অধ্যায় মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যরীতির বিশ্লেষণ	৩৩০-৩৫৮
উপসংহার	৩৫৯-৩৬৪
গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রপত্রিকা	৩৬৫-৩৭১

ভূমিকা

মীর মশাররফ হোসেন সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বহুদিনের। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসে 'বিষাদসিন্ধু' পড়বার সময় এই কৌতূহল আরো বৃদ্ধি পায়। মীর মশাররফের সাহিত্যকর্মের নানাদিক সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা হয়। তারই ফলে মীর মশাররফের সাহিত্যকর্ম নিয়ে গবেষণা করতে ইচ্ছা করি। আমি যখন এ নিয়ে প্রথম ভাবতে শুরু করি তখন তাঁর রচনাবলী বা তাঁর সম্বন্ধে বইপত্র সুলভ ছিল না। অনেক বিষয় সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতেও পারিনি। ফলে কাজের গতি খুব শ্লথ হয়ে পড়ে। যাই হোক পরবর্তীকালে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু বই যোগাড় করতে পারি। বাংলাদেশ থেকেও কিছু বই এদেশে আসে। সেগুলি সংগ্রহ করি। তাঁর রচনাবলী এখানে পাওয়া সম্ভব হয়। ফলে প্রথমদিকে কাজের গতি শ্লথ হয়ে পড়লেও তা এতদিনে সম্পন্ন করতে পারলাম।

মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের যুগের লেখক। নানা কারণে তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য লেখক। তাঁর লেখায় যেমন সেদিনকার যুগ জীবনের ছায়া ধরা পড়েছে তেমনি তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও ব্যক্ত হয়েছে। আর এ সবের উপরে তদানীন্তন নবজাগরণের একটি প্রভাবের বিস্তার ঘটেছে। আমরা আমাদের এই আলোচনায় বাংলাদেশের (অখন্ড বঙ্গদেশ) এই যুগ পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে মশাররফের সাহিত্য আলোচনা করেছি। মীরের জীবন ও সাহিত্য আলোচনায় সন্ধান করেছি তিনি এই রেনেসাঁসের প্রভাব কতোটা আত্মসাৎ করতে পেরেছেন এবং তাঁর লেখায় তা কতোটা ব্যক্ত হয়েছে।

এই গবেষণা আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ এবং আন্তরিক সহযোগিতা না থাকলে এই কাজ করা আমার পক্ষে দুষ্কর হতো। এই গবেষণা কাজে আমি অনেকের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি। অনেকে পরামর্শ ও উৎসাহও দিয়েছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক ডঃ বিষ্ণু বসু তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমাকে গ্রন্থ ব্যবহার করতে দিয়েছেন। আজহারউদ্দীন খান মেদিনীপুর থেকে তাঁর গ্রন্থের প্রতিলিপি পাঠিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার বিশেষ পরিচিত মোহাম্মদ হবিবুর রহমান ঢাকা থেকে কতিপয় গ্রন্থ পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন। সর্বোপরি কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন অফিসের লাইব্রেরী অবাধে ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন সেখানকার কর্মী মোহাম্মদ হেলাল ভাই। এছাড়া আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন আমার শিক্ষক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুনীল কুমার ওঝা, কান্দী রাজ কলেজের অধ্যাপক রতনকুমার মন্ডল, সাউথ মালদা কলেজের (যেখানে আমি বর্তমানে কর্মরত) অধ্যক্ষ ডঃ পার্থ চক্রবর্তী, মাথাভাঙ্গা কলেজের অধ্যাপক ও আমার সহকর্মী বন্ধু আফজল হোসেন, ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক আজিজ আহমেদ এবং কান্দির রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র কলেজ অব্ কমার্সের অনুজ-প্রতিম অধ্যাপক সেখ আবদুর রশীদ।

এ গবেষণার জন্য আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করতে হয়েছে। কলকাতার 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার', বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্ট্রাল লাইব্রেরী', উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, মাথাভাঙ্গা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, কান্দি রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ অব কমার্সের গ্রন্থাগার এবং বিশেষভাবে কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন অফিস লাইব্রেরী থেকে বহু সাহায্য পেয়েছি। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের সৌজন্য ও সহযোগিতার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বোলপুরের 'বীরভূম ইন্‌ফোটেক'-এর কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারিবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি।

০২.০২.২০০২.

মোহাম্মদ শামসুল হক

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকের নবজাগরণ ও বাঙালী মুসলমান সমাজ

ভূমিকা ঃ রেনেসাঁস ও বাংলাদেশ

১.

বাংলা সাহিত্যে যে সব মুসলমান সাহিত্য সেবক অবতীর্ণ হয়েছেন মীর মশাররফ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমান সমাজ যখন আধুনিকমনস্কতা থেকে সরে গিয়ে নিজস্ব সমাজ ও শরীয়তের মধ্যে আত্মমগ্ন হয়েছিলেন তাঁদের তখনকার চেতনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা উপেক্ষিত হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবার মুসলমান সাহিত্যিকেরা বাংলা গদ্য অবলম্বন করে আধুনিক সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত হন। বাংলা সাহিত্যের সাধনায় তাঁর কালের আর যে সব সাহিত্যকার আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা এখন প্রায় সকলেই ইতিহাসের পাতায় আত্মগোপন করে আছেন। এঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য সম্ভার এখনো সংস্কৃতি সচেতন মানুষের কাছে জীবন্ত রসবস্তু হিসাবে মূল্যবান। প্রায় শতবর্ষ কালের ব্যবধানেও তাঁর রচনাবলী এখনো পুনঃ পুনঃ পঠিত হচ্ছে এবং নিত্য নতুন বিশ্লেষণে তাঁর রচনাবলীর গুণ নির্ণয় হচ্ছে। বিশেষ করে তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' ও 'জমীদার দর্পণ' বাংলার পাঠকদের কাছে যে মর্যাদা লাভ করেছে তা বিস্ময়কর। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' পাঠ করে 'বিচলিত' হয়েছিলেন।[১] বহু রসিক পাঠক তাঁর এই গ্রন্থ পাঠ করে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। তাঁর 'জমীদার দর্পণ' আধুনিক বিংশ শতকেও অত্যাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটকের মর্যাদা লাভ করেছে। এই সব কারণে মীর মশাররফকে সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের একজন 'সার্থক শিল্পী'র[২] মর্যাদা দেওয়া হয়। মশাররফ হোসেনের সতীর্থ সাহিত্যসাধক শেখ আব্দুর রহিম তাঁকে মুসলমান সমাজের 'ধ্রুবতারা' হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন।[৩]

মীর মশাররফ হোসেনের জীবৎকাল (১৮৪৭ - ১৯১১) নানা দিক থেকে বাংলাদেশ ও বাঙালী সংস্কৃতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জন্মের প্রায় অর্ধশত বৎসর পূর্বে এদেশে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্পর্শে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের নবোন্মেষ ঘটেছে। চিন্তা-জগতে এবং ভাবের জগতে এই পাশ্চাত্য প্রেরণা বাঙালীর জীবনকে নবজাগ্রত চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। মীর মশাররফ বাংলাদেশের এই নবজাগরণের যুগের মানুষ। ঐতিহাসিকেরা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় শতবর্ষকালকে বাংলার নবজাগরণের কাল বলে অভিহিত করেছেন[৪]। দু বছর ব্যবধানে এদেশে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৭ সালে। কেউ কেউ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নবজাগরণের কাল গনণার পক্ষপাতী। এই শতবৎসর বাংলাদেশ ও বাঙালী জীবনের নানা গঠন, নূতন জীবনরস ও জীবনচেতনায় উদ্বোধিত হয়ে ওঠার কাল। এই কালে আমাদের সমাজ, অর্থনীতি ও সাহিত্যের নানা পরিবর্ধন ও পুষ্টি সাধন হয়। সুশোভন সরকার বলেছেন, 'বুর্জোয়া অর্থনীতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির'[৫] প্রবল প্রভাবেই নবজাগরণের চেতনা প্রথমে জাগে। এই নবজাগরণের মূলধর্ম মানবতা এবং ঐহিক বোধ। এরই ফলে মানুষের ইহ জীবনকে পূর্ণতররূপে উপলব্ধি করবার প্রেরণা জাগে।

২.

যাকে নবজাগরণ বলা হয় ভন মার্টিনের কথা উদ্ধৃত করে বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন, আসলে তা মধ্যযুগীয় চিন্তার সঙ্গে বিচ্ছেদ। রেনেসাঁসের যুগকে মধ্য যুগের থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবা রেনেসাঁসের ইতিহাসকারেরাই শুরু করেছিলেন। ভন মার্টিন বলেছেন রেনেসাঁস হচ্ছে "first cultural and social breech between the middle ages and modern times"[৬] বিনয় ঘোষ এই cultural and social breech-এর মূল কথা ভেবেছেন সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের পার্থক্য। তিনি লিখেছেন, "আধুনিক যুগ বলতে এখানে ধনতান্ত্রিক যুগের কথা বলা হয়েছে"।[৭] বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থেই দেখিয়েছেন, ইংরেজরা এদেশে বুর্জোয়া অর্থনীতিক ব্যবস্থার পত্তন করে। সুশোভন সরকারও তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, 'বুর্জোয়া অর্থনীতি'র প্রভাবেই বাংলার রেনেসাঁস সূচিত হয়[৮]। বিনয় বাবু তাঁর গ্রন্থে নানা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ইংরেজরা আমাদের এশিয়াটিক স্বনির্ভর সমাজ ভেঙে ফেলে। তারা ভূমিরাজস্ব পদ্ধতি বদলে ফেলে, ভূমির ব্যক্তিগত স্বত্বহীনতা[৯] লোপ করে ও স্থিতিশীল সমাজের ভিত্তি ভেঙে দেয়। এতে আমাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে[১০]। ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থে এদেশের কাঁচামাল বিলেতে সরবরাহ হয়, চা-বাগান তৈরী হয়, নীলচাষ হয়, আবার রেলপথ ও কলকারখানার পত্তন ঘটে, নানাবিধ যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। এইভাবে আমাদের পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে[১১] এবং এদেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা হয়। নানাবিধ যন্ত্র-ব্যবহার, মুদ্রণ-যন্ত্র স্থাপন, রেল ব্যবস্থা, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, আধুনিক বুর্জোয়া অর্থনীতির সূচনা করে। বিনয় ঘোষ এগুলিকেই বলেছেন নবজাগৃতির প্রথম দূত।[১২] এরাই এদেশের পুরানো সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে। এদেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ-এর মূল এখানেই।[১৩] বিনয় বাবু লিখেছেন, ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে আধুনিক যুগের সম্পর্ক ওতপ্রোত। অথচ ভারতবর্ষে এই ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়নি।[১৪] পরাধীনতা এর অন্যতম কারণ। এই কারণে এদেশের নবজাগৃতির পরিসর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একথা ঠিক আমাদের দেশে বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ হয়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। কিন্তু এর ফলে এদেশের নবজাগরণকে একেবারে 'অতিকথা' বলতে চাননা অনেক ঐতিহাসিক। বিনয় বাবু বলেছেন এদেশে পাশ্চাত্য নবজাগৃতির কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি, যা ঘটেছে সেটা সংস্কৃতি সংঘাত জনিত আদর্শের আদান-প্রদান বা মিশ্রণ।[১৫] একথা একটু অন্যভাবে ইতিবাচক দিক থেকে বলেছেন অমলেশ ত্রিপাঠী। "আমাদেরটা পুরো পশ্চিমের imitio বা অনুকরণ নয়। পশ্চিম ও পূর্বের বীজের সঙ্কর ভারতের মাটিতে পড়ে যে ফসল ফলিয়েছে — তাই।[১৬] বিনয় বাবু রেনেসাঁসকে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের বিচ্ছেদ বলে যে ব্যাখ্যা করেন সেই রকম প্রকৃত বিচ্ছেদ কিন্তু হয়না। তিনি বলেছেন,

> মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছেদ ঘটে রেনেসাঁসের যুগে এবং সেইদিক থেকে রেনেসাঁসকে আধুনিক যুগের প্রথম উদয় পর্ব বলা যায়। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পথে কখনও অতীত যুগের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামাজিক সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ ঘটেনা, বিচ্ছেদের শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে — সমাজের মূল গঠন বিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে। এই মূল গঠন বিন্যাস অর্থনৈতিক, যার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সমাজের গোষ্ঠীবিন্যাস ও শ্রেণী বিন্যাস গড়ে ওঠে এবং তার উপর ভিত্তি করে সমাজের ধ্যান-ধারণা ভালমন্দ বিচারবোধ সবকিছুর বিকাশ হয়।[১৭]

বিনয়বাবুর মূল জোরটা অর্থনীতির উপর। অমলেশ ত্রিপাঠী হুইজিঙ্গার-এর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন এই কথা জানাতে

যে কোনোভাবেই দুই যুগের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ সম্ভব হয় না ঃ

> The renaissance cannot be considered as a pure contrast to medieval culture, not even as a frontier territory between medieval and modern times.[১৮]

আজকাল বরং প্রবহমানতার উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেনা বরং ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রগতির সম্ভাবনা দেখা যায়।[১৯] "আমাদের মনে রাখতে হবে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির বিবর্তনে একটা মুখ্য প্রবণতা ছিল ঐতিহ্যের সাহায্যে আধুনিকীকরণ"।[২০] এইকথা আমাদের রেনেসাঁস যুগের মনীষীরা জানতেন তাই "সীমিত শক্তিতে সীমিত ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে আধুনিকীকরণের কাজে তাঁরা লাগিয়েছিলেন"।[২১] বহিরাগত ভাবসংঘাতের ফলে প্রকট সাংস্কৃতিক সামাজিক আলোড়নকে এইজন্য সীমিত অর্থে বিনয়ঘোষ রেনেসাঁস বলতে অরাজী নন।[২২]

৩.

রেনেসাঁসের ইতিহাস রচনা করেছিলেন যে ঐতিহাসিকেরা তাঁরা দেখিয়েছিলেন মধ্যযুগের মানুষের চেতনা ধর্মবিশ্বাস এবং প্রথানুগত্যের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। ব্যক্তি ছিল সমাজ শাসনে নিস্পিষ্ট। ব্যক্তির মুক্তি ও বিকাশ, যুক্তিবাদের অভ্যুদয় এবং মানবমুখিনতা এইগুলি হল রেনেসাঁসের বিশিষ্ট লক্ষণ। এইজন্য এইযুগকে বলা হয়েছে মানবিকতার যুগ, মানুষই এর মূল।

এই দিক দেখলে বলা যায় উনিশ শতকের বাংলাদেশে মানবমুখী জীবন-চেতনা প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠল। নবজাগরণের যাঁরা অগ্রদূত তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষের ঐহিক জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। কিন্তু বলা উচিত আমাদের এই মানববোধের পাশাপশি অধ্যাত্মচেতনা কোনোদিন সম্পূর্ণ বর্জিত হয়নি। এখানেও secularism –এর পাশাপাশি ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে।[২৩] রেনেসাঁসের আরেকটি ধর্ম ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য চেতনা। আগে বিনয় ঘোষের কথা অনুসরণ করে দেখেছি আর্থনীতিক পরিবর্তন থেকেই এই স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হয়। এই যুগে এটিরও কিছু লক্ষণ স্পষ্ট হল। ব্যক্তির স্বাধীন মত প্রকাশে, ধর্মমত গ্রহণে এবং সমাজের বিরুদ্ধতার মধ্যেও নিজমত প্রকাশের স্বাতন্ত্র্যে এই ধর্মের প্রকাশ দেখতে পাই। এর সঙ্গে যুক্ত হল যুক্তিনিষ্ঠা। সুশোভন সরকারের চমৎকার বিশ্লেষণ মনে রেখে বলা যায় রেনেসাঁসের যুগে প্রাথমিক চেষ্টাটা ছিল সামাজিক সংস্কার। সমাজের নানা কুসংস্কারাছন্ন, অযৌক্তিক ও অন্যায় প্রথাকে আক্রমণ করা– সেই সূত্রেই এল যুক্তি। সংস্কারকেরা নিজেদের বক্তব্যকে যুক্তির উপর দাঁড় করালেন"।[২৪] যুক্তিবাদের উপর এখন সব কাজকে দাঁড় করানোর চেষ্টা আরম্ভ হলো। এরই উপর নির্ভর করে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত হানা হ'ল। মানুষের ইহমুখিনতাকে এই যুক্তিবাদ আরও প্রসারিত তাৎপর্য দিতে পারলো। শাস্ত্র, ধর্ম, দেশাচার, আর জনশ্রুতি থেকে এবার যুক্তির সাহায্যে মানুষের জীবনকে পরীক্ষা করা সম্ভব হল। এরই ফলে যেমন ধর্মানুশাসনের প্রতিপত্তি থেকে মানুষ মুক্তি পেলো তেমনি ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা পেলো। প্রতিষ্ঠা পেলো মানবতাবাদ। এই ধর্মানুশাসন ও সমাজ আচারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ কিছুটা যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। এই বিহ্বলতা নব্যবঙ্গীয় যুবকদের আচরণে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তারা ধর্ম এবং সমাজের প্রতি এমনই আঘাত হানতে উদ্যত হল যাতে দীর্ঘদিনের স্থবির সমাজের জড়তা ভেঙে যায়। এরই সঙ্গে উল্লেখ করা যায় এই কথা

যে রেনেসাঁসের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র কিন্তু এদেশে প্রকাশ পায় নি। ধর্মসংস্কার ও নূতন যুক্তিবুদ্ধির উপর ধর্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। ধর্মকে মানুষের জীবনাভিমুখী করে গড়ে তোলারও কাজ শুরু হল। মধ্যযুগের ধর্মনীতি ও সমাজানুশাসন মানুষের মনুষ্যত্বকেই খর্ব করে রেখেছিলো। তার ব্যক্তিবোধ ছিল অপুষ্ট ও অপরিণত। গতানুগতিক ধর্মচর্চার স্থানে দেখা দিল নবগঠিত ধর্ম ভাবনা। এর সঙ্গে উল্লেখ্য নারীর জীবনাধিকারের মর্যাদার কথা। মানবজীবনের তাৎপর্য পরিবর্ত্তিত হলো বলে এখন সমাজ অনুশাসন থেকে নারীর জীবনকে মুক্ত করবার প্রয়োজন দেখা দিলো। নারীমুক্তির চেতনার সূচনা হল এই উনিশ শতকে। সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন, বিধবা-বিবাহ প্রথার প্রবর্তন, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এই নারী মুক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অবস্থান থেকে মুক্ত করে নারীর জীবনাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ অত্যন্ত জরুরী ছিলো। এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ, ইতিহাস চেতনা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষের প্রসঙ্গ। নবযুগের চিন্তানায়কেরা এই রাজনীতি এবং জাতীয়চেতনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।

৪.

রামমোহন রায়কে প্রায় সকল চিন্তাশীল মানুষই ভারতের ইতিহাসের আধুনিকতার অগ্রদূত বলে বর্ণনা করেছেন।[২৫] তাঁকে অনেকেই যুগ প্রবর্তকের সম্মান দিতে চান।[২৬] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর আবির্ভাবকালে এদেশের ইতিহাসের মজা নদী শুষ্ক হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তিনি এদেশের সর্ববিধ পুনর্জীবনায়নের "Social, religious intellectual and political regeneration"[২৭]— এর কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে যে প্রধান বৈশিষ্ট্যটি ঐতিহাসিকেরা লক্ষ করেছেন তাকে সুশোভন সরকার বলেছেন সংশ্লেষণ, "Rammohun worked out a synthesis of the best thought of the East and the West"[২৮] অবশ্য এই সংশ্লেষণের তত্ত্ব পরে তিনি কিছুটা পরিবর্তন করে প্রতীচ্যবাদী ধারণার গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২৯] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান তিনি আত্মীকরণ করেছিলেন। এসবই দেশের মানুষের সর্বাঙ্গীন পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি ভেবেছিলেন নূতন যুগের ভারত প্রতিষ্ঠিত হবে যুক্তিবাদের উপরে – পূর্ব এবং পশ্চিমের জ্ঞান তাকে গঠিত করবে। এই ভারত পশ্চিম থেকে গ্রহণ করবে নিশ্চয় কিন্তু এই গ্রহণ হবে এমন একটা "Creative Process" এর মাধ্যমে যাতে ভারতীয় চিন্তা এবং সংস্কৃতির পুর্নজন্ম 'renovated' [৩০] হয়।

রামমোহনের চিন্তার নির্যাস গ্রহণ করলে দেখি তিনি হিন্দুর পৌরাণিক যুগের বহুদেবনির্ভর ধর্মকে পরিত্যাগ করে তাকে একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর পুরোহিততন্ত্রের প্রখর সমালোচনা এবং মূর্তিপূজার বিরুদ্ধতা কে সুশোভন সরকার 'প্রোটেস্ট্যান্ট বিপ্লবের' সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৩১] একে রামমোহনের নয়া উদারবাদ 'New leberalism'[৩২] বলা হয়েছে। সুশোভন বাবুও তাঁর লেখায় এই পুরোহিত তন্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবাদের দ্বন্দ্ব দেখেছেন।[৩৩] রামমোহন আমাদের অধঃপতিত ধর্ম ও সমাজকে বেদান্তবাদের অভিমুখে নিয়ে গিয়ে যেমন একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন তেমনি তার দ্বারা ভারতীয় সমাজের ঐক্য রচনার কাজও করলেন। এই কারণে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন তাঁর বড়ো কাজ। তিনি জাতিভেদ প্রথাকে ভারতীয় ঐক্যের প্রধান প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছিলেন। এরই ফলে আমাদের সমাজে অনৈক্য এবং বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

> the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling.[৩৪]

বেদান্তের একেশ্বরবাদ ও জীব-শিব ঐক্যের তত্ত্ব ব্যবহার করে এই বিভেদ যে ঘুচিয়ে ফেলা তত্ত্বগতভাবে সম্ভব তা বোঝা যায়। নারীর অধিকার, সতীপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নূতন শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা এবং জাতীয় সচেতনতা ও সংস্কারের জন্য তার সংগ্রাম — এসবই তাঁর নবযুগের চিন্তা-নায়কোচিত ভূমিকা। সুশোভন সরকার লিখেছেন ঃ "Inspired with new ideals of life Rammohun was breaking away from the tradition of passivity so congenial to feudal times."[৩৫] আগেই উদ্ধৃত করেছি জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। জাতিভেদ প্রথাই যে মানুষকে বিছিন্ন করেছে সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা দেখেছি। এই কারণে ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। রামমোহনের চরিত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁর উৎসাহ। বিপান চন্দ্র তাকে বলেছেন 'Firm believer in internalism'।[৩৬] রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন, তিনিই প্রথম আধুনিক যুগের তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন। এইসব কারণে তাঁকে রেনেসাঁসের পথিকৃৎ বলা হয়।

রেনেসাঁসের যে বৈশিষ্ট্য রামমোহনের চিন্তায় ও কর্মে পরিস্ফুট হয়েছিলো তাঁর সহযোগীরাও সেইসব কর্মে খুব উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কালেই ১৮২০-৩০-এর মধ্যে আরো প্রগতি-চিন্তক একটি নব্যবঙ্গীয় আন্দোলন তৈরী হয়। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন এর প্রেরণা। ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে সেকালে একদল নব্যশিক্ষিত ছাত্র একটি অধিকতর বৈপ্লবিক ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। এঁরা যুক্তিবাদকে আরো প্রসারিত করেন এবং রাজনীতি সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠেন। বাংলার নবজাগৃতির যে মৌলধর্ম সুস্থ মানবতাবাদ তাকে এরা আরো প্রবলতর করে তোলবার কাজে ব্যাপৃত হন। তাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, শ্রমিকদের দুরবস্থা বিষয়ে এবং ইংরেজিকে রাজকার্যের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদানের আন্দোলন করেছিলেন। তাঁদের কাজের মধ্যে মুখ্য দুটি প্রবণতা ছিলো — রাজনীতি-মনস্কতা এবং প্রচলিত সামাজিক প্রথার বিরোধিতা। এই কারণে এই দেশের সমাজে তাঁরা একটা প্রবল আলোড়ন তুলেছিলেন। অবশ্য তাঁরা সমাজ সংস্কারে স্থায়ী কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারেন নি। কারণ সুশোভন বাবুর মতে, তাঁরা পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিঘাতেই আন্দোলিত হয়েছিলেন, কিন্তু ঐ বিপ্লবের তাৎপর্য ঠিকমতো আত্মস্থ করতে পারেন নি।[৩৭] ফলে কতকটা চাঞ্চল্য তৈরী করা ছাড়া অধিক কিছু তাদের দ্বারা সিদ্ধ হয়নি।

রামমোহন বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে ফিরিয়ে এনে একই সঙ্গে ধর্ম এবং সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম সংস্কারে ঐহিকতা মুখ্য ছিল। বিদ্যাসাগর কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেও প্রত্যক্ষ ধর্মের আচরণ করেন নি। বরং মানুষের ঐহিক জীবনকে কিভাবে উন্নত করা সম্ভব তা নিয়ে চিন্তা করেছেন। এদিক থেকে বলা যায় তিনি ছিলেন *নবজাগরণের যুগের ভাব চেতনাসম্পন্ন আধুনিক মানুষ।* তাঁর হাতে বাঙালীর সংস্কৃতি তিনদিক থেকে পুর্ণগঠিত হয়ে উঠলো।

১. সমাজ ঃ নারীর জীবনাধিকার প্রতিষ্ঠা

২. শিক্ষা ঃ পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ

৩. সাহিত্য ঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নির্মাণ

এই তিনটিই বাঙালীর নবজাগ্রত জীবনচেতনার প্রত্যক্ষ ফল। বিদ্যাসাগর হিন্দু-বাঙালী নারীর জীবনে বৈধব্যকে নিষ্ঠুর অভিশাপ রূপে দেখেছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের যুক্তি মন্থন করে এবং তদানীন্তন সরকার ও প্রগতিশীল মানুষের সমর্থনে তিনি যে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন তাকে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম বলে অভিহিত করেছেন। এই কাজের মূল্যায়ণ করে আমরা বুঝতে পারি বাঙালী সমাজে তা সুফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু যে প্রবল শক্তিতে তিনি বাঙালী হিন্দু সমাজকে নাড়া দিয়েছেন তাতে তার ভিত্তির স্থবিরতাও কেঁপে উঠেছিল। সন্দেহ নেই বাঙলার বৃহৎ মুসলমান সমাজ এইসব সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা উপকৃত হয়নি। কিন্তু অন্যভাবে দেখলে বুঝতে পারা যায় রামমোহন বা বিদ্যসাগরের নারী জীবন-কেন্দ্রিক সংস্কার-আন্দোলন কোন একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের কাজ ছিলনা। তা ছিল সমগ্রভাবে নারীমুক্তির এক-একটি ধাপ। রামমোহন শুধু সতীদাহ প্রথা রদের কাজটুকু করেননি, নারীর জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজও করেছিলেন। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। অর্থাৎ নবজাগৃতির ফলে উদ্ভূত যে মানববোধ তারই ফলে অগ্রণী চিন্তানায়কেরা বাঙলাদেশের নারী জীবনের প্রতিবন্ধকতা দুর করে তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেবার কাজ শুরু করেছিলেন। এ কাজের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সমাজের মধ্যে নারীমুক্তির কাজ হওয়া সম্ভব ছিলো। অবরোধ প্রথা দূরকরা, নারীর শিক্ষা এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সেই ক্ষেত্রে বিশেষ কাজ হতেও পারত। কিছু কিছু হয়েওছে। ফলকথা নারীমুক্তি-কেন্দ্রিক যে আন্দোলন বাঙলাদেশে শুরু হয় তার মূল এই নবজাগরণের চেতনায় নিহিত ছিল। নারীর জীবনকে সামান্যতম হলেও সফলতা দেবার কাজ করেছিলেন বিদ্যসাগর। যে উদ্যম ও অধ্যবসায়ে তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও প্রচলন করেন তা এককথায় বিস্ময়কর। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল। বেথুন কলেজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগ যেমন ছিলো তেমনি তিনি বিভিন্ন জেলায় তিনি কতকগুলি বালিকা বিদ্যলয় স্থাপন করেছিলেন।[৩৮] তাছাড়া সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের দ্বার অব্রাহ্মণ হিন্দু ছাত্রদের জন্য খুলে দেওয়া এবং সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রেও তাঁর শিক্ষাসংস্কারের ভূমিকার গুরুত্ব ছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব ছিলো অপরিসীম। এই বাংলা সাহিত্যই এই পর্বে নবজাগরণের ভাব প্রকাশের অধিক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। মানবতাবাদ, যুক্তিনিষ্ঠা এবং নারীর জীবনাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অবলম্বন করে বাঙালীর যে নব্য যুগের সাহিত্য গড়ে উঠেছে বিদ্যসাগর তার একজন ভাবুক ও নির্মাণকর্মী। তিনি যেমন চিন্তা করেছেন তেমনি নির্মাণ করেছেন। তাঁর সমাজ ভাবুকতাকে তিনি নিজের গদ্য রচনাবলীতে ব্যক্ত করেছেন। এতে একদিকে যেমন চিন্তানায়ক হিসাবে তিনি বাঙালীর সাহিত্যকে যুক্তি, বুদ্ধি ও মানবধর্মের উপর স্থাপন করেছেন তেমনি বাংলা গদ্যের নির্মাণ-শিল্পে তাঁর অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের মুদ্রা অঙ্কন করে গেছেন। সাহিত্যের দিক থেকে বিদ্যসাগরের রচনাবলীর যে মূল্য তা অনেকটাই আদি কর্মিকের, কিন্তু গদ্যের নির্মাণে তিনি স্থপতি। তাঁর শক্তিকে তিনি কল্পনামূলক সৃজনধর্মে রূপায়িত করেন নি বরং বাংলা গদ্যে শক্তি সঞ্চার করে

তাঁর যুগের ধর্ম ও দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলা গদ্যের এই শক্তি পরবর্ত্তীকালের সাহিত্য সৃষ্টিতে আরো বহুরূপ ভঙ্গিমায় নিজস্ব শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে। বাংলার নবজাগরণের এই প্রভাব কিন্তু বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যযুগীয় তন্দ্রা ঘুচিয়ে তাকে আধুনিক যুগের ঊষালোকে মুক্তি দিতে পারে নি। ইংরেজী সংস্কৃতির সংস্পর্শ-জনিত কারণে বাঙালী হিন্দুর সমাজে শিক্ষার হার বেড়েছে; নূতন ভাবচিন্তার স্পর্শে তার চিত্তের জড়তা কাটতে শুরু করেছে। সম্পূর্ণভাবে সারাদেশের মানুষের জীবনের জড়ত্ব তাতে ঘোচেনি। বাংলার রেনেসাঁস মাত্র নাগরিক মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের সীমাবদ্ধ পরিসরের বস্তু হয়েই থেকে গেছে। সমস্ত দেশের মানুষের জীবনে তার প্রভাব পড়েনি। গ্রামীণ হিন্দু বাঙালী ও বিশেষত বাঙালী মুসলমান সমাজে তার প্রভাব প্রায় পড়েনি। তাঁদের মধ্যে শিক্ষার হার কম; মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান সমাজের বিকাশও দেরীতে হয়েছে। নারীর জীবনে নানা সমস্যার প্রতিও মনোযোগ পড়েনি। সমাজ ঐতিহাসিকেরা এর নানা কারণ অনুসন্ধান করেছেন। প্রথমত ইংরেজরা এদেশ অধিকার করে নেবার ফলে তাদের অনেকেই চাকরী হারায় এবং একটা বড়ো অংশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত ফরসী ভাষা রাজকীয় কার্যে যে মর্যাদা পাচ্ছিল ইংরাজি সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তারা আরো পিছিয়ে পড়লেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি কিছুটা অনীহা কিছুটা সুযোগের অভাবে তাঁরা নবযুগের ভাবকেন্দ্রের বাণী আত্মস্থ করতে পারলেন না। ১৮৪৯ সালে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শকে গ্রহণ করে যে ব্যক্তিসত্তার জাগরণ হিন্দু সমাজে সম্ভব হয়েছিলো মুসলমানরা তা থেকে পিছিয়ে পড়লেন। একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের ১৩টি স্কুল কলেজের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অতি সামান্য অংশই ছিল মুসলমান ছাত্র।[৩৯] ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারার পিছনে যেমন তাদের মধ্যে সচেতন দিক-নির্দেশের অভাব ছিলো তেমনি ইংরেজ সরকারেরও একটি অনুদার ভূমিকা ছিলো। ইংরেজরা প্রথমদিকে মুসলমানদের প্রতি আস্থা রাখতে পারেনি। তারা তাদের সন্দেহ করেছে। মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সচেতনতার অভাব দেখা দিয়েছিলো। এই যুগোচিত শিক্ষার এবং সমাজের সংস্কারের অভাবে তারা ক্রমশ বেশী করে নিজেদের প্রথাবদ্ধ সমাজ এবং ধর্মের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে তাঁরা ক্রমশ হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকেন। এবং বেশী করে ধর্মকে আশ্রয় করেন। ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন ১৮৩৭ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত কাল মুসলমান সমাজের পতনের কাল।[৪০] হিন্দু সমাজ কিন্তু তখন অগ্রগতির স্বপ্ন দেখছে।

৫.

রামমোহনের মধ্যে রাজনীতি চেতনা ও আন্তর্জাতিকতার প্রথম অস্পষ্ট সূচনা হলেও তিনি ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করতেন। তিনি "সামাজিক ও ধর্মীয় মুক্তি এবং ব্যক্তিগত মানুষের চিন্তায় মননে ও আচরণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন।"[৪১] এই দাবীর সার্থকতা এই যে সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে তিনি দেশবাসীর চিত্তকে গড়ে তুলে বৃহৎ মানবতার মধ্যে তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। এই কারণে তিনি ইংরেজ শাসনকে স্বীকার করতেন। কেননা তাঁর মনে হয়েছিলো ইংরেজ শাসনে "জ্ঞানের বিস্তার, যুক্তিবাদ, অধিকার বোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা"-র[৪২] উদ্ভব হয়েছিলো। এই কারণে ইংরেজ জাতিকে তিনি মুক্তিদাতা ও রক্ষাকর্তা বলেছিলেন। রামমোহনের এই চিন্তার পিছনে যে অর্থে জাতিগঠনের চিন্তা ছিলো পরাধীন দেশে তা সম্ভব ছিলো না। ফলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে এদেশের যে

গঠন হল তা বিকৃত এবং বিরূপ। কারণ ইংরেজ এদেশে নিজের শাসনকার্যের উপযোগী যে শ্রেণী গড়বার কাজে শিক্ষাকে ব্যবহার করলো তারা হলো একটি অনুকারক শ্রেণী; সেকালের ভাষায় 'Indian in blood and colour but English in tastes in opinions in moral and intellect' [৪৩] এই নূতন শ্রেণী সেকালের বাঙলাদেশের সমাজের নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত শক্তি। কিন্তু এদেরই হাতে গড়ে উঠলো জাতীয় চেতনার প্রথম মঞ্চ। ভারতবর্ষের সিপাহী বিদ্রোহকে বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সমর্থন করেনি। বিদ্রোহী মুসলমান সমাজ এই ইংরেজ শাসনাধিকারকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেনি। এরই প্রতিক্রিয়ায় একদিকে ওয়াহাবী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলো। এই আন্দোলন কেবল তাদের জাতীয় সংগঠনকারী শক্তি হিসাবে কাজ করলো না, তা ভূমি-নির্ভর কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক আন্দোলনও হয়ে উঠলো। এরই সমকালে নীলচাষকে কেন্দ্র ক'রে যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলো তা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রজাশক্তিকে সংগঠিত করে তোলে। নীলকরদের অত্যাচারে চাষীদের মধ্যে যে গণআন্দোলন হল তাকে একটি শক্তিশালী গণ-আন্দোলন বলা যেতে পারে। এই গণ-আন্দোলনের ধারায় এর পরেও বেশ কয়েকটি কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল এবং দরিদ্র প্রজাদের ভিতর থেকেই এর নেতার অভ্যুদয় হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর একাংশ যেমন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ এর বৌদ্ধিক সমর্থনকারী ছিলেন। এই কালেই হিন্দুদের মধ্যে যে জাতীয় রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা যায়, তার ঝোঁক হিন্দু মানসিকতার দিকেই ছিল।[৪৪] হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা, দেশীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ এবং দেশপ্রেমের উদ্দীপনার জন্য সাহিত্য রচনা এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের কয়েকটি দিক। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে। অনেকগুলি পত্র পত্রিকা সমাজের গঠন কর্মের সৃজনশীল দায়িত্ব পালন করেছে। আর বিশেষ করে গড়ে উঠেছে বাঙালীর সাহিত্য। হিন্দুদের জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠার পাশাপাশি মুসলমান সমাজেরও জাগরণ হওয়া বাঞ্ছিত ছিল। কিন্তু তেমনটি হয় নি। এর কারণ আগেই বলেছি মুসলমান সমাজে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর বিকাশে বিলম্ব। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কার ও সমাজের উন্নতির জন্য কাজ শুরু হল। তখনও নানা কারণে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে জাতীয় চেতনার ডাকে সাড়া দিতে পারলেন না। জাতীয় কংগ্রেসকে হিন্দুত্ববাদী প্রতিষ্ঠান মনে করে তাঁরা বর্জন করলেন। পাশাপাশি বসবাসকারী দুই সম্প্রদায়ের মানুষের অসম উন্নয়ণের ফলে এবং বিদেশী শাসকশক্তির কৌশলে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার কারণে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের জীবন বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে গড়ে উঠল। সে বিরুদ্ধতা বিদূরিত হয় নি। বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজের উন্নতির কাজ শুরু হয় এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র স্থাপনা থেকে কাল গণনা করেছেন ওয়াকিল আহমদ।[৪৫]

উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমস্ত ক্ষেত্রেই মুসলমান সমাজের যেমন পতনের চিত্র লক্ষ করা যায়, তেমনি এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই অবস্থার কিছু পরিবর্তনও শুরু হতে থাকে। অর্থাৎ সমগ্র ক্ষেত্রেই আধুনিক সচেতনতা লক্ষ করা যায়। এই শতকেরই একেবারে গোড়ার দিকে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে জাগরণ শুরু হয়েছিলো মুসলমান সমাজে তা শেষার্ধে দেখা দিতে শুরু করে। সুতরাং শিক্ষা, অর্থ, রাজনীতি ও সমাজ সংক্রান্ত মুসলমান সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্টীকৃত হবে।

শিক্ষা

১.

বঙ্গদেশে উনিশ শতকে যে জাগরণ হয় বাংলার হিন্দুদের মধ্যেই তার উৎপত্তি ও প্রসার। প্রথমদিকে দেশের মুসলমান সমাজকে এ জাগরণ প্রকৃত প্রস্তাবে স্পর্শ করেনি। বাঙালী হিন্দুরা কিছু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই শতকের প্রথম থেকেই ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যান। কিন্তু মুসলমান সমাজ তখন এই গ্রহণের ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েন। এই পশ্চাদপদতার কারণেই তাঁদের আধুনিক সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চাও বিলম্বিত হয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের এই অনগ্রসরতার পেছনে নানাবিধ কারণ অনুসন্ধান করা যায়। ইংরেজরা এদেশে আসবার আগে মধ্যযুগে হিন্দুদের শিক্ষার জন্য টোল, চতুষ্পাঠী আর পাঠশালা এবং মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা ও মক্তব প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মুসলমানরা বাংলা শিখতে পাঠশালায় যেতেন তবে আরবী ফারসী ভাষায় ধর্মীয় শিক্ষালাভের কারণে তাঁদের মূলত জোর ছিল মক্তব ও মাদ্রাসায়। আবার মধ্যযুগে মুসলমান আমলে ফারসী রাজভাষা হওয়ায় সরকারী সুযোগ সুবিধে লাভের আশায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ফারসী শিখতেন। এ ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে তখন উর্দু পারিবারিক ভাষা হিসেবে বেশ গুরুত্ব পেত। অবশ্য তখনকার বিদ্যা-শিক্ষার অবস্থা যে খুব খারাপ ছিল না তা এ্যাডামের রিপোর্ট থেকে জানা যায়।[৪৬] তবে মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল এই ভাষা সমস্যা। আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি একাধিক ভাষা অধ্যয়নের ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলমানদের ক্ষেত্রে নিয়মিত স্কুল-জীবনের প্রারম্ভ বিলম্বিত হত।[৪৭]

২.

ইংরেজ আগমনের পর প্রধানতঃ উনিশ শতকের প্রথম থেকে এদেশে বাঙালী জীবনে ইংরেজি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে দেখা দেয়। কেন না, এই ইংরেজি ভাষা ছিল তখন পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতিকে জানবার মুখ্য দ্বারস্বরূপ।

কোম্পানী-আমলের প্রথমদিকে ইংরেজরা এদেশবাসীকে শিক্ষাদানের কোনো প্রয়োজন অনুভব করে নি। ফলে তেমন কোন উদ্যোগও গৃহীত হয়নি। বরং তারা ভারতবাসীর জনসাধারণকে শিক্ষাদান করাটা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং সাম্রাজ্যের পক্ষে 'সমূহ বিপদ' বলে মনে করেছে। এ প্রসঙ্গে কোম্পানীর জনৈক ডিরেক্টর স্পষ্ট মন্তব্যই করেছিলেন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার কারণেই আমেরিকা তাঁদের হাতছাড়া হয়। নতুন উপনিবেশ ভারতবর্ষ সম্পর্কে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটুক তা তাঁরা চান না।[৪৮] সুতরাং সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও অবাধ শোষণের স্বার্থেই তাঁরা প্রথম পর্যায়ে কোন উদার শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন নি।

তবে এই সময়ে কোম্পানী সরকারের প্রয়োজনে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে — কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০) এবং বেনারস সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২)। কিন্তু 'হিন্দু ও মুসলিম আইনজ্ঞ কর্মচারী সৃষ্টি'ই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।[৪৯] এছাড়া প্রাচ্যবিদ্যার উন্নতির জন্যে ইউরোপীয় গবেষকদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়

'এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪)। লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন না করে তাঁরা গতানুগতিক আরবি ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষাকে সীমিত ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেন। অতঃপর ১৮০০খ্রীঃ কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এই কলেজ স্থাপনারও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বিদেশী কর্মচারীদের এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া। তবে এই কলেজকে কেন্দ্র করেই প্রধানতঃ উইলিয়ম কেরী এবং দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় সৃষ্টি হয়েছে বাংলা এবং উর্দু গদ্য সাহিত্যের যা পরবর্তীকালে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।[৫০]

কোম্পানী শাসনের প্রথম পর্যায়ে সরকারী প্রচেষ্টা না থাকলেও অষ্টাদশ শতক থেকেই এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত মিশনারী স্কুলগুলি বিকাশ লাভ করে।[৫১] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার।

এই এশিয়াটিক সোসাইটি, মিশনারী প্রচেষ্টা ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তখন বঙ্গদেশে 'নতুন শিক্ষার আলোকবর্তিকার' ভূমিকা পালন করেছিল।[৫২]

ক্রমে ইংরেজ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা আগ্রহী হয়েছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সর্বপ্রথম ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য কোম্পানীকে নির্দেশ দেয়।[৫৩] ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাখাতে বার্ষিক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের জন্য 'General Committee of Public Instruction' গঠন করেন। ১৮২৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরস ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান নির্ভর আধুনিক শিক্ষার বিষয়টি অনুমোদন করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে কোম্পানীকে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ এই টাকা ব্যয়ের নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে মেকলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁর বিখ্যাত মন্তব্যে (Minute) প্রাচীন পদ্ধতির প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাদানের তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দা করে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের উপর জোর সুপারিশ করেন। মেকলের অভিমত গ্রহণ করে লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ শিক্ষা বাবদে বরাদ্দ সমস্ত অর্থ একমাত্র ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত সরকারী নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন।[৫৪]

মেকলের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য আপাতদৃষ্টিতে প্রগতিশীল বলে মনে হলেও এর পেছনেও ছিল সংকীর্ণ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সীমিত ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে একটি ইংরেজ ভক্ত সমাজ সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করা। তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন —

> আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানকারী। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, ব্যক্তিরা হবে রক্তে, ও রঙে ভারতীয়, আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।[৫৫]

ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানিক সুযোগ অতি সীমিত থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনেক বাঙালীই ভালো ইংরেজি শিখেছিলেন।[৫৬] বাঙালী হিন্দুর ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহের ফলে ১৮১৭ খ্রী. 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া সরকারী আনুকূল্যের উপর নির্ভর না করে দেশী বিদেশী শিক্ষানুরাগীদের সহায়তায়

'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) এবং 'স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮) স্থাপিত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি পাশ্চাত্য সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত প্রভৃতি ব্যবহারিক বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে বঙ্গদেশের শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষান্দোলনের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে। 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং এই ধরণের আরো অনেক প্রতিষ্ঠান দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে।[৫৭]

কোম্পানী শাসনের সূচনা থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সুযোগ প্রধানত হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কেরী, মার্শম্যান, ডেভিড হেয়ার, বেথুন প্রমুখ বিদেশী শিক্ষাব্রতী এবং রামমোহন, রাধাকান্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বের প্রয়াস ও অবদানে হিন্দুসমাজ লাভবান হয়। ফলে এই কালপর্বে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুসমাজ এগিয়ে যায় এবং তাঁদের মধ্যবিত্ত সমাজের গঠনকার্য প্রায় সম্পন্ন হয় যা আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল।

৩.

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়লেও তাঁরা একেবারে ইংরেজি শিখতেন না তা নয়। এমনকি তখন তাঁদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে তেমন জটিল আকারও ধারণ করে নি। সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল ফারসীকে রহিত করে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের সময়। কলকাতা মাদ্রাসায় প্রথমদিকে ইংরেজি চালু করার বিষয়ে মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ করলেও পরে(১৮২৬ সালে) প্রবর্তিত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাসায় ৮৭ জন ছাত্র ইংরেজি শিখতো।[৫৮] ১৮২৬ সালে ঢাকার মুসলমানগণ শহরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে হেবসের নিকট আবেদন করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে সরকার তা অগ্রাহ্য করেন।[৫৯] মুর্শিদাবাদে মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত(১৮২৪) 'নিজামত কলেজে' ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।[৬০] ঐ সময় মিশনারী স্কুলগুলিতে মুসলমান ছাত্ররাও যে পড়ত তার প্রমাণ রয়েছে চুঁচুড়ায় প্রতিষ্ঠিত রবার্ট মে'র স্কুলগুলিতে মুসলমান ছাত্রদের উপস্থিতিতে।[৬১] সোসাইটি পরিচালিত স্কুলসমূহে মুসলমান ছাত্রেরা—হিন্দুর তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও পড়াশুনা করত।[৬২] কাজেই ইংরেজি ভাষা ও বিদ্যার প্রতি ঐ সময় তাঁদের একেবারে বিরূপ মনোভাব ছিল না।[৬৩] প্রকৃতপক্ষে যখন চাকুরী প্রভৃতির প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষা আবশ্যিক রূপে দেখা দিল বা পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখনই মুসলমান সমাজে নানাবিধ সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল।

মুসলমান সমাজে তখন আশরাফ আতরাফ (উচ্চ নীচ) সামাজিক শ্রেণীভেদ ছিল। আশরাফ বা অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মতো শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও চর্চা ছিল। পক্ষান্তরে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ আতরাফ বা অনভিজাত মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিষয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না। গ্রামাঞ্চলে যদিও মক্তব মাদ্রাসায় এরা শিক্ষার্জন করত তবু তা ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ — কোন বৈষয়িক জ্ঞানচর্চার মনোভাব তাঁদের প্রায় ছিল না। সুতরাং তাঁদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্নই আসে না। আবার অভিজাত মুসলমানদের একটি অংশও সমাজের পার্থিব ভালমন্দের কথা না ভেবে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অধিক নজর দিতেন। যেহেতু ইসলামের ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি আরবী ফারসীতে লেখা, সেহেতু আরবী ফারসী শিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য তখন ফারসী শিক্ষার মানও উন্নত ছিল।[৬৪]

মধ্যযুগের মুসলমান শাসনামল থেকে কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমদিক পর্যন্ত ফারসী ছিল সরকারী ভাষা। কাজেই বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি এই ভাষাটি ক্রমে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছেই সামাজিক মর্যাদালাভের প্রতীকও হয়ে উঠেছিল। কবি ভারতচন্দ্র থেকে শুরু করে রাজা রামমোহন রায় পর্যন্ত অনেক কবি বা মনীষীগণ ফারসী চর্চা করেছিলেন। আর শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমানদের রচিত অধিকাংশ গ্রন্থই ছিল ফারসীতে লেখা। ফলে বিশেষ করে মুসলমান সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারগুলিতে ফারসী মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতীক স্বরূপ ছিল। এই রাজভাষা ফারসীর স্থান-চ্যুতিতে মুসলমানরা সাময়িকভাবে ভীষণ আঘাত পান এবং বৈষয়িক সুবিধে হারাবার ফলে তাঁদের এই আঘাত আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং "আইনের দ্বারা একটা ভাষার মুণ্ডচ্ছেদ হলেও যাঁরা এ ভাষাকে ভালবাসেন তাঁরা রাতারাতি এটিকে বিসর্জন দিতে পারেন নি।"[৬৫] ফলে এ সময় তাঁরা যুগোপযোগী শিক্ষাগ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু তখন হিন্দু সমাজ যুগের দাবীর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে ১৮৩৫ সালে যখন ফারসীর বদলে ইংরেজী চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন হিন্দুরা তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বদরুদ্দিন ওমর বলেছেন যে, অগ্রসর হিন্দুদের এই পরিবর্তিত মনোভাবকে পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজ ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁরা রাজভাষা ফারসীর স্থান-চ্যুতির পেছনে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের গোপন ষড়যন্ত্র বলে মনে করেছিলেন।[৬৬] আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষার প্রতি মেকলের চরম ঘৃণার মনোভাব।[৬৭] এতে মুসলমানরা স্বাভাবিক কারণে বেশী ক্ষুব্ধ হন এবং নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে থাকবার প্রবণতা আরো প্রবল হয়। সুতরাং ফারসীর স্থান-চ্যুতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজই বৈষয়িক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হিন্দু সমাজ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে সেই ধাক্কা সামলে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা সেখানে ইংরেজি শিক্ষার অভাবে চাকুরী প্রভৃতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আর্থিক দিক থেকে ভীষন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে যুগের তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজি বিমুখতার পেছনে মুসলমানদের জাত্যাভিমান ও ধর্মীয় গোঁড়ামিও যে কার্যকরী হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ এর পশ্চাতে ছিল তাদের 'কয়েক শ বছর ভারত শাসন করার অহমিকা।'[৬৮] "ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান সমাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গোঁড়ামি ও গর্ববোধ থাকা তখন স্বাভাবিক" ছিল।[৬৯] কাজেই সে সময় "মুসলমানদের নিকট ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণে সম্মত হওয়ার অর্থ ছিল, তাদের নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি নতুন বিদেশী ব্যবস্থার নিকট প্রতিরোধহীন আত্মসমর্পণ।"[৭০] আর মুসলমানদের এই প্রতিরোধ আন্দোলনের পেছনে কাজ করেছে ধর্মীয় নেতা শাহ আবদুল আজিজের একটি ফতোয়া (ভারতকে 'দারুল হর্‌ব' অর্থাৎ 'শত্রুর দেশ' বলে ঘোষণা করা) যা সরাসরি ইংরেজি শাসনের বিরুদ্ধে বলা হয়েছিল। অবশ্য তিনি ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। কিন্তু তখনকার এই ইংরেজ শাসন বিরোধিতার কারণে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধেও বিরূপ করে তুলেছিল।[৭১] এর ফলে আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানরা ইসলামী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের নামে এই ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে ছিলেন। আবার অন্যদিকে এই বঙ্গদেশে ওয়াহাবী ও ফরায়েজী দুটি ধর্ম ও সমাজ সংস্কার-মূলক আন্দোলনকালে গ্রামের সাধারণ মুসলমানেরা রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে ইংরেজ-শাসন বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে "ইংরাজী-ভাষা-সংস্কৃতি মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফতোয়া জারি হয়।"[৭২] গ্রামের মুসলমানদের এই ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিরোধী মনোভাবের

পরিচয় দিতে গিয়ে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'আমার জীবনী'তে লিখেছেন ঃ

> ইংরেজী পড়িলে পাপ ত আছেই, আর মরিবার সময় গিডিমিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ রসুলের নাম মুখে আসিবে না। তাহার পরেও আত্মীয় স্বজন গুরুজনগণের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংরেজী পড়িলেই, একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়।[৭৩]

তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ায় অনেকে ধর্মহানির আশঙ্কা করেছিলেন।[৭৪] অবশ্য তখন এ আশঙ্কার মূলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপও অনেকটা দায়ী ছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতার একটি প্রধান কারণ হল দারিদ্র্য। সদ্য শাসনক্ষমতা হারানো অভিজাত মুসলিমদের পূর্ব থেকে ভোগ করে আসা সামরিক, রাজস্ব ও বিচার বিভাগের চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল প্রভৃতি নানা কারণে (যা 'অর্থনীতি' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে) মুসলমানরা দারিদ্রবস্থার মধ্যে পতিত হন। সে সময়কার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে উইলিয়ম হান্টার বলেছেন ঃ

> একশো সত্তর বছর আগে একজন বাঙালী মুসলমানের পক্ষে গরীব হওয়া অসম্ভব ছিল, আর আজ তার পক্ষে ধনী হিসেবে টিকে থাকাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৭৫]

এই মুসলমানদের পক্ষে ব্যয়বহুল শহুরে ইংরেজি স্কুলে পড়ানোর মতো সামর্থ্য তখন ছিল না। এ প্রসঙ্গে ডঃ এ. আর. মল্লিকের মতটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

> The early efforts of the company to educate the people were made in the city of Calcutta where the Hindus predominated. The over-whelming Muslim majority districts of East and North Bengal did not receive the much needed attention of the Government till very late. Another factor was the known poverty of the Muslims which made it impossible for them to educate themselves without adequate help from the Government.[৭৬]

এর উপরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের মুসলিম-বিদ্বেষ। সে কারণে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান উইলিয়াম হান্টারও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "বহু ইংরেজ কর্মচারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিরন্তর ঘৃণামিশ্রিত রোষ নিয়ে এদেশে চাকরি করে গেছেন।"[৭৭] মুসলমানদের কাছ থেকে শাসন-ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হয়েছে বলে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের অবিশ্বাস ও বিদ্বেষভাব ছিল। সে কারণে ইংরেজ শাসকরা হিন্দুদের মত শিক্ষার সুযোগ মুসলমানদের দেননি। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে বিনয় ঘোষ তাই মন্তব্য করেছেন ঃ

> প্রথমযুগে ব্রিটিশ গর্বমেন্টের নীতি মুসলমান বিদ্বেষ এবং হিন্দু পক্ষপাতিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই হিন্দুরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছেন, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং ইংরেজদের অধীনে কিছু কিছু মোটা বেতনের সরকারী চাকরিও পেয়েছেন। মুসলমানরা সে রকম সুযোগ বা উৎসাহ পাননি।[৭৮]

কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। এই সময় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ একলক্ষ টাকা ব্যয় করার ক্ষেত্রে ১৮১৪ সালের ৩রা জুনের ডেসপ্যাচে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স যে নির্দেশ দেন তাতে মুসলমানদের স্বার্থ এবং আরবী ফারসী বিদ্যা-শিক্ষা

বা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় অথচ হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষায় উক্ত অর্থ ব্যয় করার জন্য বলা হয়েছিল।[৭৯] ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত General Committee of Public Instruction ঐ টাকার বেশীর ভাগ বেসরকারী হিন্দু কলেজের জন্যে ব্যয় করেন।[৮০] হিন্দু কলেজে মুসলমানদের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ডেসপ্যাচে হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের কথা বলা হলেও সরকারী প্রতিষ্ঠান কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয়নি। সুতরাং তৃতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক এবং ফলভোগী ছিল হিন্দু সম্প্রদায় আর অন্যান্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ মুসলমান সমাজ সে সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিল।

এই সময়ে সরকারী আরো কিছু আদেশের ফলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অসমবিকাশ বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে থেকে সরকারী কাজে ফারসী ভাষাকে স্থানচ্যুত করে ইংরেজি অথবা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সরকারী কাজে সুযোগ সুবিধে লাভ করতে থাকেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু কলেজে' আইন পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের জন্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চালু হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টরের পদ কেবলমাত্র ইংরেজি-জানা ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত আইন পরীক্ষা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে চালু হয় এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র আইনের গ্রাজুয়েটরাই মুন্সেফ হবার যোগ্য বলে সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্তে আরো ঘোষণা করা হয় যে, কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষায় সফল হতে পারলেই ভালো সরকারী পদ লাভ করা সম্ভব হবে। আবার মুসলমানদের অর্থে স্থাপিত হুগলী মহসীন কলেজে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বটে কিন্তু সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রই পড়বার সুযোগ থাকায় হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল।[৮১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র শহুরে এবং ইংরেজি-অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এই সমস্ত সরকারী ব্যবস্থাপনায় বেশী লাভবান হয়েছেন। মুসলমানরা তখন ইংরেজি শিক্ষায় পিছিয়ে থাকায় তা থেকে আরো বঞ্চিত হয়েছেন। কলকাতা মাদ্রাসায় প্রাথমিক মানের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হত বটে, কিন্তু তাঁরা কলেজের উচ্চশিক্ষিত প্রতিযোগীদের সঙ্গে তেমন এঁটে উঠতে পারতেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্বেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। নচেৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে প্রথমদিকে হিন্দুদের মধ্যেও সংস্কার বা বিরোধিতা কম ছিল না। কিন্তু সেক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ রাজা রামমোহন রায়ের মতো উদার ও সংস্কারপন্থী নেতার সহযোগিতা তাঁরা পেয়েছেন। মুসলমানদের মধ্যে তখন সে রকম কোন নেতার আবির্ভাব ঘটেনি। সে কারণে তাঁদের ষাটের দশকে নবাব আবদুল লতিফ এবং তার কিছু পরে সৈয়দ আমীর আলীর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত বাঙালী মুসলমান সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রেও চরম বিপর্যয় ও নৈরাশ্যের কাল গেছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালী মুসলমান সমাজের নতুন যাত্রা শুরু হয়। কেন না সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) পর্যন্ত মুসলমানদের সরকারী বঞ্চনা ও হতাশার দিকটি ছিল প্রবল। সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলমানদের উপর ইংরেজ শাসক যেমন কঠোর দমন পীড়ন করেন তেমনি এর পর থেকে মুসলমানদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে। এতদিন ধরে মুসলমানরা তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক দুর্গতির জন্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে

আসছিলেন। ইংরেজ শাসক অনুভব করলো, তাদের পশ্চাদপদতার মূলে রয়েছে শিক্ষার অভাব। এছাড়া এ সময় রেভারেণ্ড জেমস লঙ, উইলিয়াম হান্টার প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতগণও মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ ব্যাখ্যা করে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের উন্নয়নের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভাসা ভাসা ভাবে হলেও তখন থেকে মুসলমানদের শিক্ষা প্রসারে সহানুভূতির সঙ্গে অনুধাবন করার মনোভাব ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে লক্ষ করা যায়। ওয়াহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলনের স্মৃতির দ্বারা আতঙ্কিত হওয়ার দিন তাদের শেষ হয়। পক্ষান্তরে এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষায় অনগ্রসরতা সম্পর্কে সাধারণভাবে সচেতনতা লক্ষ করা যায়। তাঁরা, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা উপলব্ধি করেন, এই অনগ্রসরতা কাটাতে হলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সংঘাতে নয়, তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব।

আধুনিক জীবনের প্রধান সঞ্জীবনী মন্ত্র ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার মধ্য দিয়েই মুসলমান সমাজের নবচেতনা জাগ্রত হয়। পঞ্চাশ বছর আগে হিন্দু সমাজ যা করেছিল, পঞ্চাশ বছর পরে মুসলমান সমাজকে সেই পথ অনুসরণ করতে হল। কলকাতা মাদ্রাসার জুনিয়র স্কলারশিপ পাশ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ (১৮২৮—১৮৯৩) ১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করে কলকাতার অভিজাত মুসলমানদের চিন্তার জগতে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন।[৮২] এর কিছু পরে সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯—১৯২৮) 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮) প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের উভয়ের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনে কোন দ্বিমত ছিল না। তাঁদের স্থির লক্ষ্য ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই মুসলিম সমাজের মোহের আবরণ ছিন্ন হয় এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবাধ আগ্রহ দেখা দেয় ও ইংরেজি চর্চা শুরু হয়। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে লেখা পড়ার চর্চা হিন্দু মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই তেমন ছিল না। সুতরাং তাদের কথা আলাদা। যে অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাচর্চা অব্যাহত ছিল তাদের নতুন মন্ত্রে উজ্জীবিত করার প্রয়োজন ছিল। কারণ, তাঁরাই গোঁড়ামি ও জাত্যাভিমানের কারণে ইংরেজি শিক্ষা থেকে বিমুখ ছিলেন। আবদুল লতিফ ও আমীর আলী জাতির সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলে ঐ নবমন্ত্রে ডাক দিয়েছেন এবং যথেষ্ট সাড়া পেয়েছেন। গোঁড়া মুসলমানদের সামান্য বাধা থাকলেও তা অতিক্রম করতে তাঁদের তেমন অসুবিধে হয়নি। তাঁদের প্রধান সংগ্রাম করতে হয়েছে সমাজের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে দাবী আদায়ের মধ্যে। কারণ ততদিনে ব্রিটিশ নীতির ফলেই শিক্ষা দীক্ষা ও চাকরির সমস্ত ক্ষেত্রেই শিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কর্তৃত্ব পুরোপুরি কায়েম হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা হতদরিদ্র হয়ে পিছিয়ে পড়েছিল।

আবদুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসাগুলিতে আরবী ফারসী শিক্ষা চালু রাখারও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে জনচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফারসী ভাষায় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদানের ঘোষনা করেন এবং শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে পুরস্কৃতও করেন।[৮৩] ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পরামর্শ অনুসারেই কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসী বিভাগ খোলা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র জুনিয়র স্কলারশিপ পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।[৮৪] অতঃপর তিনি মুসলমানদের উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষার দাবীতে সরকারের কাছে আন্দোলন করেন। তাঁর এই আন্দোলনের ফলে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ সরকারী খরচে পরিচালিত প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং এখানে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমান ছাত্ররাও পড়বার সুযোগ লাভ করে।[৮৫] এ যাবৎ মহসীন ফাণ্ডের টাকা

149649
13 MAR 2003
Library

সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়ে আসছিল। ফলে হুগলী মহসীন কলেজে হিন্দু ছাত্রদেরই আধিক্য ছিল। অবশ্য যদিও হাজী মহম্মদ মহসীনের উইলে উক্ত টাকা কেবলমাত্র মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে এমন কথা বলা না থাকলেও এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ ছিল। আবদুল লতিফ ১৮৬১ সাল থেকে বারে বারে আবেদন করে এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মহসীন ফাণ্ডের টাকা সাশ্রয় করে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা স্থাপন করতে পরামর্শ দেন। অবশেষে ১৮৭৩ সালে সরকার তা কার্যকরী করেন। এইসঙ্গে মুসলমান ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস ও বেশ কিছু বৃত্তিদানেরও ব্যবস্থা হয়।[৮৬] ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জে.পি. গ্রান্ট আবদুল লতিফকে মুসলমানদের অভিযোগ সম্পর্কে মতামত জানাতে বলেন। সে অনুসারে তিনি একটি প্রবন্ধ (A Minute on the Hoogly Madrassah, Calcutta 26 December, 1861) লিখে বাংলাদেশের মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। তিনি এই প্রবন্ধে মুসলমান সমাজে আরবী ফারসীর মর্যাদার কথা ভেবে ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে আরবী-ফারসী শিক্ষারও ব্যবস্থার কথা বলেন। তিনি মুসলমান সমাজকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেন — (১) বিজ্ঞ শ্রেণী (Learned class) এবং অন্যটি বৈষয়িক শ্রেণী (Worldly class)। প্রথম শ্রেণীর মুসলমানেরা ধর্মচর্চায় নিমগ্ন। এঁরা দরিদ্র, সংখ্যায় অল্প কিন্তু সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত ও প্রভাবশালী। এঁরা আরবীরই চর্চা করেন — ইংরেজির প্রতি তাঁদের আগ্রহ নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমানেরা জাগতিক বিষয়ে বেশী আগ্রহী। সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যবসায়ীরা এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা ইংরেজি শিখতে আগ্রহী ছিলেন। সে কারণেই তিনি প্রথম শ্রেণীর জন্য আরবী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ইংরেজি ফারসী শিক্ষার পক্ষে সুপারিশ করেন।[৮৭] তাছাড়া তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়নে এবং গ্রন্থ নির্বাচনে মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার কমিশনের ভাষাশিক্ষার বিষয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের জন্যে যথাক্রমে উর্দু ও বাংলা দুটি পৃথক ভাষা মাধ্যমের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে সংস্কৃতবহুল বাংলাভাষার সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দযুক্ত করে তাকে মুসলমানীরূপ দেওয়ার কথাও বলেছিলেন[৮৮]।

শিক্ষাক্ষেত্রে আবদুল লতিফের অবদানের গুরুত্ব স্বীকার করেও একটি কথা বলতে হয় যে, তিনি ইংরেজী শিক্ষা ও আরবী-ফারসী শিক্ষার ক্ষেত্রে দোলাচল মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে একটা স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে তিনি পেরেছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁর সংগঠন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন'ও বাংলার মুসলমান সমাজের শিক্ষা প্রসারে এবং নতুন চেতনা সঞ্চারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তিনি আবদুল লতিফের চেয়ে প্রগতিশীল ও আধুনিক ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইস অব্ রিপনকে প্রদত্ত 'স্মারকপত্রে' তিনি বলেছিলেন ১৮৩৭ সালেই ফরাসী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। এ কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসী বা উর্দুর বদলে ইংরেজী মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমেই জাতির পুণর্জাগরণ সম্ভব বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।[৮৯] ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেই হান্টার কমিশনের কাছে তাঁর এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপিতে হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদ্রাসাগুলি তুলে দিয়ে কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যে কলকাতায় একটি ইংরেজী কলেজ স্থাপনের কথা বলা হয়েছিলো। অবশ্য আবদুল লতিফ এ মতের তীব্র বিরোধিতা করেন।[৯০] এ ছাড়া তিনি ও তাঁর এ্যাসোসিয়েশনের গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তিদান এবং বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠার কার্যসূচীর মাধ্যমে

মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে ও উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে ছিলো। বস্তুত আমীর আলী ও তাঁর সংগঠন শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে জনচেতনা সৃষ্টি ও "আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পাশ্চাত্য শিক্ষার" পক্ষে যাবতীয় প্রয়াস ব্যাপৃত করেছিলেন।

এছাড়া আরও কিছু শিক্ষিত মুসলমান, শিক্ষানুরাগী, জমিদার-জোতদার এই সময় বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে এবং নানা জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেন। ক্রমে মুসলমান লেখকেরাও বাংলা ও পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে একে ব্যাপক আন্দোলনের রূপ দেন।[৯১]

এই সমস্ত উচ্চশিক্ষিত মুসলমান নেতার কর্মপ্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সহায়তার সঙ্গে সে সময়কার বাস্তব সুযোগ-সুবিধার আকস্মিক যোগে বাঙালী মুসলমানেরা আধুনিক শিক্ষা লাভ করতে অগ্রসর হল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলাদেশে পাট চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে ১৮৫০ সালে এদেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ফলে পাটচাষের পরিমাণ বাড়ে ও পাটের দামও বাড়ে। অর্থকরী ফসলের জন্য গ্রামের মুসলমান কৃষকের হাতে নগদ টাকা আসে। ফলে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলেরা বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে।[৯২]

কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা আন্দোলন বিফলে যায়নি। উনিশ শতকের সাতের দশক থেকেই এর সুফল ফলতে শুরু করেছিলো।[৯৩] সরকারী শিক্ষানীতির উদারতা, সমাজনেতাদের আন্দোলন, স্বল্পবিত্তদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি নানা কারণে মুসলমান সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে বাঙালী-মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ১৪.৭ ভাগ মাত্র স্কুল কলেজে পড়াশুনা করত, সেখানে ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৩.৮ ভাগে।[৯৪]

ফলস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজে একটি শিক্ষিত ও সচেতন শ্রেণী গড়ে ওঠে। নবযুগের পদধ্বনি শোনা যায়। ক্রমে এই শিক্ষিত সচেতন শ্রেণীর একাংশ আধুনিক সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসেন।

মুসলমান নারীশিক্ষা

এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের মুসলমান নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে কিঞ্চিত উল্লেখ না করলে মুসলমান সামাজের শিক্ষার বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তখন মুসলমান নারীদের শিক্ষার অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ঢাকার নবার পরিবারের মত বহু মুসলমান পরিবার নারীশিক্ষার পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন।[৯৫] তবে অনেক মুসলমান বনেদী পরিবারে গৃহশিক্ষার প্রচলন ছিল। অবশ্য সে শিক্ষা পর্দার অন্তরালে ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজি বাংলা শিক্ষা নারীর অন্দর মহলে প্রবেশ করেনি। আবদুল লতিফ শিক্ষার জন্য যা কিছু করেছেন তার সবই ছিল ছেলেদের শিক্ষার জন্য। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তার মনোভাব ছিল পুরোপুরি রক্ষণশীল।[৯৬] তিনি এ ক্ষেত্রে যুগধর্ম ও যুগ মানসিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সৈয়দ আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ছিল। তিনি ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান কনফারেন্সের' সভাপতির ভাষণে নারীশিক্ষার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন।[৯৭] কিন্তু তিনিও নারীশিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নি।

মুসলমান নাগরিকের প্রচেষ্টায় ১৮৯৭ সালের ১৯ জানুয়ারী 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যা ছিল মুসলমানদের উদ্যোগে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয়।[৯৯] পরবর্তীকালে কলিকাতায় এসে বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন লেখনীর মাধ্যমে আধুনিক নারীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' (১৯১১)। তবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মফস্বলে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর অবদান। তিনি গোঁড়া মুসলমানদের বিরূপ সমালোচনা উপেক্ষা করেও নিজ ব্যয়ে কুমিল্লায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[১০০] এ ছাড়া এ সময়ে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯০৩), 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩), 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' (১৮৭৬) প্রভৃতি সংগঠনগুলি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

এ সময় প্রায় সব মুসলমান লেখকই নারী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তবে প্রথমদিকে এই সব লেখকগণ ও বিভিন্ন সভাসমিতি "পরদার সহিত স্ত্রীশিক্ষা"[১০১] এবং "ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন"[১০২] এর কথাই বলেছেন। এছাড়া তাঁরা নারীর "উচ্চশিক্ষা লাভ করা" কে সমর্থন করেন নি।[১০৩] পরবর্তীকালে তাঁদের এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এমনকি সমকালেও এ নিয়ে বিতর্ক হয়। ফলে অনেকেই নারীর "ইংরেজি শিক্ষার বন্দোবস্তের"[১০৪] কথা যেমন বলেছেন, তেমনি নব্যশিক্ষিত মুসলমানগণ নারীর উচ্চশিক্ষাসহ আধুনিক শিক্ষাদানের উপর জোর দিয়ে মন্তব্য করেন— "যতদিন আমাদের মাতৃসমাজ সুশিক্ষিত হইয়া উপযুক্ত না হইবে, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা নাই।"[১০৫]

এইভাবে বাঙালী মুসলমান সমাজ ক্রমে উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে সমাজের জাগরণ ও উন্নয়নের সঙ্গে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির গভীর যোগ রয়েছে। ফলে দেখা যায়, নারীশিক্ষা সম্পর্কে মুসলমান সমাজের একটা স্থবির অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে গতিশীলতার দিকে অগ্রগমন ঘটেছে। অবশ্য যদিও এই গতিময়তা ছিল মন্থর, তবু তখন নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমাজ-মানসিকতায় একটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে।

অর্থনীতি

১.

নবাবী আমলে রায়তদের উপরে জমিদারের অত্যাচার ছিল, তবু বাংলার কৃষি ও শিল্পের অবস্থা এতটা ভেঙ্গে পড়ে নি।[১০৬] পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের নামে লুণ্ঠন শুরু করে। তাদের সরকারী রাজস্ব সংগ্রহের নীতি, ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য ও দুর্নীতি — উভয় পথেই এই শোষণ শুরু হয়। সংগৃহীত রাজস্বের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী অর্থ বিলেতে চলে যেত।[১০৭] ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পর ক্লাইভের কথা অনুযায়ী "সমস্ত খরচ বাদ দিলেও কোম্পানীর খাঁটি মুনাফা" হয় "অন্তত ১২২ লক্ষ সিক্কা টাকা বা ১৬, ৫০, ৯০০ পাউণ্ড স্টার্লিং।"[১০৮] আবার অন্যদিকে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে ইংরেজরা ব্যক্তিগতভাবে এদেশের লোকের কাছে যে ঘুষ আদায় করে, তার একটি অসম্পূর্ণ হিসাবেই পাঁচ কোটি টাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০৯]

এইভাবে ইংরেজ বণিকদের নির্লজ্জ শোষণ ও লুঠতরাজ চলতে লাগল। কারুশিল্প ও কুটির শিল্প

> ধ্বংস তো হলই, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বাংলার কৃষকের ও কৃষির চরম অবনতি ঘটল।[১১০]

এর ফলস্বরূপ ১৭৭০-৭১ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে ইতিহাসে কুখ্যাত। কিন্তু তাতেও কোম্পানীর আয় কমে নি বা জুলুম অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস পায় নি। দুর্ভিক্ষে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় এবং চাষবাসের চরম ক্ষতি হয়। তবু দুর্ভিক্ষের পরের বছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি রাজস্ব সংগৃহীত হয়।[১১১] এইভাবে সাধারণ প্রজারা যেমন সর্বস্বান্ত হতে থাকে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও ভেঙ্গে পড়ে। অন্যদিকে দুর্ভিক্ষে উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও বিপর্যস্ত হয়।

এদেশে দীর্ঘকাল চাষীর ভূমির উপর ব্যক্তিগত সত্ত্ব ছিল না।[১১২] কিন্তু ইংরেজ আমলে এই পদ্ধতির পরিবর্তন হল। পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে যে সব রাজকর্মচারী রাজস্ব বিভাগের কাজ করতেন তাঁরা ক্রমে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার হয়ে ওঠেন। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী সেকালের জমিদারেরা একালের জমিদারদের মত ভূমির স্বত্বাধিকারী হয়ে ওঠেননি। গ্রামের প্রজারাও চাষবাস করবার জন্য উত্তরাধিকারসূত্রে ভূমির স্বত্ব ভোগ করত। কিন্তু এ সবই ছিল প্রথানুগত। বিধিবদ্ধভাবে তা কোথাও লিপিবদ্ধ ছিল না।[১১৩] মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে অতিরিক্ত অর্থলোলুপতার কারণে তাঁরই প্রবর্তিত 'মালজামিনী' ব্যবস্থায় এইসব রাজা ও জমিদারদের পতন ঘটে এবং নতুন রাজস্ব সংগ্রাহক ''ইজারাদার''দের প্রতিপত্তি শুরু হয়। এঁরাই পুরোনো জমিদারদের স্থান দখল করে ফেলেন এবং 'জমিদার' বা 'রাজা' বা 'মহারাজা' হিসেবে পরিচিত হন।[১১৪]

কোম্পানী রাজস্ব আদায়ে আরো সুষ্ঠু ও নিশ্চিত পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য প্রথমে 'পাঁচসালা' এবং পরে 'দশমালা' বন্দোবস্ত করেন। অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব বাংলাদেশের আর্থসামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এর ফলে আবহমান কাল ধরে প্রচলিত এদেশের ভূমি ব্যবস্থার রূপ ও রীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটল। জমিদার বংশানুক্রমিক ভোগদখলিস্বত্ব লাভ করল। বঙ্গদেশে জমিদারদের পক্ষ থেকে সরকারকে দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছিল, চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু বন্দোবস্তের প্রথম বছরেই জমিদারগোষ্ঠী কৃষক প্রজার নিকট থেকে এর প্রায় তিন গুণ খাজনা আদায় করেন। এই অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১১৫] এর ফলে কৃষকসমাজ ক্রমশ নিঃস্ব ও ভূমিহীন হয়ে পড়ে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে বহু পুরানো জমিদার জমিদারী হারালেন। নতুন অবস্থায় তাঁরাই জমিদারী লাভ করতে পারলেন যাঁদের হাতে নগদ অর্থ মজুদ ছিল। এর ফলে এক শ্রেণীর অনুগত জমিদার সৃষ্টি হয়েছিল যাঁরা পরবর্তীকালে নতুন শাসকের প্রয়োজনসিদ্ধ করেছিলেন।[১১৬]

কোম্পানী এবং বৃটিশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহে এ দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদেশী কোম্পানীগুলি লাভবান হতে থাকলেও দেশীয় কোম্পানীগুলি মার খেতে থাকে। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ইংল্যাণ্ডের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে।[১১৭] খুব স্বল্পকালের মধ্যেই এদেশে তিন-চারশ নীলকুঠি গড়ে ওঠে। এছাড়া তারা এখানকার তাঁত শিল্পকেও ধ্বংস করে। ফলে এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল এদেশীয় তাঁতীরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২.

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এই বিপর্যস্ত অর্থনীতির মধ্যে পড়ে। কিন্তু মুসলমান সমাজের উপর তার প্রতিক্রিয়া একটু বেশিই হয়। হান্টার বলেছেন, বাংলাদেশে "মুসলমানরাই ব্রিটিশ শাসনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[১১৯]

প্রাক-ব্রিটিশ পর্বের মুসলমান সমাজকে সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ ক. অভিজাত শাসকগোষ্ঠী খ. শাসন-সহায়ক শক্তি ঃ মধ্যস্বত্বভোগী সরকারী বেসরকারী কর্মচারী, জমিদার জোতদার, ছোটখাট ব্যবসায়ী ও কারিগর, এবং গ. বৃত্তিজীবী গ্রামীণ মানুষ ঃ কৃষক, দিনমজুর, জেলে-জোলা, মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি।[১২০] এই তিন শ্রেণীর মানুষই ইংরেজ শাসনের অভিঘাতে বিপর্যস্ত হয়।

হান্টার বলেছেন ঃ একজন খান্দানী মুসলমান "সেনাদলে নিয়োগ, খাজনা আদায় এবং বিচার অথবা শাসন বিভাগে চাকরি" থেকে রোজগার করতেন।[১২১]

কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর এঁদের আয়ের উৎস বিনষ্ট হয়। মুসলমান সৈন্যদের পরিবর্তে ইংরেজ সিপাহীরা নিযুক্ত হওয়ায় তাঁরা কর্মচ্যুত হন।[১২২] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলমান কর্মচারীদের বাদ দিয়ে ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করা হয়। আগে শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ প্রভৃতি বেসামরিক চাকুরিতে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এখন শাসনযন্ত্রে নিযুক্ত মুসলমান আমিল ফৌজদারেরা অধিকার-চ্যুত হন। মুসলিম আইনের প্রাধান্যের কারণে বিচার বিভাগে মুসলিম নিয়োগ অবধারিত ছিল। কাজীর পদটি বংশানুক্রমে পূরণ করা হত। কিন্তু বিচার বিভাগেও মুসলমান ক্ষমতা লুপ্ত হয়। এইভাবে অধিকাংশ দায়িত্বশীল পদগুলিতে মুসলমানদের পূর্বেকার প্রাধান্য দ্রুত খর্ব হতে থাকে।[১২৩] এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায় এবং আর্থিক অবস্থারও অবনতি ঘটে।

কোম্পানী শাসনামলের প্রথম পঞ্চাশ বছর সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদেরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল।[১২৪] কিন্তু সরকারী কিছু নীতির ফলে এবং ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে না নেওয়ার কারণে মুসলমানদের অধঃপতন শুরু হয়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজরা বিরূপ হয় এবং ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে এই বিরূপতা আরো বৃদ্ধি পায়। এতদিন পর্যন্ত সরকারী কাজে ফারসী ভাষারই কদর ছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ফারসীকে তাঁরা আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হল। বাঙালী হিন্দুরা সহজেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করলেন। কিন্তু মুসলমানরা স্বধর্ম থেকে পতিত হবার ভয়ে[১২৫] রাজার জাত বলে প্রবল আত্মাভিমানে[১২৬] এবং যুগোপযোগী সচেতনতার অভাবে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা গ্রহণ করলেন না। ফলে মুসলমান রাজত্বের তুলনায় সরকারী চাকুরীতে হিন্দুর সংখ্যা বাড়তে লাগল। কমতে লাগল মুসলমানের সংখ্যা। হান্টার ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসের সিভিল লিস্ট অনুসারে গেজেটেড পদের চাকুরীর যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত মোট ২১১১ জনের মধ্যে ১৩৩৮ জন ইংরেজ, ৬৮১ জন হিন্দু এবং সে ক্ষেত্রে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯২ জন।[১২৭] এমন কি চিকিৎসা ও আইন ব্যবসায়ের মতো স্বাধীন পেশার ক্ষেত্রেও মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েন।

ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলমানের অসম বিকাশ উনিশ শতকে মুসলমানদের পশ্চাৎ পদতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

নবাবী আমলে ভূমি-ব্যবস্থায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দুদের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। নবাবেরা জমির ইজারাদার এবং শাসন ব্যবস্থার উচ্চপদে বেশীর ভাগ বাঙালী হিন্দুদেরই নিয়োগ করতেন। কানুনগো বিভাগের সব কর্মচারী, বড় বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন।[১২৮] ফলে হিন্দুদের একাংশের হাতে প্রচুর অর্থ আগে থেকেই ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার প্রাচীন ও বনেদী হিন্দু-মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হিন্দু সমাজ অনেকাংশে এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। হান্টার সাহেব মিঃ জেমস ও কিনীলের বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন ঃ

> এ পর্যন্ত যে সব হিন্দু গোমস্তা অত্যন্ত ছোটখাট স্তরের কাজে নিযুক্ত ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা সবাই জমিদার বনে গেল, জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করলো এবং তাদের ঘরে সেই সব ধন দৌলত জমা হতে লাগল, যেগুলি পূর্বে মুসলমানদের আমলাদারীতে তাহাদেরই ঘরে জমায়েত হতো।[১২৯]

এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান যে মন্তব্য করেছেন তাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

> নতুন অবস্থায় তাঁরাই জমিদারী লাভ করতে পারলেন যাঁদের হাতে নগদ অর্থ মজুত ছিল। এই শর্ত পালন করতে পারলেন কেবল নবাবী আমলের হিন্দু রাজস্ব সংগ্রাহকেরা। তাই নতুন জমিদার শ্রেণীতে হিন্দু প্রাধান্যই দেখা যায়। একথা বলা যেতে পারে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে বাংলার ধনবান হিন্দুরা পুনর্গঠনের যে সুযোগ পেলেন, নগদ অর্থের অভাবে মুসলমানেরা তা থেকে বঞ্চিত হলেন।[১৩০]

এছাড়া কলকাতাবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, কোম্পানীর দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, দালাল, পোদ্দার, মহাজন প্রভৃতি — যাঁরা ইংরেজের অনুগ্রহ ও সহযোগিতায় প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁরা নিলামে অনেক জমিদারী ক্রয় করেন। এইভাবে স্বল্প-সংখ্যক যে জমিদারী মুসলমানদের ছিল তাও প্রায় হাতছাড়া হল। যা অবশিষ্ট ছিল তাও আবার মুসলমানী উত্তরাধিকার আইনের ফলে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে এককালের জমিদার কয়েক পুরুষের ব্যবধানে ভূমি-কৃষকের ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য হন।[১৩১] এমনিতে পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে বেশীর ভাগ কৃষক ছিলেন মুসলমান।[১৩২] এর ফলে কৃষক মুসলমানের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন' -এর বলে বহু 'লাখেরাজ' (নিষ্কর ভূমি) সম্পত্তি মুসলমানদের হাতছাড়া হয়। এই জমিগুলি মুসলমান নবাব বাদশাহগণ তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদ, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং আশ্রিত ব্যক্তিদের দান করেছিলেন। এই আইনের বলে বহু অভিজাত মুসলমান পরিবার সর্বস্বান্ত হয়।

এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের সরকারী নীতি ও শোষণ বুদ্ধির ফলে বাংলাদেশের শুধু অভিজাত মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হননি সেই সঙ্গে কৃষক - তাঁতি - কারিগর প্রভৃতি বহু গ্রামীণ সাধারণ মানুষও আর্থিকভাবে ক্রমশঃ নিঃস্ব হয়ে গেছেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আর্থিক পশ্চাদপদতার কারণেই মুসলমান সমাজ যেমন আধুনিক নগর সভ্যতার শিক্ষা সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারেননি, তেমনি সমকালের অগ্রসরমান হিন্দু সমাজের সঙ্গে সমতালে এগিয়ে যেতে পারেন নি। বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে রেনেসাঁসের একটা সম্পর্ক রচনা করা হয়েছে। বাঙালী মুসলমান সমাজ অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার ফলে এমনই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিক্ষায় এবং চাকরিতে বেশি পরিমাণে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। ফলত মুসলমান সমাজে বুর্জোয়া আর্থনীতিক অবস্থার আংশিক বিকাশও ঘটে অনেক দেরিতে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবও বিলম্বিত হয়।

তবে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মুসলমান নেতার আন্দোলনের ফলে মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চার হয়। সরকারের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। অনেক মুসলমান ক্রমে চাক্‌রি ও ব্যবসার সুযোগ পুনরায় পেতে শুরু করলে তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এই সময় বাংলাদেশে পাটকল স্থাপনার ফলে পাটচাষ বৃদ্ধি পায়।[১৩৩] মুসলমান কৃষকদের হাতে কিছু অর্থাগম হতে থাকে। এই অর্থাগমের ফলে শহরে গিয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগও তারা গ্রহণ করতে শুরু করে। এই ভাবে ক্রমে অর্থ ও শিক্ষার যুগলবন্দিতে মুসলমান সমাজে বুদ্ধিজীবী তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন ও বিকাশের পথ সুগম হয়। তাঁদের মধ্যে নতুন চেতনার সঞ্চার হতে থাকে। সুতরাং আর্থিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে চিন্তা-চেতনায়ও মুক্তি আসে। ফলস্বরূপ এই মুসলমান সমাজের আধুনিক সাহিত্যচর্চার দিকেও মনোযোগ লক্ষিত হয়।

রাজনীতি

১.

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয়ের পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটে। এরপর কিছুদিন ইংরেজরা তাদের বশংবদ ও আজ্ঞাবহ নবাবকে নামেমাত্র ক্ষমতায় রেখে নেপথ্যে শাসকের ভূমিকা পালন করে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পর থেকে এদেশে প্রতক্ষ্যভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়। অতঃপর ক্লাইভের (১৭২৫-১৭৭৪) বিখ্যাত 'দ্বৈত-শাসন' প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থার কুফল বুঝে কোম্পানী কর্তৃক বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮)। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কালেই ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী নতুন ব্যবস্থায় ভারত শাসনের ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৪ সাল থেকে গর্ভনর জেনারেলের (বড়লাট) অধীনে লেফটান্যান্ট গর্ভনরের (ছোটলাট) মাধ্যমে বাংলা-বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের শাসনকার্য পরিচালিত হতে থাকে।[১৩৪] এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে কোম্পানীর যে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তার সম্প্রসারণ ঘটে।

প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহ' ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঐতিহাসিকরা একে নানাভাবে দেখেছেন। কেউ একে স্রেফ 'সৈন্যগণের বিদ্রোহ' [১৩৫] কেউ ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান সামন্ত শক্তির পুনরুত্থান প্রয়াস,[১৩৬] কেউবা ভারতবাসীর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম[১৩৭] বলে মনে করেছেন। এর ফলে

কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম ক্ষোভের বিষয়টি ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে। ১৮৫৮ সালের ১ লা নভেম্বর এক ঘোষণাবলে ভারতের শাসনভার কোম্পানীর হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে চলে যায়। ভারতের জনসাধারণ এরপর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজাকুলের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পরবর্তী প্রায় একশ বছরে ব্রিটিশ রাজের শাসন পদ্ধতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এদেশের মানুষের মনে প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল। মাঝে মধ্যে বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ বা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এরকম অনেক ছোট বড়ো গণ-সংগ্রাম ও কৃষক বিদোহ বাংলাদেশে সংঘঠিত হয়।[১৩৮] এগুলি হল উত্তরবঙ্গের ফকির ও সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ (১৭৬৭ - ১৮০০), ময়মনসিংহের পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ (১৮৩৩), ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮১৮-১৮৭০) ফরায়েজী আন্দোলন (১৮১৮ - ৪৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫ - ৫৬), নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯ - ১৮৬১), পাবনার প্রজাবিদ্রোহ (১৮৭৩) প্রভৃতি। এই সমস্ত বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্রমশঃ এদেশবাসীর মনে স্বাদেশিকতাবোধ ও সামন্ত-বিরোধী মনোভাব অঙ্কুরোদ্গম হতে থাকে। তবে সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনাবোধ তখনও গড়ে ওঠেনি।[১৩৯]

২.

উনিশ শতকে বঙ্গদেশে যে জাগরণ ঘটে তার প্রভাব মূলত নাগরিক হিন্দুদের মধ্যেই পড়ে। নানা কারণে মুসলমানরা তার ফল গ্রহণ করতে পারেন নি। ক্রমে হিন্দুদের রাজনীতি ও সমাজনীতিতে যে জাতীয়তাবোধের উদ্দীপন ঘটে তাকে মুসলমানরা হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলে মনে করেন। ফলে মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তা গড়ে উঠল।

সে সময় রাজনৈতিক চেতনাসৃষ্টিতে বিভিন্ন সভা সমিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো।[১৪০] সাহিত্য রচনার মাধ্যমেও দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনা সঞ্চারের প্রচেষ্টা হয়। ইংরেজদের আনুগত্য বজায় রেখে জনমতগঠনে নানা প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম হয়েছে; যেমন — বেঙ্গল-ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), হিন্দুমেলা (১৮৬৭)। ইন্ডিয়ান লীগ, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬), ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (১৮৮৩) প্রভৃতি। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে জনসাধারণের যোগ ছিলনা। এই প্রেক্ষাপটে সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে ভূতপূর্ব ইংরেজ সরকারী কর্মচারী অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের (১৮২৯ - ১৯১২) উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। প্রথমদিকে কংগ্রেসের নেতারা প্রকাশ্যে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি মজবুত করার কথা ঘোষণা করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে সমগ্র বঙ্গদেশে অভূতপূর্ব জনজাগরণের সূচনা হয়। এর ফলে ক্রমেই স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর মনে যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয় তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল হিন্দু ঐতিহ্যগর্ব। এমনকি রমেশচন্দ্র মজুমদার "বিদেশী দ্রব্য বর্জনকে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত করা এবং মন্দিরে দেবমূর্তির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করা"-র কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪১]

৩.

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদের নির্ভরতা বা আস্থা ছিল না। তারা এই

শাসনের বিরুদ্ধে বিছিন্নভাবে হলেও আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এদের মধ্যে ফরায়েজী (১৮১৮-১৯০৬ খ্রী.) এবং তরিকা-ই-মহম্মদীয়া বা ভারতবর্ষের ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮১৮-১৮৭১) গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মুসলমান সমাজে এই আন্দোলনগুলির গভীর প্রভাব ছিল। ফরায়েজী – ওয়াহাবী আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলন রূপে আরম্ভ হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তা অর্থনৈতিক - রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ওয়াহারীরাই সর্বপ্রথম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী এক সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আর এই ওয়াহাবী আন্দোলনকে মুসলিম কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে উল্লেখ করা হয়।[১৪২] ওয়াহাবী-আন্দোলনের অনুসারী তিতুমীর (১৭৮২ - ১৮৩১) সীমিত আকারে হলেও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করেছিলেন। যেহেতু ইংরেজদের কর্তৃত্বকেই তাঁরা মানেননি তাই ইংরেজদের শাসন-ব্যবস্থা থেকে তাঁরা বিশেষ কোন রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে আত্ম-উন্মোচন করতে পারেন নি।

সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের-ই সক্রিয় ভূমিকা বেশী ছিল।[১৪৩] মুসলমান সমাজে এর প্রভাব হয়েছিলো সুদূরপ্রসারী। ফলে তাঁদের উপর ইংরেজ শাসকের দমন, পীড়ন, অত্যাচার, অবিচার নেমে আসে। আগে থেকে চলে আসা ফরায়েজী-ওয়াহাবীদের ইংরেজ-বিরোধিতার কারণে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা মুসলমানদের আরো অবিশ্বাস ও সন্দেহ করতে শুরু করে।

এই সময় মুসলমান সমাজের কিছু অগ্রণী মানুষ অনুভব করেন মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সহায়তা প্রয়োজন। তাঁরা মনে করেন, শুধু বৈরিতা বা অসহযোগিতা নয় — রাজশক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে বিভিন্ন দাবী আদায়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের উন্নয়ন সম্ভব। তাই তাঁরা মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও সঞ্চারের জন্য বেশ কিছু সভা সমিতি গঠন করেন।[১৪৪] উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) এবং বাংলার আবদুল লতিফ (১৮২৮ - ১৮৯৩) ও সৈয়দ আমীর আলি (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ সমাজ-নেতা তাঁদের সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

সৈয়দ আহমেদ খান সিপাহী বিদ্রোহের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি উর্দুতে "আসবাব-এ-বাগাওয়াত - -এ হিন্দ্" নামক গ্রন্থ রচনা করে সরকারের সন্দেহ নিরসনে প্রয়াসী হন। তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষই ছিল শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক লাভ করা এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থায় অধিকার অর্জন করা। তিনি ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন হবার আশঙ্কায় রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহন পছন্দ করেন নি। ১৮৮৮ সালের ১৬ই মার্চ মীরাটের বক্তৃতায় তিনি মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করতে প্রকাশ্যে নিষেধ করেছিলেন।[১৪৫] অনুমান করা যায়, তাঁরই প্রভাবে বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীও কংগ্রেস বিরোধিতা করেছিলেন।

নবাব আবদুল লতিফ মুসলমান সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে ইংরেজের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে চলবার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা প্রথমে 'মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫৫) এবং পরে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৬৩) নামক সমিতি গঠন করে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সরকারের প্রতি আনুগত্যের

কারণেই তিনি লর্ড মেয়ো ও জাষ্টিস নরম্যানের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন এবং লর্ড মেয়োর হত্যাকারী শের আলীকে মুসলমান সমাজের "a convict villain" বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা করেন নি।[১৪৬] ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'সোসাইটি'র একটি সভা আহ্বান করে 'তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া'র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সমালোচনা করেন এবং ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' (শত্রুর দেশ) না বলে 'দারুল ইসলাম' বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন মৌলনা কেরামত আলী জৌনপুরী। এতে ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ আর ইসলাম-শাস্ত্রানুমোদিত রইল না। ক্রমে এই সিদ্ধান্তটি সারা ভারতে প্রচার লাভ করেছিলো।[১৪৭] এছাড়া সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশন প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে সৈয়দ আমীর আলী সরকারী নীতির সমালোচনা করলে 'লিটারেরী সোসাইটি' এর প্রতিবাদ করে।

সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁর সংগঠন 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (পরে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮) নামে পরিচিত হয়) সৈয়দ আহমদ বা আব্দুল লতিফের মতো ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় ও তাঁর প্রতি আনুগত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তবুও তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে রাজনৈতিক প্রয়াস যুগের দাবীর সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তিনি এবং তাঁর সংগঠন ইংরেজদের সহায়তায় বিভিন্ন দাবী আদায়ের পাশাপাশি "ধীরে ধীরে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করা"র[১৪৮]পক্ষপাতী ছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলির 'এ্যাসোসিয়েশন' ১৮৮২ সালের ৬ ফ্রেব্রুয়ারী লর্ড রিপনের কাছে একটি দীর্ঘ স্মারকপত্র পেশ করে।[১৪৯] এর মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও যুগ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ স্মারকপত্র মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে পরবর্ত্তীকালে সরকারের গৃহীত নীতি সমূহের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আমীর আলীর এ্যাসোসিয়েশন "সমাজগতভাবে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ও উন্নতি কামনা করলেও রাজনীতিগতভাবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য বোধের উন্মেষকেই প্রশ্রয় দিয়েছে"।[১৫০] এ কারণেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। মুসলমান সমাজে আমীর আলীর এই সংগঠনের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয়েছিলো ঃ

> এর ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানেরা 'আঞ্জুমান' গঠিত করে চলে। এইসব আঞ্জুমানের বা সম্মেলনের বড়ো লক্ষ হয় মুসলমানদের মধ্যে সংহতি স্থাপন করা —— ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সব ব্যাপারেই মুসলমানদের আশা আকাঙ্খা সংহত ও সুস্পষ্ট হোক এই হল এর লক্ষ্য।[১৫১]

'জাতীয় কংগ্রেসে' যোগদানের বিষয়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহ, দ্বিধা ও টানাপোড়েন ছিল। কংগ্রেসে কেবলমাত্র হিন্দুদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয় — এই অভিযোগ তুলে মুসলমানেরা এতে যোগদানে বিরত থাকেন।[১৫২] দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া জোরালো হওয়ার কারণে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকার বিরূপ হয়ে ওঠে।[১৫৩] মুসলমানেরা ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে পূর্ব থেকে এমনিতেই ইংরেজের বিরাগভাজন হয়ে উঠেছিলেন এবং নানা সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। তাই তাঁরা আর পুনরায় কংগ্রেসের সরকার বিরোধী মনোভাবে সায় দিতে পারেন নি। তখনকার বাংলার গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন মুসলিম সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় তাঁদের এই মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।[১৫৪]

অবশ্য মুসলমানদের একাংশ কংগ্রেসে যোগদানের পক্ষেও মত পোষণ করেছিলেন। বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা বদরুদ্দীন তৈয়েবজী (১৮৪৪ - ১৯০৬), পণ্ডিত শিবলী নোমানী (১৮৫৭ - ১৯১৪) সহ বাংলাদেশের বর্দ্ধমানের আবুল কাশেম, দেলদুয়ারের আবদুল হালিম গজনবী, পাবনার ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাহিত্যিকগণ, ঢাকার 'আঞ্জুমানে ইসলাম'-এর মত সংগঠন ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'সোলতান' প্রভৃতি কিছু পত্র-পত্রিকা কংগ্রেসে যোগদানের সপক্ষে মত পোষণ করেন।

এর থেকে বোঝা যায়, মুসলমানদের মধ্যে ক্রমে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয় এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁদের একাংশের কংগ্রেস-সমর্থন সত্ত্বেও অধিকাংশের মনোভাব ছিলো ইংরেজদের প্রতি অনুগত। এই ইংরেজ সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে মুসলিম সমাজ-নেতারা স্বসমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পথ উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। এর আশুফল হয়েছিলো ইংরেজি শিক্ষালাভে আগ্রহবৃদ্ধি এবং পাশ্চাত্য প্রভাবে মুসলমান সমাজের উন্নতির পথ প্রশস্ত করা।

উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙালী মুসলিম মানসে একই সঙ্গে ইসলামীয় ঐক্য ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য রক্ষার মনোভাব বজায় ছিল। এই সময়ে নানা কারণে ক্রমশঃ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। অগ্রগামী হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব থেকে মুসলমান সমাজ স্বার্থ-সংরক্ষণে আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) সংঘটিত হলে এর প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়। মুসলমানেরা স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়েও দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। একটি অংশ[১৫৫] এই আন্দোলনকে সমর্থন করলেও অধিকাংশ মুসলমান এর বিরোধিতা করেছিলেন।[১৫৬] সেই সময় মুসলমান সমাজের উপর ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, ময়মনসিংহের সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী এবং কলকাতার নবাব সৈয়দ আমীর হোসেনের ব্যাপক প্রভাব ছিল। ব্রিটিশ সরকার মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে মুসলমান সমাজের সুযোগ-সুবিধের কথা তুলে ধরলে তাঁরা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া মুসলমানরা পূর্ববঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার পাবে এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে 'হিন্দু-ঐতিহ্য' গর্ব যুক্ত থাকায় মুসলিম-মানসকে এর বিরোধী করে তুলেছিলো। তাছাড়া, ক্ষুদ্র মুসলমান ব্যবসায়ীদের উপর স্বদেশীদের 'অমানুষিক জোরজুলুম ও অত্যাচার'-এর কারণে অনেক মুসলমান বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করলেও বয়কট বা বিদেশীদ্রব্য বর্জন কার্যকলাপকে সমর্থন করতে পারেন নি।[১৫৭]

বঙ্গভঙ্গের এই প্রেক্ষাপটে হিন্দু মুসলিম পরস্পর অনেকটা বিছিন্ন হয়ে পড়ে। ইংরেজদের ঈপ্সিত হিন্দু মুসলিম ভেদনীতি[১৫৮]—র ফলে এই বিছিন্নতা আরো বৃদ্ধি পায়। এই পটভূমিকায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়। হিন্দু-প্রাধান্য থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইংরেজরা তখন হিন্দু-কংগ্রেসের ক্রমাগত প্রাধান্যে ও আন্দোলনে আতঙ্কিত ছিলেন। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন 'a possible counter-poise to congress aims'।[১৫৯] সিমলা ডেপুটেশনের সূত্র ধরে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'সারা ভারত মুসলিম লীগ' গঠিত হয় যা ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রতিষ্ঠাকালে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতি রক্ষা করে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষা করাই ছিল লীগের

প্রধান উদ্দেশ্য।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে নানা ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগতে থাকে। ক্রমশ বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সীমিত রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়। অবশ্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। মূলতঃ মুসলমান স্বার্থরক্ষা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেই এই চেতনা দেখা দিতে থাকে। অবশেষে 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে "বাঙালী মুসলিম সমাজে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য চিন্তা ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ সংরক্ষণের ঝোঁক বিশেষ প্রশ্রয় লাভ করে এবং সমাজ-রাজনীতিতে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব মুদ্রিত হয়"।[১৬০] নব জাগরণের অন্যতন প্রধান শর্ত হল, "রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন"।[১৬১] উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমান সমাজে সীমিত আকারে হলেও এই রাজনৈতিক চেতনা দেখা দেয়। ফলে তাঁদের আধুনিক চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর মুদ্রিত হতে থাকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের লেখনীতে। তাঁদের এই চেতনা ও প্রয়াস থেকে চিত্তোৎকর্ষের উদ্বোধন হয়। নতুন সাহিত্য রচনার পথও সুগম হয়ে ওঠে।

সমাজ

বাংলাদেশে মুসলমান সমাজের পত্তন ও বিকাশ দীর্ঘ-ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সম্পাদিত হয়েছে। শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিক সূত্রে জাত মিশ্র রক্তধারার মানুষ—এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের গঠন ও পরিবর্ধনের কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল।[১৬২] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে এই মুসলমান সমাজের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র বাংলাদেশে একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে সচেতনতা দেখা দেয়। সুতরাং এই সময়ে মুসলমান সমাজ নানা ভাব-সংঘাত ও সমস্যা-দীর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে কাল অতিবাহিত করেছে।

উনিশ শতকে জাতিতত্ত্বের আলোচনা বাঙালী মুসলমান সমাজকে যথেষ্ট সচেতন ও সক্রিয় করে তোলে। বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে বলে গ্রিয়ারসন, হাণ্টার, ডাল্টন, ব্লুক, জেমস ওয়াইজ, হার্বার্ট রিজলি প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিতগণ অভিমত পোষণ করলে[১৬৩] আভিজাত্যগর্বী মুসলমানদের অনেকেই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। মুর্শিদাবাদ এস্টেটের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বির এই মত খণ্ডন করে 'হাকিকত-ই মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' নামক (১৮৯১) ফারসী-গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই বিদেশাগত অভিজাত শ্রেণীর লোক। ফজলে রাব্বির এই মত ষোল আনা সত্য না হলেও সেকালের মুসলমান সমাজের একাংশের মনোভাব এতে প্রতিফলিত হয়েছিল। জাতিতত্ত্ব নিয়ে এই তর্ক-বিতর্ক অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমানদের 'স্বতন্ত্র অস্তিত্ব' ও 'বংশ-কৌলিণ্য' সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।[১৬৪]

ইসলাম ধর্মে জাতিভেদ বা বর্ণ-বৈষম্য না থাকলেও বাংলাদেশে হিন্দু জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রম প্রথার প্রভাবে বা সাদৃশ্যে মুসলমান সমাজেও জাতিভেদ দেখা দেয়। সামাজিক বিন্যাসের দিক থেকে রুবেন লেভী-এই মুসলমান সমাজের তিন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন– (১) আশরফ বা অভিজাত, (২) আতরাফ/আজলাফ বা অনভিজাত মুসলমান

এবং (৩) আরজাল বা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণী।[১৬৫] সৈয়দ, শেখ, মোঘল ও পাঠান-এই চার শ্রেণীর বিদেশাগত মুসলমান এবং এদেশীয় উচ্চ বর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দুগণ নিজেদের আশরাফ বলে পরিচয় দিতেন। এঁরা বেশীর ভাগ রাজপদ অলঙ্কৃত করতেন এবং বংশ-মর্যাদায় ও শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রণী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ আতরাফগণ 'রযীল' বা 'ইতর' নামেও পরিচিত ছিলেন। দৈহিক শ্রমের উপর এদের পেশা নির্ভর করত। কৃষক, দর্জি জোলা, বারহি, ধুনিয়া, কসাই, কলু, নিকারী, বেদিয়া, হাজ্জাম, তুতিয়া প্রভৃতি পেশাজীবীগণ এই শ্রেণীর। তৃতীয়তঃ যাঁরা একেবারে নিম্নস্তরের পেশায় নিযুক্ত ছিলেন তাদের বলা হত আরজাল। হালালখোর, হিজড়া, কসবি, মেহতব, মাঙ্গতা, লালবেগী প্রভৃতি এই শ্রেণীর মুসলমান। এরা দরিদ্র এবং এদের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চা ছিলনা। এই শ্রেণীর লোকেদের মসজিদে প্রবেশ করতে এবং সাধারণ গোরস্থানে মৃতদেহ দাফন (কবরস্থ) করতেও দেওয়া হত না।[১৬৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই শ্রেণী-ভেদ এবং আভিজাত্য-বোধ প্রবল ছিল বলে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আশরাফগণ আতরাফ ও আরজালদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতেন। আর এইভাবে তখন বাঙালী মুসলমানগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাতে মুসলমান সমাজের সমগ্র অংশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

উনিশ শতকে বাঙালী-মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই আশরাফ শ্রেণীরাই সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনামলে নানা কারণে এরা এক আভিজাত্য গর্বী, অতীতাশ্রয়ী দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হন। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণেও তাঁরা আগ্রহী ছিলেন না। বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকেও তারা অবজ্ঞা করেছেন। সাধারণ অনভিজাত মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সামাজিক যোগসূত্র হীনতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক দূরত্বও বজায় ছিল। পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্বিভাবের ফলে এই দূরত্ব ঘুচে গিয়ে অনেকটা কাছাকাছি আসে।

তবে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার মতো মুসলমান সমাজে এই শ্রেণীভেদ অলঙ্ঘনীয় ছিল না। ধর্মের কোন বিধিনিষেধ ছিলনা বলে বিত্ত ও বিদ্যার জোরে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরা উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হবার সুযোগ সহজেই লাভ করতে পারতেন। সে কারণে এ সম্পর্কে একটি প্রবাদ বেশ চালু ছিল ঃ

> গত বছর আমি একজন জোলা ছিলাম, এ বছর আমি একজন 'শেখ', আগামী-বছরে ফসলের দাম ভাল পেলে আমি একজন 'সৈয়দ' হব।[১৬৭]

এইভাবে মুসলমান সমাজ একদিকে উচু-নিচু ভেদাভেদের কারণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থবির সমাজে পরিণত হয়েছিল এবং সার্বিক ভাবে প্রথমদিকে আধুনিক চিন্তা-চেতনার বদলে সঙ্কীর্ণ ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়েছিল। ফলে তাঁরা যুগের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল।

উনিশ-শতকে মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফ্ শ্রেণীভেদের দ্বন্দ্ব ছাড়াও শিয়া-সুন্নী, মজহাবী-লা-মজহাবী, শরীয়তপন্থী-মারিফতপন্থী, পীরপন্থী ও পীর-বিরোধী প্রভৃতি ধর্মীয় সমাজগোষ্ঠীর অন্তর্কলহও তখন বজায় ছিল।[১৬৮]

অন্যদিকে বহির্দ্বন্দ্বে আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হিন্দুসমাজের বিরোধও উভয় সমাজকে আন্দোলিত করেছিল। আর এই পারস্পরিক দ্বেষ-বহ্নিতে ইন্ধন যুগিয়েছিল বিদেশীশাসক

ইংরেজরা। বাংলাদেশে এই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মুসলমান সমাজে সুদুর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সংঘাতের সম্পর্ক মধ্যযুগ থেকেই চলে আসছিল। উনিশ শতকে উভয় সম্প্রদায়ের অসমবিকাশের ফলে ক্রমে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং নানা বিভেদজনিত কারণে দুরত্বটি আরো বেড়ে ওঠে।

উনিশ শতকে এমনিতেই মুসলমান জমিদারের সংখ্যা অনেক কমে এসেছিল। তবু যে ক'জন জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান ছিলেন তাদের অশিক্ষা, অকর্মণ্যতা, বিলাসিতা ও সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কে ঔদাসীন্য মুসলমান সমাজের অগ্রগতিকে আরো বিলম্বিত করেছিল। এ সময়কার জমিদার শ্রেণীর বিত্তবানদের একটি চিত্র সেখ আবদোস সোবহান তাঁর 'হিন্দু মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন ঃ

> বাইজী, খেমটাঅলি, তরফদার, যাঁহার বিলাসীতার অঙ্গ, এসব আমোদে যিনি অহো রাত্রি মগ্ন। কবুতর উড়ান, মোরগবাজি, ঘুড্ডি খেলা, সৎরঞ্চ খেলা, যাহার প্রিয়কার্য– পারসির এক দস্তখত পর্য্যন্ত যাঁহার দৌড়, যিনি সমুদয় দিন, কি অন্ততঃ দিনের ১০ ঘটিকা পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে নিদ্রা যান, সেই 'চৈতন্য জড় পদার্থ'[১৬৯] ই

—বাঙালী মুসলমান জমিদার। আর "অশিক্ষিত মূর্খ, মদ্যপায়ী, বিলাসী, লম্পট, মোসাহেব ইয়ার"-ই[১৭০] ছিল এঁদের সঙ্গী। সুতরাং এদের দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয়নি।

পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজের নারীদের অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল তা বলাই বাহুল্য। কেননা তাঁরা সীমিত ক্ষেত্রে অন্তঃপুরে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পেলেও আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় প্রায় বঞ্চিত ছিলেন। পর্দা ও অবরোধপ্রথার কারণে তাঁরা বহির্জগতের শিক্ষালাভে বঞ্চিত ছিলেন বলে নারীমুক্তিও আসেনি। মুসলমান সমাজে হিন্দুসমাজের গৌরীদান প্রথার মতো বাল্যবিবাহ বা বিধবাবিবাহ কোন ধর্মগত সংস্কার ছিলনা। হজরত মোহম্মদ (সঃ) একাধিক বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন। তবু এই দুটি সংস্কার ভারতীয় হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলমান সমাজেও উনিশ শতকে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে বিধবা-বিবাহকে অনেক মুসলমান অবজ্ঞা করেছেন। ফলে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় বাংলার মুসলিম পরিবারে ৪ থেকে ২৯ বছর পর্যন্ত বিধবার সংখ্যা ছিল ১৭, ২১, ৩৯০ জন।[১৭১] বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে চারটি পর্যন্ত বিবাহের অনুমোদন ইসলাম ধর্মে রয়েছে।[১৭২] এর সুযোগ নিয়ে মুসলমান পুরুষেরা একাধিক বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রে যথেচ্ছ স্বেচ্ছাচারিতা করতেন বলে মুসলিম নারীদের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এছাড়া ছিল দাসী বাঁদী প্রথা। সুতরাং নারীদের এইসব বহুবিধ সমস্যার ফলে সমগ্র মুসলমান সমাজকে আরো কিছুদিন অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

বাংলাদেশে ইংরেজ আগমনের ফলে আধুনিকতার সূচনা হয়। পুরোনো সমাজ-কাঠামো ভেঙ্গে গড়ে ওঠে নতুন শ্রেণী ও সমাজ। পূর্বে এদেশের গ্রাম সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মনির্ভরতা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা।[১৭৩] ইংরেজ-শাসন আমাদের গ্রাম সমাজের এই স্বয়ং সম্পূর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতাকে নষ্ট করে পারস্পরিক যোগসূত্র তৈরী করে দেয় এবং মানুষ শহরমুখী হয়ে ওঠে। জমির পরিবর্তে মুদ্রা হয়ে ওঠে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের মাপকাঠি। গ্রাম ও শহরে নতুন সামাজিক বিন্যাস দেখা দেয়। একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামীণ বাংলায় জমিদার ও রায়ত শ্রেণীর

পাশাপাশি জন্ম নেয় জোতদার, মহাজন, ক্ষেতমজুর ও ব্যবসায়ী শ্রেণী; অন্যদিকে শহরাঞ্চলে দেখা দেয়—শিল্পপতি বণিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, কেরাণী, কুলি, মজুর প্রভৃতি পেশাজীবী শ্রেণী।[১৭৪]

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে এঁদের বলা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে কোন পৃথক শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজে বিত্তবান পুঁজিপতিরা হলেন উচুতলার আর শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ নীচু তলার। এর মাঝের শ্রেণীই মধ্যবিত্ত। সমালোচকের ভাষায় ঃ

> . . . the middle class includes within its ranks the middling size enterpreneur in industry and trade; the simple producer of goods, such as the artisan and farmer; the small shopkeeper and trademan ; and the official and salaried employee. [১৭৫]

প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে প্রশাসন, ভূমি ও ব্যবসায় কেন্দ্রিক মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব ছিল ঠিকই, কিন্তু তারা শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে তেমন সচেতন ছিল না। তখনকার দিনে ছিল এক দরবার সংস্কৃতি এবং অন্যদিকে লোক সংস্কৃতি। মধ্যবিত্তের নিজস্ব কোন সংস্কৃতি ছিল না। আধুনিক নগর-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের মূলে রয়েছে যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য। ইংরেজ সরকারের মাধ্যমেই ক্রমশঃ কলকাতায় মধ্যবিত্তের পত্তন হয়। কলকাতায় বিভিন্ন দপ্তরে ভাগ্যান্বেষীর দল ভিড় জমিয়ে কালে যে সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে তাকেই শহরকেন্দ্রিক শ্রেণীসচেতন আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলা হয়েছে।[১৭৬] আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন ঃ

> বাংলাদেশে নতুন শ্রেণী রূপায়ণের ফলে সমাজে যে শ্রেণীর বিস্তার হয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় যার আধিপত্যও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী।[১৭৭]

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বাংলার ভাব-বিপ্লবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এঁরাই শহরকেন্দ্রিক আধুনিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। তবে বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে সমভাবে মধ্যবিত্তের বিকাশ হয়নি।

উনিশ শতকের প্রারম্ভকাল থেকেই হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের গঠন ও বিকাশের কাজ শুরু হয়। কিন্তু মুসলমান সমাজে আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃজন ও বিকাশের সূচনা হতে বিলম্বিত হয়। তবে বিলম্বে হলেও বাঙালী মুসলমানরাও আধুনিক জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষতঃ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল লতিফের 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটী' এবং এর কিছু পরে সৈয়দ আমীর আলীর 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮) প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমান সমাজে আন্দোলন শুরু হয়। পূর্বেকার গোঁড়ামি ও ইংরেজ-বিরূপতা দূর হয়ে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষায় তাঁরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমবর্ধমান দাবী ও আন্দোলনের কারণে তাঁদের বিপক্ষে 'সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি'র ভিত্তিতে শাসনকার্য চালনার সুবিধার্থে মুসলমানদেরও ইংরেজ শাসক এরপর থেকে আনুকূল্য করেন। ফলে শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সীমিত আকারে হলেও কিছুটা সুযোগ-সুবিধে লাভের কারণে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠতে থাকে।

তাঁরাও ক্রমশ আধুনিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। নূতনভাবে অনেক কিছু বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেন। একদিকে তাঁরা যেমন স্বসমাজের অনেক অনাচারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা শুরু করেন, অন্যদিকে তেমনি হিন্দুমধ্যবিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করেন।

ইতিপূর্বে যে সমাজের নেতৃত্ব ছিল কেবল উচ্চশ্রেণী ও বিত্তবানদের হাতে তা ক্রমশঃ সচেতন ও ক্রমবিকাশমান এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে পরিচালিত হতে লাগল। এরপর নবমূল্যায়ণের সময় মুসলমান সমাজে পূর্বেকার আশরাফ-আতরাফ প্রভৃতি জাতিভেদের নিন্দা করা হতে লাগল। তাঁরা একে শরীয়তবিরোধী বলে চিহ্নিত করেন। এই জাতিভেদ সমাজে প্রাচীর রচনা করে এর গতি রুদ্ধ করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন এবং এর বিলোপ-সাধনের জন্যে মসীচালনা শুরু করেন।[১৭৮] পর্দা ও অবরোধ প্রথা সমাজে নারীমুক্তির ও উন্নতির অন্তরায় এরূপ চেতনা থেকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, তালাকপ্রথা ও বাঁদীপ্রথা প্রভৃতি প্রথার ক্ষেত্রে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মুসলমান সমাজে যে অনাচার উনিশ শতকে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে এই সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা নানাভাবে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। সর্বোপরি মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতা ও তার উন্নয়নের উপায়-চিন্তা নিয়ে এই অংশ নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। এসব করতে গিয়ে তাঁরা নানা প্রতিষ্ঠান, সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার আশ্রয় নিয়ে প্রচার চালিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা সামাজিকভাবে যথেষ্ট সচেতন হয়ে ওঠেন। আবার সামাজিক সমস্যা ও আপন ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু হবে তা নিয়েও মুসলমান সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এ ছাড়া সমকালে হিন্দু লেখক সাহিত্যিকদের দ্বারা মুসলমান সমাজ ও ঐতিহাসিক চরিত্রকে বিকৃতকরে অঙ্কিত করা হয়েছে- — এরূপ অভিযোগ করে মুসলমান লেখকরাও এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ লেখনী চালনা করেন।[১৭৯]

এইভাবে দেখা যায়, শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃজন ও ক্রমবিকাশের ফলে উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমান সমাজে নানা বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। ক্রমপরিবর্তনমুখী এই মুসলমান সমাজ শিক্ষা সচেতন হয়ে ওঠেন এবং সমাজের উন্নতির জন্য নানা ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্বিভাব ঘটলে আধুনিক সাহিত্যচর্চার প্রবণতাও তৈরি হয়।

তথ্যসূত্র

১. আবুল আহসান চৌধুরী, 'মীর মশাররফ হোসেন', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৫২

২. ঐ , পৃ. ৫৭

৩. শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, "বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ", ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৭৪, পৃ. ২১৯

উল্লেখ, আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৪. সুশোভন সরকার, 'বাংলার রেনেসাঁস' , কলকাতা, দীপায়ন, কার্তিক ১৩৯৭, পৃ. ১০-১১

৫. ঐ, পৃ. ১০

৬. Alfred Von Martin, "Sociology of the Renaissance", London, 1945, P-3

উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২য় সং, আষাঢ় ১৩৯১, পৃ. ১৬৮

৭. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

৮. সুশোভন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৯. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

১০. ঐ , পৃ. ২১-২২

১১ ঐ , পৃ. ২৬

১২, ঐ , পৃ. ১৩৫

১৩. ঐ , পৃ. ১৩৫

১৪. ঐ , পৃ. ১৬৯

১৫. ঐ , পৃ. ১৮৪

১৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, 'ইতালীর র‍্যনেসাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি', ২য় পরিবর্ধিত সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ৫০

১৭. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

১৮. অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১৯. ঐ , পৃ. ৩৬

২০. ঐ , পৃ. ৩৭

২১. ঐ , পৃ. ৩৮

২২. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

২৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

২৪. সুশোভন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬

২৫. গোপাল হালদার, "রামমোহন পর্ব ও রামমোহন রায়", পশ্চিমবঙ্গ-রামমোহন সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৩, পৃ. ৮৩

২৬. বিপিনচন্দ্র পাল, "যুগ-প্রবর্তক রামমোহন" পশ্চিমবঙ্গ-রামমোহন সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

২৭. Bipan chandra, Modern India, National council of Educatioal Research and Training, New Delhi, 1984, page-124.

২৮. Susobhan sarkar, On the Bengal Renaissance, Calcutta, Papyrus, 1979, p-14

২৯. সুশোভন সরকার, বাংলার রেনেসাঁস, পৃ. ৮৯

৩০. Bipan chandra, Modern India, p-125

৩১. সুশোভন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৩২. ঐ , পৃ. ১৬

৩৩. ঐ , পৃ. ৮৮

৩৪. উদ্ধৃত, পশ্চিমবঙ্গ, রামমোহন সংখ্যা, ১৪০৩, পৃ. ৪৮

৩৫. Susobhan Sarkar, op. cit., p-14-15

৩৬. Bipan chandra, op. cit., p-127

৩৭. সুশোভন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৩৮. ঐ , পৃ. ৩৮

৩৯. স্বপন বসু, বাংলায় নব চেতনার ইতিহাস, কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, ২য় সং, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ২১৩

৪০. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী. ১৯৮৩, পৃ. ৪৩

৪১. অজিতকুমার ঘোষ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, ভূমিকা, পৃ. ২৫

৪২. ঐ , পৃ. ২৫

৪৩. উদ্ধৃত, স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৪৪. সুশোভন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৪৫. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৪৬. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, মুক্তধারা, নভেম্বর, ১৯৭১, পৃ. ২২

৪৭. মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ৫৫

৪৮. "One of the directors of the company bluntly stated that the English had just lost America for their folly, in having allowed the establishment of schools and colleges in new world and that it would not be wise to repeat the same act of folly in regard to India."

Amitava Mukherjee, Reform and Regeneration in Bengal (1774-1823), Calcutta, 1968, p-72

আজিজুর রহমান মল্লিক, বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান, দিলওয়ার হোসেন সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৮৬

আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৪৯. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৫০. ঐ , পৃ. ২৩

৫১. ঐ , পৃ. ৩৮

৫২. Nimai Sadhan Bose, The Indian awakening and Bengal, Calcutta, 1969, p-26

৫৩. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ১৯৯০, পৃ. ৫৯

৫৪. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লিঃ, ৪র্থ সং, ১৯৯৯ পৃ. ১২৯-৩০

৫৫. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৫৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮

৫৭. ঐ , পৃ. ১২৩

৫৮. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭

৫৯. ঐ , পৃ. ৯৭

৬০. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭

৬১. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৬২. ঐ , পৃ. ৩৮

৬৩. উইলিয়াম এ্যাডামেরর রিপোর্টে লেখা হয় ঃ- "Learned Musalmans are in general much better prepared for reception of European ideas than learned Hindus.

উদ্ধৃত, ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭

৬৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭-৯৮

৬৫. ঐ , পৃ. ৯৯

৬৬. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, জিয়াদ আলি সম্পাদিত, কলকাতা, নবজাত প্রকাশন, ১৯৭১, পৃ. ৯

৬৭. শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্টে মেকলে লিখেছেন ঃ- "I have never found anyone among themselves (orientalists) who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole literature of India and Arabia.

উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ৫৭

৬৮. রশীদ আল ফারুকী, বাংলা-উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, কলকাতা, রত্নাপ্রকাশন, ১৯৮৪, পৃ. ১০১

৬৯. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৭০. মোহাম্মদ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৭১. আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১২৩

৭২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২

৭৩. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী', শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃ. ১২১

৭৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩

৭৫. উইলিয়াম হাণ্টার, দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস, আবদুল মওদূদ অনূদিত, ঢাকা, আহমদপাবলিশিং হাউস, জানুয়ারী, ১৯৯৬, পৃ. ১০৪

৭৬. A. R. Mallick, British Policy and the Muslims of Bengal, Dacca, 1961, page-193

উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ৩৯

৭৭. উইলিয়াম হাণ্টার পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

৭৮. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৭৯. মোহাম্মদ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৮০. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪

৮১. অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২য় মুদ্রণ, জুলাই ১৯৯১, পৃ. ১০৭

৮২. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫

৮৩. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮

স্বপন বসু, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পৃ. ২২১

৮৪. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৮৫. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৮৬. মোহাম্মদ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-৩০

অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪-০৫

৮৭. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯-১১০

৮৮. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮

৮৯. ঐ, পৃ. ১০৯

৯০. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৯১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০-১১২

৯২. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১

৯৩. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

৯৪. ঐ, পৃ. ৮৭

৯৫. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫-২৬

৯৬. ঐ, পৃ. ১২৬

৯৭, ঐ, পৃ. ১২৬-২৭

৯৮. ঐ, পৃ. ১২৭

৯৯. ঐ, পৃ. ১২৭

১০০. ঐ, পৃ. ১২৯

১০১. ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, পৃ. ৭৫

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০

১০২. ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ-১৩১০, পৃ. ৪১৮

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৩০

১০৩. মিহির ও সুধাকর, ১৪ আশ্বিন ১৩১১, পৃ. ৪

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৩২

১০৪. মিহির ও সুধাকর, ২৩ মাঘ ১৩০৯

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৩১

১০৫. কাজী ইমদাজুল হক, আমাদের শিক্ষা, নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৩২

১০৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১০৭. ঐ, পৃ. ১৯

১০৮. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১০৯. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, পৃ. ৪২

১১০. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১১১. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪

১১২. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

১১৩. ঐ , পৃ. ১০

১১৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

১১৫. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ডি. এন. বি. এ. ব্রাদার্স, ১৯৬৬, পৃ. ১৬

১১৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২১

১১৭. নরহরি কবিরাজ, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৬৪

১১৮. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১১৯. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

১২০. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬

১২১. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

১২২. ঐ , পৃ. ১০৪

১২৩. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪-১০

অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭-০৮

১২৪. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

১২৫. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১-১২

১২৬. স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১-১২

১২৭. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

১২৮. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬

১২৯. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

১৩০. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১৩১. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮-৩৯

১৩২. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

১৩৩. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১

১৩৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯,৩৬

১৩৫. ঐ , পৃ. ৬৪

১৩৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ২৭

১৩৭. নরহরি কবিরাজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১৩৮. বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য ঃ সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭০, অথবা ঃ সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ডি.এন.বি.এ. ব্রাদার্স, জুলাই ১৯৬৬।

১৩৯. Ramesh chandra Majumder, Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century, Calcutta, 1950, p-18

১৪০. যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৬৬-৮৩

১৪১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৩৩

১৪২. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১-৯৫

১৪৩. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

১৪৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-১৩৭

১৪৫. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬১

১৪৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১৪৭. ঐ , পৃ. ৮৪

১৪৮. ঐ , পৃ. ৮৬

১৪৯. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮

১৫০. ঐ , পৃ. ১৬৪

১৫১. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কলিকাতা, ১৩৬৩,পৃ. ১২৮

১৫২. Pradip Kumar Lahiri, Bengali Muslim thought: 1818-1947, Calcutta, K.P. Bagchi & co., 1991, P-64

১৫৩. Amit Sen, Notes on Bengal Renaissance, 2nd ed., Calcutta, 1975, P-59

১৫৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬১-৬৩

১৫৫. বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে স্বদেশী আন্দোলনকে যে সমস্ত মুসলমান নেতা, লেখক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সমর্থন করেছিলেন তাঁরা হলেন ঃ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আব্দুর রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, লিয়াকত হোসেন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রভৃতি। তবে মুষ্টিমেয় এই সমস্ত ব্যক্তি বিপুল সংখ্যক সাধারণ মুসলিম সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।

১৫৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

Amit Sen, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

১৫৭. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

১৫৮. বিনয় ঘোষ, বাংলার নব জাগৃতি, পৃ. ৭১

১৫৯. Pradip kumar Lahiri, op cit. p-66

১৬০. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, আগষ্ট, ১৯৯৬, পৃ. ২০

১৬১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৬

১৬২. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত. ১ম খণ্ড, পৃ. ৪

১৬৩. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫

অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

P.K. Lahiri, op cit, P-5

১৬৪. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১-২২

১৬৫. রুবেন লেভী, সোস্যাল স্ট্রাকচার অব ইসলাম, ডঃ গোলাম রসুল অনূদিত, কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫,

পৃ. ২৩

তুলনীয়, অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২-২৫

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৮

১৬৬. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭

P. K. Lahiri, Op cit, p-3

১৬৭. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮

১৬৮. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮-২২

১৬৯. সেখ আবদোস সোবহান, "হিন্দু মোসলমান", ১৮৮৮

উদ্ধৃত, কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

১৭০. ঐ, পৃ. ২২০

১৭১. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩

১৭২. "তফসীরে মা-আরেফুল কোরআন", সুরা নিশা, আয়াত নং ৩, মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক বাংলায় অনুদিত, দেওবন্দ, উত্তর প্রদেশ, বাংলা ইসলামিক একাডেমি, সংখ্যা-৭, পৃ. ৩১৭-৩১৮

১৭৩. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

১৭৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫

১৭৫. Edwin R. A. Seligman (ed.), Encyclopaedia of Social Sciences, Vol-9, New York, The Macmillan Company, 1950, P-407

উদ্ধৃত, উয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮

১৭৬. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫২

১৭৭. বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ৬৪

১৭৮. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬-৮

১৭৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখক ঃ প্রসঙ্গ উনিশ শতক

বাংলা ভাষা ও মুসলমান সমাজ

উনিশ শতকে মুসলমান সমাজের সামনে ইংরেজি ছাড়া আরবী, ফারসী এবং উর্দু – প্রভৃতি ভাষা গুরুত্ব পেয়ে আসছিল। বাংলা ভাষা নিয়েও তাদের মনে নানা দ্বিধা ছিল। আরবী ছিল ধর্মীয় আবেগের ভাষা। হাদীসে তিনটি কারণে আরবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ঃ– ১) কোরআনের ভাষা আরবী, ২) বেহেশতের অধিবাসীদের ভাষা আরবী এবং ৩)হজরত মহম্মদ নিজে একজন আরবী ভাষী ছিলেন। এই তিনটি কারণে মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলিতে ভাষাটির প্রচলন হয়েছে।[১] বাংলাদেশেও ধর্মীয় কারণে বাঙালী মুসলমানের কাছে আরবী ভাষা শিক্ষা ছিল অপরিহার্য। অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মতো বাঙালী মুসলমানদের কাছেও আরবী পবিত্র ভাষা। 'ঐতিহ্য সচেতন এবং সংস্কৃতিগত প্রাণ' ইরানীরাও ধর্মীয় কারণে ফারসী ভাষার উপরে আরবীর দাবী মেনে নিয়েছেন।

অষ্টম শতকে মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ফারসী ভাষারও অনুপ্রবেশ ঘটে। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজদরবারে দরবারী ভাষা হিসাবে ফারসী প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান, নবাব, বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ প্রভৃতি অভিজাত শ্রেণী সংস্কৃতি চর্চার ভাষা হিসেবে ফারসী ব্যবহার করতেন। আমজনতার মধ্যে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে মুসলমানদের আগমন ও ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটতে শুরু করলে ফারসী এখানেও রাজভাষা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।[২] এ সময় বাঙালী হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দরবারে চাকুরী প্রভৃতি সুযোগ সুবিধে লাভের আশায় ফার্সী ভাষা শিখতেন।

এদিকে ভারতবর্ষে নবসৃষ্ট উর্দুভাষা নিয়ে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু না বাংলা - এ নিয়ে বিতর্ক চলেছিল দীর্ঘদিন। উনিশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধে উর্দুকেই মুসলমানদের মাতৃভাষা বলে মনে করতেন আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানরা। এ সময় "সমিতি গড়িয়া, সভা ডাকিয়া, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া তাঁহারা বাংলার জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন যে, বাঙালী মুসলমানের ভাষা বাঙলা নহে, 'দো-ভাষী বাংলা'ও নহে, একেবারে সরাসরিভাবেই উর্দু।"[৩] এই উর্দু ভাষার উৎপত্তি এবং বাঙালী মুসলমান সমাজের সঙ্গে এর যোগসূত্রটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তা জানবার জন্যে একটু পিছনে ফিরে তাকানো যায়।

ভারতবর্ষে উর্দু ভাষার উৎপত্তিস্থল বিষয়ে মতান্তর না থাকলেও এর উদ্ভবকাল নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে গ্রাহাম বেইলি, ডঃ জহুরউদ্দীন, আলি জাওয়াদ জইদি প্রভৃতি আধুনিক গবেষক জানিয়েছেন যে, প্রায় অষ্টম শতাব্দী থেকে উর্দুর যাত্রা শুরু। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সুলতানী আমলে ফারসী, আরবী, তুর্কি, পুশতু প্রভৃতি বিদেশী ভাষার সঙ্গে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খড়িবোলি, ব্রজভাষা, বাঙরু, কনৌজি, অউধি প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষা মিলেমিশে এক সংকর ভাষাই হয়ে উঠল দিল্লীর সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা।[৪] মুঘল আমলের শেষ দিকে এর নাম হল উর্দু। তুর্কি শব্দ 'উর্দু' র অর্থ 'সৈন্যশিবির'। উর্দু আসলে তৎকালে প্রচলিত সেনাশিবিরের ভাষা। ক্রমে এই সেনানিবাসের বা সাধারণের ভাষা অভিজাত শ্রেণীর ভাষা হয়ে সম্রাট শাহজাহানের আমলে (১৬২৬ - ৫৭) দরবারের স্বীকৃতি লাভ করলে এর কদর বেড়ে যায়। এর বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি আরবীতে হওয়ায় এবং আরবী, ফারসী, তুর্কির অপর্যাপ্ত শব্দ এবং

আরো অন্যান্য প্রভাব থাকায় একে আর ভারতীয় আর্যভাষা বলে চেনবার উপায় নেই। প্রথমদিকে মির তকি মির (১৭২২-১৮১০), সওদা (১৭১৩-১৭৮০), নাজির আকবরাবাদি (১৭৪০-১৮৩০), শ্রেষ্ঠ কবি মির্জা গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯), এবং পরে কবি হালি (১৮৩৭-১৯১৪), আলিগড় আন্দোলনের নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮), শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪) এবং বিখ্যাত কবি ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) - প্রভৃতি বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় উর্দুভাষা সর্বতোভাবে উন্নত ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

মুঘল আমলেই এই উর্দুভাষা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। মোঘল বাদশাহ যে সব নবাব-সুবেদার-মনসবদার-জায়গীরদার-আয়মাদার ও তাঁদের পরিবার পরিজন সৈন্য পাঠাতেন তাঁরাই উর্দুভাষা এদেশে ছড়িয়ে দেন। সে সময় থেকে এখানে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে উর্দুচর্চার সূত্রপাত হয়। তখন ভারতের ভাগ্যান্বেষীর দল রাজধানী ও বানিজ্যিক শহরগুলিতে এসে ভিড় করতেন। এঁদের সমন্বয়ে এদেশে ক্রমে উর্দুভাষী অবাঙালী মুসলমানের একটি নাগরিক শ্রেণী গড়ে ওঠে। তাঁরা উর্দুকে পারিবারিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন।[৫]

যদিও হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই উর্দু ভাষায় কথা বলতেন এবং সাহিত্যচর্চা করেছেন।[৬] তবু অধিকাংশ উর্দুভাষীই ছিলেন মুসলমান। আর খুব সম্ভবতঃ আরবী বর্ণমালা ও লিপি পদ্ধতি এবং ফারসীর মাধুর্যপূর্ণ শব্দের কারণে বাঙালী মুসলমানের কাছে আরবীর মতোই উর্দু ছিল পবিত্র। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্র। রাজভাষা হিসেবে ফারসী এবং উর্দু তাঁদের শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করেছিল। বাঙালী জমিদার জোতদারগণ সামাজিক মর্যাদা লাভের আশায় নবাব-নাজিম ও আমীর-ওমরাহদের অনুকরণে আরবী ফারসীকে বিদ্যাচর্চার ও উর্দুকে পারিবারিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলকাতা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল। তখন থেকে এটি আধুনিক শহররূপে ক্রমশঃ গড়ে উঠতে থাকে। এ সময় ভাগ্যান্বেষণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা কলকাতায় ভিড় জমাতে শুরু করে। উত্তর ভারতের বহু উর্দুভাষী অবাঙালী মুসলমানও বিশেষতঃ শ্রমিক মজুর জীবিকার টানে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ৪৫,০০০ মুসলমানের মধ্যে অবাঙালী মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০,০০০।[৭] এছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা পাঞ্জাব থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলকাতা মাদ্রাসায়ও কাশ্মীর থেকে বহু ছাত্র পড়াশোনা করতে আসতেন। ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদের, ১৭৯৯সালে মহীশূরের ও ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার পতন হয়। কোম্পানী ঐ সব রাজপরিবারকে নিজ তত্ত্বাবধানে কলকাতায় রাখেন। এঁদের সঙ্গে এঁদের পরিবার পরিজন, দাসদাসী এবং বহু অনুরাগী মানুষ এসে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। এঁরাই এখানে উর্দু ভাষার ক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। ক্রমশঃ বাংলাদেশে উর্দুচর্চা বিস্তার লাভ করে।

> ঢাকার নতুন নবাব পরিবারের মৌখিক ভাষা উর্দু ছিল। ..... আরবী - ফারসী শিক্ষাকে তাঁরা সংস্কৃতিবানের শিক্ষা বলে মনে করতেন। যতদূর জানা যায়, রংপুর পায়রাবন্দের 'সাবের' পরিবার, টাঙ্গাইল - করটীয়ার 'পন্নী' ও দেলদুয়ারের 'গজনবী' পরিবার, ময়মনসিংহ - ধনবাড়ির 'চৌধুরী' পরিবার, বগুড়ার 'চৌধুরী' পরিবার, সায়েস্তাবাদের 'চৌধুরী' পরিবার, মেদিনীপুরের 'সোহরাওয়ার্দী' পরিবার প্রভৃতি উর্দু - ফারসীর চর্চা করতেন। নব্য শিক্ষিত আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, আব্দুর রহিম, আব্দুল জব্বার খান বাহাদুর, সৈয়দ শামসুল হোদা প্রমুখ উর্দু – ফারসী ও ইংরাজী ভাষার সেবা করেছেন। মাদ্রাসার শিক্ষিত মৌলবী মৌলানারাও উর্দু - ফারসীর সমর্থক ছিলেন। তাঁরা ঐ ভাষাতেই শিক্ষা লাভ করতেন। তাঁরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ওয়াজ-নসিহত করতেন উর্দুতে। তাঁরা বাংলা ভাষাকে বাঙালী হিন্দুর ভাষা বলে মনে করতেন।[৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার হার কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ সচেতনতাও দেখা দেয়। পত্র পত্রিকা ও সাহিত্যচর্চার দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়ে। এ সময় তাঁদের একটি অংশ উপলব্ধি করেন যে, উর্দু কোন কালেই বাঙালীর মাতৃভাষা ছিল না, – কেবল সামাজিক মর্যাদালাভের আশায় অভিজাতদের মধ্যে উর্দু গ্রহণের প্রবণতা; তাই উর্দুকে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস বৃথা। এর ফলেই শুরু হয় মাতৃভাষার দাবিদার রূপে উর্দুপন্থী ও বাংলাপন্থীদের বিতর্ক।

অবশ্য এ বিতর্কের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে নয়। আগে থেকেই ছিল। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার জন্যে মুসলমান লেখকদের জবাবদিহিও করতে হয়েছে যথেষ্ট। মধ্যযুগের পুঁথি-রচয়িতাদের অন্যতম কবি শেখ মুত্তালিব লিখেছেন,

মুসলমানী শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলু ।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু ॥[৯]

– কিফায়াতুল মুসল্লীন

আর মোহাম্মদ জান তাঁর 'নামাজনামা' গ্রন্থে আরবী কথাকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করলে 'সত্তর নবী বধে'র সমান পাপ হয় বলে উল্লেখ করেছেন।[১০] আঠার শতকের[১১] সন্দীপের কবি আব্দুল হাকিম কিছুটা অশালীনভাবেই বলেছিলেন—

যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যায়।[১২]

এই উদ্ধৃতিতে পুঁথি লেখকদের বাংলা ভাষার প্রতি দরদের কথা পাওয়া যাচ্ছে। আহমদ ছফা সাহেবের মতে, এর মধ্যে গভীর বাংলা প্রীতি নয় - যাঁরা তখনকার বাংলাভাষা বিদ্বেষী ও ঘৃণাকারী ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে 'প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং মর্মবেদনা'র প্রকাশ পেয়েছে।[১৩]

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার কমিশনের কাছে নবাব আব্দুল লতিফ নিম্ন শেণীর মুসলমানদের জন্যে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে উর্দুর সুপারিশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি যা বলেন তা উল্লেখযোগ্য—

> Briefly sumerised my opinion as regards Bengali is that primary instruction for the lower classes of the people, who for the most part are ethnically allied to the Hindoos, should be in the Bengali Language —purified, however, from the superstructure of Sanskritism of learned Hindoos and supplemented by the numerous words of Arabic and Persian origin which are current in everyday speech : for this the Bengali of the low-courts furnishes a good example. For the middle and the upper classes of Mahomedans, the Urdoo should be recognised as the vernacular[১৪]

এখানে তিনি মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীদের জন্যে উর্দুকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষাকে দুটি ভাগে ভাগ করে নেন - (১) সংস্কৃত গন্ধী হিন্দু বাঙালীর ভাষা এবং (২) সংস্কৃত-প্রভাব মুক্ত ও আরবী-ফারসী মিশ্রিত মুসলমান বাঙালীর ভাষা। অথচ ফরিদপুর নিবাসী আব্দুল লতিফ ভাল বাংলা জানতেন।[১৫] মীর মশাররফ হোসেনও তাঁর 'বসন্তকুমারী নাটক'টি তাঁকে উৎসর্গ করে তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যের প্রতি যথোচিত অনুরাগ'-এর কথা বলেছেন। কিন্তু আব্দুল লতিফ বা তাঁর সোসাইটী

বাংলা ভাষার কোন চর্চা করেননি। সেখানে যাবতীয় চর্চা হয়েচে উর্দু, ফারসী এবং ইংরেজীতে। ফলে "বাংলা দেশের মুসলমানেরা আরও বেশ কিছুকাল মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে শুধু আরবী, ফারসী, উর্দু জবান রপ্ত করার চেষ্টা চালালেন"।[১৬]

সৈয়দ আমীর আলী এবং আমীর হোসেন দুজনেই বাঙালী ছিলেন না। আমীর আলি বাংলা শিখেছিলেন কিন্তু চর্চা করেন নি। অবশ্য এঁদের মতো কতিপয় অভিজাত অবাঙালী মুসলমানের পক্ষে তখনকার দিনে সেইটেই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু হুগলীর দেলওয়ার হোসেন, কুমিল্লার সিরাজুল ইসলাম ও সৈয়দ শামসুল হোদা, শ্রীহট্টের আব্দুল করিম, মেদিনীপুরের আব্দুর রহিম ও ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, বর্ধমানের আব্দুল জব্বার খান - প্রভৃতি প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন ঘোরতর উর্দুর সমর্থক।

ক্রমে ভাষা-প্রশ্নের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির বিভাজিকা বুদ্ধি কৌশলে জাতীয়তার যোগসাধন ঘটে। কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এড্ওয়ার্ড ডেনিসন রস (১৯০৩-১১) একটি সভায় প্রস্তাব আকারে বলেন - "মক্তবে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। কেন না বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিলে মুসলমানের জাতীয়তা অর্ধেক বিনষ্ট হইবে এবং বাঙ্গালা ভাষা মুসলমানদিগকে হীনবীর্য করিয়া ফেলিবে।"[১৭] সৈয়দ আমীর আলী, স্যার আব্দুর রহিম, শামসুল হোদা, দেলওয়ার হোসেন প্রভৃতি সভ্যদের উপস্থিতিতে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বহু বাঙালী মুসলমানের উর্দুপ্রীতির এটি যেমন একটি জ্বলন্ত প্রমাণ, তেমনি উর্দু-কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদেরও পরিচায়ক। আমাদের মনে হয়, 'নিজেদের অভিজাত মুসলমান এবং বিদেশাগত আরবী, ইরানী, তুরানীদের বংশধর প্রমান করার জন্যই পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলমানরাও'[১৮] উর্দুভাষীদের আনুগত্য করে গেছেন। এই উর্দু-পন্থীদের সম্পর্কে মোজাফ্ফার হোসেন বলেছেন, অবাঙালী "উর্দুভাষীরা যে বাংলাদেশের মোসলমানদিগের মধ্যে বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষা চালাইবার চেষ্টা করেন . . . তাঁহাদের সঙ্গে আবার একদল 'ফেউ' আছেন। এই 'ফেউরা' প্রায় খাঁটী বাঙালী।"[১৯] আরো পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ তীব্র মন্তব্য করেন - "উর্দু ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মোসলমানগণ জাতীয়তাবিহীন ও কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের মোসলমান দিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে, বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"[২০] এ উক্তিতে মিঃ রসের অভিমতের প্রতিধ্বনি রয়েছে।

এরূপ চিন্তাধারা বাঙালী মুসলমানদের অগ্রগতির পথে যে কতদূর ক্ষতিকারক হয়েছিল তা তাঁদের অনুধাবন করতে বেশ সময় লেগেছিল। কেননা উর্দুভাষা উত্তরপ্রদেশে মুসলমানদের মাতৃভাষা হওয়াতে সেখানে তাঁদের সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের জন্যে যে ভাষা প্রগতির বাহন ছিল সে ভাষাই বাংলাদেশে ছিল প্রতিক্রিয়াশীলতার সহায়ক। বাংলাদেশের বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উর্দু চর্চা তাঁদের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে দারুনভাবে ব্যাহত করে, আর সমগ্র বাঙালীর জাতীয় জীবনের মূল প্রবাহ থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে।[২১]

যাইহোক, উর্দুপন্থীদের এই মানসিক আবহাওয়ার মধ্যেই ক্রমান্বয়ে বাংলার মুসলিম জনমানসে এই মনোভাবের পরিবর্তন হতে থাকে। মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই তখন পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে বাংলাভাষার সপক্ষে যুক্তি খাড়া করেছেন। তাঁরা উর্দুপন্থীদের উর্দু চাপানোর প্রতিবাদ করে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন , "পূর্ব্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্তান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন"[২২] তাঁরা বাঙালী এবং তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা। এ বিষয়ে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে মওলানা আকরম খাঁ বলেন—

> দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভূত প্রশ্ন আছে। 'বাঙালী মুছলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দ্দু না বাঙ্গালা?'
>
> - এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভূত।

কারণ তাঁর মতে,

> বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।[২৩]

'হিতকরী'(১০ই পৌষ, ১২৯৭) পত্রিকায় 'আমাদের শিক্ষা'প্রবন্ধে মীর মশাররফ বলেন —

> বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশভাষা বা মাতৃভাষা 'বাঙ্গালা'। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই সে মানুষ নহে।[২৪]

১৩০৭ সালে (ভাদ্র) 'বঙ্গীয় মুসলমান ভাই বহিনের খেদমতে' - নূর-অল-ইমান পত্রিকা এক আবেদনে বলে —

> আমাদের বঙ্গীয় মুসলমানের কোনও ভাষা নাই। শরিফ সন্তানেরা এবং তাদের খেদমৎকারগণ উর্দ্দু বলেন, বাঙ্গালা ভাষা ঘৃণা করেন, কিন্তু সেই উর্দ্দু-জবানে মনের ভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, পশ্চিমা লোকের গিলিত চর্ব্বিত শব্দগুলিও অনেকে যথাস্থানে শুদ্ধ আকারে যথার্থ অর্থে প্রয়োগ করিতেও অপারগ। অথচ বাঙ্গালায় মনের ভাব প্রকাশ সুবিধে হইলেও ঘৃণা করিয়া তাহা হইতে বিরত হন।[২৫]

১৩১০ সালে 'নবনূর' (১ম বর্ষ, ৯ সংখ্যা, পৌষ) পত্রিকা লেখে —

> বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দ্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসলমানের একই মাতৃভাষা করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।[২৬]

বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন,

> বঙ্গভাষা দেবভাষা সংস্কৃতের দুহিতা হইলেও, মুসলমান ধাত্রীর ক্রোড়াশ্রয়েই ইহা প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে।[২৭]

কাজেই তিনি একে হিন্দু মুসলমানের যৌথ সম্পদ বলে উল্লেখ করে এই সম্পদ পরিত্যাগ করাকে 'স্বাধিকারচ্যুত্য' বলে অভিহিত করেছেন। সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজী সমাজে বাংলা শিক্ষাও ইংরেজীর মত অধর্ম (হারাম) ছিল বলে উল্লেখ করে এখন এই বাংলা ভাষার 'সেবা না করিলে অধর্ম হয়' বলে মত ব্যক্ত করেছেন।[২৮] বাঙালী মুসলমান সমাজে এইভাবে মাতৃভাষার প্রশ্নে একটি পরির্তনের সূচনা হতে থাকে এবং উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলাভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে সেই ভাষাতেই সাহিত্য চর্চার একটা ধারাবাহিক প্রবাহ লক্ষ করা যায়।

এই সময় বাংলা-উর্দু বিতর্কের পাশাপাশি আরবী-ফারসী-সংস্কৃত শব্দকেন্দ্রিক ভাষা-বিতর্কের সূচনা হয়। হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা নয়, মুসলমানদের জন্যে আরবী-ফারসী শব্দযুক্ত, বাংলা ব্যবহার করবার উপর জোর দেওয়া হতে লাগল। এ বিতর্ক হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। খুব সম্ভব, হান্টার কমিশনের কাছে আব্দুল লতিফের প্রদত্ত ঐ সুপারিশ পত্রই এ বিতর্কের পথিকৃৎ। কেননা সেখানে তিনি মুসলমানদের জন্যে আরবী-ফারসী মিশ্রিত বাংলাভাষার একটি পৃথক রূপ দাঁড় করাবার কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে মাতৃভাষার সেবক মুসলমানরা বাংলা-উর্দু বিতর্কে উর্দু প্রত্যাখ্যান করে বাংলাকে গ্রহণ করবার কথা বললেও সে সময় একটি প্রচলিত ধারণা ছিল, "আরবী এবং উর্দুকে বাদ দিয়া বাংলায় বাঙ্গালী মুসলমানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।" অতএব "আরবীকেই জাতীয় ভাষার পদে বরণ করিতে হইবে।" শুধু তাই নয় "মুসলমানের জাতীয়ভাষা যে আরবী একথা ভুলিলে মুছলমানের সর্ব্বনাশ হইবে।"[২৯] অন্যদিকে বাংলাদেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে ফার্সী-উর্দু জানা শাসক

ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেদের সামাজিক মেলামেশার সুযোগ ছিল না বললেই হয় - বরং তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব বজায় ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে 'ধর্মশিক্ষা' ও 'উচ্চ ও মধ্যবিত্তের সংস্কৃতির সহিত সংযোগ' রক্ষার তাগিদে বাঙালী মুসলমানেরা আরবী, ফার্সী এবং উর্দু - এই তিনটি ভাষায় যথাসাধ্য শিক্ষা গ্রহণের প্রচেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু এই তিনটি ভাষাই যখন তাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা কঠিন বা দুঃসাধ্য মনে হয়েছে তখন তাঁরা একটি সহজ পথ আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন। এই বাঙালী মুসলিম লেখকেরা আরবী হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা করেছেন[৩০] এবং সমাজে তা প্রচলিত করবার জন্যে প্রস্তাবও প্রদান করেছেন।[৩১] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এরূপ আরবী হরফে বাংলা পুঁথিপত্র কিছু রচিতও হয়েছে।[৩২] কিন্তু সমাজে যখন তা চালু করা গেল না তখন তাঁরা—

> বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার আরবী-ফার্সী শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। জনগণ তাঁদের এই ভাষাটিকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোন জনগণ ? এঁরা ছিলেন সেই জনগণ, সংস্কৃত যাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিলো, আরবী অজানা, ফার্সীর নাম শুনেছেন এবং ঊর্দু ভাষা কানে শুনেছেন মাত্র।[৩৩]

যাই হোক এই ভাষারীতিটিই পরবর্তী কালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মুসলমান লেখকদের একটি অংশ ব্যবহার করেছেন।

এই বিশেষ ভাষারীতিটিকে নানা জনে নানা নামে অভিহিত করেছেন। সম্ভবতঃ রেভারেন্ড জেমস লঙ(১৮১৪-১৮৮৭) ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুস্তক বিবরণীতে প্রথম এই ভাষাকে 'মুসলমানী ভাষা' (Musalman Bengali) এবং এই ভাষায় রচিত সাহিত্যকে মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্য বলে অভিহিত করেছিলেন।[৩৪] জে. এফ. ব্লুমহার্ডও এই নাম ব্যবহার করেন।[৩৫] ১৮৭৩ খ্রী. 'বঙ্গদর্শনে' (বাং- ভাদ্র, ১২৮০) সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' নাটকটির ভাষা প্রসঙ্গে 'মুসলমানী বাঙ্গালা' ভাষারীতির কথাটি উল্লেখ করেছিলেন।[৩৬] ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে (ফাল্গুন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'মুসলমানি বাঙ্গালা' নামে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ রচনা করে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেন।[৩৭] এরপর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'[৩৮], ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Origin and Development of Bengali Language' গ্রন্থে 'মুসলমানী বাঙ্গালা' নামটিই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গ্রহণ করেন।[৩৯] 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩০৩) একটি প্রবন্ধে ব্যোমকেশ মুস্তফী একে 'ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঊর্দু কবিতা' বলে অভিহিত করেছেন।[৪০] ডঃ সুকুমার সেন একে 'ইসলামী বাংলা' বলেছেন।[৪১] এবং প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' - এর বড় খাঁ গাজীর জবানীর ভাষা-প্রয়োগকে 'ইসলামী ঢঙের হিন্দী রচনা' (মুস্তফী যাকে 'ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঊর্দু কবিতা' বলেছিলেন) নামে উল্লেখ করেছেন। সে যাই হোক, এ ভাষায় বহু 'পুঁথি সাহিত্য' রচিত হয়েছে, সাধারণ লোক তা বুঝতেও পারতেন, কিন্তু এই ভাষারীতিটি বাঙালী মুসলমানদের কথ্যভাষা রূপে কতটা প্রসারলাভ করেছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেন যে "যাঁরা বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আরবী-ফারসী-বিশেষ্য মিশ্রিত করে কথা বলেন, তাঁরাই সবচেয়ে সুচারুরূপে বাংলা বলতে পারেন বলে স্বীকৃত।"[৪২] কিন্তু জেমস্ লঙ নিজেই উল্লেখ করেছেন যে এ ভাষা মাঝিমাল্লাদের মধ্যেই প্রচলিত ('a mixture of Bengali and Urdu, called the boatmen's language'), তবে নগরে তার কিছু কিছু প্রচলন হয়েছে।[৪৩] তাই বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানদের ভাষার সঙ্গে এর যথেষ্ট তফাৎ ছিল। এ বিষয়ে কাজী আব্দুল মান্নান জানিয়েছেন—

> মুগল আমল থেকে এ দেশের পুরানো শহরগুলোতে 'আশরাফ' সমাজ ও বিভিন্ন জায়গার মানুষের সংস্পর্শে মুসলমানদের মধ্যে বাংলা - ঊর্দু - হিন্দীর সংমিশ্রণে এক ধরণের মৌখিক

> ভাষার প্রচলন হয়। মালদা জেলায় এ ভাষাকে বলা হয় 'খোট্টাভাষা'। কোলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, মালদা প্রভৃতি শহরে এখনও এ-ভাষার প্রচলন দেখা যায়। মনে হয়, 'দোভাষী পুঁথি'র মধ্যে ঐ ভাষাই এক ধরণের সাহিত্যিক রূপ লাভ করে।[৪৪]

এই ভাষারীতির কাব্যকে আধুনিককালের সাহিত্যের ইতিহাসকারদের অনেকে 'দোভাষী পুঁথি' নামে অভিহিত করেছেন।[৪৫] কিন্তু এই নামটিও সুপ্রযুক্ত নয় বলে মনে হয়। কেননা এই ভাষায় তো কেবলমাত্র দুটো ভাষার নয় - অনেক ক'টি ভাষার (বাংলা, আরবী, ফারসী, তুর্কী, উর্দু ও হিন্দী) প্রচুর শব্দ এসে মিশ্রিত হয়েছে। এ কারণে আনিসুজ্জামান একে 'মিশ্রভাষারীতি' বলে অভিহিত করে বলেছেন - "বিদেশী শব্দ বাহুল্যের কথা বিবেচনা করে একে মিশ্র ভাষা বলা অসঙ্গত নয় এবং তার অনুসরণে এই কাব্যধারাকেও মিশ্রভাষারীতির কাব্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে।"[৪৬] এই ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' ও ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৪৭]

এই মিশ্রভাষায় রচিত সাহিত্যকে বিষয়বস্তু বা ভাবধারার দিক দিয়ে নির্বিচারে মুসলমানী বা ইসলামী বলা যায় না। সর্বোপরি 'মুসলমানি বাঙ্গালা' বা 'ইসলামী বাংলা' নামটিতেই আধুনিক পণ্ডিত ডঃ মহম্মদ এনামুল হক আপত্তি তুলেছেন।[৪৮] কেননা,

> কোন জাতি বিশেষের গায়ে হিন্দুয়ানী বা মুসলমানী মার্কা মারিতে পারা গেলেও কোন দেশ, বিশেষত কোন দেশের ভাষার গায়ে তেমন কোন মার্কা মারা যায় কিনা সে বিষয়ে আমাদের বিস্তর সন্দেহ আছে।[৪৯]

এই নামকরণের পেছনে তিনি সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ ও মুসলমান লেখকদের প্রতি 'ঘৃণার ভাব' লক্ষ করেছেন। অবশ্য তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে প্রথমদিককার পণ্ডিতগণ অত্যন্ত 'অসাবধানভাবে' কোন 'ঘৃণার ভাব' ছাড়াই তা ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালের বাঙালী হিন্দু লেখকগণ অবজ্ঞা-ভরে তা ব্যবহার করতেন বলে তাঁর বিশ্বাস।

অবশ্য এটি লক্ষণীয় যে প্রাক-আধুনিক যুগ বা মধ্যযুগ থেকেই এই আরবী-ফারসী-হিন্দী মিশ্রিত বাংলা ভাষা হিন্দুলেখকগণও ব্যবহার করে আসছিলেন। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র রায়, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, কৃষ্ণরাম দাস প্রভৃতি কবি এই 'মিশ্রভাষা রীতি' বা 'মুসলমানী বাংলা' সীমিতভাবে হলেও প্রয়োগ করেছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রামেশ্বরের 'সত্যপীর' থেকে উদ্ধৃত অংশ ঃ-

> কাহে কুট্টন গির্দ্দ মৌত লগা তেরা।
> ছোর সদানন্দ নাম সেবককো মেরা॥
> নহি ঠোর মারুঙ্গা রখেগা কৌন চচ্চা।
> ও লোগ ভি চোর ঔর তুলোক ভি সচ্চা॥[৫০]

১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল'-এর ভাষা ঃ-

> ভাগ গিয়া [শালা] এবে কিয়া করে আব।
> হোগা হারামজাদ খানে খারাব॥
> শোন্তে হো দক্ষিন রায় এসা দাগাবাজী।
> বাঁধকে লে আনেসে তবে হাম গাজী॥[৫১]

এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ শব্দেই 'বাংলাত্ব' অনুসন্ধান করা মুশকিল।

বাংলাদেশের বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান লেখকগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল পর্য্যন্ত একরূপ

'খিচুড়ি'বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে থাকে, যা অধুনা 'বটতলার সাহিত্য' নামে অভিহিত হয়। এই বটতলার সাহিত্যকেই লঙ্ সাহেব 'মুসলমানী বেঙ্গলী' নাম দিয়েছিলেন। ভাষার দিক থেকেও এদের মূল্য যেমন নগন্য, সাহিত্য সম্পদের দিক থেকেও এর মূল্য তেমন হেয়।[৫২] এই ভাষার মধ্যে কৃত্রিমতা যত বেশী আছে, স্বাভাবিকতা ততই কম। কেননা এইরূপ ভাষায় কোন অঞ্চল বিশেষের মুসলমান কথা বলতেন কিনা তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। আর এই সময়ের হিন্দু রচিত সাহিত্যও 'মুসলমানী' সাহিত্যের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে গেছে বলে একে অনেকে 'মুসলমানী বাঙ্গালা' না বলে 'উর্দুকৃত বাঙ্গালা' বলার পক্ষপাতী। এতেও হয়তো এর সবটা পরিচয় দেওয়া যায় না। এ কারণে "এইরূপ কোন নাম দেওয়াই সমীচীন নহে। বাঙ্গালা ভাষার প্রগতির ইতিহাসে ইহা একটি স্তর মাত্র।"[৫৩]

যাই হোক, এই মিশ্রভাষায় মুসলিম শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চা বিষয়ে তৎকালীন বাঙালী মুসলমান লেখকদের মধ্যেও পরস্পর বিরোধী মনোভাব লক্ষ করা যায়। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর 'ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে বাংলা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের সংস্কৃতানুসারী বাংলা ভাষার বিরোধিতা করেছেন।[৫৪] মির্জা মহম্মদ ইউসুফ আলীর 'দুগ্ধ-সরোবর' (১৮৯১) নামে একটি পুস্তিকায় বেশ কিছু আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য দেখে জনৈক হিন্দু সমালোচক ঠাট্টা করে মন্তব্য করেছিলেন - "মুসলমানের বাবুর্চিখানায় পক্ক দুগ্ধ হিন্দুর অস্পৃশ্য"। এতে তিনি বেশ ক্ষুব্ধ হন এবং এর উত্তরে তিনি লেখেন - "আমরা মোসলমান। আমরা নিজে, আমাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ, আমাদের দাসদাসী, গোলাম-বান্দী, পাড়া-পড়শী সকলে বাংলাভাষায় যে শব্দ আরামের সহিত মনের ভাব প্রকাশ করিতে ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরূপ শব্দ ইহার মধ্যে বেশ থাকিবে।" এবং তিনি "এসলাম ধর্মের সহিত অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধযুক্ত ওজু, গোসল, ফরজ, ওয়াজেব, হালাল, হারাম, আল্লাহ, রসুল ইত্যাদি" আরবী ফারসী শব্দগুলি "মোসলমান সমাজের উন্নতির যুগান্তর" আনবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সেইসঙ্গে মুসলমান সমাজকেও ঐ প্রবন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়ে লেখে- "বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া লউন।"[৫৫] সৈয়দ এমদাদ আলী "মাতৃভাষা ও বঙ্গ মুসলমান" প্রবন্ধের বক্তব্যে মুসলমানদের জন্যে পৃথক ভাষার ইঙ্গিতটি প্রতীয়মান হয়—

> এই বঙ্গভাষা রূপ নূতন দুর্গের মধ্যে আমরা নিরাপদে আমাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান করিয়া লইতে পারি এবং তাহা করাই আমাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। নতুবা হিন্দু ভাব ও হিন্দু আদর্শপূর্ণ সাহিত্যপাঠে মুসলমান সমাজ ক্রমে ক্রমে নিজেদের বিশেষত্ব বর্জিত হইয়া এক অদ্ভূত মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। . . . . ইহাতে মুসলমান সমাজ প্রচলিত বঙ্গভাষা হিন্দুর ভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে, কিন্তু তাহাতে বঙ্গভাষার বা বঙ্গদেশের কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং বল সঞ্চয় হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।[৫৬]

'ইসলাম প্রচারক' সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদও একই মনোভাব পোষণ করে লেখেন—

> যেদিন আমরা এই মাতৃভাষা বাঙ্গালায়, জাতী ভাষা আরবী, ফার্সী, উর্দু প্রভৃতি হইতে জাতীয় বহুল শব্দ, জাতীয় ভাব, জাতীয় তেজ, জাতীয় ধর্মপ্রাণতা আনয়ন করিতে পারিব, সেইদিন এই মাতৃভাষা দ্বারা আমরা যথোচিত ফললাভ করিতে সক্ষম হইব। . . . . . আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষার আলোচনা এদেশ হইতে উঠিয়া গেলে, আমরা জাতীয়ত্ব হারাইয়া সম্পূর্ণ হিন্দু হইয়া পড়িব, তাহা হইলে কালে বৌদ্ধদিগের ন্যায় আমাদিগের অস্তিত্ব হিন্দুদিগের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে।[৫৭]

এই উদ্ধৃত বক্তব্যগুলির মধ্যে যেমন 'হীনমন্যতাবোধ ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব' কাজ করেছে তেমনি সমকালীন অপেক্ষাকৃত অগ্রসরমান হিন্দুসমাজের চাইতে সর্বক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির অবলুপ্তির অমূলক আশঙ্কাও প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আবার এরই পাশাপাশি 'ভাষা সমস্যা' বিষয়ে এয়াকুব আলী

চৌধুরীর প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনারও পরিচয় পাওয়া যায়। 'কোহিনুর' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেন —

> ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানীর প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ গুণে প্রয়োজন।[৫৮]

সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক এবং সংস্কৃতি-চর্চা বিষয়েও তৎকালীন পত্র পত্রিকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল॥ এখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ে ইসলামী নীতির কিছু আলোচনা এসে যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার বিষয়ে ইসলামী বিধান রক্ষণশীল এবং অনেকক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। কবি ও কবিতার প্রতি হজরত মোহাম্মদের বিরূপতা ছিল, কিন্তু গল্প বলার (Story telling) প্রতি অনুরাগ ছিল।[৫৯] আবার দেখা যায়, ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম ধর্ম ও হজরত মহাম্মদকে উদ্দেশ্য করে বহু কবিতা লেখা হয়েছে। ইসলামী ধারায় একালের শ্রেষ্ঠ কবিও ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত হাসান বিন সাবেত। কোরআন শরীফে র ভাষার কাব্যময়তা ও সঙ্গীতময়তা আরববাসীদের সাহিত্য প্রীতিকে জাগিয়ে তুলেছিল। সঙ্গীতচর্চার বিষয়ে ইসলামের যা বিধান তা পরস্পর বিরোধী। তাই কারো কাছে তা সমর্থিত আবার কারো কাছে তা নিন্দারযোগ্য তথা 'হারাম'।[৬০] হজরত মোহাম্মদ (সঃ) সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন না, কিন্তু কখনো কখনো তাঁর উপস্থিতিতেই সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে খলিফাদের অনেকেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন।[৬১]

সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় ইসলামের এই পরস্পর বিরোধী বিধিবিধানের ফলে চলে আসা বহুদিনের বিতর্ক ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যেও দেখা যায়। 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় থিয়েটারের 'বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা' প্রকাশিত হলে ইবনে মাআজ 'ইসলাম প্রচারকে' কঠোর সমালোচনা করেন। কেননা তাঁর ধারণায় 'নাট্যাভিনয় মানেই পাপানুষ্ঠানের প্রশস্ত দ্বারস্বরূপ।'[৬২] থিয়েটার ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। কাজেই নাট্যাভিনয়ের এই বিরোধিতা নাট্যসাহিত্য চর্চারও বিরোধিতার সামিল। নৃত্য-গীতের মতো থিয়েটারও ইসলামে নিষিদ্ধ — এই বিশ্বাস থেকেই এই বিরূপ মনোভাবের জন্ম। অন্যদিকে তৎকালীন সাহিত্যিকদের অনেকেই 'ইংরেজী ছাঁচে ঢালা' ভাবময়ী আধুনিক গীতিকবিতার বিরোধী ছিলেন, পক্ষান্তরে 'জাতীয় ভাবের উদ্দীপনাময়ী কবিতার' পক্ষপাতী ছিলেন। সৃষ্টিশীল লেখক হওয়া সত্ত্বেও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তাছাড়া তিনি কাল্পনিক গল্প উপন্যাসের পরিবর্তে ধর্মীয়, জ্ঞান বিজ্ঞানমূলক ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও গল্পগুজবের ছড়াছড়িতে আশঙ্কা প্রকাশ করে লিখেছেন —

> সাপ্তাহিক হইতে আরম্ভ করিয়া সাময়িক পত্রিকা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই গাঁজাখুরী গল্প এবং নায়ক-নায়িকার উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়যুগলের পূতি গন্ধে পরিপূর্ণ। . . . উপন্যাস পাঠে যে উপকার, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, জীবনী, প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বের আলোচনায় কি তদপেক্ষা বহুল উপকারের আশা নাই ?[৬৩]

কবি কায়কোবাদ ধর্মচিন্তা নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। এ ছাড়া অধিকাংশ মুসলমান লেখকই অতীতের গৌরব কাহিনী ও প্যান-ইসলামীয় মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যচর্চা করেন। নূর-অল-ইমান, বাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় স্কুল-পাঠ্যতালিকায় হিন্দুভাবাপন্ন কাব্য-কাহিনীর পরিবর্তে ইসলামী আদব-কায়দা, জীবনী এবং ঘটনাবলীর বিষয় আনয়ন করবার জন্যে লেখনী চালনা করেন।

মাতৃভাষা ও সাহিত্যচর্চার বিষয়ে এ সময়ের মুসলমান লেখকগণ নানান জটিল ও পরস্পর বিরোধী সমস্যার সম্মুখীন হন। আর এইসব সমস্যা সৃষ্টির মূলেও ছিল তৎকালীন সমাজ-মানস। তাঁদের ধ্যান ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে এইসব লেখকদের রচনায়। মাতৃভাষার প্রশ্নে একদিকে বাংলাকে অস্বীকার করবার পরিস্থিতি যেমন ছিল না, তেমনি

আরবী ফারসী উর্দুর মায়া-বন্ধন থেকেও তারা মুক্ত হতে পারেন নি। অথচ এতগুলি ভাষা আয়ত্ত করা সত্ত্বেও যে ছাত্রদের পক্ষে শুভ হয় নি তাও তাঁরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এ কারণে বহু লেখকের ভেতরেই ছিল এই পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্ব। মাওলানা আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সৈয়দ এমদাদ আলী, আবুল কালাম,শামসুদ্দিন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিকগণও তাই এই পরস্পর বিরোধিতার ঘুরপাকে আবর্তিত হয়েছেন।[৬৪]আবার একদিকে ধর্মীয় অনুশাসন ও অন্যদিকে যুগ ও সামাজিক চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে তাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। তাই একালে উপন্যাস নাটকের সংখ্যা যেমন নগন্য, মানও তেমনি তুচ্ছ। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা তাড়িত হয়ে সাহিত্যচর্চা করতে গেলে স্বতঃস্ফূর্ত উন্নত সাহিত্য রচিত হতে পারে না—হয়ে ওঠে প্রচার-সর্বস্ব রচনা। সাহিত্য তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তি অর্জন করতে পারে না। এই সময়ের মুসলমান লেখকদের ক্ষেত্রে এই নির্মম সত্যটি বারে বারে ধরা দিয়েছে। তাই ভাষা ও সাহিত্যের বিতর্কে এ সময়ে মুসলমানদের মধ্যে একটা নতুন জিজ্ঞাসা তথা নবজাগরণের ঢেউ এসেছে বটে, কিন্তু তা এসেছে 'সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যচিন্তার বর্ণে রঞ্জিত হয়ে'।[৬৪-ক] বহু বাদ বিতন্ডার মধ্যে তাঁরা বাংলা ভাষাকে "মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করলেও বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে সংস্কার মুক্ত ছিলেন না বলে তাঁদের দ্বারা উন্নত সাহিত্য রচিত হয় নি।"[৬৫]

প্রাক্ মশাররফ মুসলমান লেখকদের সাহিত্য-চর্চা

১.

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা হয়। কিন্তু বিস্ময়কর মনে হলেও এটি ঐতিহাসিক সত্য যে এ সময়কার মুসলমান লেখকগণ প্রাচীন ধারায় 'মিশ্রভাষারীতি'র পুঁথিসাহিত্য এবং আঞ্চলিক ভাষায় লোকসাহিত্য চর্চায় মশগুল ছিলেন। তাঁরা আধুনিক বাংলা ভাষা সাহিত্য চর্চায় অগ্রসর হননি। এর পেছনে অবশ্য নানা ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল মুসলমান সমাজে তেমন কোন নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে প্রথমদিকে শহুরে শিক্ষিত মুসলমানগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিমুখ ছিলেন। বাংলা ভাষাকে তাঁরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের ভাষা বা সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলাকে হিন্দুদের ভাষা বলে অবজ্ঞা করে তার চর্চা থেকে দূরে থেকেছেন। স্বল্পবিত্ত গ্রামীণ মুসলমানদের একাংশ বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করলেও নানা কারণে উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বা ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পাননি। এছাড়া সুফি সাধক কবি সাহিত্যিকদের মরমিয়াবাদী ধর্মমূলক সাহিত্যচর্চা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শরীয়তপন্থী ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে ধাক্কা খায়। এমনকি ওয়াহাবীরা রসধর্মী সাহিত্যচর্চার ও বিরোধী ছিলেন। ফলে মুসলমান সাহিত্যিকগণ তখনও পুরোনো ধারা বেয়ে নবসৃষ্ট মিশ্রভাষায় কাব্যচর্চা করে গেছেন। সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর জনপ্রিয়তা তখনও ছিল। কেননা তখনও পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে উন্নত রুচিসম্পন্ন পাঠক শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। এতে একদিকে অবশ্য এই সময়কার মুসলিম সাহিত্য সাধকদের শূন্যতা তাঁরা পূরণ করেছিলেন বটে কিন্তু নতুন চিন্তা-চেতনা বা সৃজনী-ক্ষমতার উন্মেষ ঘটতে আরো সময় লেগেছিল।

অথচ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের অবদান অবিসংবাদিত। বেশ কিছু প্রতিভাবান কবি সে সময়কার সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। এদের মধ্যে শাহ মুহম্মদ সগিরের 'য়ূছুফ জোলেখা' (আনুঃ ১৩৮৯-১৪০৯) মুসলমান রচিত বাংলা আদিকাব্য বলে অভিহিত।[৬৬] এর পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে (অবশ্য আবির্ভাবকাল নিয়ে

মতভেদ আছে) জৈনুদ্দিন নামে আরেকজন কবি[৬৭] কাহিনীমূলক ও ধর্মমূলক কাব্য রচনা করেন। ষোড়শ শতকে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেন তাঁরা হলেন সাবিরিদ খাঁ, দোনাগাজী, সেখ ফয়জুল্লাহ, দৌলত উজীর, মুহম্মদ কবীর প্রভৃতি।[৬৮] সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত আরাকান রাজসভার দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল সুপরিচিত। তাঁরাই প্রথম গতানুগতিক ধারা থেকে সরে এসে ধর্মনিরপেক্ষ নরনারীর প্রেমকাহিনী নিয়ে কাব্য লিখেছিলেন। এই সময় সৈয়দ মর্তুজা, লাল মামুদ, নসির মামুদ, আলী রাজা প্রভৃতি কবিরা বৈষ্ণব পদ রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কোন কারণে মুসলমান কবিদের সাহিত্যচর্চায় ভাঁটা পড়ে।

দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে একদা ক্ষমতাবান ও বিত্তবানেরা তাঁদের ক্ষমতা ও বিত্ত হারিয়ে ফেললে কবি-সাহিত্যিকগণ পৃষ্ঠপোষকদের আশ্রয়চ্যুত হয়ে পড়েন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নতুন পটভূমিকায় সদ্যগঠিত নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠে সেখানে শুরু হয় যাত্রা, পাঁচালী, খেউড়, টপ্পা, তর্জা, আখড়াই প্রভৃতি স্থূলরুচির কাব্যকলার অনুশীলন। তবে এই সময়কার সাহিত্য চর্চার প্রকৃত পরিচয় রয়ে গেছে কবিওয়ালা শ্রেণীদের সাহিত্যকর্মে এবং 'মিশ্রভাষা'রীতি কাব্যচর্চার মধ্যে। মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণ - এই দুটো ধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছেন - এর উর্দ্ধে উঠে আধুনিক ভাবধারার সাহিত্যচর্চা করতে পারেননি। কবিওয়ালা শ্রেণীর অন্ততঃ দুজন মুসলমান কবি তখন বর্তমান ছিলেন - এঁরা হলেন মীর্জ্জা হুসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ।[৬৯] আবার 'তরজার প্রবর্তক ছিলেন একজন মুসলমান, তাঁর নাম হোসেন খান'।[৭০] তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যে ধারাটি বাঙালী মুসলমানদের হাতে সযত্ন লালিত পালিত হয় তাহল 'মিশ্রভাষারীতি'র কাব্যের ধারা।

শিল্প নৈপুণ্যের দিক থেকে 'মিশ্রভাষারীতির' কাব্যগুলির তেমন কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। তবু 'প্রাচীন কাব্যের ক্রমবিলীয়মান সৌন্দর্যরশ্মি অস্পষ্ট আভায় এ সমস্ত রচনায় ধরা পড়েছে। সে কারণেই সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রমধারা এবং প্রবহমানতা এগুলির দ্বারাই রক্ষিত হয়েছে।'[৭১] একথা মনে রেখেই এখানে সংক্ষেপে এই ধারার কয়েকজনের কাব্য ও তাঁদের কাব্য-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল।

হুগলীর বালিয়া হাফেজপুর গ্রামের ফকীর গরীবুল্লাহকে এই ধারার পথিকৃৎ বলা যায়। তাঁর রচিত 'আমীর হামজা (১ম পর্ব), ইউসুফ জোলেখা, মোক্তাল হোসেন বা জঙ্গনামা, সোনাভানের পুঁথি, সত্যপীরের পুঁথি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরে খ্যাতিমান কবি ছিলেন হুগলীর ভুরশুট পরগণার উদনা গ্রামের সৈয়দ হামজা (জন্ম - ১৭৩৩-৩৪)। তিনি রচনা করেন চারটি কাব্য— মধুমালতী (আনুঃ ১৭৮৮খ্রী.), আমীর হামজা(২য় খন্ড) - (গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন), জৈগুনের পুঁথি এবং হাতেম তাইর কেচ্ছা। এঁরা দুজনেই অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা বাংলা এবং উর্দু গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানকার শিক্ষক পন্ডিতদের দ্বারাই বাংলা ও উর্দু গদ্যের চর্চা শুরু হয়। এবং এঁদের রচিত গ্রন্থগুলি গদ্যের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তোলে। খুব সম্ভবতঃ এখানকার উর্দুগ্রন্থগুলি তৎকালীন মিশ্রভাষার কাব্যের প্রেরণা যুগিয়েছিল।[৭২] এই সময় যখন বাঙালী হিন্দুদের দ্বারা বাংলা গদ্যের কাঠামো তৈরী হচ্ছে এবং তাঁরা সেই গদ্যচর্চায় নিয়োজিত আছেন তখনও বাঙালী মুসলমানরা গদ্যচর্চায় ভ্রুক্ষেপ না করে পুরোনোরীতির মিশ্রভাষায় কাব্যচর্চা করে গেছেন। এই ধারাবাহিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তীকাল, এমনকি বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

এই কালপর্বে রচিত এই ধারার কবি ও কাব্যগুলি হল— আরিফ নামক জনৈক কবির 'লালমন'; জয়নাল

তাই'; দ্বিতীয় গরীবুল্লাহর 'ঈমানদার নেক বিবির কেচ্ছা', 'ইবলিসনামা'; খ্যাতনামা কবি মোহম্মদ খাতেরের 'মৃগাবতী', 'লায়লা মজনু', 'গুল ও হরমুজ' ও তাঁর শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কাব্য 'সাহানামা'। 'সাহানামা'র মত বৃহৎ ও জনপ্রিয় আরেকটি কাব্য মফিজুদ্দিন আহমদের 'কেচ্ছা আলেফ লায়লা'। সাদ আলী ও আবদুল ওয়াহাবের 'শহিদে কারবালা' রমজানউল্লাহ খলিলুদ্দিন গাইনের 'ভানুমতীর লড়াই' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকে রচিত এই মিশ্রভাষার কাব্যগুলিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ স্থূলরুচির পাঠকের রসপিপাসা নিবৃত্ত করবার তাগিদে রচিত এই সমস্ত কাব্যে শিল্পমূল্য প্রায় ছিল না। তৎকালীন মুসলমান সমাজ-মানসের প্রতিফলন এতে ঘটেছে। হিন্দু ধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে রচিত কাব্যগুলিতে যথেষ্ট কাল্পনিকতা ও অলৌকিকতার রঙ মিশ্রিত হয়েছে। সাধারণ লোকের জন্যে রচিত হলেও লোকসাহিত্যের মতো এর আবেদন সার্বজনীন হতে পারেনি। বাস্তব জীবন-বিমুখতার কারণে পীর দরবেশ প্রভৃতি অলৌকিক ব্যক্তিদেরই ছিল প্রাধান্য। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই রচয়িতাগণ নূতন বিষয় ও আঙ্গিকের চিন্তা করতে ব্যর্থ হন এবং সর্বোপরি এদের মধ্যে থেকে এমন কোন প্রতিভাবান মুসলমান কবির আর্বিভাব ঘটে নি যাঁরা নবসৃষ্টির আলোড়ন তুলতে পারতেন। তাই ষোল আনা ইসলামধর্ম সম্মত কাব্য না হওয়া সত্ত্বেও এদের আবেদন কেবল অশিক্ষিত মুসলমান সমাজের মধ্যেই সীমিত থেকে গেছে।

এই শতাব্দীতে মিশ্রভাষার কাব্যরীতির পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায়, অবশ্য গতানুগতিক রীতিতে, কিছু কিছু কাব্য রচিত হয়েছে। যেমন চট্টগ্রামের নালপুর গ্রামের আজগর পণ্ডিতের 'চিন লেম্পতি' (রচনাকাল ১৮৬৬ এবং প্রকাশকাল ১৯০৬)[৭৩] পুরোনো কাব্যের ছাঁদে বিশুদ্ধ সাধুভাষায় রচিত গ্রন্থ। সিলেটের (?) খলিল নামে জনৈক কবির প্রণয় গাথা 'চন্দ্রমুখী'; ফরিদপুর জেলার তালগিচর গ্রামনিবাসী মোহম্মদ মিরণের 'বাহার দানেস' (১২৪৪ বঙ্গাব্দ/ফারসী কাব্য অবলম্বনে রচিত)। মীর্জাপুরের এবাদত আলী (বা এবাদ তুল্লা) এর 'গোলে বকাওলি' এবং 'কুরঙ্গভানু' (১৮৫৭খ্রী.); ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা গ্রামের আবদুর রহিমের 'গাজী-কালু ও চম্পাবতী' প্রভৃতি এই শ্রেণীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই সময়ে মিশ্রভাষায় হোক অথবা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় হোক বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকগণ কেবল গতানুগতিক ধারায় দীর্ঘকাল কাব্যচর্চা করে গেছেন। কোন নূতন দিশা তাঁরা দিতে পারেননি অথবা সাহিত্যের মূল প্রবাহে নিজেদের যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রাক মশাররফ মুসলমান লেখকদের সাহিত্য-চর্চা

২.

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার সূচনা হল তার বাহন হল বাংলা গদ্য। গোটা মধ্যযুগ ধরে বাংলা সাহিত্যের বাহন ছিল পদ্য। তখন কবিরা পদ্যকে সমস্তরকম যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তার মাধ্যমে যুক্তি ও দার্শনিক মননচিন্তনের কাজও করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকে যে আধুনিকতার সূচনা হল তার মূলকথা হল যুক্তিবাদ ও মানবতাবোধ। আর মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনার উন্মেষ। যুক্তিবাদ বা rationality যা যেকোন আধুনিকতার মূল কথা তার প্রকাশ মাধ্যম গদ্য। পদ্যের সুনিয়মিত ছন্দশাসিত প্রকাশ মাধ্যম যুক্তির আধুনিকতাকে

প্রকাশ করতে পারে না।

বাংলা গদ্য চর্চায় পর্তুগীজ মিশনারী ও ইংরেজ মিশনারীদের কৃতিত্ব আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। ১৮০০ খ্রীঃ যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় তা বাংলা গদ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অবশ্য শিক্ষাগারের পৃষ্ঠপোষণে যে গদ্যের বিকাশ তাতে সাহিত্যের সৌন্দর্য বা ভাব প্রকাশের শক্তির সম্পূর্ণতা ছিলো না। রামমোহন রায় বাংলা গদ্য সম্বন্ধে বলতে এসে বলেছিলেন এদেশে লোকেরা গদ্য লেখেন না, গদ্যের অন্বয় বুঝে উঠতে পারেন না। তিনিই গদ্যকে যুক্তি ও তর্কের বাহন রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তাকে মনন চিন্তনের ভাষারূপে দৃঢ় করে তুললেন। বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত আনলেন বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রকাশের মতো শক্তি। যুক্তি ও মননের ভাষা হিসেবে বাংলা তাঁর হাতে গড়ে উঠল। অতঃপর বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে দিলেন অন্তঃছন্দ ও ধ্বনি সৌষম্য। ভাষার প্রবহমানতা আর ভাষার সৌন্দর্য দুয়েই শক্তির বিকাশ ঘটল তাঁর লেখায়। সাহিত্যিক গদ্যের উন্মেষণ হল তাঁরই হাতে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা গদ্যের শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোন বাঙালী মুসলমান লেখককে গদ্যচর্চা করতে দেখা যায়নি। এই শতকের দ্বিতীয়ভাগে যখন তাঁরা সাহিত্য রচনা করতে এলেন তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য – উভয় ক্ষেত্রেই একটা গঠিত আদর্শ তাঁদের সামনে ছিল। তবুও বাংলা গদ্য সাহিত্যে খুব কম মুসলমান লেখকই সফল হতে পেরেছিলেন। মশাররফ হোসেনের পূর্বেকার গদ্য লেখকদের প্রায় কেউই সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। ভালো গদ্যের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী', পর্যন্ত। তবু ইতিহাসের ধারাবাহিকতা স্বীকার করতে গিয়েই প্রাক-মশাররফ-পর্বের কয়েকজন মুসলমান লেখকদের উল্লেখ করতে হয়।

মীর মশাররফ হোসেনের পূর্বে বাংলা গদ্যভাষা চর্চায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা হলেন – খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী (সমছুদ্দিন ছিদ্দিকি খোনকার), মুনশী আজিমুদ্দীন, মুনশী নামদার, গোলাম হোসেন, শেখ আজিমদ্দী, আয়েন আলী শিকদার এবং শিমুয়েল্ পীর বক্স[১৪]। এঁদের মধ্যে একমাত্র আয়েন আলী শিকদার ছাড়া বাকী প্রায় সবাই ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের লোক।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম মুসলমান লেখক হিসেবে বর্ধমান জেলার সর্বমঙ্গলার অধিবাসী খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর নাম প্রসিদ্ধ। তার রচিত 'উচিত শ্রবণ' মুসলিম প্রণীত প্রথম গদ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত।[১৫] অবশ্য গ্রন্থকার নিজ নাম 'খোন্দকার শ্রী সমছদ্দীন মহম্মদ ছিদ্দিকি' বলে উল্লেখ করেছেন। 'উচিত শ্রবণ' গ্রন্থটির রচনাকাল জানা যায়নি। তবে ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব 'সওগাত' (পৌষ, ১৩৫৪ সন) পত্রিকায় 'মুসলমান লিখিত প্রাচীনতম গদ্য গ্রন্থ' নামক প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে, ১২৭১ সালের আগেই এটি রচিত হয়েছিল।[১৬] Blumhard s catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum থেকে জানা যায় 'উচিত শ্রবণ' মুদ্রিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে।[১৭] সুফী তত্ত্বের কথা এতে বর্ণিত। আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে লেখা এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, মানুষের পক্ষে কী শ্রবণ করা উচিৎ অথবা অনুচিৎ। রসিক পাঠক সমাজের কাছে এর আবেদন

ছিল সামান্যই। তাঁর গদ্য-ভাষাকে কেউ[৭৮] 'অত্যন্ত সুললিত, মার্জিত, সুন্দর', কেউ বা[৭৯] 'জটিল এবং আড়ষ্ট' বলেছেন। গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত এই গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে ডঃ ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন — "লেখকের গদ্যভঙ্গি কোথাও জটিল, কোথাও সরল, কিন্তু পদ্যরীতি সর্বত্র অবাধ ও সচ্ছল।"[৮০] তাঁর গদ্যভঙ্গি দীর্ঘায়িত ও অনুপ্রাসমন্ডিত, বাক্যগঠন অনেকটা ঈশ্বরগুপ্তের গদ্যের সমধর্মী এবং তা কখনো সরল, কখনো জটিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গদ্যসাহিত্যের বিকাশপর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতে গদ্য যে উৎকর্ষ লাভ করেছিল সিদ্দিকী সে রকম ভাষাভঙ্গি আয়ত্ত করতে পারেননি। তবে সিদ্দিকীর মধ্যে একটি সাহিত্য-বোধ ছিল। এই বোধ তিনি গদ্যে সঞ্চারিত করতে না পারলেও কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন। তিনি 'ভাবলাভ' (১৮৫৩)এবং 'শুরতজান' নামক দুটি রূপকথাজাতীয় কাহিনীকাব্য রচনা করেছিলেন।

কালের দিক দিয়ে প্রায় একই সময়ে আরেকজন লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল তিনি শিমুয়েল পিরবক্স। শিমুয়েল পিরবক্সের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তবে তিনি এক সময় মুসলমান ছিলেন, পরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি তখন এন্টালির মিশন স্কুলে শিক্ষক ছিলেন।[৮১] পিরবক্স 'বিধবা-বিরহ নাটক' নামে গদ্যে-পদ্যে একটি সামাজিক নকশা শ্রেণীর নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকটির রচনাকাল ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁর নাটকে সমসাময়িক ব্যক্তি ও ঘটনার চিত্রণ দেখে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন, সম্ভবতঃ ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি রচিত হয়েছিল।[৮২] নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। ছয় অঙ্কে বিভক্ত নাটকটিতে হিন্দু সমাজের বিধবাদের যন্ত্রণাকে নিতান্ত নগ্নরূপে পরিস্ফূট করা হয়েছে। লেখকের বাস্তব-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে নাটকটি রচনা হিসেবে সার্থক নয়। এই নাটকে শিমুয়েল পিরবক্স পুরো না হলেও গদ্যকে তাঁর ভাবের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

বর্ধমান জেলার মেমারির দক্ষিণে খাঁড়ি গ্রামের অধিবাসী মুনশী আজিমুদ্দীনের নামে দু'খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় — (১) 'জামালনামা' এবং (২) 'কি মজার কলের গাড়ী'। 'জামালনামা' (১৮৫৯) পদ্যে রচিত রূপককাব্য। এতে মিশ্রভাষারীতির অনুকরণ প্রচেষ্টা থাকলেও সংস্কৃত-বহুল বাক্যগঠনই অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। 'কি মজার কলের গাড়ী' (১৭৮৫ শকাব্দ/১৮৬৩ খ্রীঃ) গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত নক্সা জাতীয় রচনা। ইংরেজরা এদেশে প্রথম নতুন রেলগাড়ী চালু করলে লেখক আজিমুদ্দীন তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে এই পুস্তিকাটি রচনা করেন। এই রেলগাড়ীর প্রচলনে সাধারণ মানুষের বহির্জীবনে ও অন্তর্জীবনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা'ই তিনি ব্যঙ্গের সুরে চিত্রিত করেছেন। এতে লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাভঙ্গি ও রচনারীতি বেশ সরস ও প্রাণবন্ত। আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, গ্রন্থটি মুসলমান রচিত প্রথম নক্শা হিসেবে ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী।[৮৩]

এই সময় মুন্সী নামদার নামে একজন জনপ্রিয় মুসলমান লেখকের আবির্ভাব ঘটে। মুন্সী নামদার প্রায় ১২ খানা পুস্তিকা রচনা করেন। এগুলি লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।[৮৪] পুস্তিকাগুলি সবই আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র অর্থাৎ পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮ থেকে ১৬'র মধ্যে। নক্শা শ্রেণীর এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলি পয়ারজাতীয় পদ্যে এবং কথ্যরীতির ঢঙে গদ্যে রচিত।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খন্ড)গ্রন্থে নামদারের নামে পাঁচটি পুস্তিকার উল্লেখ করে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন – "মুন্‌শী নামদারের এই পুস্তিকাগুলি সম্ভবত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা" এবং আরো জানিয়েছেন – "বছর দশেক পরে ঢাকার হরিহর নন্দী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনাগুলি নিজনামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[৮৫] কিন্তু তাঁর ঐরূপ সন্দেহের কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেননি। এ কারণে সাম্প্রতিককালের অনেক গবেষকই তাঁর ঐ অনুমানসিদ্ধ মতামত মানতে নারাজ। জনৈক আধুনিক গবেষক জানিয়েছেন, নামদারের অধিকাংশ পুস্তিকাগুলির বিবরণ দেখে মনে হয় রচনাগুলি কোন এক মুসলমানের রচনা এবং তিনি মুন্সী নামদারই – ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় নন বা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনামও নয়।[৮৬]

'কাশীতে হয় ভূমিকম্প, নারীদের এ কি দম্ভ।' – পুস্তিকায় লেখক লেখেন –

রচে হীন কবিকার নামে নামদার।
বালিয়া ভূপতিপুরে বসতি আমার॥[৮৭]

মুন্‌সী নামদার বর্ধমানের বালিয়া পরগণার ভূপতিপুরের অধিবাসী ছিলেন।

মুন্সী নামদার সম্পর্কে আর একটি বিতর্ক রয়েছে। তাঁকে 'হাড় জ্বালানীর' লেখক গোলাম হোসেনের ছদ্মনাম বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই বিভ্রান্তির কারণ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গোলাম হোসেনের 'হাড় জ্বালানী' এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মুন্সী নামদার প্রণীত 'কলির বউ হাড় জ্বালানী'র বিষয়বস্তু, ভাষা ও রচনার হুবহু মিল। এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে কাজী আবদুল মান্নান সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তৎকালীন প্রকাশক ব্যবসায়িক স্বার্থে লেখক মুন্সী নামদারের জনপ্রিয়তার কারণে ভণিতায় 'গোলাম হোছেন নাম বসন্তপুরেতে' তুলে দিয়ে 'মুন্সী নামদার নাম ভূপতিপুরেতে' বসিয়ে দিয়েছিলেন। – "কাজেই অন্য কোন সুস্পষ্ট প্রমান হাতে না আসা পর্যন্ত আমরা ধরে নেব যে, মুন্সী নামদার নয়, গোলাম হোসেনই 'হাড় জ্বালানী'র প্রকৃত লেখক এবং তাঁরা এক নন, ভিন্ন লেখক এবং তাঁরা সমসাময়িক কালের দু'জন মুসলমান গদ্য লেখক।"[৮৯]

মুন্সী নামদারের অধিকাংশ পুস্তিকাগুলিই ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এগুলি হল ঃ

(ক) 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প। নারীদের একি দম্ভ।' (১৮৬৩ খ্রীঃ), (খ) 'দুই সতীনের ঝগড়া' (১৮৬৭), (গ) নগদ ভাজের ঝগড়া (১৮৬৭), (ঘ) বাঞ্ছারামের গল্প (১৮৬৭), (ঙ) নূতন ঝড় (১৮৬৭), (চ) বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা (১৮৬৭), (ছ) নারীর ষোল কলা (১৮৬৮), (জ) খেলারামের গীত (১৮৬৮), (ঝ) মনোহর ফেঁসড়া (১৮৬৮), (ঞ) খেদের গান (১৮৬৮), (ট) কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী (১৮৬৮) এবং (ঠ) কলির বউ হাড় জ্বালানী (১৮৬৮)।[৯০] এছাড়া আরেকটি পুস্তিকার নাম সুকুমার সেন তাঁর গ্রন্থে[৯১] উল্লেখ করেছেন সেটি হল 'ভ্যালারে মোর বাপ' (১৮৭৬)।

নক্‌শাজাতীয় এই রচনাগুলিতে মুন্‌সী নামদার সেকালের সমাজের নানা ভন্ডামি, নীতিহীনতা ও অসঙ্গতিকে চিত্রিত করেছেন। এগুলিতে তাঁর গভীর রসবোধ ও সমাজ চেতনার পরিচয় আছে। তবে সাহিত্যমূল্যের বিচারে পুস্তিকাগুলি তেমন উল্লেখণীয় নয়। কেবল গদ্য-ভাষারীতির ধারাবাহিক ইতিহাসে মুসলমান রচিত ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবেই রচনাগুলি স্মরণীয়।

বসন্তপুরের বাসিন্দা গোলাম হোসেন গদ্যে-পদ্যে-মিশ্রিত 'হাড়জ্বালানী' (১৮৬৪) শীর্ষক নক্‌শাধর্মী একটি পুস্তিকা রচনা করেন। সম্ভবতঃ লেখক কোন বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করে এটি রচনা করেন। বইটির কোন চরিত্রের নামকরণ করা হয়নি। প্রবাসী পুত্রের অবর্তমানে সংসারের কর্তৃত্ব নিয়ে শাশুড়ী-পুত্রবধূর দ্বন্দ্ব, শাশুড়ীর নানা দুঃখ-ভোগ, পুত্র সব বিষয় অবগত হয়েও স্ত্রীর পক্ষাবলম্বন — ইত্যাদি এই পুস্তিকার বর্ণিত বিষয়। তখন মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার ভেঙ্গে পড়ছে এবং ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পরিবারে পুরাতন মানবিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে — মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের এই পরিবর্তনের একটি আলেখ্য এতে অনেকটা ফুটে উঠেছে। তবে চরিত্রগুলি টাইপ শ্রেণীর। ভাষা সহজ এবং অনাড়ম্বর। এতে পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের মুসলমান সমাজের কথ্যরীতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

সেকালে সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাকে নিয়ে যে প্রহসন রচনার প্রচলন হয়েছিল সেই ধারাকে অনুসরণ করেই শেখ আজিমদ্দী রচনা করেন গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' নামে একটি ক্ষুদ্র প্রহসন। বইটি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার কলকাতা থেকে মুদ্রিত। প্রথম মুদ্রণের কোন তারিখ উল্লেখিত হয়নি। লেখক 'কড়েয়ার' বাসিন্দা ছিলেন। লেখক তাঁর গ্রন্থে নিজ নাম কখনো আজিমদ্দী, কখনো বা আমিরদ্দী ব্যবহার করেছেন।[৯২]

অর্থবান বৃদ্ধ কর্তৃক তরুণী বিবাহ এবং তার শোচনীয় পরিণতি প্রহসনটির মূল বিষয়। অনুরূপ জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে পূর্বেই মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৯), দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) প্রভৃতি প্রহসন রচিত হয়েছিল। 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' পুস্তিকাটি গদ্যে-পদ্যে রচিত হলেও এতে পদ্যের চেয়ে 'গদ্যের ভাগ বেশী'। এর গদ্য ভাষায় লেখক যুগপৎ অলঙ্কারবহুল দীর্ঘ ও জটিল বাক্য এবং নাটকীয় সংলাপে সরল কথ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। তিনিও সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে সমকালীন অন্যান্য প্রহসনগুলির তুলনায় তাঁর প্রহসনে স্থূলতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ পরগণার অধিবাসী আয়েন আলী শিকদার 'বিধবা-বিলাস' নামে গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত একখানি রূপকথাধর্মী রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনী রচনা করেন। গ্রন্থটি রচিত হয় ১২৭৩ সাল অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং দু'বছর বাদে ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খ্রীঃ) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[৯৩] 'বিধবা বিলাসে'র কাহিনী ও ভাষারীতি কৃত্রিম। গদ্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুকরণ করবার প্রয়াস লক্ষণীয়।[৯৪] নিছক মধ্যযুগীয় কাহিনী পরিবেশন ছাড়া এর আর কোন মূল্য নেই।

এছাড়াও ডঃ সুকুমার সেন 'মুসলমান খ্রীষ্টান' সুজাত আলীর রচিত 'দুঃখিনী কন্যা' (১৮৬৩) নামে একটি গদ্য-আখ্যায়িকার সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে রচনাটি দুষ্প্রাপ্য। এছাড়া সুজাত আলীকে মুসলমান বলে গণ্য করাও মুশকিল।

মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ববর্তী এইসব সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান — উচ্চ শ্রেণীর লোক এঁরা নন। কলকাতা শহর থেকে দূরে গ্রামীণ পরিবেশেই এঁদের সাহিত্য-চর্চা। সাদা-মাটা দৃষ্টি দিয়ে প্রতিপার্শ্বের জগৎ ও জীবনকে যা দেখেছিলেন তাই তাঁদের রচনায় তাঁরা রূপায়িত করেছিলেন। তাছাড়া যে পত্র পত্রিকাকে নির্ভর করে বাংলা গদ্য চর্চা শুরু হয়েছিল এঁরা তার কোন সহায়তা পাননি। এবং গদ্যগ্রন্থ মুদ্রণের সুবিধাও তাঁদের বিশেষ ছিল না। তাঁরা

'মিশ্রভাষা' রীতির কাব্য-কবিতা রচয়িতাদের চাইতে একধাপ এগিয়ে কল্পলোক থেকে অপেক্ষাকৃত বাস্তবমুখী গদ্য-নির্ভর সাহিত্য রচনা করেছেন। সমসাময়িক সমাজের নানা সমস্যাকে তাঁরা দেখিয়েছেন। অবশ্য এঁদের সকলের রচনা নির্ভেজাল গদ্যে রচিত নয়। গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত রচনা তবু তাঁরা গদ্য-ভাষা-চর্চার ক্ষেত্রে যেমন সাধুভাষার আশ্রয় নিয়েছেন তেমনি অঞ্চল বিশেষের কথ্য-ভাষাকেও রূপায়িত করেছেন। তাঁদের এই গদ্যভাষা সমসাময়িক কালের বা পূর্ববর্তী হিন্দু লেখকগণের তুলনায় ছিল দুর্বল এবং অনুকরণমুখী। এছাড়া "মার্জিত মনের পরিচয় নেই বলেই এই রচনাগুলো শিক্ষিত সমাজে আদৃত হয়নি।"[৯৫]

মশাররফ-সমকালীন কবি-সাহিত্যিকগণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্যন্ত বাঙালী মুসলমান কবি-সাহিত্যিকেরা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু লিখতে পারেন নি। মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ববর্তী মুসলমান লেখকদের গদ্যচর্চার ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া সাহিত্যিক মূল্য তেমন ছিল না। তাছাড়া তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলি ছিল গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত রচনা। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী' প্রকাশিত হওয়ার পর একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। 'রত্নবতী' যদিও রূপকথা জাতীয় গল্পমাত্র – রচনা হিসেবেও তেমন সার্থক নয়, তবু এখান থেকেই মশাররফ হোসেন সম্পূর্ণ গদ্যে প্রথম গল্প রচনার সূত্রপাত করলেন এবং সমকালীন 'মুসলমানী বাংলা'র প্রভাব-মুক্ত বাংলা ভাষায় সাহিত্য-চর্চার দ্বার উন্মুক্ত করলেন। মশাররফের সমকালে বেশ কিছু প্রধান অপ্রধান কবি সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটল। তাঁরা খন্ড-কবিতা, গীতি-কাব্য, মহাকাব্য, নাটক,প্রহসন, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের সাহিত্য রচনা করলেন। এই সমস্ত রসধর্মী সাহিত্যের পাশাপাশি অধিকাংশ মুসলমান কবিসাহিত্যিকগণ ধর্মমূলক সাহিত্য রচনায় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। সুতরাং মশাররফকে অনুধাবন করতে এবং রসসাহিত্য-চর্চায় উৎসাহী তাঁর সমকালের অন্যান্য বাঙালী মুসলমানদের মনোভাব বুঝতে তাঁদের কিঞ্চিৎ সাহিত্য-পরিচয় গ্রহণ আবশ্যক।

এই কালপর্বে মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণ তেমন মহৎ শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন নি সত্য, কিন্তু তাঁদের রচিত সাহিত্যে তৎকালীন যুগের আবেগ-অনুভূতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আশা-আকাঙ্খা, আধ্যাত্মিক-চেতনা ও বাস্তব সমাজবোধ প্রভৃতি নানা বিষয় অকপটে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা এবং সর্বোপরি সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার পরিধি উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সীমিত।

কাব্য-কবিতা

উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত যেসব বাঙালী মুসলিম কবি কাব্য-চর্চায় উল্লেখযোগ্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁরা হলেন ঃ মুহম্মদ কাজেম আলকোরেশী ওরফে কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আব্দুল হামিদ খান ইউসফজয়ী, আবুল মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী, শেখ ওসমান আলী প্রমুখ কবি। এছাড়াও নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, রেয়াজুদ্দীন আহমদ, সমীরুদ্দীন মন্ডল, আর্জুমন্দ আলী,

সৈয়দ আবুল হোসেন, সেখ আবদোস সোবহান, মোহাম্মদ গোলাম হোসেন প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় অল্পবিস্তর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ঢাকার অধিবাসী মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী ওরফে কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫২ খ্রী) একালে কাব্য কবিতায় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি খুব অল্প বয়স থেকেই কাব্য চর্চা শুরু করেন। এ সময়ের তাঁর তিনটি গীতিকাব্য হল — বিরহবিলাপ[৯৬] (১৮৭০), কুসুমকানন (১৮৭৩) এবং অশ্রুমালা (১৮৯৪ খ্রী)[৯৭]। এদের মধ্যে প্রথম দুটি কাঁচা হাতের রচনা। 'লিরিক আবেগের অকৃত্রিম প্রকাশ এতে (অশ্রুমালায়) ঘটেছে, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকাশ-নৈপুণ্য।'[৯৮] কাব্য তিনটির বিষয়বস্তু মানব-প্রেম, সমাজপ্রেম ও অধ্যাত্মপ্রেম।

কবি হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের অনুসরণে তাঁর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) রচনা করে কায়কোবাদ খ্যাতি অর্জন করেন। মহাকাব্যিক নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও অধিকাংশ সমালোচকই একে মহাকাব্য বলে মেনে নিয়েছেন।[৯৯] তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৭৬১) ভারত-আফগান মিলিত মুসলমান শক্তির সঙ্গে মারাঠা শক্তির রক্তক্ষয়ী সংগ্রামই 'মহাশ্মশান' কাব্যের বিষয়বস্তু। এর রচনারীতি দুর্বল। মহাকাব্যের গাম্ভীর্য এতে নেই; কবির রোমান্টিক প্রবণতা, দুর্বল সংলাপ এবং বর্ণনায় পুনরুক্তিদোষ এতে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-ভিত্তিক রোমান্সগুলো বা রমেশদত্তের উপন্যাস হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কে বাঙালী হিন্দু পাঠকদের যে সচেতনতা এনে দিয়েছে কোন সম্প্রদায়ের বাঙালী পাঠকের জন্যেই কায়কোবাদ তা করতে পারেন নি।[১০০]

কায়কোবাদ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদার , নিরপেক্ষ ও মিলনকামী ছিলেন। এ কারণে তাঁকে অনেক সময় রক্ষণশীল মুসলমানদের সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে হিন্দু লেখকগণ তাঁর কাব্যের ভাব ও ভাষার প্রশংসা করেছেন। তাঁর চিন্তাধারায় পরস্পরবিরোধী রূপ লক্ষ্য করা যায় — 'পরাধীনতার জন্যে বেদনাবোধ এবং ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ'[১০১]। যাই হোক, তিনি তাঁর গীতিকবিতা ও মহাকাব্যের জন্যে সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

নদীয়ার শান্তিপুরের বাসিন্দা কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) গদ্যসাহিত্য ও কাব্যকবিতায় বেশ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সাবলীল ও পরিশীলিত ভাষাভঙ্গির জন্যেও সমালোচকদের প্রশংসা পান। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এক বছরের বড় মোজাম্মেল হক ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই সময়ে কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই কালপর্বে মোজাম্মেলের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল ঃ কুসুমাঞ্জলি (১৮৮১), অপূর্বদর্শন (১৮৮৫), প্রেমহার (১৮৯৮), ইসলাম-সঙ্গীত (১৮৯৮) এবং হজরত মহম্মদ (১৯০৩)। বারোটি কবিতা সম্বলিত 'কুসুমাঞ্জলি'র বিষয়বস্তু মর্ত্যপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম। 'অপূর্বদর্শন' ঐতিহাসিক কাহিনীকাব্য। তাঁর প্রথম গীতিকবিতার সংগ্রহ 'প্রেমহার' কাব্যের বৈশিষ্ট্য 'অকৃত্রিম লিরিক অনুভূতি' এবং 'দেহসচেতনতা'। এতে বিহারীলালের কাব্যের প্রভাব আছে। মুসলমান সমাজের কল্যাণ কামনায় ইসলামের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণ 'ইসলামী সঙ্গীত'। এ পর্যায়ে তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি 'হজরত মোহাম্মদ' কাব্যে মহম্মদের (সঃ) জীবনকাহিনী খুবই নির্লিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভক্তির আবেগে প্লাবিত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর পিউরিট্যানিক সংস্কার আন্দোলন তাঁর কবিসত্তাকে বিচলিত করেনি। ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে কবি কাব্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

টাঙ্গাইলের চারান গ্রাম নিবাসী এবং নওসের আলী খান ইউসফজয়ীর আত্মীয় আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০) সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী করিমন্নেসা খানম চৌধুরানীর অর্থানুকূল্যে টাঙ্গাইল থেকে 'আহমদী' (১৮৮৬) নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত তার সম্পাদক ছিলেন তিনি। পত্রিকাটি অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল মনোভাবের জন্যে সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান করে আছে। মীর মশাররফ হোসেন এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইউসফজয়ী একদা দেলদুয়ার এস্টেটে মশাররফের সহকর্মী ছিলেন।

আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী কাব্যচর্চাও করেছিলেন। এ সময়ে তাঁর তিনখানি কাব্য প্রকাশিত হয় — বিরাগসঙ্গীত (১৮৯০), প্রবোধসঙ্গীত (১৮৯১) এবং 'যোগেশ বা উদাসী' (হার্মিট) (১৯০১)। প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু অধ্যাত্মপ্রেম। সুফী সাধকেরা করুণ সুরের মাধ্যমে আশিক-মাশুকের যে প্রেমার্তি প্রকাশ করেন তাঁর এই সঙ্গীতধর্মী কবিতাগুলিতে সেই সুর ধ্বনিত হয়েছে। সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ 'উদাসীতে' আবার তিনটি স্বতন্ত্র কাব্যকাহিনী সংকলিত হয়েছে — 'উদাসী', 'কিরণপ্রভা' ও 'অরুণভাতি'। কাব্য তিনখানিরই বিষয়বস্তু প্রেম। অকারণ আবেগ-উচ্ছাসময় কবিতাগুলির মধ্যে কোন অভিনবত্ব নেই। তবে সমাজ ও দেশাত্মবোধক কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর কাল ও সমাজ সচেতনতার পরিচয় আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কাহিনী কাব্যধারারই অন্তর্ভুক্ত তাঁর 'উদাসী' কাব্যটি।

পাবনার সিরাজগঞ্জ শহরের বাসিন্দা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) বাগ্মী, সমাজকর্মী এবং সর্বোপরি সাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সিরাজীর আখ্যানকাব্য ও গীতিকবিতাগুলির মধ্যে আধুনিক মনোভাবের পরিচয় আছে। হিন্দু মুসলিম মিলনকামনা, দেশাত্মবোধ, মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমুসলিম ভাবনা — তাঁর কাব্যগুলির মূল সুর। অনেক ক্ষেত্রে তিনি হেম-নবীনের সমতুল্য।

এই কালে সিরাজীর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অনল প্রবাহ'র (১৯০০ খ্রী) বিষয়বস্তু ইসলামের অতীত গৌরব স্মরণ এবং দেশাত্মবোধ। বইটি ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্তও হয়।[১০২] পরবর্তী কাব্য 'মহাশিক্ষা' (১৮৯৮-১৯১০) কারবালার কাহিনী অবলম্বনে রচিত একখানি মহাকাব্য। অবশ্য তাঁর জীবিতাবস্থায় গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়নি।[১০৩] এই কাব্যের কাহিনীর উপাদান মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' থেকে গৃহীত। তাই এতে যেমন অনৈতিহাসিকতা রয়েছে, তেমনি 'বিষাদসিন্ধু'র প্রভাবও পড়েছে। কাব্যটি জাতীয় উদ্দীপনামূলক। এর পর প্রকাশিত 'উচ্ছ্বাস' (১৯০৭) নামে তাঁর 'জাতীয় কাব্য'-এ তিনি ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য স্মরণ করে মুসলমানদের নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। যাই হোক, উদার মনোভাবাপন্ন লেখক হয়েও তাঁর স্বাতন্ত্র্যপন্থী লেখনী চালনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজকে আত্মসচেতন করে তোলা।

টাঙ্গাইলের চারাণ গ্রাম নিবাসী নওশের আলী খান ইউসফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪) এই সময়ে কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'শৈশব-কুসুম' (১৮৯৫) ও 'মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত' নামে দুখানি কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু স্বদেশপ্রেম ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যানুভূতি। অবশ্য রচনারীতিতে তেমন নৈপুণ্য নেই।

মধুসুদন ও নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যধারার অনুসারী আর এক জন কবি হলেন চট্টগ্রাম নিবাসী আবুল মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৭৪-১৯৫৪)। মুসলমানদের জন্যে 'স্বতন্ত্র সাহিত্য' রচনার ঐকান্তিক ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে

তাঁর কাব্যগুলিতে। তাঁর একালের কাব্যগুলি হল – 'ভ্রাতৃবিলাপ' (১৯০৩), 'কাসেমবধ' (১৯০৫/ কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত), 'কবিতা-কুঞ্জ' (১৯০৫) – খন্ড কবিতার সংগ্রহ, 'জয়নালোদ্ধার কাব্য' (১৯০৭) এবং 'সোহরাব বধ' (১৯০৯)। তাঁর অধিকাংশ কাব্যই জাতীয় আখ্যানমূলক।

শেখ ওসমান আলী (১৮৭২-১৯৫২) বিশ শতকের প্রথম দশকে আবির্ভূত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। মেদিনীপুরের বাসিন্দা[১০৪] এই লেখক ছিলেন একাধারে কবি ও প্রাবন্ধিক। ওসমান আলী ভারতবর্ষের পরাধীনতা ও হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বের কারণে পীড়া অনুভব করতেন। তিনি সর্বদা উভয় সম্প্রদায়ের মিলন কামনা করতেন। এই মানসিকতাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচিত সাহিত্যে। তিনি চারখানি কাব্য রচনা করেন – 'হাফেজ সাহেব' (১৯০০), 'দেবলা' (১৯০১), 'অলোকসভা' (১৯০৪), এবং পরবর্তীকালে 'লাল চাঁদ' (১৯১২)। এগুলির মধ্যে 'দেবলা'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

এছাড়া এই সময়ে আরো কতিপয় স্বল্পপ্রতিভাধর কবি গতানুগতিক ধারায় কবিতা, আখ্যানকাব্য প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। এঁরা হলেন – সৈয়দ আবুল হোসেন (যমজ ভগিনী কাব্য – ১৯০৫, স্বর্গারোহন কাব্য– ১৯০৬, জীবন্ত পুতুল কাব্য – ১৯০৭, ভুবন-ভ্রমণ– ১৮৮৭), আবদুর রহমান (অশ্রুহার– ১৯০৭), কবি দাদ আলী (ভাঙ্গাপ্রাণ– ১৯০৫, আশেকে রসুল– ১৯০৭), গোলাম হোসেন (বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য– ১৯০৬), শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (শোকানল – ১৯০৮), মোসারত আলী খান (শোকোচ্ছ্বাস– ১৮৯৬, সাঁঝের আলো – ১৯০০), সেখ সাজ্জাদ করিম (ফুলের মালা – ১৯০২), দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ (পুষ্পহার – ১৯০৩, হাসির তরঙ্গ – ১৯০৮) প্রভৃতি।

এই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মুসলমান মহিলা সাহিত্যিকারদের সাহিত্যচর্চা। তিন চারজন মুসলিম মহিলা এই সময় সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁরা প্রধানত মুশাররফের জীবনের শেষ দিকে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। এঁরা হলেন – নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩), আজিজুন্নেসা চৌধুরানী, খায়রুন্নেসা খাতুন এবং বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। এঁদের মধ্যে এই কালপর্বে ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী তিনখানি কাব্য রচনা করেন। সেগুলি হল – 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' (১৮৮৭), সঙ্গীতসার, সঙ্গীতলহরী। তবে গ্রন্থগুলি সঙ্গীত জাতীয়। তাঁর গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত রূপকধর্মী গ্রন্থ 'রূপজালাল' (১৮৭৬) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[১০৫] আজিজুন্নেসা 'হারমিট বা উদাসীন' (১৮৮৪) নামে টমাস পার্নেলের বীররসাত্মক 'হারমিট' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে কাব্য রচনা করেন।

গল্প-উপন্যাস

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখে বাংলা উপন্যাসকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে মীর মশাররফই প্রথম উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেন। তাঁর সৃষ্টিশীল পর্বে কতিপয় লেখক উপন্যাস জাতীয় রচনায় হাত পাকিয়েছিলেন। এই সমস্ত রচনায়

তাঁদের মন-মানসিকতা, সমাজ-জিজ্ঞাসা এবং উপন্যাস-শিল্পের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মুনশী মোহাম্মদী, গোলাম রব্বানী ও দুর্গানন্দ কবিরত্নের সহায়তায় 'হাতেমের উপাখ্যান' নামে একটি অনুবাদমূলক আখ্যানধর্মী রচনা প্রকাশ করেন। রচনাটি ফারসীমূল থেকে অনূদিত এবং গদ্যে-পদ্যে মিশিয়ে লেখা। তাই একে ঠিক উপন্যাস জাতীয় রচনা বলা যায় না।

এই পর্যায়ে উপন্যাস লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী চৌধুরী মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলীর নাম। তাঁর 'প্রেমদর্পণ' (১৮৯১) নামক 'উপন্যাসটিই বাঙালী মুসলমান লিখিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস' বলে খ্যাত।[১০৬] উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য এক মুসলমান যুবক ও হিন্দু বালিকার মধ্যে অসধর্ম প্রণয় ও বিবাহ। সমসাময়িক কালে হিন্দু সাহিত্যিকগণ হিন্দু নায়ক ও মুসলমান নায়িকাকে কেন্দ্র করে অনেক উপন্যাস (যেমন — বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি) রচনা করেন। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলমান লেখক কর্তৃক রচিত এই ধরনের প্রয়াস এই প্রথম। এতে লেখকের উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে মৌলবাদী চিন্তা চেতনার ছাপ আছে। লেখকের জীবন-জিজ্ঞাসার স্পষ্ট কোন স্বাক্ষর নেই — চরিত্র-চিত্রণেও তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তবে সমাজের রূপ-চিত্রণে তাঁর দক্ষতা এবং কাহিনী নির্মাণের একটা সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাই উপন্যাসটি সার্থক না হলেও উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ এতে রয়েছে।

গোলাম কিবরিয়া (জন্ম ১৮৪৩—) নামে একজন লেখক কাজী কেরামতউল্লাহর সহযোগিতায় 'উচিৎ কথা' নামে গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত একটি রসরচনা জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এতে ভন্ড ফকিরদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর পরিচয় দিতে গিয়ে 'সুধাকর' পত্রিকায় লেখা হয় — 'পুস্তকখানির কোন কোন স্থান সুন্দর উপন্যাস এবং নাটকের ন্যায় মনোরম।'[১০৭] কিন্তু এটি ঠিক উপন্যাস নয়, আখ্যায়িকা জাতীয় রচনা। গ্রন্থটি সুখপাঠ্যও নয়।

ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থ-রচয়িতা আবদুর রহিমও রসসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। তবে তাঁর রচনা অনুবাদমূলক। ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর 'দি আলহামরা' অবলম্বনে 'আলহামরা' এবং 'দি পিলগ্রিমজ্ অব লাভ' অবলম্বনে 'প্রণয়যাত্রী' অনুবাদমূলক দুটি সুখপাঠ্য গল্প। এই সময়কার আর একজন লেখকের উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় সেটি হল হাফিজ আমিনউদ্দিন আহমদের 'চন্দ্রমুখী' (১৮৯৩)।[১০৮]

বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা উপন্যাস যখন অনেক পরিণত তখনও মুসলমান লেখকগণ উপন্যাস ও গল্প রচনায় হাত পাকাচ্ছেন। তাঁরা কখনো বিদেশী গল্প-আখ্যানকে অনুবাদ করছেন, কখনো বা ইতিহাসের আশ্রয়ে ঐতিহাসিক রোমান্স জাতীয় রচনা করছেন আর দু-একজন সমকালীন সমাজ-সমস্যামূলক আখ্যান রচনা করছেন।

তাই একালে আরো কিছু উপন্যাসধর্মী অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়া যায়। এগুলি প্রায় সবই ফারসী প্রণয়মূলক কাব্যকাহিনী থেকে অনূদিত। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শেখ ফজলুল করিমের 'লায়লী মজনু' (১৯০৩), আবদুল লতিফের 'জোলেখা' (১৯১০), মোজাম্মেল হকের 'শাহনামা' (১৯০৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'লায়লী মজনু' বাংলা সাধুগদ্যে রচিত। "উপন্যাসের ভঙ্গিতে লেখা হলেও বিষয়বস্তুর করুণ মধুর আবেদন স্রোতঃশীল ও স্নিগ্ধ বাংলা গদ্যে সমর্পিত হয়ে সম্পূর্ণ বইটিকে গীতিকাব্যের মাধুর্য দান করেছে।"[১০৯] 'জোলেখা' একঘেয়ে রচনা, তবে কৌতূহলোদ্দীপক।

এ সময়ের লেখক আফতাব উদ্দিন আহমদের নামে 'প্রেমপাগল' (১ম খন্ড / ১৯০৩) নামে একটি উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া গেলেও[১১০] সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। হিন্দু লেখকদের মুসলিম-বিদ্বেষ প্রসূত রচনাবলীর প্রতিবাদস্বরূপ মুসলিম-লেখক রচিত উপন্যাসের একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীর উপন্যাস হল মতীয়র রহমান খানের 'যমুনা' (১৯০৪) এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'তারাবাঈ' (১৯০৮)। 'যমুনা' তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। এখানে নায়ক আহমদ শাহ আবদালীর সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিশ্বাস রাও-এর কন্যা যমুনার প্রণয়-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তবে মতীয়র রহমানের অন্য উপন্যাস 'নব কুমুদ' (১৯০০) উনিশ শতকের সমাজ-চিত্র, কিন্তু পাত্রপাত্রী মুসলমান সমাজের নয়। দুটি বিপরীত আদর্শের দ্বন্দ্বের কোনটির প্রতিই লেখকের সহানুভূতি না থাকায় রচনাটি সার্থক হয়নি।[১১১] মতীয়র রহমান খান তাঁর উপন্যাস গুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উদ্দেশধর্ম ও শিল্পধর্ম কোনটাই বজায় রাখতে পারেন নি। মুসলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকার প্রণয়চিত্র অঙ্কনের মানসিকতায় রচিত ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'তারাবাঈ' একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এতে শিবাজী-তনয়া তারাবাঈ ও বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁর প্রেম চিত্রিত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে দু-একজন মুসলিম মহিলাও উপন্যাস রচনায় হাত দেন। নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৫৮-১৯০৩) নামে জনৈক ত্রিপুরার সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা 'রূপজালাল' শিরোনামে গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত একটি বই লিখে মুসলমান মহিলা কর্তৃক প্রথম বাংলা গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব অর্জন করেন।[১১২] কেউ এই গ্রন্থটিকে 'প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা'[১১৩] কেউ 'রূপকধর্ম আখ্যায়িকা'[১১৪], কেউ বা একে 'আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস' [১১৫] বলে অভিহিত করেছেন। এই গ্রন্থের গদ্যভাষা মার্জিত, বিশুদ্ধ এবং আরবী-ফারসী প্রভাবমুক্ত। লেখিকা তাঁর অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। মধ্যযুগীয় প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্যাদর্শের প্রভাব এতে রয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাহিনী অলৌকিকতামন্ডিত। আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার ছাপ নেই। খায়রুন্নেসা খাতুন নামে একজন লেখিকা 'সতীর পতিভক্তি' (১৯১০) শিরোনামে একটি আখ্যায়িকা গ্রন্থ রচনা করেন। বিখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) এই সময় রচনা করেন 'সুলতানার স্বপ্ন' (১৯০৫) নামে একটি ছোট্ট রূপক উপন্যাস। এটি অবশ্য তাঁরই ইংরেজিতে লিখিত 'সুলতানাস্ ড্রিম'-এর বঙ্গানুবাদ। এতে লেখিকা একটি রূপক কাহিনীর আশ্রয়ে নারীস্বাধীনতা ও নারীশিক্ষার আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছেন। ১৯০৭ সালে কংগ্রেস অধিবেশন ভেস্তে গেলে বেগম রোকেয়া লিখলেন – 'মুক্তিফল' নামক গল্পটি। নবীন-প্রবীনের দ্বন্দ্বে মুক্তি যখন বিলম্বিত তখন মহিলারাই এর পথিকৃৎ হতে পারে। এই মানসিকতারই ফসল 'মুক্তিফল'। এই দুটি রচনাই বেগম রোকেয়া যখন লেখেন মশাররফ তখন সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্যায়ে।

তখন আর যে সমস্ত গল্প বা উপন্যাস-জাতীয় রচনা স্বল্পপ্রতিভাধর লেখক লেখিকাদের দ্বারা রচিত হয়েছিল সেগুলি হল ঃ কফিলউদ্দিন আহমদের 'নিষাদকুমারী' (ঐতিহাসিক উপন্যাস/১৮৯১), আবদুল ফাত্তাহ'র 'বেলাতি উপন্যাস' (১ম খন্ড/১৮৯৫), মোহাম্মদ আখিলুদ্দিনের 'তারাবতী মনোহরা' (গল্পের বই/১৮৯৬), শেখ ওসমান আলীর 'হাফেজ সাহেব' (পারিবারিক উপন্যাস/১৯০০), শেখ সাজ্জাদ করিমের 'আমিনা' (সামাজিক উপন্যাস/১৯০০) প্রভৃতি। এই সমস্ত রচনায় তৎকালীন সমাজ-সমস্যা ও পারিবারিক নানা টানাপোড়েনের ছবি বিধৃত হয়েছে।

যাই হোক, মশাররফের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের কালে এই সমস্ত লেখক-লেখিকা তাঁদের জড়তা কাটিয়ে গল্প-উপন্যাসের মতো রস-সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যদিও তা সর্বদা শিল্পসুষমা-মন্ডিত হয়নি।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

প্রবন্ধ হচ্ছে মনন চিন্তন মূলক রচনা। তা যুক্তিপূর্ণ গদ্য ভাষায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ রচনার জন্য চাই বিষয়ের সঙ্গে চেতনা, তাকে চিন্তা দ্বারা পরিচ্ছন্ন ভাবে অনুধাবন করার শক্তি এবং যুক্তিপূর্ণ গদ্যে ব্যক্ত করার ক্ষমতা। বাঙালী মুসলমান সাহিত্যকারেরা বাংলা সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় খুব উৎসাহী হননি। কিন্তু প্রবন্ধ রচনাকে তাঁরা সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন সামাজিক ও সাহিত্যিক বিষয় নিয়ে গদ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। সম্ভবত এসব রচনার পিছনে তাঁদের সমাজ সংগঠন ও লোক হিতৈষণা প্রবল ছিল। গদ্য প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে স্পষ্টত শিক্ষিত করে তোলার কাজ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তেমনি ভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁরা ক্রমশ পারঙ্গমতা অর্জন করেছিলেন। এই দুই দিক থেকে – ভাষা ও মনন চিন্তনের ক্ষেত্রে তাঁরা নবজাগরণের ফলকে আত্মস্যাৎ করে বাঙালী মুসলমান সমাজকে সাংস্কৃতিক ভাবে অগ্রণী করে তোলবার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এঁরা যদিও বিশেষত রস সাহিত্যের রচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন নি কিংবা সাহিত্যিক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও এঁদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তবুও এই চর্চার মাধ্যমে তাঁরা মুসলমান সমাজকে ক্রমশ সাহিত্যের রসাস্বাদ এনে দিচ্ছিলেন।

এই পর্বের বাঙালী মুসলমান সাহিত্যকারদের গদ্য প্রবন্ধ রচনাকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারি।

১) সাহিত্যিক রচনা
২) ইতিহাস, দর্শন, সমাজ ও ধর্মমূলক রচনা।
৩) আইন চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ
৪) বিবিধ

১. মশাররফের সমকালে সাহিত্যিক প্রবন্ধ রচনায় কোন মুসলমান লেখকই এগিয়ে আসেন নি। তাই এই সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ-গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবে মাতৃভাষার প্রশ্নে বাঙালী মুসলমান সমাজ যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন বাংলা ভাষার সপক্ষে শেখ আবদুর রহিম রচনা করেন 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ' নামক প্রবন্ধটি। এতে ভাষার প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ। এছাড়া এতে তাঁর সাহিত্যিকসুলভ মন ও মেজাজের পরিচয়ও আছে।

২. ইতিহাস, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় মুসলমান লেখকগণ অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাই এই কালপর্বে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ-গ্রন্থ তুলনায় বেশী রচিত হয়েছিল। বরিশাল জেলার অধিবাসী সৈয়দ আবদুর রহিম প্রণীত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর' (১৮৭০) ইতিহাস বিষয়ক এইরূপ একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। কোন মুসলমান লেখক কর্তৃক ইতিহাস লেখার প্রয়াস এই প্রথম এবং এই গ্রন্থটি তার নিদর্শন।[১১৬] অতি প্রাচীন

কাল থেকে মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যন্ত ইতিহাস ছাত্র শিক্ষকের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রচিত হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। 'আবদুল রহিমের গদ্য সুখপাঠ্য এবং প্রাঞ্জল'।[১১৭] পন্ডিত রেয়াজ অলদীন আহমদ মাশহাদি (১৮৫৯-১৯১৮) রচনা করেন ধর্ম ও ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থ 'প্রবন্ধ কৌমুদী' (১৮৯১) এবং ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'সুরিয়া বিজয়' (১৮৯৫)। বিষয়ের গভীরতার জন্যে 'প্রবন্ধ কৌমুদী' তৎকালে প্রশংসিত হয়। উভয় গ্রন্থের ভাষাই প্রাঞ্জল। আবদুল করিম রচনা করেন 'ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' (১৮৯৮) শীর্ষক একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল।[১১৮] আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী 'সার সংগ্রহ' (১ম খন্ড-১৮৭৮) নামে একটি নীতি উপদেশমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এতে চারটি কবিতা এবং দুটি প্রবন্ধ রয়েছে। ইউসফজয়ীর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ 'বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদি বৃত্তান্ত' (১৮৯৯) হল খোন্দকার ফজলে রাব্বির 'দি ওরিজিন অব্ দি মুসলমানস্ অব বেঙ্গল' গ্রন্থের (১৮৯৫) বঙ্গানুবাদ। মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) যথেষ্ট পরিশ্রম করে 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ' (১৮৯৯-১৯০৮) নামে একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। সে সময়ে তুরস্ককে মুসলমানদের মর্যাদার প্রতীক দেশ রূপে গণ্য করা হত। এই গ্রন্থে লেখক তুর্কী বীরদের পাশে গ্রীকদের কাপুরুষরূপেই অঙ্কিত করেছেন এবং একে একটি ধর্মযুদ্ধরূপেই উপস্থাপিত করেছেন। এখানে লেখকের মূল অভিপ্রায় ছিল ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে স্বজাতির চৈতন্য ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করা। তাঁর আর একটি গ্রন্থ 'বিলাতী মুসলমান' (১৯০৯)-এ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত লিভারপুলের ইংরেজদের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া ইতিহাস বিষয়ক আরো কয়েকটি গ্রন্থ হল ঃ শেখ ফজলুল করিমের 'আফগানিস্তানের ইতিহাস' (১৯০৯), 'মদিনা শরীফের ইতিহাস' (১৯০৭), 'বয়তুল মকাদ্দসের ইতিহাস' (১৯১০), ময়েজউদ্দিন আহমদ ওরফে মধুমিয়ার 'শান্তিকর্ত্তা বা হজরত মোহাম্মদ', 'তুরস্কের ইতিহাস', ইমদাদুল হকের 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা' (১৯০৪) প্রভৃতি।

বাঙালী মুসলমান সমাজের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি ও সমস্যা নিয়ে এবং তাঁদের উন্নতি কামনা করে বেশ কিছু প্রবন্ধ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর (১৮৬৪-১৯২৪) 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯০) অনুরূপ একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এতে লেখক সমাজের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন না চাইলেও মুক্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। এই ধারারই আর একটি গ্রন্থ হল শেখ আবদুস সোবহানের 'হিন্দু-মুসলমান' (১৮৮৮)। উনিশ-শতকের শেষার্ধে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যার উদ্ভব ঘটে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান মিশনারী ও রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ আর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। এই অবস্থায় ইংরেজদের সঙ্গে আপোষকামী মনোভাবের মধ্যে দিয়ে তাদের চলতে হয়েছে। এই পশ্চাদপদ হতাশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় 'হিন্দু-মুসলমান' নামক গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থে লেখক স্বসমাজের প্রতি অপরিসীম দরদ দেখাতে গিয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান সমাজের একটি অসামান্য দলিল হিসেবে এর মূল্য আছে। এছাড়া আবদুস সোবহান 'আর্য্যধর্ম্ম' (১ম ও ২য় খন্ড, ১৯০৪ খ্রী ঃ) নামে একটি ধর্ম্মসমালোচনা মূলক গ্রন্থও রচনা করেন।

হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলমান সমাজেও একসময় বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত হওয়ার রেওয়াজ কোন কোন অঞ্চলে চালু হয়। মুসলমান সমাজের এই গভীর ক্ষতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যশোহরের ধর্মপ্রবক্তা মুন্‌শী মেহেরুল্লা (১৮৬১-১৯০৭) রচনা করেন 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' (১৮৯৪) নামক একটি প্রবন্ধ পুস্তিকা। মুসলমান সমাজে বাল্য বিবাহের কুফল বিষয়ে পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মেহেরুল্লাহ রচনা করেন 'বাল্যবিবাহের বিষময় ফল' (১৯০৯) নামে আরেকটি প্রবন্ধ পুস্তিকা।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনও বাঙালী মুসলমান লেখকদের চিন্তা চেতনাকে আলোড়িত করেছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় কিছু প্রবন্ধগ্রন্থও রচিত হয়। এইরূপ একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ হল জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক মোহাম্মদ নজিবর রহমানের (১৮৬০-১৯২৩) 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' (১৯০৫)। বইটি অংশত প্রবন্ধের এবং অংশত সংলাপের ভঙ্গিতে রচিত। এর কিছু পরে তৎকালীন বঙ্গবিভাগ এবং হিন্দু মুসলমানের বিরোধের পটভূমিকায় গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪) রচনা করেন 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান' (১৯১০)। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সত্ত্বেও তাদের মিলন সম্পর্কে তিনি গভীর আশাবাদী ছিলেন।

উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত শেখ আবদুল লতিফের 'মানব-সংস্কারক' (মেদিনীপুর, ১৮৭৮) অন্যতম শ্রেষ্ঠ মননশীল প্রবন্ধ গ্রন্থ। 'মনুষ্যের বর্তমান অবস্থা' ও 'মনুষ্যজীবন' – এই দু'ভাগে ভাগ করে মোট ২১টি প্রবন্ধ এতে গৃহীত হয়েছে। ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধগুলি লিখিত। সমগ্র গ্রন্থটির বক্তব্যের মূল সুর মানব কল্যাণ। তাঁর কোন কোন প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদের সুর আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও মীর মশাররফ হোসেনের সমকালীন লেখক হিসেবে ভাষার পরিপাট্যে, চিন্তাশক্তির স্বচ্ছতায়, উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে, যুক্তি ও মননশীলতার প্রকাশে শেখ আবদুল লতিফের এই গ্রন্থটি একালের একটি মূল্যবান সম্পদ।[১১৯] মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (১৮৫৮-১৯২০) 'মোসলমান সমাজের উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক' তা বর্ণনা করে 'দুগ্ধসরোবর' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে লেখকের তীব্র সমাজবোধ ও হিতাকাঙ্ক্ষা প্রকটিত হয়েছে। তবে এই গ্রন্থের আরবী-ফারসী মিশ্রিত ভাষা নিয়ে সমকালে বিরূপ সমালোচনা করে লেখা হয় – 'মুসলমানের বাবুর্চিখানায় পক্ক দুগ্ধ হিন্দুর অদৃশ্য, এইজন্য আমরা এ দুগ্ধের আস্বাদ লইতে পারিলাম না।'[১২০]

মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা ও নারীশিক্ষা নিয়েও কিছু কিছু প্রবন্ধগ্রন্থ এ সময়ে লেখা হতে শুরু করে। তবে এগুলির সবই ছিল মশাররফ হোসেনের সাহিত্য জীবনের শেষের দিকের রচনা। এইগুলির মধ্যে রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচুর' (১ম খন্ড, ১৯০৪) এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'স্ত্রীশিক্ষা' (১৯০৭) উল্লেখযোগ্য।

৩. আইন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়েও কোন কোন মুসলমান লেখক প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে মীর আসরফ আলী প্রণীত 'মিডোয়াইফেরি অর্থাৎ ধাত্রীবিদ্যা' (কলকাতা, ১৮৬৯), 'বালচিকিৎসা' (১৮৭০) এবং 'স্ত্রীচিকিৎসা' (১৮৭১) নামক গ্রন্থগুলি শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ। অবশ্য চিকিৎসাবিদ্যার দুরূহ ও জটিল বিষয়কে সহজভাবে বলতে গিয়েও আশরফ আলী ভাষাকে সুললিত এবং সহজবোধ্য করে তুলতে পারেননি। জটিল ইংরেজি শব্দের কোনরূপ পরিভাষা ব্যবহার না করে কেবল বাংলা অক্ষরে সেগুলির প্রয়োগ দেখিয়েছেন।[১২১]

আইন বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম মুসলমান লেখক শ্রীযুক্ত মহম্মদ স্মাইল উকিল রচনা করেন 'হিন্দু এবং মহম্মদীয় ধর্ম শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব' (১৮৬৯) শিরোনামে একখানি আইনের অনুবাদ গ্রন্থ।[১২২] ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী আইনে ঊর্দু তুলে দিয়ে তার বদলে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ওকালতি ও মুন্সেফ গিরির পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হলে তিনি ছাত্র ও আইন ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে এই গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন।

এ ছাড়া আরো বিবিধ বিষয়ে বিশেষতঃ ধর্মতত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ লিখিত হয়েছিল। সেগুলি সাহিত্যালোচনায় অপ্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখিত হল না।

নাট্যসাহিত্য

নাট্যসাহিত্যে মুসলমান লেখকদের ভূমিকা প্রথমদিকে তেমন ছিলনা বললেই হয়। কেননা নাট্যাভিনয় ও নাট্য-রচনাকে তাঁরা সুনজরে দেখতেন না। 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় থিয়েটারের বিজ্ঞাপন বেরোলে এবনে মাওজ 'ইসলাম প্রচারকে' এর কঠোর সমালোচনা করে প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে, "নাট্যাভিনয় মানেই পাপানুষ্ঠানের প্রশস্ত দ্বার স্বরূপ।"[১২৩] আর যেহেতু থিয়েটার ও নাট্যমঞ্চের সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের গভীর সম্পর্ক, তাই নাট্যসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও এ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল। কেননা নৃত্য-গীতের মত নাট্যাভিনয়ও ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কয়েকজন মুসলমান নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন। উনিশ শতকে মীর মশাররফ হোসেনের কালে অন্ততঃ দুজন নাট্যকারের পরিচয় জানা যায়, এঁরা হলেন — শ্রী মহম্মদ আবদুল করিম ও কাদের আলী।

মহম্মদ আবদুল করিম মালদহের শ্যামপুর-বাজিতপুরের[১২৪] অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'জগৎমোহিনী' (১৮৭৫ খ্রীঃ) নামে একটি রোমান্টিক নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকটি মীর মশাররফের 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) এবং 'জমীদার দর্পণ'-এর (১৮৭৩) পরেই রচিত বলে এর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। নাটকের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'আমি এই জগৎমোহিনী আখ্যায়িকাটি কোন এক সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী মহাত্মার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম।'[১২৫] এর পর তিনি আরো জানিয়েছেন যে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে তিনি তাকে নাট্যরূপ দেন। ফলে এতে কাল্পনিক রাজরাজড়াদের গল্প-আখ্যানের নাট্যরূপ ছাড়া কোন গভীর জীবনজিজ্ঞাসা প্রতিফলিত হয়নি। চরিত্র বিকাশের প্রয়োজনাতিরিক্ত কাহিনীটি গুরুভারাক্রান্ত। ঘটনাগুলির অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর মুখে বিবৃত। সংলাপের ক্ষেত্রে সাধু গদ্যরীতি অনুসৃত হয়েছিল।

কাদের আলী 'মোহিনী প্রেমপাশ' (১৮৮০ খ্রীঃ)নামে একখানি রোমান্টিক নাটক রচনা করেন। উনিশ শতকের হিন্দু জমিদার পরিবারের একটি কাহিনী নাটকটির উপজীব্য। রূপহীন স্বামীর প্রতি পরমাসুন্দরী স্ত্রীর অনাসক্তি, স্বল্পকালের জন্যে পরপুরুষে আসক্তি ও জটিলতা এবং সব জটিলতাশেষে স্বামী-স্ত্রীর মিলন — চার অঙ্কের নাটকটির এই হল কাহিনী। সমকালীন সমাজচিত্র রূপায়ণে এর মূল্য আছে। সংলাপের ভাষা কথ্য ও স্বাভাবিক। 'জগৎমোহিনী'র তুলনায় 'মোহিণী প্রেমপাশ'-এ বাস্তবিকতা বেশী। তবে লক্ষ করবার বিষয় এই যে, আবদুল করিম এবং কাদের আলী — উভয়েই নাটকের পাত্রপাত্রী নির্বাচন করেছেন হিন্দুসমাজ থেকে — মুসলমান সমাজ থেকে কোন প্রেরণাই লাভ করেন নি।[১২৬]

এর পর বিশ-শতকের প্রথম দশকের মধ্যে দু'জন নাট্যকারের পরিচয় পাওয়া যায় — শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬) এবং দৌলত আহমদ। শেখ ফজলুল করিম ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে রচনা করেন 'প্রেমের স্মৃতি' (১৯০৫)কাব্যনাট্য। 'পলাশীর রণাবসানে গভীর নিশীথে সিরাজউদ্দৌলা ও লুৎফন্নেসা মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ ত্যাগ হইতে শুরু করিয়া মহম্মদী বেগের অসির আঘাতে সিরাজউদ্দৌলার নিধন পর্যন্ত ঘটনাবলী'[১২৭] এতে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে মুসলমান লেখকের এটিই প্রথম রচনা। অন্যদিকে দৌলত আহমদ রচনা করেন 'জীবন-মঙ্গল' (১৯০৫) নামে একটি রূপক কাব্যনাট্য। হিন্দু পুরাণ কেন্দ্রিক কাহিনী অবলম্বনে জীবন,নিবৃত্তি, মায়া, প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, স্মৃতি, মোহ প্রভৃতি নৈর্ব্যক্তিক কাল্পনিক চরিত্র দ্বারা নাটকটি রচিত হয়েছে।[১২৮]

জীবনীমূলক সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে মশাররফের জীবনী ও আত্মজীবণী রচনার পূর্বে ও পরে কয়েকজন মুসলমান লেখক আত্মজীবনী এবং কেউ কেউ নানা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির বা মহাপুরুষের জীবনচরিত রচনা করেন। এই জীবনী-সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েও তৎকালীন মুসলমান লেখকদের সাহিত্যচর্চার একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

বাঙালী মুসলমান লেখকদের মধ্যে প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতার কৃতিত্ব লাভ করেন পুলিশ-সাব-ইন্সপেক্টর আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী। তিনি রচনা করেন তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী 'আত্মচরিত' (১ম খন্ড, বরিশাল, ১৮৮৯)। ১২৭৫ সালে প্রকাশিত রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' (কলিকাতা ১২৭৫, ইং ১৮৬৮) প্রথম বাংলা আত্মজীবনী।[১২৯] সেদিক থেকে এটি দ্বিতীয় রচনা। এতে লেখকের বাল্যকাল থেকে চাকুরী জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ পর্যন্ত জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি সরল ও অকপট। দোষে গুণে ভরা একজন সাধারণ মানুষের পরিচয় এতে রয়েছে এবং সমকালীন সমাজ-জীবনের একটি ছবিও ফুটে উঠেছে। তবে রচনাটি আত্মজীবনীর মর্যাদালাভ করলেও অসম্পূর্ণ রচনা।

মোহাম্মদ আবদুল করিম 'আশাবৃক্ষ' (১৮৯২, অপ্রকাশিত) নামে একটি আত্মজীবনী লেখেন। এর প্রথম খন্ডের পান্ডুলিপিতে নিজ বংশাবলী ও বাল্য-জীবনের স্মৃতির কথা বর্ণিত আছে। এর গদ্য সরস ও চিত্রধর্মী। কিন্তু এটিও অসম্পূর্ণ এবং অপ্রকাশিত রচনা।[১৩০]

কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০) রচনা করেন 'আমার জীবনী ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ বৃত্তান্ত' (১৮৯৮)। তাঁর বাল্যজীবন, শিক্ষা, খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ ও প্রচার, ইসলামে পুনঃদীক্ষা এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এতে বর্ণিত হয়েছে।[১৩১] এছাড়া তিনি মুনশী মেহেরুল্লাহর ব্যক্তিগত কর্মকান্ড ও তাঁদের উভয়ের একত্রে ইসলাম ধর্মপ্রচার ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত একটি জীবনীগ্রন্থ 'মেহেরচরিত' (১৯০৯) রচনা করেন।

জীবনীমূলক গ্রন্থের প্রথম নিদর্শন শেখ আবদুর রহিম রচিত তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্ম্মনীতি'(ফাল্গুন, ১২৯৪/১৮৮৭)। তাঁর পূর্বে আর কোন বাঙালী মুসলমান হজরত মহম্মদের জীবনালেখ্য রচনা করেননি।[১৩২] এ গ্রন্থে তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর আছে। উনিশ শতকীয় মুসলিম ভাব-আন্দোলনের ছাপও রয়েছে।

এছাড়া লেখকের যুক্তিবাদী মনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তৎসম শব্দবহুল ধ্বনিময় গদ্যভাষা।[১৩৩]

পন্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মাশহাদী মুসলিম জগতের বিপ্লবী বীর পুরুষ সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানীর (১৮৩৮-১৮৯৭) জীবন ও কর্মসাধনা নিয়ে জীবনীমূলক গ্রন্থ 'সমাজ ও সংস্কারক' (১৮৮৯) রচনা করেন। লেখক এতে জামালউদ্দিনের জীবন ও কর্মসাধনার বর্ণনা করেছেন; সেইসঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।[১৩৪] রচনাভঙ্গী গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুসারী।

এছাড়া এই সময়ের মধ্যে আরো কিছু ক্ষুদ্র-বৃহৎ জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়। সেগুলির আশ্রয় কখনো হজরত মহম্মদ, কখন কোন পীর বা ওলি আউলিয়া, আবার কখনো কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। শিল্পবিচারে বা গভীর চিন্তা চেতনার দিক থেকে সেগুলি তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। তাই ঐ গ্রন্থগুলির কেবল নামোল্লেখ করা হল; যেমন — মোজাম্মেল হকের 'মহর্ষি মনসুর' (১৮৯৬), 'ফেরদৌসীচরিত' (১৮৯৮), 'তাপসকাহিনী' (১৯০০); আলাউদ্দীন আহমদের 'হজরত বড় পীর সাহেবের জীবন চরিত' (১৮৯৯) ও 'ওমর চরিত' (১৯০৩); কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদের 'মহাত্মা হজরত আবু হানীফা সাহেবের জীবনচরিত' (১৮৯৯); শেখ ফজলুল করিমের 'মানসিংহ' (১৯০৩) প্রভৃতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মীর মশাররফ হোসেনের পূর্বে ও সমকালে নানা জড়তা কাটিয়ে কিছু কিছু মুসলমান কবি-সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁদের দ্বারা তেমন উল্লেখযোগ্য আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। তাঁরা কেবল ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার কারণেই উল্লেখযোগ্য। ভাব-বৈচিত্র্যে ও রীতি-প্রকরণে এঁদের মধ্যে একমাত্র মীর মশাররফই আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টিতে দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং বলা যায়, তাঁর আবির্ভাবের পর থেকেই উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের আধুনিক সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়।

তথ্যসূত্র

১. আহমদ ছফা, বাঙালী মুসলমানের মন,কলকাতা, মিরান্দা, পশ্চিমবঙ্গ সং, ফাল্গুন, ১৩৯৫, পৃ. ১৪

২. আহমদ ছফা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

রশীদ আল ফারুকী, বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, কলিকাতা, রত্নাপ্রকাশন, ১৯৮৪, পৃঃ ৯৯

৩. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩

ডঃ নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২য় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০২, পৃ. ১৯৯

৪. জাহিরুল হাসান, উর্দুভাষা ও সাহিত্য, কলিকাতা, পাণ্ডুলিপি, ১৯৯৪, ১ম সং, পৃ. ১-২

৫. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

৬. জাহিরুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮-৯

৭. ডঃ নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

এছাড়া, মীর মশাররফ হোসেন 'আমার জীবনী'তে, (কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, মশাররফ রচনা-সম্ভার, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬-১৭) লিখেছেন যে, তাঁর পিতামহ মীর এবরাহিম হোসেন উর্দুভাষা শিক্ষার জন্য পদমদী ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ রওনা হন। মশাররফের পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন বাংলা জানতেন না, বাংলা বিদ্যাকে বিদ্যা বলে মনে করতেন না। জমিজমার কাগজপত্র সই করতেন ফারসীতে। মীর পরিবারকে গ্রামের সম্ভ্রান্ত জোতদার হিসাবে ধরে আমরা ঐ যুগের বংলার মুসলমান বনেদী শ্রেণীর মানুষের মনোভাবটি অনুধাবন করতে পারি।

৮. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫-৩৬

৯. ঐ , প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২-২৩

পাঠান্তর, মোছলমানি শাস্ত্র (আমি) বাঙ্গালা করিলু
বহুপাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু।

দ্রষ্টব্য- ডঃ সুকুমার সেন, ইসলামী বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৌষ,১৪০০, পৃ. ১৩১

১০. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড,পৃ. ২২

১১. ডঃ নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

এই গ্রন্থে সতের শতক বলা হয়েছে।

১২. ঐ, পৃ. ১৯৯

১৩. আহমদ ছফা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৪. Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings Related Documents, p- 225
উদ্ধৃত, ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯

১৫. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯০, পৃ. ১১৩
ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮

১৬. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭১, পৃ. ১১

১৭. 'মিহির ও সুধাকর', ১৩ আষাঢ় ১৩০৯,
উদ্ধৃত, ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০-৪১

১৮. ডঃ নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০-২০১

১৯. মোজাফ্ফর আহমদ, উর্দুভাষা ও বঙ্গীয় মোসলমান, আল এসলাম, শ্রাবণ ১৩২৪
উদ্ধৃত, ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১

২০. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা, কলিকাতা, সোলেমানী প্রেস, ১৩৫৫(৪সং), 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২
আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, মুক্তধারা, নভেম্বর, ১৯৭১, পৃ. ২৮২

২১. বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতির সংকট, ৩য় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৬৫
অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯১, পৃ. ১২৮-২৯

২২. হামেদ আলী, উত্তরবঙ্গের মুসলমান সাহিত্য, বাসনা, বৈশাখ ১৩১৬
উল্লেখ, রশীদ আল ফারুকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

২৩. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সভাপতির অভিভাষণ'
উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১

২৪. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমাদের শিক্ষা' (প্রবন্ধ), কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজ, পৃ. ৩৪০

২৫. রশীদ আল ফারুকী, মুসলিম-মানস ঃ সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া, কলকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৮১, পৃ. ১৮

২৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ.

৫৭

২৭. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪

২৮. ঐ, পৃ. ১৪৪-১৪৫

২৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ কর্তৃক তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ, রশীদ আলফারুকী, বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, পৃ. ১১০

৩০. আহমদ ছফা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৩১. খাদেমোল এসলাম, 'বাঙ্গালীর মাতৃভাষা', আল এসলাম, অগ্রহায়ণ ১৩২২। এই প্রবন্ধে আরবী হরফে বাংলার নমুনাও প্রদান করা হয়েছে।
উল্লেখ, রশীদ আল ফারুকী, বাঙলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, পৃ. ১১০

৩২. আহমদ ছফা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৩৩. ঐ, পৃ. ১৭

৩৪. J. Long, A descriptive catalogue of Bengali works, calcutta, 1855
উদ্ধৃত, দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় খণ্ড (২য় মুদ্রণ, ১৯৯১) কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৮৫৩

৩৫. J.F. Blumhardt, Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum (London, 1885)
উল্লেখ, আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৩৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৮০, পৃ. ২৬৩
উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে', পৃ. ১৩৮

৩৭. হরপ্রদাস শাস্ত্রী, 'মুসলমানি বাংলা' (প্রবন্ধ), ফাল্গুন ১২৯৪/১৮৮৮, সত্যজিৎ চৌধুরী ইত্যাদি সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৮–৫৭৪
সত্যজিৎ চৌধুরী ইত্যাদি সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

৩৮. দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬

৩৯. Suniti Kumar chatterjee, The Origin and Development of the Bengali Language, London, 1970, p- 210-212.

৪০. ব্যোমকেশ মুস্তফী, 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায় মঙ্গল', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৩।
"কবি কৃষ্ণরাম যে কেবল পীর গাজীর মুখেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু কবিতা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, তুরঙ্গ

সহরের ঘাটোয়াল ও কোটালের মুখেও ঐ ভাষা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।"

উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

৪১. ডঃ সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৪৮

৪২. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৪৩. J. Long, A Descriptive catalogue of Bengali works

উদ্ধৃত, দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫৩

আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৪৪. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

৪৫. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ম সং, পৌষ, ১৩৯৫, পৃ. ২১-৩১

৪৬. আনিসুজ্জামান, পুর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

৪৭. আনিসুজ্জামান, পুর্বোক্ত, পৃ. ১০৮-১০

ডঃ সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৪৮-৫০

মহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), পৃ. ২৭-২৯

৪৮. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, 'মুসলমানী বাঙ্গালা' (প্রবন্ধ/ নভেম্বর ১৯৪৭খ্রী.), মনীষা-মঞ্জুষা, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৬, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯১-২০৪

৪৯. ঐ , পৃ. ১৯১

৫০. ঐ , পৃ. ১৯৪

৫১. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

৫২. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

৫৩. ঐ , পৃ. ২০৪

৫৪. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫

৫৫. নূর-অল ইমান, ভাদ্র ১৩০৭

উদ্ধৃত, ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬

৫৬. নবনূর, পৌষ ১৩১০, পৃ. ৩৪৯

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬-৪৭

৫৭. ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৩, পৃ. ২১ (পাদটিকা)
উদ্ধৃত, ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭

৫৮. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য', কোহিনুর, মাঘ ১৩২২
উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩

৫৯. রশীদ আল ফারুকী, বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, পৃ. ৯৮

৬০. ঐ , পৃ. ৯৮

৬১. ঐ , পৃ. ৯৯

৬২. ইসলাম প্রচারক, মার্চ এপ্রিল, ১৯০০, পৃ. ২৮৫
উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭

৬৩. নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ. ৫৯-৬০
উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯

৬৪. রশীদ আল ফারুকী, বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, পৃ. ১১১

৬৪-ক. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২

৬৫. ঐ , পৃ. ১৫২

৬৬. রশীদ আল ফারুকী, বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, পৃ. ১৩৪

৬৭. ঐ , পৃ. ১৩৪

৬৮. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ৩য় সং, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, পৃ. ২৬৪

৬৯. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৩
আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৭০. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৭১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৭২. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

৭৩. সুকুমার সেন, ইসলামী বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৪৩

৭৪. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা— সমকালের দর্পণে, পৃ. ৫৪
সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০৩, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৮, ১৫২

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫

৭৫. কাজী আবদুল মান্নান, পুর্বোক্ত, পৃ. ১২১

৭৬. সওগাত, পৌষ ১৩৫৪, ৩০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৯০

৭৭. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৭৮. ডঃ আনিসুজ্জামান, 'সাহিত্য পত্রিকা', ঢাকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃ. ৩১৮
উল্লেখ, কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২

৭৯. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

৮০. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪

৮১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পাদটীকা, পৃ. ১৫২

৮২. ঐ , (পাদটীকা), পৃ. ১৫২

৮৩. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬

৮৪. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

৮৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১

৮৬. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪-৩৭
মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্যরচনা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ভাদ্র, ১৩৮২ (১৯৭৫), (পাদটীকা), পৃ. ৭

৮৭. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

৮৮. বালিয়া পরগনা পূর্বে বর্ধমান জেলার অংশ ছিল, পরে এটি হুগলী-জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার হাওড়া-হুগলী সীমান্তে অবস্থিত ভুরশুট পরগণা। এই ভুরশুট-মান্দারণ তথা বালিয়া অঞ্চলে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য-চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। মিশ্রভাষারীতির কাব্য সাহিত্যের বিখ্যাত কবি গরীবুল্লাহ এই বালিয়া পরগণার হাফিজপুরের বাসিন্দা ছিলেন।

৮৯. কাজী আবদুল মান্নান, পুর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮-৩৯

৯০. মুন্সী নামদারের পুস্তক-তালিকাটি কাজী আবদুল মান্নানের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ' (পৃ. ১৩৪-১৫১), এবং মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের 'মীর মশাররফের গদ্যরচনা' (পৃঃ ৬-৭)–গ্রন্থ দুটির উপর ভিত্তি করে তৈরী। কিন্তু প্রথম রচনাটি বাদে বাকী রচনাগুলির প্রকাশকালের ক্ষেত্রে উভয় গ্রন্থে বেশ কিছু গরমিল আছে।

৯১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১

৯২. কাজী আবদুল মান্নান,পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০

৯৩. ঐ , পৃ. ১৬২

৯৪. ওয়াকিল আহমদ,পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮

৯৫. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮

৯৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক যুগ) গ্রন্থে (পৃঃ ২২৯), 'বিরহ বিলাপ' নয়, বইটির নাম 'বিরহবিলাস' বলা হয়েছে।

৯৭. 'অশ্রুমালার' প্রকাশকাল বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন সালের উল্লেখ রয়েছে ঃ–

(ক) আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (পৃ. ২২৩) – ১৮৯৫খ্রী।

(খ) মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) (পৃ. ২২৯) – ১৮৯৪ খ্রীঃ।

(গ) ওয়াকিল আহমদ, ঊনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড (পৃ. ২৯১) – ১৮৯৪ খ্রীঃ।

(ঘ) মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা-সমকালের দর্পণে (পৃ. ১০৭) – – ১৮৯৬ খ্রীঃ।

৯৮. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

৯৯. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯২

১০০. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭

১০১. ঐ, পৃ. ২২৩

১০২. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬

আনিসুজ্জামান, পুর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৩-৪৪

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, (পাদটীকায়) পৃ. ১৮

১০৩. কাজী আবদুল মান্নান, পুর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৯

১০৪. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬

১০৫. ঐ, পৃ. ৩৮৩-৮৪

১০৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

১০৭. 'সুধাকর', ২৪ ফাল্গুন ১২৯৬

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০২

১০৮. ডঃ বদরুল হাসান, উনিশ শতক ঃ নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস, কলকাতা, জগৎমাতা-পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃ. ১৮৪

১০৯. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

১১০. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৬

১১১. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২

১১২. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩০

১১৩. ঐ, পৃ. ২৩০

১১৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪

১১৫. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

১১৬. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮০

১১৭. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

১১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস', আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং, প. ব. সরকার, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৯৬১

১১৯. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫

১২০. নূর-অল-ইমান, শ্রাবণ, ১৩০৭

উদ্ধৃত, কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭

১২১. দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ১৯২-৯৫

১২২. ঐ , পৃ. ১৯৫

১২৩. ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০, পৃ. ২৮৫

উদ্ধৃত, ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭

১২৪. এই অঞ্চলটি বর্তমানে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত।

১২৫. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

১২৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮

১২৭. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯

১২৮. ঐ , পৃ. ৩৯৬

১২৯. মুনীর চৌধুরী, মীর-মানস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৬৮, পৃ. ১১৪

তবে সোমেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী' (কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৯৩, পৃ.

৪২) গ্রন্থে জানিয়েছেন, "১২৭৪ সালে তাঁর (রাসসুন্দরী দাসীর) বই প্রথম ছাপা হয়।"

১৩০. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২

১৩১. ঐ , পৃ. ৩৪২

১৩২. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০

১৩৩. ঐ , পৃ. ২৬২-৬৪

১৩৪. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯-৩০০

তৃতীয় অধ্যায়
মীর মশাররফ হোসেন ঃ মানুষ ও লেখক

সমকাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা

মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী 'আমার জীবনী', তাঁর অন্যান্য রচনা এবং সমসাময়িক কালের বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী তাঁর জীবৎকালের পরিসীমা ২রা নভেম্বর ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ[১] থেকে ১৯শে ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ[২] পর্যন্ত মোটামুটি ৬৪ বছর। এই কাল পর্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত নানা পট পরিবর্তন ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্ন থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত নানা ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পরিবর্তন মুখী অথবা দ্বন্দ্ব সংশয় সঙ্কুল জীবনধারার অনেক ঘটনার সাক্ষী মীর মশাররফ হোসেন। আর এর মধ্যেই তাঁর মানস-জগৎ গঠিত হয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেনের জন্মের পূর্বেই মুসলমান সমাজের দুটি বড় ধর্মান্দোলন – ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলন – হয়ে গেছে। তাঁর জীবৎকালে তার জের নিঃশেষিত হয়ে না গেলেও ক্রমশঃ তা থিতিয়ে এসেছে। তাঁর জন্মের পর দেশে বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ–সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৮-৫৯) এবং কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ – সংঘটিত হয়েছে। এরই মধ্যে জন্ম নেয় 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫), সংঘটিত হয় 'বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন' (১৯০৫)এবং সেই সূত্রে স্বদেশী আন্দোলন–এমনকি এই বঙ্গভঙ্গ রদও হয় তাঁরই জীবদ্দশায়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাতে মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন 'মুসলিম লিগের' জন্ম হয়। এই সময়ে বাঙ্গালী মুসলমানেরা ব্রিটিশ আনুগত্য এবং বিরোধিতা— দুই পরস্পর বিরোধী মানসিক দোলাচলতায় আবর্তিত হয়েছেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে এই কালপর্বে হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে নিজস্ব সংগঠন গড়ে ওঠে নতুন ভাবে ধর্মভিত্তিক উৎসব পালিত হতে শুরু করে। একদিকে নবাব আবদুল লতিফের উদ্যোগে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৬৩), সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮), 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ-সম্মিলনী' (১৮৮৩), 'নূর-অল-ইমান সমাজ' (১৮৮৪), 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি' (১৯০৩), 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসমিতি' (১৯১১) প্রভৃতি মুসলমানদের নিজস্ব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান – অন্যদিকে হিন্দুদের 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭), 'গো-রক্ষিনী সভা' (১৮৮২), 'শিবাজী উৎসব' (১৮৯৫) প্রভৃতি সম্প্রদায় ভিত্তিক সংগঠন বা উৎসবাদি গড়ে উঠেছে। ফলে একালে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের আবহ তৈরী হয়েছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ই যে তাকে সচেতনভাবে লালন করে চলেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া উনিশ শতকে গো হত্যাকে কেন্দ্র করে হিন্দুমুসলমান সমাজে যেমন পরস্পর নানা দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে, তেমনি তৎকালীন সাহিত্য ও পত্র পত্রিকায় একে কেন্দ্র করে নানা বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এরই পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল। মশাররফের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় নীলকরদের বিরুদ্ধে হিন্দুমুসলমান প্রজাদের সংঘবদ্ধতা–এর

সাক্ষ্য বহন করে।

এদেশে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হলে বাঙালী-জীবনে অর্থনৈতিক কাঠামোর হেরফের ঘটে যায়। বাঙালীদের অনেকেই আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। পুরনো জমিদার-তন্ত্রের বা সামন্ত-তন্ত্রের জায়গায় স্থান করে নেয় নব্য ধনবাদ। এই সময় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হিন্দুরা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হলেও তুলনামূলক ভাবে পশ্চাদপদ এবং সদ্য রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হন অনেক বেশী। তাঁদের অনেকেই পুরনো জমিদারী হারিয়ে অথবা পুরনো সুবিধা ভোগী বৃত্তি খুইয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন। মীর মশাররফ হোসেন এবং তাঁর পিতৃপরিবারও অনুরূপ জমিদার শ্রেণীর মানুষ হয়েও জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁদের অর্থকষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। তাঁর কালে অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যলগ্নে মুসলমান সমাজে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তেরই অস্তিত্ব ছিল। আধুনিক অর্থে মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝায় মুসলমান সমাজে তার সূচনা তাঁর কালে দেখা দিলেও প্রকৃতপক্ষে তা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই আত্মপ্রকাশ লাভ করে।[৩] ঊনবিংশ শতাব্দীতে জমিদারগণের মধ্যে অধিকাংশই উচ্ছৃংখল, বিলাসবহুল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানে কোন তফাৎ ছিল না। তবে এই বেপরোয়া স্বেচ্ছাচারী জীবনাচরণের জন্যে কত মুসলমান জমিদার যে তার পূর্ব আর্থিক কৌলিন্য খুইয়ে বসে ছিলেন তার ঠিক ছিলনা। এছাড়া বাঈজী কালচার এবং উপপত্নী রাখা তাদের জীবনের অঙ্গ ছিল। মীর মশাররফ হোসেনের পিতৃ পিতামহ যে অনুরূপ স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তার বিবরণ মশাররফ নিজেই তাঁর 'আমার জীবনী', 'বিবি কুলসুম', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী-মিয়াঁর বস্তানী' প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাছাড়া মশাররফের পিতা মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন বরাবরই ইংরেজ ভক্ত। এই ইংরেজ ভক্তি ছিল তৎকালীন জমিদার মানসেরই প্রতিফলন।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে দাসপ্রথা চালু ছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'Law commission on slavery in India' গঠন করে এই প্রথা আইনত নিষিদ্ধ করা হলেও এর পরবর্তী কালেও বাঙালী হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে যে এই প্রথা চালু ছিল তার প্রমাণ মশাররফের আত্মজীবনীতে আছে। কেননা তিনি জানিয়েছেন তাঁদের বাড়ীতে ত্রিশ-বত্রিশ জন দাসী-বাঁদী ছিল। উক্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায়, মুসলমান সমাজে দাসীদের অন্যত্র চলে যাওয়া রোধ করতে অনেকে তাদের বিয়ে করে স্ত্রী হিসাবে ঘরে রেখে দিতেন। তাছাড়া মুসলমান সমাজে প্রচলিত 'গোলাম' নামে যে এক শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল তারাও আসলে ক্রীতদাস।[৪]

পূর্ব অধ্যায়েই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মে যদিও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ স্বীকৃত নয়, তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজে হিন্দু সমাজের প্রভাবের ফলে এই 'বর্ণভেদ' প্রথা চালু ছিল। বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্ষেত্রে আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানগণ বিশেষতঃ সৈয়দ বংশের [৫] লোকেরা আতরাফ বা নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করত না—করলেও তাঁকে হীন দৃষ্টিতে দেখা হত। [৬] তৎকালীন সমাজে নারীদের স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না।[৭] মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিলনা--বরং তার পরিবর্তে 'সতীদাহ' প্রথা বজায় ছিল।[৮] ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ বেআইনী ঘোষিত হলেও এর পরে আরও কিছুকাল এটি বজায় ছিল। আর প্রধানতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের জটিলতা দূর হয়— কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা প্রচলিতও হয়। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুদের

প্রতিবন্ধকতায় তা ব্যাপক ভাবে চালু হয়নি। বহুবিবাহ হিন্দু–মুসলিম – উভয় সমাজে বিদ্যমান ছিল। মশাররফের পারিবারিক ঐতিহ্য বহু বিবাহের দ্বারা লালিত।[৯]

ঊনিশ শতকের শেষদিকে গ্রামীণ সমাজে মুসলমানদের মধ্যে মক্তব-মাদ্রাসা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে টোল পাঠশালা প্রভৃতি এদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যদিও গ্রাম্য পাঠশালায় অনেক উদার মুসলমান সন্তানেরা পাঠগ্রহণ করতেন। এগুলিতে প্রধানতঃ বাংলা, আরবী-ফারসী শিক্ষা দেওয়া হত। "তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কোলকাতার কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে কোথাও ইংরেজী পড়ানো হতো না বা পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না।"[১০] তবে হিন্দু সমাজ ইংরেজি ভাষা তথা পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণে উন্মুখ হলেও মুসলমানেরা তা থেকে নানা কারণে বিমুখ ছিলেন। এ বিষয়ে তৎকালীন মুসলমানদের মনোভাব মশাররফ হোসেন তাঁর 'আমার জীবনী' তে মনোরম ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন,

> – ইংরেজী পড়িলে পাপ ত আছেই, আর মরিবার সময় গিডীমিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ রসুলের নাম মুখে আসিবেনা। তাহার পরেও আত্মীয়স্বজন গুরু জনগণের ধারনা ও বিশ্বাস যে ইংরেজী পড়িলেই, একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে। সরাব খায়.... মাতামহীর ধারণা ছেলে খৃষ্টান হইয়া মেম বিয়ে করিবে। মরিবার সময় ইংরেজী কথা বলিয়া মরিবে। খোদা-রসুলের নাম করিবে না। মোসলমান ধর্ম প্রতি বিশ্বাস থাকিবে না।[১১]

তদুপরি মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষার অবস্থা যে অতীব করুণ ছিল তা হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট থেকেই জানা যায়।[১২]

সর্বোপরি মুসলমান সমাজে বাংলা ভাষা চর্চার প্রতি অনীহা ছিল।[১৩] আরবী-ফার্সী-উর্দু ভাষা শিক্ষাকেই তাঁরা ধ্যান জ্ঞান ও আভিজাত্যের প্রতীক বলে মনে করেছেন। এক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের অগ্রদূত হয়েও আব্দুল লতিফের বাংলাভাষা বিষয়ে পশ্চাদপদ মনোভাব থেকেই তা স্পষ্ট। ফলে শহরে মুষ্টিমেয় সংখ্যক যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের কারও কারও কণ্ঠে পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সে সুর সাহিত্যের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টায় ছিলেন। প্রথমদিকে কলকাতার মত আধুনিক শহরের শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়নি, পল্লীবাংলার সাধারণ মানের অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারাই সে চর্চা শুরু হয়।[১৪]

বাংলাদেশের এই পরিবেশে মীর মশাররফ হোসেন যে অখ্যাত ও ক্ষুদ্র গ্রাম্য অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন সেই লাহিনীপাড়া কেন্দ্রীক পরিবেশে একটি 'স্থানিক গুরুত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' ছিল। নদীয় (বর্তমান বাংলা দেশের কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালী থানার অন্তর্গত লাহিনী পাড়া গ্রাম। কুমারখালী সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের (১৮৩৩-১৮৯৬) জন্মস্থান। লাহিনীপাড়া সংলগ্ন ছেঁউড়িয়া গ্রাম বাউল সম্রাট লালন সাঁইয়ের (১৭৭৪-১৮৯০) জন্ম ও সাধনক্ষেত্র। এই অঞ্চলের কাছাকাছি শিলাইদহে বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের যোগসূত্র তো সুবিদিত। রেশমকুঠী ও নীলকুঠী কেন্দ্রিক ফিরিঙ্গি সংস্কৃতির সঙ্গে সামান্য হলেও পরিচিতি ছিল এই এলাকার মানুষের। কাজেই 'কুষ্টিয়া কুমারখালীর ঐতিহ্যগত সারস্বত-সাধনার— এই কেন্দ্রীয় ভূমিতেই'[১৫] এবং উপরিবর্ণিত পরিবেশগত অবস্থার মধ্যেই

ঊনবিংশ শতব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলমান লেখক এবং কালজয়ী প্রতিভা মীর মশাররফ হোসেনের আর্বিভাব।

জীবন কথা

উনিশ শতকের বঙ্কিম সমসাময়িক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যকার মীর মশাররফ হোসেনের জীবনেতিহাস, কর্মকাণ্ড ও সাহিত্য সাধনার মূল উৎস সন্ধানে তিন শ্রেণীর তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এগুলি হল ঃ

১. তাঁর প্রকাশিত জীবনীমূলক গ্রন্থসমূহ –

(ক) উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০)

(খ) গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯)

(গ) আমার জীবনী (১৯০৮-১০)

এবং (ঘ) আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী (১৯১০)

২. মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত নানা বিষয়ক রাফ খাতা বা দিন পঞ্জিকা।[১৬] এবং

৩. বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বা সম্পত্তির দলিল। এক্ষেত্রে 'এডুকেশন গেজেট' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখিত উৎস সমূহের উপর ভর করে আমরা তাঁর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত রচনা করব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এত সব তথ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবনের কোন কোন পর্বের বা সময়ের ঘটনার বিবরণ আমাদের অজ্ঞাত থেকে গেছে। কারণ সেসব কালের বিবরণ তিনি আমাদের জানান নি বা অন্যত্রও পাওয়া যায় না।

অবিভক্ত নদীয়া (বর্তমানে বংলাদেশের কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালী থানার অন্তর্গত[১৭]গৌরী নদীর তীরবর্তী লাহিনী পাড়া গ্রামে, মাতামহ মুন্সী জিনাতুল্লার বাটিতে, বিবি দৌলতননেসার গর্ভে মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মীর মোয়াজ্জেম হোসেন।

মশাররফের জন্মের সঠিক সাল তারিখ নিয়ে নানা সংশয় ও বিতর্ক আছে। এ বিষয়ে তাঁর পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন সন-তারিখের উল্লেখ[১৮] একে আরো কুয়াশাচ্ছন্ন করে তুলেছে। 'আমার জীবনী'তে তিনি বলেছেন 'আমার জন্ম সন মাস তারিখ দণ্ড সকলি জন্ম পত্রিকায় লেখা আছে।'[১৯] অথচ তিনি তাঁর প্রকাশিত কোন গ্রন্থে তাঁর জন্ম তারিখের উল্লেখ করেন নি। বরং তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন–'শুধু অমুক তারিখে জন্মিলাম, অমুক সনে অমুক কার্য্য করিলাম–অমুক তারিখে মরিলাম হইতে জীবনী সম্পূর্ণ হয় না'[২০] – এটিই বোধ হয় তাঁর ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে আশরাফ সিদ্দিকী, সৈয়দ মুর্তাজা আলী ও আনিসুজ্জামান কোনো সূত্র উল্লেখ ছাড়াই মশাররফের জন্ম সাল ১৮৪৮ সাল বলে বিবেচনা করেছেন।[২১] ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় (২৯ আশ্বিন ১৩১০) প্রকাশিত মশাররফের পিতার জীবনী থেকে তাঁর জন্ম তারিখ জানিয়েছেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর (২৮ কার্তিক,১২৫৪)[২২]। এই তারিখটিই অধিকাংশ গবেষক গ্রহণ ও ব্যবহার করেছেন। মুহম্মদ আবদুল হাই, কাজী আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, আলী আহমদ, আবদুল আজীজ আল-আমান প্রমুখ পণ্ডিতগণ এবং হাল আমলের গবেষকগণের মধ্যে সেলিম জাহাঙ্গীর, সিরাজুদ্দীন আমেদ, সৌমিত্র শেখর[২৩] ব্রজেন্দ্রনাথ প্রদত্ত সন তারিখটিই গ্রহণ করেছেন। অন্য গবেষক পৃথ্বীলা নাজনীন এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন–"১৮৪৬

এর পরে ১৮৪৭ বা ১৮৪৮ এর কোন এক সময়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।[২৪]" এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালের পণ্ডিত আবুল আহসান চৌধুরী মশাররফের অপ্রকাশিত খসড়া থেকে তাঁর যে জন্মের সন তারিখ উল্লেখ করেছেন তাহল- -২ নভেম্বর ১৮৪৭।[২৫]

পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেনের দ্বিতীয়া স্ত্রী দৌলতননেসার চার পুত্র ও দুই কন্যা। এঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান। "কার্য্যের পারদর্শিতা অনুসারে রাজদত্ত উপাধি মীর এবং বংশ মর্য্যাদা ও বংশ-পরিচয়ের উপাধি সৈয়াদ। মীর হইলেই সৈয়াদ হইতে পারে না।"[২৬] তাই পরবর্তী কালে সৈয়দ বংশীয় হওয়া সত্ত্বেও বংশ উপাধি ক্রমশঃ সরে গিয়ে 'মীর' বলে তাঁরা পরিচিত হন।

ইসলামধর্ম আরবদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচার করবার উদ্দেশ্যে এক সময় বিভিন্ন ওলি আউলিয়া পীর দরবেশ প্রভৃতি অধ্যাত্ম-সাধকগণ নানা দেশে যান। মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ব পুরুষ ছিলেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত অনুরূপ ধর্মপ্রচারক সাধক পুরুষ। প্রায় আড়াই শত বছর পূর্বে (এই কাল পর্বের কথা মশাররফ বর্ণনা করেছেন তাঁর "আমার জীবনী" গ্রন্থে যার রচনা কাল-১৯০৮-১০ খ্রী.) অর্থাৎ মশাররফের জন্মের সাত পুরুষ আগে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে (১১৮০ হিজরি) "জগৎবিখ্যাত বোগদাদ নগর ইহতে মহামাননীয় তাপস-প্রবর সৈয়দ সাদুল্লা জগৎ ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে আধুনাতন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সেকাড়া গ্রামে উপস্থিত হন।"[২৭] এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ধর্মপ্রচার ছাড়াও সৈয়দ সাদুল্লা এদেশে এসেছিলেন নিখোঁজ পিতার সন্ধানে। তিনি অবশ্য পিতার সন্ধান শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি। তাঁর গুরুপুত্র সাহ্ সাহ্ পাহলাওয়ান অনেক আগে থেকেই সেই গ্রামে বাস করছিলেন। সৈয়দ সাদুল্লা তাঁর গুরুপুত্রের আশ্রয়ে থেকে পরবর্তীকালে পাহলাওয়ানের এক মাত্র কন্যার পাণি গ্রহণ করেন এবং সেখানেই চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এই সৈয়দ সাদুল্লাই কোন এক রাজা বা সুলতান কর্তৃক 'মীর' উপাধি লাভ করেছিলেন।

সৈয়দ সাাদুল্লা চার পুত্র রেখে মারা যান। কিন্তু তাঁদের নাম মীর মশাররফ উল্লেখ করেননি কোন গ্রন্থে। তিনি কেবল তাঁর এক পৌত্রের নামোল্লেখ করেছেন, তাঁর নাম হল সাহ সৈয়াদ মীর কুতবুল্লা। মীর কুতবুল্লার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম মীর ওমর দারাজ এবং কনিষ্ঠ পুত্র মীর আলী আকবর। মীর ওমর দারাজের পুত্র মীর এবরাহিম হোসেন। মীর এবরাহিম হোসেনের পুত্র মীর মোয়াজ্জেম হোসেন এবং পৌত্র মীর মশাররফ হোসেন। অন্যদিকে পদমদীর নবাব মীর মহম্মদ আলী হলেন মীর আলী আকবরের অধঃস্তন পুরুষ।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর পিতামহ মীর এবরাহিম হোসেনের জীবনের অনেক নাটকীয় ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার জীবনের গৌরব ও মান মর্যাদার মূল কারণই মীর এবরাহিম হোসেনের আশ্চর্য্য ঘটনা।"[২৮] মীর এবরাহিম হোসেন ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির মানুষ। শিক্ষা দীক্ষার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। বন্য শূকর শিকার করতে গিয়ে তাঁর প্রাণ অল্পের জন্যে বেঁচে যায়। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে পিতা তাকে ভাতের বদলে ছাই খেতে আদেশ করলে আভিমানক্ষুব্ধ পুত্র গৃহত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু পথিমধ্যে সাঁওতা গ্রামের জনৈকা মহিলা জমিদার আনার খাতুনের আশ্রয় পান। জানা গেল আনার

খাতুন এবরাহিম হোসেনের দূর সম্পর্কের বোন। নিঃসন্তান আনার খাতুন মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত সম্পত্তি মীর এবরাহিম হোসেনকে দিয়ে যান। ফলে এই সময় থেকে তিনি হলেন জমিদার। কিছুদিন পরে আনার খাতুনের দূর সম্পর্কীয় ভাইয়েরা সেই সম্পত্তি থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করলে তিনি তা যশোহরের জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তায় পুনরুদ্ধার করেন। এরপর দীর্ঘদিনের ব্যবধানে মীর এবরাহিম তাঁর পৈতৃক আবাস পদমদীতে ফিরে গিয়ে পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হন এবং সেখানে বিবাহ করেন।

মীর এবরাহিম হোসেনের এই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। প্রথম পুত্র মীর জোলফেকার আলী, কনিষ্ঠ পুত্র মীর মোয়াজ্জেম হোসেন এবং কন্যা হাফিজা খাতুন ও নাসিমা খাতুন। এই দ্বিতীয় পুত্র মীর মোয়াজ্জেম হোসেনই মীর মশাররফ হোসেনের পিতা। তিনি সাঁওতা গ্রামে নতুন বাড়ীঘর নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। তবে পদমদীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ বজায় ছিল। কিছু সময়ের ব্যবধানে প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে তিনি বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। এর স্বল্পকাল পরে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তবে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দু পক্ষের পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করে যান। দ্বিতীয় পক্ষের কনিষ্ঠ পুত্র মীর মহেব আলীর জন্য লাহিনী পাড়ায় একটি পৃথক বাড়ী প্রস্তুত করে দিয়ে যান।

মীর এবরাহিম হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর জোলফেকার আলীর দুই স্ত্রী। অপুত্রক জোলফেকার আলীর দুই স্ত্রীর গর্ভে দুটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা শুকরণনেসাকে নাবালিকা অবস্থায় রেখে তিনি মারা যান। এই কন্যাটিকে লালন পালন করেন চাচা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি ফরিদপুর জেলার গট্টি গ্রামের জনৈক সাহ গোলামাজমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই করে রাখেন। এই সাহ গোলামাজমই পরবর্তীকালে এবরাহিম হোসেনের উইল জাল করে সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন এবং মীর মোয়াজ্জেম হোসেনকে তাঁর পৈতৃক বাড়ি থেকে উৎখাত করেন। ফলে তাঁকে ভীষণ অর্থকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে মশাররফের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়।

মীর মোয়াজ্জেম হোসেন 'মিষ্টভাষী, সরল প্রকৃতি এবং ঘোর আমোদী' লোক ছিলেন। তিনি দুটি বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রী হামিদননেসা একমাত্র পুত্র আজগার আলীকে ছোট রেখেই অকালে মারা যান। স্বল্পকালের মধ্যে আজগার আলীরও মৃত্যু হয়। ভ্রাতুষ্পুত্রী জামাতা সা-গোলামাজম কর্তৃক স্বগৃহ থেকে বিতাড়িত, মৃতদার, নিঃ সঙ্গ মীর মোয়াজ্জেম হোসেন এরপর লাহিনীপাড়ার মুন্সী জেনাতুল্লাহর একমাত্র কন্যা বিবি দৌলতননেসাকে বিবাহ করেন। এ বিবাহ ১২৫২ সালের পৌষ মাসে সংঘটিত হয়। এরপর তিনি শ্বশুরালয়েই বসবাস করতে থাকেন। এই দৌলতননেসাই মীর মশাররফ হোসেনের জননী। অবস্থাপন্ন শ্বশুরের মৃত্যুর পর মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মালিক হন এবং এতদিন জীবন ও সংসারের প্রতি উদাসীন মোয়াজ্জেম সাহেব পুনরায় সংসারের প্রতি মনোযোগী হন।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর জনক জননীর অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। পিতা মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন ইংরেজ-ভক্ত, নীলকর সাহেব টি আই কেনীর বন্ধু। তিনি ছিলেন মজলিশী স্বভাবের মানুষ,

গীত-বাদ্যের প্রতি অনুরাগী এবং নৈতিক দিক থেকে শিথিল চরিত্রের অধিকারী। মাতা সম্পর্কে মশাররফ লিখেছেন— "মাননীয় দৌলতননেসা দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মধ্যমাকৃতি। চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, ভ্রূ, ললাট নিখুঁত।"[২৯] এবং "...পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী এবং আজীবন চিরসতী।"[৩০] অবশ্য তাঁদের দাম্পত্য জীবন বরাবর সুখের ছিলনা। তাঁর পিতার চরিত্র দৌর্বল্যের কারণে তাঁর মা খুব মনোকষ্টে থাকতেন। এই কারণেই হয়তো অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। অবশ্য স্বামীর প্রতি দৌলতননেসার অগাধ ভক্তি ছিল। মশাররফ তাঁর মাতার মৃত্যুর কোন সন তারিখ উল্লেখ করেন নি।

তবে দৌলতননেসার মৃত্যুকালে মশাররফের বয়স ছিল চৌদ্দ বছর কয়েকমাস মাত্র। কাজেই আনুমানিক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। মশাররফের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর খসড়া নোট থেকে জানা যায়, পত্নীবিয়োগের পর মোয়াজ্জেম হোসেন প্রায় ছয় বছর জীবিত ছিলেন। ১২৭৩ সালের ৯ই চৈত্র শুক্রবার বেলা দুটোর সময় পদমদীর বাড়ীতে তাঁর জীবনাবসান হয়।[৩১]

মোয়াজ্জেম-দৌলতননেসা দম্পতির চার পুত্র ও দুই কন্যা মিলে মোট ছয় সন্তান। এরা হলেন যথাক্রমে- মশাররফ, শামসুন্নেসা, মোহতেশাম, স্বল্পায়ু এক কন্যা, মোকাররম, এবং বজলাল হোসেন। মশাররফের ভাই বোনের মধ্যে অধিকাংশেরই অকাল মৃত্যু ঘটে। এঁদের মধ্যে কেবল মোকাররমই দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন। মধ্যম ভ্রাতা মোহতেশাম হোসেন আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। সভা সমিতির সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। এই সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে মশাররফের আমৃত্যু আন্তরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক বজায় ছিল।

মাতার মৃত্যুর পর মশাররফ মাতামহী ফাখেরা খাতুনের তত্বাবধানে বিশেষ আদর যত্নের মধ্যে দিয়ে প্রতিপালিত হতে থাকেন। সে সময় পিতৃ মাতৃকূলে একমাত্র পুত্র সন্তান হওয়ায় এই স্নেহ যত্নের মাত্রা একটু বেশীই ছিল। মশাররফের ভাষায়, "মাতামহী আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, পিতাও অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং মাতা তাঁর নাম ধরিয়া কখনও ডাকেন নাই। 'বড় হজরত' বলিয়া ডাকিতেন, এতই ভালবাসিতেন, এতই স্নেহ করিতেন যে তাহা মুখে প্রকাশ অসাধ্য"।[৩২] সন্তান বাৎসল্যের ক্ষেত্রে তাঁর জননীর একটি ভিন্ন রূপ মশাররফ তুলে ধরেছেন। তাঁর মাতা ছেলে মেয়েদেরকে কখনো 'তুই' বলে সম্বোধন করেন নি— 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন॥

ছেলেবেলায় মশাররফ ভীষণ দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'এই বদমেজাজী হঠকারিতা এবং দুষ্টুমি বৃদ্ধি হইতে লাগিল'। মাতামহী অনেক সাধ্যসাধনা করে দুধ খাওয়াতেন। বাড়ীর ৩০/৩২ জন দাসীর উপস্থিতি তাঁর এই উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আবার এদের সংস্পর্শেই তাঁর চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ঘটে। মশাররফ জানিয়েছেন, "আমাকে শান্ত ধীর স্থির করিতে একমাত্র উপায় ছিল গান বাজনা আর নাচ।"[৩৩]

প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চায় সাফল্য মশাররফের অসম্পূর্ণ শিক্ষা জীবনে আসেনি। এর পেছনে উপযুক্ত শিক্ষানুরাগী অভিভাবকত্বের অভাব, প্রথাবদ্ধ শিক্ষার প্রতি মশাররফের অনীহা, বাউণ্ডুলে স্বভাব, 'বিলাস-ব্যসন

আমোদ প্রমোদে' অতিরিক্ত আসক্তি, নৈতিক চরিত্রের স্খলন এবং মহৎ জীবনাদর্শের অভাব অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৩৪]

মীর মশাররফ হোসেন মুখে মুখে 'জিনিসের' নাম বলা বা গণনা করা মায়ের কাছে থেকেই শেখা শুরু করেন। তবে সেকালের নিয়মানুসারে প্রথাগত হাতেখড়ি বা 'হাতে তাক্তি' হয়েছিল যখন তাঁর বয়স চার বছর চার মাস চার দিন। ঐ দিন তাঁর পিতার উপস্থিতিতে লাহিনী পাড়ার পার্শ্ববর্তী পাহাড়পুর গ্রাম নিবাসী মুন্সী জমিরুদ্দিন মশাররফের 'হাতে খড়ি' দিয়েছিলেন। এই মুন্সী জমিরুদ্দীন মশাররফের পিতারও হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। সেই উৎসবে বাতাসা বিতরণ করা হয়েছিল। মশাররফের বর্ণনায় তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এরূপ বর্ণনা উইলিয়ম এ্যাডামের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টেও লক্ষ্য করা যায়।[৩৫] সেদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হয়। সে সময় প্রবাদ ছিল, মুন্সী সাহেব হাতে খড়ি দিলে দারগাগিরি চাকুরী না হয়ে যায় না। মুন্সী সাহেব বাংলা লিখতে জানতেন না। এবং মুন্সীসাহেবরা বাংলা বিদ্যাকে নিতান্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। মীর মশাররফের পিতা বাংলা অক্ষর চিনতেন, পড়তে পারতেন, কিন্তু লিখতে পারতেন না। সে কারণে কাউকে চিঠি দিতে হলে মুহুরী বা অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে নিজে ফারসীতে সই করতেন। তবে তিনি বাংলা বা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। যাই হোক, মশাররফের হাতেখড়ি হয়েছিল আরবী-ফারসী অক্ষর আলিফ বে দিয়ে। তৎকালীন মুসলিম পরিবারে আরবী ফারসী দিয়েই লেখাপড়া আরম্ভ হতো।

'হাতে তাক্তি' হলে মাসিক দুটাকা বেতনে হেরাছতুল্লা নামে আর একজন মুন্সী মশাররফকে 'আলিফ বে পড়াইতে নিযুক্ত হইলেন।' মুন্সী সাহেবের কাছে এক বছরের মধ্যে কোরাণ শরীফের প্রথম পারা (অধ্যায়)[৩৬] তিনটি সুরা পাঠ শেষ করেন। মশাররফ লিখেছেন, "অক্ষর পরিচয়ে বানান করিয়া পড়িতে পারিলেই কোরাণ পাঠ করা হইল। শিক্ষক মুন্সী মহোদয়েরও কোরাণের অর্থ জ্ঞান নাই, আমি শিক্ষা করিব কি প্রকারে ?"[৩৭] এই সময় গ্রামের জনৈক দুর্গাচরণ রায়ের হাতের অক্ষর ভাল ছিল বলে তার অনুকরণে বাংলা অক্ষর তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। তখন ১৮৫১সাল।

পরের বছর (১৮৫২) লাহিনীপাড়ার উত্তরে জয়নাবাদ গ্রামে জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় মীর মশাররফ ভর্তি হলে প্রকৃত পক্ষে এখান থেকেই তাঁর বাংলা শিশু পাঠ শুরু হয়। মশাররফের পিতার অনুরোধে নন্দীমহাশয় মশাররফদের 'বাটীতে' ঐ পাঠশালা তুলে আনেন। আরবী ও বাংলা শিক্ষা পাশাপাশি চললো। তবে "আরবীর বর্ণমালা শিক্ষার অগ্রে বাঙ্গালার বর্ণমালা মুখস্থ হইল"।[৩৮] তিনি তালপাতায় লেখা শিখতেন। নন্দী মহাশয়ের পাঠশালায় তিনি প্রায় চার বছর লেখাপড়া করেন।

এই সময় দুরন্ত শিশু মশাররফের পড়াশুনার চাইতে খেলাধুলোয় মনোযোগ বেশী ছিল। ঘুড়ি ওড়ানো তাঁর প্রিয় সখ ছিল। খেলা ধুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর লেখাপড়ার চর্চা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সালঘর মধুয়ার কুঠির কাছের সানপুকুরিয়া গ্রামের জনৈক মুন্সী কছিমউদ্দীনের কাছে ফারসীভাষা শিখেছিলেন। কিন্তু অর্থ না বুঝে 'পন্দেনামা' ও 'গোলেস্তাঁর' মতো ফারসী গ্রন্থ কেবলমাত্র বানান করে পাঠকরা ও মুখস্থ করার মধ্যেই তাঁর এ বিদ্যা সীমাবদ্ধ থাকে। ক্রমে তিনি বাংলা লেখায় পটু হয়ে উঠতে থাকেন। যখন তাঁর বয়স দশ বছর তখন তাঁর পিতা তাঁকে দিয়ে প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখাতে শুরু করেন। বিষয় আশয় সংক্রান্ত যাবতীয় লেখাপড়ার কাজ তিনি তখন লক্ষ্মী

ছেলেটির মতো করতেন। এইভাবে লেখার অভ্যাস গড়ে উঠতে লাগল।

লাহিনীপাড়ার পাশের গ্রাম সালঘর মধুয়ায় ছিল মশাররফের পিতৃবন্ধু নীলকর সাহেব টি. আই. কেনীর কুঠি। এই কেনী সাহেবকে পিতা মোয়াজ্জেম হোসেন নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। 'ইংরেজ-ভক্ত' মীর মোয়াজ্জেম সাহেবের এই কাজ মশাররফের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাহিত্যিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। যাইহোক, কৃতজ্ঞ কেনী তাঁর কন্যাদের সঙ্গে মীর মশাররফকে বিলেতে উচ্চ শিক্ষার জন্যে নিজ খরচে পাঠাতে চেয়ে তাঁর পিতার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু স্নেহান্ধ মাতামহীর কারণে এ প্রস্তাব বাস্তবে কার্যকর হয় নি। তাঁর ধারণা ছিল যে, মশাররফ বিলেতে গেলে 'খ্রীষ্টান' হবে এবং মেম বিয়ে করবে। বলাই বাহুল্য, উনিশ শতকের বাস্তব পরিস্থিতিতে এ ধারণা যেমন অমূলক ছিলনা, তেমনি সে সময়ের মুসলিম মানসের দৈন্যও এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে পাশাপাশি মশাররফ-জননীর নির্দ্বিধ সম্মতির মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রমী চিত্র লক্ষ করি। মশাররফের যাওয়া না হলেও পরবর্তী কালে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর মহতেসাম হোসেন বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে আসেন।

এই সময় মশাররফের জীবনে পর পর দুটো দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হল, মশাররফের একটি ছোট বোনের সঙ্গে পাবনা কালেক্টরেটের কেরানী নাদের হোসেনের পুত্র ফজলে হকের বিয়ের কথাবার্তা হয় কিন্তু মায়ের আপত্তিতে এ বিবাহ হয়নি। এর কিছু দিনের মধ্যেই বোনটি মারা যায়। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, (আনুমানিক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে) মশাররফের পূজনীয়া জননীর মৃত্যু। মশাররফের পিতা 'রূপসী' নামে এক নর্তকীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এই রূপসী গোপনে 'সব্জা' দাসীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁর জননীর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। ফলে তিনি বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[৩৯] মশাররফের বয়স তখন চৌদ্দ বছর কয়েক মাস।

পিতা মোয়াজ্জেম হোসেন পুত্রের লেখাপড়ার বিষয়ে সর্বদা সমান যত্নশীল থাকতে পারেন নি। মশাররফ বলছেন "আমার মাতৃবিয়োগের পর আমার বিদ্যাশিক্ষা পক্ষে পিতৃদেবের যেন তত আগ্রহ ছিলনা"।[৪০] অবশ্য তখন স্ত্রী বিয়োগের কারণে তাঁর পিতার মধ্যে একধরনের সংসার-বৈরাগ্য দেখা দেয়। এরপর মশাররফের বেশ কিছুকাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ বন্ধ হয়ে যায়।

মশাররফ বাল্যজীবন অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী উচ্চ শিক্ষায় দেখা দিল নানা সমস্যা। "এখন আমি বালক নহি—যুবক। জীবনের ভালমন্দ দুনিয়ার হালচাল যেন কিছু কিছু বুঝতে পারি। বিদ্যাশিক্ষা এইখানেই যেন ইতি বোধ হইতেছে। কারণ দূরদেশে না গেলে আর দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় নাই।"[৪১] আত্মীয় গুরুজনদের ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহ এবং দূরদেশে অভিভাবকহীন অবস্থায় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পিতার অনীহার কারণে প্রায় বছর খানেক সময় কেটে যায়। এই অবকাশে মশাররফ গ্রামে থেকে বাংলা চিঠিপত্র লেখা, হেঁয়ালি রচনা করা, বাংলা পুঁথি পড়া এবং আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে 'বয়েত বাহাস' (কবিতা রচনার লড়াই) করার মধ্যদিয়ে সময় অতিবাহিত করেন। এই সময়েই তিনি লেখক হরিনাথ মজুমদার ও বাউল কবি লালন ফকিরের সংশ্রবে আসেন।

ভোগ বিলাসপূর্ণ ও যুবতীদাসী বাঁদী পরিবৃত লাহিনীপাড়ার গৃহপরিবেশে মশাররফের মত বয়ঃসন্ধিকালের

এক জন যুবকের পক্ষে তখন পদস্খলনের সম্ভাবনা ছিল প্রবল। এ কারণে এই সময় তিনি এই মোহময় পরিবেশ থেকে নিজেকে বাঁচাতে না পেরে অকপটে স্বীকার করেছেন–"দাসী-বান্দী কর্তৃকই আমার চরিত্র প্রথম কলঙ্ক রেখায় কলঙ্কিত হয়।"[৪২] "ক্রমে পূজনীয় পিতার মনেও যেন কিছু সন্দেহ বসিল," এবং তিনি পুত্রকে এই অধঃপতন থেকে মুক্ত করবার জন্যে "যেখানে যাইতেন আমাকে সঙ্গে করিয়া যাইতেন।"[৪৩] কাজেই মশাররফের বয়স যখন পনের ষোল বছর (১৮৬২-৬৩) তখন তাঁর পিতা ফরিদপুর জেলার পদমদী গ্রামে কাজের প্রয়োজনে যাওয়ার সময় তাকে সঙ্গী করে নিয়ে যান। 'যৌবন জোয়ারারম্ভ' কালে এই হল তাঁর 'প্রথম প্রবাস'।

পদমদীতে মশাররফ তাঁর এক জ্ঞাতিভ্রাতা চন্দনমৃগীর জমিদার (পরে নবাব) মীর মহাম্মদ আলীর সংস্পর্শে এসে তাসখেলা ও নৃত্যগীতমুখর বাইজী 'কালচারে'র সঙ্গে পরিচিত হন।[৪৪]এই নবাবের কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে পিতার সঙ্গে মশাররফ বরিশালের বামনার জমিদার বাড়িতেও যান। সেখান থেকে তাঁরা ঢাকা রওনা হন। ঢাকায় তাঁর পিতৃব্য মীর জোলফেকার আলীর নাত-জামাই জমিদার-পুত্র মৌলবী ওয়াহেদ আলীর বাসায় গিয়ে ওঠেন। বামনার বিবাহ-বাড়িতে এবং ঢাকার ওয়াহেদ আলীর গৃহে–উভয় ক্ষেত্রেই মদ্যপান, বাইজীনৃত্য প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণ মীর প্রত্যক্ষ করেন। যাই হোক, ঢাকায় থাকার সময় ওয়াহেদ আলীর বাসায় জনৈক হিন্দু স্কুল–শিক্ষকের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। এই শিক্ষক মশাররফকে সংস্কৃত নাটক 'কাদম্বরী'র একখানি বঙ্গানুবাদ উপহার দেন এবং 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' নামে একখানি অভিধান–গ্রন্থ সংগ্রহ করে দেন। পদমদী ও ঢাকায় ছমাস কাটিয়ে মশাররফ তাঁর পিতার সঙ্গে গ্রামের বাড়ী লাহিনীপাড়ায় ফিরে আসেন। মশাররফের ভাষায়, 'আমার প্রথম প্রবাস এইস্থানে শেষ হইল।'[৪৫]

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মশাররফের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। এ বছর কুষ্টিয়া পৃথক মহকুমা হিসেবে গঠিত হয় এবং এ বছরেই কুমারখালী থেকে কাঙ্গাল হরিনাথ দে মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। মশাররফ পরবর্তীকালে এই কাগজে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পান। এর কিছু পূর্বে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কুষ্টিয়ায় একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মশাররফ তাঁর পিতার এই সময়কার মনোভাবের কথা জানিয়ে লিখছেন,— "বামনা ঢাকা মোসলমান সমাজে, সাএস্তাবাদের মীর সাহেবদিগের মুখে ইংরাজী শুনিয়া ইংরাজী ভাষার প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ঘৃণা ছিল তাহা অনেক পরিমাণে ছুটিয়া গিয়াছে।"[৪৬] এর ফলে পুত্রদের ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য তিনি 'মনে মনে বড়ই ব্যস্ত' হয়ে পড়েন। তিনি মশাররফ ও মহতেশাম হোসেন—দুই পুত্রকে কুষ্টিয়ার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেন। এই সময়কার লেখাপড়া সম্পর্কে মশাররফ বলেছেন,

> আমরা কুষ্টিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিলাম। হেড মাষ্টার উমেশন্দ্র সরকার। পণ্ডিত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য। .... আমি ইংরাজী এ.বি.সি পড়ি—বাঙ্গালা ছোট একখানি কেতাব–প্রথম ভাগ 'শিশুশিক্ষা'। বাঙ্গালা-শিশুশিক্ষা চটীবহি, দুই তিনদিন পড়িয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, আমি এ পুস্তকের সকলি পড়িয়াছি। পণ্ডিত মহাশয় পরীক্ষা করিলেন। পড়ায় আটকিল না। বানান করায় ভুল হইল।[৪৭]

এরপর পণ্ডিত মহাশয়ের পরামর্শে তিনি 'বোধোদয়' পড়া শুরু করেন। কুষ্টিয়া স্কুলে পড়বার সময় বাড়ীতে কাউকে

না জানিয়ে সমবয়সী কয়েকটি ছেলের সঙ্গে তিনি পায়ে হেঁটে কলকাতায় পালিয়ে যান। সেখানে তাঁর বন্ধুর কাকার বাড়িতে কয়েকদিন থেকে পুনরায় বাড়ী ফিরে আসেন। এই ঘটনায় তাঁর পিতা ভীষণ ক্রুদ্ধ ও মাতামহী মর্মাহত হন।

এই ঘটনার পরে মশাররফের পিতা তাঁকে কুষ্টিয়া স্কুল থেকে ছাড়িয়ে পদমদীতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত এক 'ইংরেজী বাঙ্গালা' স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। কিন্তু এখানেও নবাব মীর মোহাম্মদ আলীর বাড়ীতে গান বাজনা, বাঈজীনাচ ইত্যাদি আমোদ ফূর্তির মধ্যে সঙ্গীত ও আমোদ প্রিয় মীর মশাররফ নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। কাজেই বিদ্যাচর্চার পরিবর্তে জনৈক স্খলিত চরিত্র স্কুল-শিক্ষক এবং প্রমোদ-মত্ত অভিভাবক নবাবের আচার আচরণের প্রশ্রয়ে তিনি আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়ে পড়লেন। পরবর্তীকালে এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন——"দুই বৎসর পদমদীর স্কুলে ছাত্র সাজিয়া ছিলাম।"[৪৮]

উদ্বিগ্ন পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন মশাররফকে এরপর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নদীয়ার কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করেন। সে সময় কৃষ্ণনগর জ্ঞান-চর্চা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। তবে এখানে মশাররফের বাংলা পড়ার সখ পূরণ হয় নি। তিনি লিখেছেন, "বাঙ্গালা পড়া আর হইল না। যে পড়া সে নামমাত্র পড়া–ইংরেজী পড়িতে লাগিলাম।"[৪৯] কৃষ্ণনগরের স্বল্পকালীন শিক্ষা মশাররফের জীবনে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে। হিন্দুপ্রধান কৃষ্ণনগর শহরে তিনি প্রথম হিন্দু-সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন যা তাঁর পরবর্তী ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য-জীবনে গভীর ছাপ রেখেছিল। তাঁর আচার-আচরণে, ভাষায় ও পোষাক পরিচ্ছদে কিছু পরিবর্তন এল। টুপি, পাজামা, চাপকান ছেড়ে তিনি ধুতি পাঞ্জাবী পরা অভ্যাস করতে লাগলেন। এখানকার মুসলমানদের নামকরণেও 'হিন্দুয়ানী' ছাপ লক্ষ করলেন, যেমন–সামসদ্দীন–সতীশ, মশাররফ–মশা, বোরহান–বিরু ইত্যাদি। পরবর্তীকালে মশাররফের আপন সন্তানদের নামকরণের ক্ষেত্রে (যেমন জ্যেষ্ঠা কন্যা রওসান আরার ডাক নাম সতী, পুত্র ইব্রাহিমের ডাক নাম সত্যবান প্রভৃতি) এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাঁর সংস্কার-মুক্ত মনের পরিচয় ফুটে ওঠে। এখানকার ভাষাও তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু ফ্যাশন-দুরস্ত 'ফুলবাবু' হয়ে পড়ার ফলে এখানেও তাঁর লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়।

কৃষ্ণনগরে ভর্তি হবার বছর খানেকের মধ্যেই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মশাররফ আবার কলকাতা পালিয়ে যান। তখন তার বয়স সতের বছর। কলকাতায় মশাররফ তাঁর বাল্যবন্ধু মুন্সী কারাম মৌলার সাক্ষাৎ পেলে তিনি তাদের চেতলার বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। মুন্সী কারাম মৌলা নাদের হোসেনের দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র পুত্র। এই নাদের হোসেন মশাররফের পিতৃবন্ধু, পূর্বে পাবনায় ফৌজদারী আদালতের নাজির ছিলেন। বর্তমানে চব্বিশ পরগনা জেলার আলিপুরে আমিন নিযুক্ত হয়েছেন। এক সময় এই নাদের সাহেবের এক পুত্র ফাজলে হকের সঙ্গে মশাররফের সহোদরা ভগ্নী শামসুন্নেসার 'বিবাহ কথা' হয়েছিল। নাদের সাহেব মশাররফকে কলকাতায় নিজের বাসায় রেখে পড়াবার ইচ্ছে প্রকাশ করে মশাররফের পিতার কাছে পত্র লেখেন। সেবার কয়েকদিন কলকাতায় থেকে মশাররফ যথারীতি কৃষ্ণনগর ফিরে আসেন। ছুটিতে মশাররফ লাহিনীপাড়ার বাড়ীতে গেলে সেখানে তাঁর কৃষ্ণনাগরিক কথাবার্তা, চালচলন দেখে সবাই বিস্মিত ও খুশি হন। এদিকে নাদের হোসেনের উৎসাহে সাড়া দিয়ে পিতা মশাররফকে কৃষ্ণনগরের লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে কলকাতায় যাওয়ার অনুমতি দেন। এই কলকাতাপর্বে শুরু হয়

মশাররফের জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

এ প্রসঙ্গে নাদের হোসেন সম্পর্কে কিছু কথা বলা আবশ্যক। নাদের সাহেবের 'বসতবাটী' যশোহর জেলার মক্তারপুর গ্রাম। তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রথমা স্ত্রী তিন কন্যা ও একপুত্র সহ থাকেন মক্তারপুরে। এই তিন কন্যার মধ্যে প্রথমা লতিফননেসা এবং দ্বিতীয়া আজীজান-নেসা ছিলেন বিবাহযোগ্যা। লতিফন ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা। পক্ষান্তরে আজীজাননেসা তেমন সুন্দর নয়। যাই হোক, মশাররফ এক মাসের ছুটি শেষে কলকাতায় নাদের সাহেবের চেতলার বাসায় গিয়ে থাকতে লাগলেন। কথা ছিল, মীর মশাররফ ও বন্ধু চাঁদ মিয়া একসঙ্গে কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করবেন। কিন্তু তা আর হলনা। নাদের হোসেন গোপনে মশাররফের সঙ্গে তাঁর কন্যা লতিফনের বিবাহ স্থির করলেন। মশাররফকে আর কলকাতায় রাখা হল না। তাঁকে তাঁদের দেশের বাড়ি মক্তারপুরে পাঠানো হল। এর ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। পরবর্তীকালে মশাররফ এ বিষয়ে বহু আক্ষেপ করেছেন।[৫০] এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তাঁর জীবনীকারদের কেউ কেউ বলেছেন, মশাররফ কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন[৫১] কিন্তু তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন কিনা তার কোন উল্লেখ নেই।

মক্তারপুরে থাকবার সময় পত্রযোগে লতিফনের সঙ্গে তাঁর প্রণয় গভীরতা পায়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৯ মে (বাংলা ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭২) শুক্রবার বিবাহের দিন স্থির হয়। পিতার অজ্ঞাতে হলেও এই বিবাহে তাঁর অসম্মতি ছিল বলে মনে হয় না।[৫২] কিন্তু তাঁর শ্বশুর বাড়ির ষড়যন্ত্রে তাঁর সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যা আজীজানের বিবাহ দেওয়া হয়। এক প্রৌঢ় ধনী জমিদারের সঙ্গে লতিফনের বিবাহ হয়।[৫৩] এর ফলে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই লতিফন বিষপানে আত্মহত্যা করেন। আর মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে মশাররফ তাঁর স্বগৃহ লাহিনীপাড়ায় ফিরে যান। পরবর্তী জীবনেও মশাররফ যে লতিফনকে বিস্মৃত হতে পারেন নি তার প্রমাণ আছে।[৫৪]

মশাররফ এবং আজীজানের এই বিবাহ সুখের হয়নি। দাম্পত্য-অসন্তোষের ফলে তিনি কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খলও হয়ে পড়েন।[৫৫] তবে আজীজানের গর্ভে তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্রদ্বয় হল মীর মফাজ্জল হোসেন ওরফে শরৎ (১২৭৯-১২৮৮) এবং মীর মহামদ হোসেন ওরফে শিশির (১২৮১-১২৯৪)। কন্যাটি অকালে মারা যায়। মশাররফ তাঁর এই পুত্রদ্বয়কে খুব ভালবাসতেন।

মক্তারপুর থেকে লাহিনীপাড়ায় ফিরে এসে মশাররফ পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশোনা করতে থাকেন। এই সময় অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে (বাং ১২৭৩ সালের ৯ই চৈত্র) তাঁর পিতার মৃত্যু হয়।[৫৬] লাহিনীপাড়ায় থাকার সময় তিনি প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জমিদারী দেখাশোনার কাজে যেতেন। এই সূত্রে 'কালী' নামে একটি শ্যামবর্ণা বালিকার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এবং বছর চারেক পর এঁদের দ্বিতীয় সাক্ষাতকারটি ছিল বেশ নাটকীয়। এক ফাল্গুনের দুপুরে লহিনীপাড়ার দক্ষিণে সাঁওতা গ্রামে ভয়ানক আগুন লাগে। আগুনের ভয়ে ভীতা কালী পালাতে গিয়ে দুটি ঘোড়ার সামনে পড়ে। মীর সে সময় সালঘর মধুয়ায় টমাস কেনীর বাসায় যাচ্ছিলেন। মশাররফকে সামনে পেয়ে ঐ কিশোরীটি তাঁকে জড়িয়ে ধরে। এই ঘটনা মশাররফের মনে গভীর দাগ কাটে। মশাররফ এই কিশোরীকে বিয়ে করেন। সময়টা ১২৮০ সালের মাঘ মাস (ইং ১৮৭৩)। মশাররফের পারিবারিক পীর বিনোদিয়ার শাহ ওরায়দুল হক 'কালী' নাম পরিবর্তন করে রাখেন কুলসুম। মশাররফের বয়স তখন ছাব্বিশ এবং কুলসুম বারো। এই বিবাহের

ফলে অসন্তুষ্ট প্রথমা স্ত্রী আজীজাননেসা এবং আত্মীয় স্বজন তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করে। সংসারে তীব্র অশান্তি দেখা দেয়। এমনকি এক সময় আজীজাননেসা বিবি কুলসুমকে ডাকাতের সাহায্যে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিলেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। অবশেষে মশাররফ ১৩০৪ সালের ৭ কার্ত্তিক (২৩ অক্টোবর, ১৮৯৭) শনিবার আজীজাননেসাকে তালাক দিয়ে দেন।[৫৭] এরপর আজীজান সম্পর্কে মীর একেবারে নীরব ছিলেন। তবে যতটুকু জানা যায়, আজীজান শেষ জীবনে সাঁওতা গ্রামে ছিলেন। কিন্তু কবর রয়েছে লাহিনীপাড়া গ্রামে।[৫৮]

কুলসুমের সঙ্গে পরিণয় মশাররফের দাম্পত্য ও সাহিত্য জীবনে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে। কুলসুমবিবি মশাররফকে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবনে নেমে এলো সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। কুলসুম তেমন রূপসী এবং উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না কিন্তু মশাররফ তাঁকে গভীর ভালবাসতেন। বলিষ্ঠ নারী ব্যক্তিত্বের অধিকারী কুলসুম শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে মশাররফকে স্বাধীন মতামত বা পরামর্শ দান করতেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, এর পরও কলকাতায় এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বারাঙ্গনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাঁর গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।[৫৯] বিবি কুলসুমের কাছে তা অজ্ঞাত ছিলনা।

১২৮৩ থেকে ১২৮৬ পর্যন্ত মশাররফ মোটামুটি লাহিনীপাড়াতেই কাটিয়েছেন। ১২৮৬ সালের চৈত্র মাসে পদমদীর নবাব মীর আবদুস সামাদ ওরফে মীর আলী আহম্মদ সাহেবের জমিদারী এস্টেটের তত্বাবধায়কের কাজে যোগ দেন। পরের বছর বৈশাখ মাসে নবাবের মৃত্যু হলে নবাব মীর মহাম্মদ আলীর অধীনে কিছুকাল কাজ করেন। তবে এখানে কতদিন এ কাজে যুক্ত ছিলেন তা জানা যায় না।[৬০]

মশাররফকে বেশ কিছুকাল আর্থিক অনটনের মধ্যে কাটাতে হয়। এ কারণেই তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯১ বঙ্গাব্দের আষাঢ়) লাহিনীপাড়া ত্যাগ করে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের বেগম করিমননেসা খানমের (১৮৫৫-১৯২৬) জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজার পদে যোগদান করেন। করিমননেসা ছিলেন রংপুর পায়রাবন্দের জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলীর কন্যা এবং সাহিত্যিক বেগম রোকেয়ার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। দেলদুয়ারে মশাররফের সঙ্গে কুলসুম বিবিও থাকতেন। এখান থেকেই মীরের সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি প্রকাশিত হয়। এখানেই তাঁর মহত্তম সৃষ্টি 'বিষাদসিন্ধু' (১২৯১-১২৯৭) রচিত ও প্রকাশিত হয়।

দেলদুয়ারে মশাররফের জীবন ছিল তিক্ত মধুর নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। প্রথমাবস্থায় বেগম করিমননেসা মশাররফ ও বিবি কুলসুমের যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। বিশেষ স্নেহ প্রীতির সম্পর্কও গড়ে ওঠে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মীর তাঁকে 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থটি উৎসর্গও করেন। করিমননেসা মশাররফকে সপরিবারে বাসের জন্য টাঙ্গাইল শহরের 'শান্তিকুঞ্জ' নামে একটি বাসারও ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে দেলদুয়ারের জমিদার-গোষ্ঠীর শরিকি অন্তর্কলহের মধ্যে মশাররফ জড়িয়ে পড়েন। এতে তাঁকে কারাভোগও করতে হয়। এর ফলে করিমননেসার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তিনি দেলদুয়ারের এষ্টেটের কাজ ছেড়ে দেন। এর পরেও অবশ্য কিছুকাল তিনি টাঙ্গাইলে ছিলেন। তখন তাঁর বাসস্থান ছিল থানাপাড়ার 'শান্তিকুটিরে'। এই সময় তাঁকে চরম অর্থ কষ্টে দিন অতিবাহিত করতে হয়।[৬১] অনুমান করা হয়, মশাররফ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে টাঙ্গাইল ছেড়ে লাহিনীপাড়ায় চলে আসেন।[৬২]

লাহিনীপাড়ায় ফিরেও কিন্তু সেখানে তিনি স্থির হয়ে থাকেননি। 'গাজীমিয়ার বস্তানী' থেকে জানা যায়, তিনি ১৮৯৬ সালে কিছুদিন বগুড়ায় কাটান। এরপর নানা সময়ে তিনি বগুড়া, পাবনা, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে কাটিয়েছেন।

'বিবি কুলসুম' গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি ১৯০৩ থেকে ১৯০৯ সাল (বাংলা ১৩১০ থেকে ১৩১৬) পর্যন্ত সপরিবারে কলকাতায় বসবাস করেন। প্রথমে তাঁর ছোট্ ভাই-এর বাড়িতে দু'বছর কাটিয়ে তিনি টালিগঞ্জের একটি বাড়িতে উঠে যান। সেখান থেকে গোরাচাঁদ রোডের ৩৬ নং বাড়িতে উঠে আসেন। কলকাতায় থাকার সময় তিনি একটি বই-এর দোকান করেছিলেন।তখন সেই আয়ই তাঁর জীবিকানির্বাহের উপায় ছিল। হয়তো সেই কারণেও তিনি প্রধানত ধর্ম নিয়ে এ সময় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কলকাতায় থাকতে থাকতে কোন একটা সময়ে তিনি পদমদীর নবাব এষ্টেটের ম্যানেজারের কাজে নিযুক্ত হন। অনুমান করা যায়, ১৯০৬ সালের আগেই তাঁর এ নিযুক্তি ঘটে।[৬৩] আব্দুল লতিফ চৌধুরী মনে করেন, ১৯০১ সালের মধ্যেই এ নিযুক্তি ঘটে ছিল।[৬৪] সম্ভবত কলকাতা থেকে যাতায়াত করেই তিনি তখন এষ্টেটের কাজ দেখাশোনা করতেন।[৬৫]১৩১৬ সালের ১লা ভাদ্র (ইং আগষ্ট, ১৯০৯খ্রী.) তিনি পাকাপাকিভাবে কলকাতা ছেড়ে পদমদী ফিরে আসেন। তাঁর শেষ জীবন এখানেই অতিবাহিত হয়।

'The statesman and Friend of India' (calcutta, 31May, 1885) পত্রিকার সূত্র অনুসারে জানা যায়, এক সময় মশাররফ হোসেন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটও নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৬৬] 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটী'র এক কার্যবিবরণী তে (৯ই জুন ১৯০০) তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে "Moulvi Meer Mosharraf Hossain, Late Honorary Magistrate, Kustia and Tangail.[৬৭]"

জঙ্গলাকীর্ণ পদমদীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিবি কুলসুম রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং স্বল্পকাল রোগভোগের পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর (১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে অগ্রহায়ণ) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। পদমদীতে কুলসুমের সমাধিগাত্রে মীর মশাররফের গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপক শোকগাথা প্রস্তর-ফলকে খোদিত আছে।

পঁয়ত্রিশ বছরের দাম্পত্য-জীবনে বিবি কুলসুমের গর্ভে পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যা মিলে মোট এগারোটি সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। বিবি কুলসুম ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই মশাররফের জীবন-সঙ্গিনী।

স্ত্রীর মৃত্যুতে মশাররফ গভীরভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। শেষ জীবনে তাঁকে নানা রোগ-শোক, অভাব-অনটনের মধ্যে কাটাতে হয়। অবশেষে বিবি কুলসুমের মৃত্যুর দুবছর পরেই ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৯শ ডিসেম্বর পদমদীতে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৬৮] পদমদীর নবাব বাড়ীর একপ্রান্তে স্ত্রী কুলসুমের সমাধির পাশে মশাররফকে সমাধিস্থ করা হয়।

মীর মশাররফ হোসেনের বংশ লতিকা

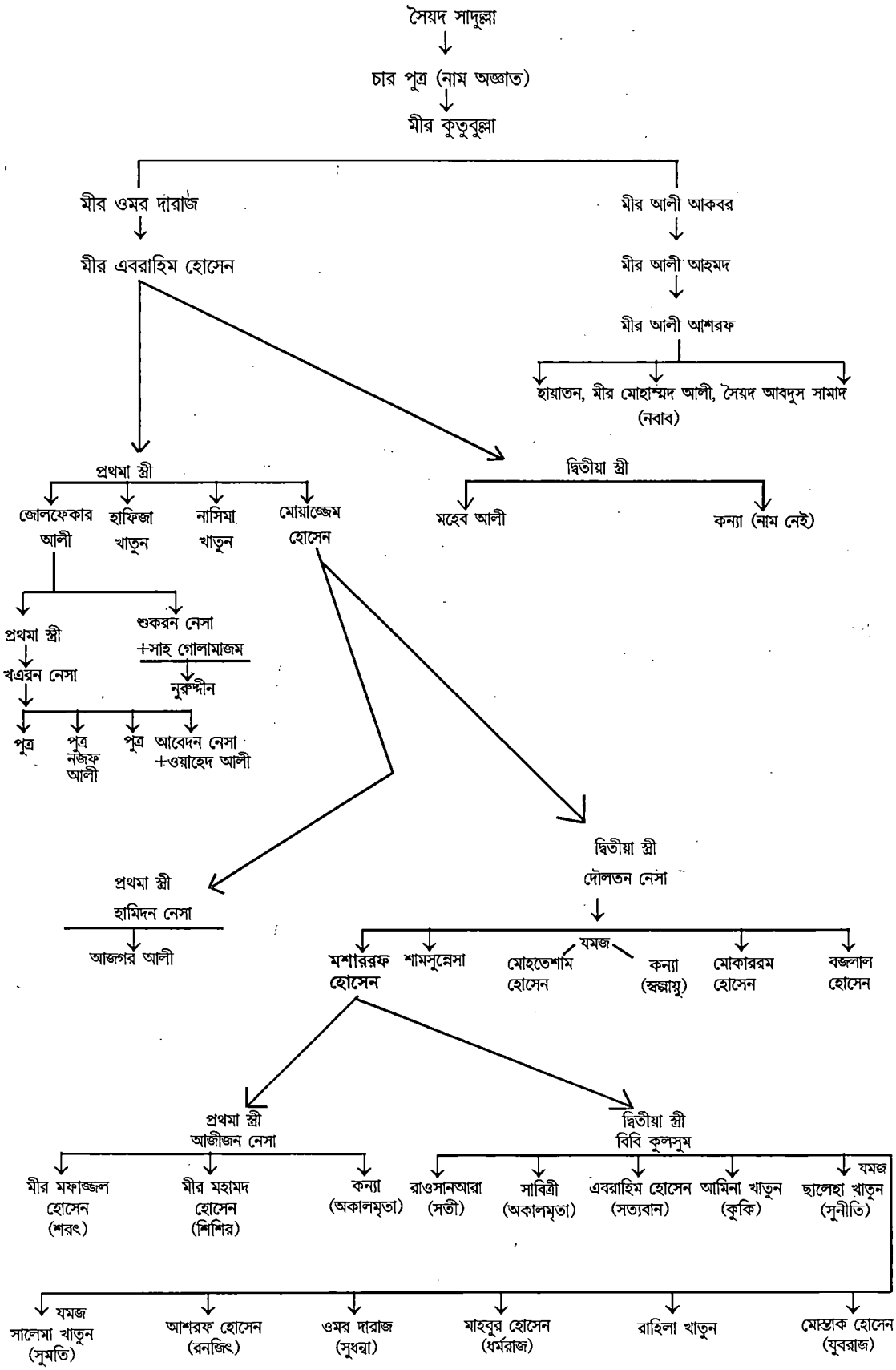

মীর মশাররফ হোসেন ও তাঁর মনঃপ্রকৃতি

উনিশ শতকের নবচেতনার কলরব কোলাহলের পর্বে মীর মশাররফের আর্বিভাব। তাঁর জন্মের আগে বাংলাদেশে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন হয়েছে। সংবাদ পত্রের প্রচার শুরু হয়েছে। মুসলমান ও হিন্দু সমাজে ধর্মীয় সংস্কার শুরু হয়ে গেছে। তাছাড়াও নবার্জিত ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কারের মার্জনায় এদেশীয় সমাজে রুদ্ধ জীবনস্রোত পুনঃপ্রবাহিত হচ্ছে। এই পর্বে ১৮৪৭খ্রীষ্টাব্দে নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার নাগরিক পরিবেশ থেকে দূরে গ্রামীণ সমাজে তাঁর জন্ম। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও তেমন অগ্রসর হয়নি। অন্যপক্ষে জীবনে নানা পদস্থলন তাঁর ঘটেছে। "তাঁর অন্তর্গত বোধ-বিশ্বাস-উপলব্ধি তাঁর জীবনাচরণের ভেতর দিয়ে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত। সামাজিক ভূমিকা, সাংস্কৃতিক চেতনা, পারিবারিক আচরণ ও ব্যক্তিক অনুভূতি – সব মিলিয়ে তাঁর যে ব্যক্তিত্ব তা একদিকে যেমন তাঁর কালকে প্রতিফলিত করে অপরদিকে তাঁর স্বভাবেরও প্রতিনিধিত্ব করে।"[৬৯]

মশাররফ চরিত্রের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে 'অকপট সত্য ভাষণ'।[৭০] তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বাসকে তিনি একদিকে যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তেমনি জীবনের অনেক গুপ্তকথা অকপটে ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেন নি। এ গুণ অনেক বড় সাহিত্যিকদের মধ্যেও বিরল। তাই আমরা মশাররফকে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে প্রত্যক্ষ করতে পারি। এ জন্যে মশাররফের সাহিত্যিক জীবনের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তি জীবনের প্রতিও আমাদের সমান কৌতূহল।

মশাররফ আপন বংশ-গৌরব ও আভিজাত্য বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি যে আশরাফ শ্রেণীর মুসলমান তা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন নি।[৭১] কিন্তু উচ্চ বংশের সন্তান হয়েও তিনি যে নৈতিক দিক থেকে স্খলিত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তা অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর এ পদস্খলন যুগ-পরিবেশ অর্থাৎ তৎকালীন জমিদারদের উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া জীবন যাপন ও পারিবারিক উত্তরাধিকারের ফল। পিতা মোয়াজ্জেম হোসেন ও জ্ঞাতিভ্রাতা নবাব মীর মোহাম্মদ আলীর নারী ও মদ্যাসক্তি ও সর্বোপরি আপন চরিত্রদোষ ও নৈতিক স্খলন সম্পর্কে অকপট স্বীকারোক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বকে একটি ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।

দুই স্ত্রীর প্রতি দুরকম ব্যবহারে তাঁর চরিত্রের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অসন্তোষের ফলে তিনি তাঁর দোষত্রুটি প্রকাশ্যে বাড়িয়ে বলতেন।[৭২] অথচ কুলসুমের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আমৃত্যু বর্তমান ছিল। এমনকি সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ে বিবি কুলসুমের মতামত ও পরামর্শও ছিল মশাররফের পাথেয়।

মশাররফের মধ্যে যুগোপযোগী আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাও বর্তমান ছিল। যদিও তিনি কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। এক্ষেত্রে তাঁর সামর্থ বা আগ্রহ–দুইয়েরই অভাব ছিল। কেননা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যে রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যায় তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত বা উচ্চবিত্তের লোকেরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় স্বল্প শিক্ষিত এবং নিত্য অন্ন-চিন্তায় ব্যস্ত মশাররফের তাতে যথেষ্ট অনীহাও ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর প্রিয় পত্নী বিবি কুলসুমের স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিরূপ মনোভাবও তাঁর মানসগঠনে কার্যকরী ছিল। তিনি লিখেছেন –

> স্বদেশী আন্দোলনে বিবি কুলসুম অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। আন্দোলনকারীদিগের দুই তিনজন ব্যতীত সকলের ঘরের খবর সন্ধান করিয়া বলিতেন যে– ইহাদের এরূপ ঝকমারী কেন? . . . . সেই হইতে আমি কোন সভা সমিতিতে যাই নাই। কারণ কুলসুম বিবির কথাটা আমার মনে লাগিয়াছিল। যাহাদের ঘরে তণ্ডুল নাই তাহাদের আবার সভা সমিতি কি? . . . . যাহার তণ্ডুলের ভাবনা নাই তিনিই ঐ সকল দেশ হিতকর সভায় যাইতে পারেন। দুবেলা উপোসের হাঁড়ী মাথায় বহিয়া পেট পোড়াইয়া দেশের উন্নতি, দেশের হিতসাধন, সভায় যাইয়া কৃত্রিমভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভাসমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত নই।[৩৩]

এ কারণে তৎকালীন মুসলমানদের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটী'র সঙ্গে মশাররফ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে পারেন নি। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন নবাব, জমিদার এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ।

মশাররফের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ এবং দেশের জন্য স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বহু রচনায় এর সাক্ষ্য রয়েছে। পক্ষান্তরে ইংরেজ সরকারের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আস্থা অর্থাৎ ইংরেজ-প্রীতি তাঁর বরাবর ছিল। এক্ষেত্রে তার পিতার ইংরেজ-প্রীতি হয়তো তাঁর এ মনোভাবের পেছনে আনেকটা কার্যকরী ছিল। তবে তাঁর এই ইংরেজ-ভক্তি একেবারে একপেশে ছিল না। এ ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্র বা সমকালীন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সমগোত্রীয়। সেকালে 'ভাল ইংরেজ' ও 'খারাপ ইংরেজ' – এই মানদণ্ডে বিভাজন করে বিচার করবার যে প্রবণতা দেখা যায় শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মশাররফের মধ্যেও অনেকটা সেরকমই প্রবণতা কার্যকরী ছিল বলে মনে হয়। এতে একই সঙ্গে রাজভক্তি ও দেশপ্রেম উভয় দিকই সমানভাবে বজায় থাকে। তিনি অনেক সময় ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করেও নীলকর ইংরেজদের সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

জমিদারদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল অনেকটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব জড়িত। নিজে জমিদার বংশের সন্তান হয়েও জমিদার সম্পর্কে তাঁর ধারণা মোটেই ভাল ছিল না। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে যায়, যিনি জমিদার সন্তান হয়েও জমিদারী প্রথা ও জমিদারদের প্রভাব প্রতিপত্তির পরিবর্তনশীলতা, ক্ষয়িষ্ণুতাকে আসাধারণ মমতার সঙ্গে তাঁর রচনায় উপস্থাপিত করেছেন। পক্ষান্তরে মশাররফ সেই বংশের মধ্যে থেকে এর কদাকার ও অত্যাচারী রূপটি অকপটে তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন। 'জমীদার দর্পণ' এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় যদি তাঁর আত্মকাহিনীর অনেকটাই খুঁজে পাই তাহলে সেখানে দেখব তিনি জমিদার জোতদারদের প্রজা-পীড়নকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারেন নি। প্রজাদের দুঃখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। জমিদারদের প্রজাদের উপর নানা নির্যাতন তাঁকে কিভাবে বিচলিত করে তুলে ছিল তার একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ রয়েছে 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রতিবাসী শ্রী মশা' ছদ্মনামে লিখিত 'কি ভয়ানক অত্যাচার' শীর্ষক একটি পত্রে।[৩৪]অথচ মজার ব্যাপার এই যে, এই মশাররফই তাঁর 'জমীদার দর্পণ' নাটকখানি উৎসর্গ করলেন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা জমিদার (পরে নবাব) মীর মহাম্মদ আলীকে, 'বসন্ত কুমারী নাটক' নওয়াব আব্দুল লতিফকে এবং সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বিষাদসিন্ধু' তাঁর মনিব জমিদার বেগম করিমন্নেসাকে। জমিদারদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ বা বিরূপ

মনোভাব বজায় রেখেও আর্থিক কারণে সেই জমিদারদেরই আবার আনুকূল্য বা অনুগ্রহ আকাঙ্খা করতেন। এখানেই মশাররফ-জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব বা ট্রাজেডি।

সামাজিক জীবনে মশাররফ কখনো কখনো প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, কখনো বা গতানুগতিক জীবন-ধারাকে মেনে নিয়েছেন। মুসলমান সমাজের পেশাদারী মোল্লা শ্রেণীকে তিনি পছন্দ করেন নি। 'জমীদার দর্পণ' নাটকের যে মোল্লা মানিক পীরের দরগায় শিরনী দিচ্ছে তাকে তিনি নিন্দা করেছেন। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে মশাররফ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার বিনোদীয়ার পীর হজরত শাহ ওবেদুল হক সাহেবের শিষ্য ছিলেন। "বিনদীয়ার পীরঘর আমাদের বংশানুসারে পীর, আমরা তাঁহাদের শিষ্য।"[৭৫] এবং ধর্মের নামে ঐ পীরের কিছু অশোভনীয় নিয়মকেও তিনি মেনে নিয়েছেন।[৭৬]

সে সময়ে সমাজে নারীর স্থান ছিল পুরুষের নীচে। চারিত্রিক বিচারে স্বামী যত হীন প্রবৃত্তিরই হোক না কেন, স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য স্বামী সেবা করা। মশাররফ তাঁর 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় এর বিবরণ বার বার দিয়েছেন।[৭৭] মশাররফের দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবি কুলসুমও স্বামীর চরিত্র-দোষের কথা অবগত হয়েও কোনরূপ তীব্র প্রতিবাদ করেন নি। মশাররফের জননীও তাঁর পিতার চরিত্র দোষের তিক্ত অভিজ্ঞতা নীরবে সহ্য করেছিলেন। তৎকালে প্রচলিত নারীদের পর্দাপ্রথা ও অবরোধ প্রথার প্রতি মশাররফের সমর্থন ছিল। বরং তিনি পর্দা-হীনতার কারণে 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'র বেগম ঠাকুরানীকে বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত করেছেন।[৭৮] বহুবিবাহ হিন্দুমুসলমান উভয় সমাজে প্রচলিত ছিল। ইসলাম ধর্মে পরিস্থিতি বিশেষে চারটি পর্যন্ত বিবাহ করার পুরুষদের অনুমতি বা বিধান[৭৯] থাকায় তৎকালীন মুসলমান জমিদার জোতদার তথা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একাধিক বিবাহ করা একরকম রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। মশাররফের পিতা ও পিতামহের একাধিক স্ত্রীর কথা তিনি জানিয়েছেন। তাছাড়া মশাররফের নিজেরও দুই স্ত্রী ছিল। তবে একাধিক স্ত্রীর উপস্থিতিতে যে দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না তার প্রমাণ তিনি নিজেই। এরই সঙ্গে এসে যায় সপত্নীবাদের তিক্ত অভিজ্ঞতাও। আজীজাননেসা তাই তাঁর সপত্নী বিবি কুলসুমকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছেন। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার জীবন্ত সাহিত্যিক রূপায়ণ মশাররফের 'বিষাদ সিন্ধু'তে রয়েছে। ইসলাম ধর্মে কন্যার সম্মতি ('এজেন') ছাড়া বিবাহ সিদ্ধ হয় না। অথচ তৎকালীন সমাজে এ সম্মতির তোয়াক্কা না করে উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্কের কোন গুরুত্ব না দিয়ে অভিভাবকেরা কেবল পাত্রের অর্থ ও বংশ মর্যাদাকে প্রাধান্য দিয়ে একরকম জোর করে বিয়ে দিতেন। মুসলিম সমাজের এই অনাচার মশাররফকে বিচলিত করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মশাররফের জন্য নির্দিষ্ট পাত্রী লতিফুনের সম্মতি ছাড়াই অন্যত্র বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনায় তিনি গভীরভাবে ব্যথিত হয়ে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

> আমাদের সমাজের গতি চমৎকার। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। যে সম্বন্ধ উপস্থিত, ইহাতে স্ত্রীলোকের প্রতি বহু পরিমান নির্ভর করা কর্তব্য। তাহা সমাজে কৈ? তাহাদিগকে জিজ্ঞেস করে কৈ? পিতা মাতা ভ্রাতাই সম্বন্ধ গড়াইয়া থাকেন। তাঁহারাই সম্বন্ধ ভাঙ্গাইয়া দেন, যার বিবাহ তার অভিমতের দিকে কেহই লক্ষ্য করেন না। এই যে এক ভয়ানক প্রথা—ইহারই জন্য আমার প্রাণ সর্বদা কাঁদে।[৮০]

মশাররফ নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি স্বাধীনতার সপক্ষে মত পোষণ করলেও নারীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল অনেকটাই রক্ষণশীল। প্রথাবদ্ধ, পর্দানসীন শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁর আগ্রহ ছিল। তবে আধুনিক প্রগতিশীল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অনুদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

এছাড়া মশাররফ জীবনের প্রাথমিক পর্বে ধমনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থায় আগ্রহী থাকলেও শেষ জীবনে মুসলমানদের জন্য ধর্মমূলক প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সপক্ষে মত পোষণ করেছিলেন।[৮১]

এতৎসত্ত্বেও তিনি বহুক্ষেত্রে উদার প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় রেখেছিলেন। রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে সঙ্গীত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বিষয়। অথচ মশাররফের পিতা ছিলেন সঙ্গীত-প্রিয়। তাঁর জীবন-কাহিনীতে দেখেছি, তাঁর আত্মীয় জমিদারদের পারিবারিক পরিবেশে সঙ্গীতের চর্চা ছিল। মীর মশাররফও যথেষ্ট সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। গান-বাজনা আমোদ-আহ্লাদে তিনি জীবনের আনন্দ অনেক সময় খুঁজে পেতেন। শুধু তাই নয়, তিনি কাঙাল হরিনাথের 'ফিকির চাঁদের' দলের জন্যে গান রচনা করেছেন–'সঙ্গীত লহরী' নামক গ্রন্থ যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমনকি সঙ্গীত-শিল্প বিরোধী মনোভাবের জন্যে গোঁড়া বাঙালী মুসলমানদের তিনি তীব্র কটাক্ষও করেছেন তাঁর 'আত্মজীবনী'তে।[৮২]

মীর মশাররফের মনঃপ্রকৃতির যেটা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দিক সেটি হল তাঁর উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। ধর্মনিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিভঙ্গি সেযুগের (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে) সাহিত্যিকদের মধ্যে দুর্লভ ছিল। ধর্মনিষ্ঠ ও স্বজাতিবৎসল হয়েও তিনি অন্য ধর্মের (এখানে হিন্দুধর্মের) প্রতি কোন রকম অনুদারতা দেখান নি। শিক্ষাজীবনে তিনি যেমন মুসলমান সমাজের প্রথানুযায়ী আরবী-ফারসী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তেমনি হিন্দু গুরুমশাইয়ের কাছে বাংলা শিখেছেন। এমনকি প্রাথমিক শিক্ষাকালে 'সরস্বতী বন্দনা'ও রপ্ত করেছেন।[৮৩] লেখার সময় তিনি নির্দ্বিধায় প্রায়ই তাঁর নামের পূর্বে 'শ্রী' ব্যবহার করতেন।

যে যুগে বাঙালীত্ব ও মুসলমানিত্ব নিয়ে ভেদরেখার একটা দ্বন্দ্ব মুসলিম সমাজে চলছিল সে সময় মশাররফ এ দুয়ের মধ্যেকার কোনরূপ বৈপরীত্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। মুসলমানদের জন্যে আবদুল লতিফ কথিত 'মুসলমানি বাংলা'কে তিনি আমল দেন নি। তিনি অসঙ্কোচে বলেছেন "বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশ ভাষা বা মাতৃভাষা 'বাংলা'। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে।"[৮৪] সেকালে এরূপ উক্তি নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক ও মুক্তমনের পরিচয়বাহী। মশাররফ তাঁর পুত্র-কন্যাদের ইসলামী নামকরণের পাশাপাশি বাঙালী নামকরণে (ক্ষেত্রবিশেষ 'হিন্দুয়ানি') সমকালীন মুসলমান সমাজের সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে উদার দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছিলেন।[৮৫]শুধু তাই নয়, হিন্দু মুসলমানের মিলনাকাঙ্খায় তিনি সেযুগে গো হত্যার মত স্পর্শকাতর বিষয়ে এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'গো জীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থ এর প্রমাণ। এর জন্যে তাঁকে স্বসমাজের নানা প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইও করতে হয়েছিল এবং চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

মশাররফের প্রথম বিবাহের স্বল্পকাল পূর্বে মক্তারপুরে থাকার সময়ে বিবাহের মন্ত্রপাঠকারী জনৈক রক্ষণশীল মুনশী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন– 'আপনার ধর্ম কি ?' প্রত্যুত্তরে মশাররফ বলেছিলেন–'মানব-ধর্ম'।[৮৬] মশাররফ তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনে আমৃত্যু এই মানবতারই সাধনা করে গেছেন।

সুতরাঁং দেখা যায়, নানা বিষয়ে মশাররফের দ্বিধান্বিত চিন্তা চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। একই সঙ্গে তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী আবার পর্দাপ্রথার সমর্থক। নারী-স্বাধীনতার অভাবে তিনি দুঃখিত, অথচ একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর কোন দৃঢ় বক্তব্য নেই। তিনি দেশের স্বাধীনতা চান, অথচ ইংরেজ শাসনের প্রতিও তাঁর অনাগ্রহ নেই। এসব দেখে মনে হয়, মশাররফ বিশেষভাবে এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করেন নি। বরং প্রচলিত মতানুসরণ করে গেছেন। ফলে তাঁর চিন্তা সেকালের বহু বাঙালী মানুষের চিন্তার মতই দ্বিধান্বিত এবং এই দ্বিধান্বিত বাঙালী জীবনসত্তা সেকালের অনেক লেখকের মতো তাঁর সাহিত্য-জীবনেও প্রভাব ফেলেছে। তবু আধুনিক মানবতাবোধ যুক্তিবাদ, প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা, নারী স্বাধীনতার চিন্তা– প্রভৃতি নব্যভাবনা তাঁর মনকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মাঝে মাঝে আলোড়িত করেছে। আর এই ভাবনা-চিন্তার জন্যই তাঁকে উনিশ শতকের নবচেতনালব্ধ বাঙালী মনীষীদের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। এই মনোভঙ্গিরই ছাপ রয়ে গেছে তাঁর সাহিত্য-সাধনায়।

সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা

মীর মশাররফ হোসেনের গৃহে সাহিত্যের কোন পরিবেশ ছিল না। অন্যান্য জমিদার জোতদারের মতো তাঁর পিতাও গান বাজনা–এমন কি বাইজীর নাচগান নিয়েই মশগুল থাকতেন। কাজেই তাঁর পিতৃগৃহে অথবা পদমদী, বামনা, ঢাকা–প্রভৃতি যে স্থানগুলিতে ছেলেবেলায় কাটিয়েছেন সেখানে কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বা সাহিত্য চর্চার বালাই ছিল না। ঐ অঞ্চলে যা তিনি দেখেছেন তাহল–মিশ্রভাষারীতির পুঁথিপাঠ এবং পল্লীগীতি বা বাউল গানের চর্চা।

ছেলেবেলায় 'পুণ্যজন্য আরবী শিক্ষা', মুনসীজীর ফারসী কাব্যপাঠ বা পাঠশালার বাংলা পদ্যশিক্ষা —এর কোনটার প্রতিই মশাররফ আকৃষ্ট হন নি। কিন্তু এরই পাশাপাশি পিতার দপ্তরে নানা প্রয়োজনে পত্রলিখনের মুসাবিদা মধ্যেই তাঁর গদ্যরচনার নৈপুণ্যের সূচনা। তাঁর পিতা পড়তে পারলেও বাংলা লিখতে জানতেন না। মশাররফ জানাচ্ছেন –

> এখন আমার বয়স দশ বৎসর। পিতৃদেবের নিকট বসিয়া পত্র লিখার দরুণ অতি দীর্ঘ সময় দোয়াত কলম কাগজের সহিত কারবার করিতে হইত।.... এ বৈঠকে ৬/৭ ঘণ্টা ক্রমাগত লিখার অভ্যাস পূজনীয় পিতৃদেবের চরণ প্রসাদাত।[৮]

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তাঁর মা মারা গেলে এবং নানা কারণে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা সাময়িক বন্ধ থাকলে এই অবসর সময়ে মশাররফ বাংলা পুঁথিপাঠ করে, বাংলায় হেঁয়ালী কবিতা রচনা করে এবং ফারসী মুনশীজীর সঙ্গে বিভিন্ন আত্মীয়ের বাড়ী বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে কবিতার লড়াইয়ে ('বয়েত-বাহস') অংশগ্রহণ করে সময় কাটাতেন। হেঁয়ালীপূর্ণ কবিতা লেখার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বুদ্ধির চর্চা হত, অন্যদিক তেমনি স্বল্পশব্দে ছন্দময় কবিতা লেখার অভ্যেসও গড়ে উঠত। এই ধরনের প্রথম একটি হেঁয়ালীর উল্লেখ করেছেন মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে—

কামারের মার ফেলে
পাঁঠার ফেলে পা
লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে
বেছে বেছে খা। (রচনা সম্ভার – ৫ম, পৃঃ১৪৭)

এ রকম বহু হেঁয়ালী তিনি রচনা করেন।

মশাররফের কণ্ঠ ভালো ছিল বলে তাঁর মাতামহীর নির্দেশে এবং পাড়ার মহিলা, ছেলেমেয়েদের অনুরোধে তিনি কেয়ামতনামা, হাজার মসলার পুঁথি, জৈগুনের পুঁথি, সোনাভান, সামর্থভান, আমির হামজা, হাতেম তাই প্রভৃতি পুঁথি পাঠ করে সবাইকে শোনাতেন। আসর শ্রোতায় ভর্তি হয়ে যেত।[৮৮] এই পুঁথি-পাঠের মধ্যেই মশাররফ গল্প-রসের সন্ধান পান। তবে তখনকার এই সাহিত্যবোধ ছিল একান্তভাবেই 'গ্রাম্যপুঁথির রুচি-শাসিত।'[৮৯]

এ সময়ে মশাররফ তাঁর ফারসী শিক্ষকের সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় 'বয়েত বাহাস' বা কবিতা রচনার লড়াইয়ে অংশ নিতেন। একদল যে অক্ষর দিয়ে সমাপ্ত করত অন্যদলকে সেই অক্ষর দিয়ে পদরচনা আরম্ভ করতে হত। এ প্রতিযোগিতায় যে দল ঐরূপ পদ রচনায় ব্যর্থ হত সেই দল হেরে যেত। মশাররফ নিজেও ঐ ধরনের পদরচনায় হাত পাকান। অবশ্য অর্থ-ভাবহীন এই ধরনের পদরচনা মশাররফের পচ্ছন্দ ছিল না। স্বরচিত এ রকম দৃষ্টান্ত তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে।[৯০]

প্রথম জীবনে যাঁদের সংশ্রব ও প্রেরণা মশাররফকে সাহিত্য-চর্চায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ঢাকার জনৈক হিন্দু স্কুল-শিক্ষক। ঢাকায় পিতার সঙ্গে তাঁদের জ্ঞাতি ওয়াজেদ আলীর বাড়িতে থাকার সময় মশাররফের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে উক্ত শিক্ষক তাঁকে সংস্কৃত 'কাদম্বরী' গ্রন্থের তারাশঙ্কর তর্করত্ন কৃত অনুবাদ গ্রন্থটি উপহার দেন এবং অর্থ অনুধাবনের জন্যে 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' নামে একটি বাংলা অভিধান ক্রয় করে দেন। স্কুলপাঠ্য বইয়ের বাইরে সাহিত্য-গ্রন্থের সঙ্গে মশাররফের এই প্রথম পরিচয়। মশাররফের প্রথম দিককার রচনায় এই দুখানি গ্রন্থের প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়।[৯১] বাংলায় চিঠিপত্র লেখা আগে থেকে শুরু করলেও 'কাদম্বরী' পাঠের পর থেকেই মশাররফ গ্রাম্য পুঁথির রুচি-মুক্ত স্বাধীন গদ্য-রচনা শুরু করেন।

মশাররফ সাহিত্য-চর্চা ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার'[৯২] সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩–১৮৯৬)-এর কাছ থেকে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মক্তারপুরে অবস্থানকালে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সঙ্গে পত্র মারফৎ তাঁর যোগাযোগ হয়। এ সময় ভুবনচন্দ্রবাবু তাঁকে কিভাবে উৎসাহিত করেছেন তা তিনি জানান—

> কলিকাতার সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত। সহকারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহিত পত্রে পত্রে দেখাশুনা যেরূপ হইতে পারে তাহা আছে। আমি অনেক সংবাদ তাঁহাদের কাগজে লিখিতাম। তাঁহারাও দয়া করে ছাপাইতেন।

> আমাকে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন 'আমাদের কুষ্টিয়ার সংবাদ দাতা'। কেউ জানিত না যে, আমি প্রভাকর পত্রিকায় কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা। সাদাসিদেভাবে সংবাদ লিখিতাম। ভুবনবাবু কাঁটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া দিতেন।[৯৩]

মীরের সাহিত্যগুরু হিসেবে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' (১৮৬৩) পত্রিকার সম্পাদক, সাহিত্যিক হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল হরিনাথের অবদান অনেক। সে সময় মীর সংবাদিকতার পাশাপাশি হরিনাথ মজুমদারের অনুরোধে রিপোর্ট জাতীয় রচনাও লেখেন। মশাররফ লিখেছেন –

> কুমারখালী, আমার বাটী হইতে নিকটে। গ্রামবার্ত্তা সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতাম, সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামবার্ত্তায় সংবাদ লিখিতাম, প্রভাকরেও লিখিতাম। মক্তারপুরে বসিয়া বসিয়া থাকি, কোন কাজকর্ম নাই। সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নিয়মিত রূপে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। হরিনাথবাবু কবতক্ষ নদীর অবস্থা লিখিতে পত্র লিখিলেন। এক একদিন বহুদূর নৌকা করিয়া দেখিয়া আসিয়া লিখিতাম। তিনি কাটিয়া ছাঁটিয়া নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন।[৯৪]

মশাররফের সাহিত্য-সাধনার এই উন্মেষ-কালে সংবাদ নিবন্ধ বা রিপোর্ট জাতীয় রচনার পাশাপাশি কিছু প্রবন্ধ ও কবিতা উক্ত পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত হয়। সেকালের মুসলমান সমাজের বিবাহের কতিপয় দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করে 'সংবাদ প্রভাকরে' (মে, ১৮৬৫ খ্রী.) লেখেন–'মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি'। এর স্বল্পকাল পরে (১২৭২সাল) 'গোলাপ' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রভাকরে'। কবিতাটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল বলে পত্রিকাটির উক্ত সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশ করতে হয়।[৯৫] এই সময় একটি কবিতা প্রকাশকে কেন্দ্র করে মশাররফ অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়েন।[৯৬] কাঙাল হরিনাথের অনুরোধে মশাররফ 'ফিকির চাঁদের দল' নামে বাউল গানের দলের জন্যে সুরে কথা বসিয়ে বেশ কিছু গানও রচনা করেন।[৯৭]এই গান রচনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়েছেন কাঙাল হরিনাথ।

ভূবন মুখোপাধ্যায় ও কাঙাল হরিনাথ–উভয়েই ছিলেন মশাররফের রচনার প্রথম সমালোচকও। তাঁরা কেবল তাঁর রচনার সংশোধনই করেননি প্রকাশভঙ্গির উন্নতিসাধনেও তৎপর ছিলেন। পত্রিকায় প্রেরিত সংবাদাদি ঘটনার নিছক বর্ণনামাত্র হলেও এরই মধ্যে মশাররফের সমকালীন ঘটনা ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করবার ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

মশাররফের এই প্রস্তুতি-পর্বের বিভিন্ন রচনা যে বেশ হৃদয়গ্রাহী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল তার সাক্ষ্য দিয়েছেন কাঙাল-শিষ্য জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯) তাঁর 'কাঙাল হরিনাথ' গ্রন্থে ঃ–

> মীর মশাররফ কাঙ্গালের প্রকাশিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার লেখক ছিলেন। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন প্রতি সপ্তাহে মীর সাহেবের লেখা পড়িবার জন্য যে কত আগ্রহ হইত তাহা বলিতে পারি না। তিনি প্রবন্ধের নিম্নে নিজের নাম দিতেন না, লিখিতেন 'গৌরীতটবাসী মশা'। এই 'মশা'র লিখিত গদ্য-পদ্য সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।[৯৮]

এইভাবে বিভিন্ন সাহিত্য-প্রেমী মানুষের প্রভাবে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষ ঘটে। তিনি ক্রমে এই নামহীন সাহিত্য-জীবন চারণার পালা সাঙ্গ করে পুঁথিসাহিত্য ও বাউল গানের প্রভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে আত্মসাৎ করে আধুনিক সাহিত্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর প্রথম বিশিষ্ট রচনা 'রত্নবতী' ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল।

বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে মুসলমান সমাজের নানা প্রতিকূলতাকে[৯৯] তিনি শিরোধার্য করে নিয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, "এ দেশের মুসলমান সমাজে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্য শিল্পী।" [১০০]মোটামুটি ১৮৬৫ খ্রী. থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর তাঁর শিল্পসৃষ্টির কাল। এই কালপর্বে তিনি নানা বিষয়ে এবং নানা আঙ্গিকে সাহিত্যের প্রায় সর্ব শাখায় বিচরণ করেছেন। এ কারণে শুধু মুসলমান সমাজেই নয়, তাঁকে উনিশ শতকের সমগ্র বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট এবং বিচিত্র প্রতিভাধর লেখক বলে অভিহিত করা যায়।

মশাররফের সৃষ্টি সম্ভার

মীর মশাররফ মোট কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং কতকগুলি প্রকাশিত হয়েছিল–তার ঠিক হিসেব আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়[১০১] এবং আনিসুজ্জামান [১০২] মশাররফের ২৫টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। আবদুল লতিফ চৌধুরী [১০৩] তাঁর গ্রন্থ-সংখ্যা ৩৫টি বলে জানিয়েছেন। আবার আশাররফ সিদ্দিকী[১০৪] ৩৭ খানা গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন। কাজী আবদুল মান্নান "ব্যাপক ও সুদীর্ঘ সন্ধানের পর" মশাররফের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত চব্বিশটি এবং পত্রিকায় প্রকাশিত অগ্রন্থিত রচনাসহ এর সংখ্যা মোট ২৯টি বলে উল্লেখ করেছেন।[১০৫]

ব্রজেন্দ্রনাথের তালিকার অতিরিক্ত গ্রন্থগুলির নাম অন্যান্য গবেষকগণ মশাররফের কোন না কোন গ্রন্থে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকেই প্রধানতঃ গ্রহণ করেছেন। আর এই বিজ্ঞাপিত গ্রন্থের সবগুলিই যে প্রকাশিত হয়েছিল এমন প্রমাণও নেই। মশাররফ প্রায়ই যন্ত্রস্থ বা প্রকাশিতব্য বা তাঁর মনস্থ বইয়ের নাম বিজ্ঞাপনে দিতেন। এ কারণে বিবি কুলসুম মীরকে যে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিতেন তারও উল্লেখ মশাররফ করেছেন ঃ—

> ঐ বিষয়টা লিখিতে চাহিয়াছিলে, কৈ লিখিলে না। এ প্রবন্ধটার এক পাত লিখিয়া ফেলিয়া রাখিলে কেন? . . . . নাম রাখিলে বিজ্ঞাপন দিলে, পুস্তকের খোঁজ নাই। পদ্যটার আধাআধি লিখিয়া আর লিখিলে না?[১০৬]

অনেক সময় বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয়নি। প্রামান্য তথ্যানুসারে মশাররফের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হল। সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপিত, অপ্রকাশিত এবং সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অগ্রন্থিত রচনার একটি তালিকাও সংযোজিত হল।[১০৭]

প্রকাশিত গ্রন্থ

১. রত্নবতী (রূপকথাজাতীয় উপাখ্যান)

প্রকাশকাল ঃ ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৯ (৩০ শ্রাবণ ১২৭৬ বঙ্গাব্দ) কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬১।

২. গোরাই-ব্রিজ বা গৌরীসেতু (কবিতা-পুস্তক)

প্রকাশকাল ঃ ২০ জানুয়ারী ১৮৭৩ (১৫ পৌষ ১২৭৯), কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮।

৩. বসন্তকুমারী নাটক (নাটক)

প্রকাশকাল ঃ ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ (১৫ মাঘ ১২৭৯), কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২৭। উৎসর্গ "পরম শ্রদ্ধাষ্পদ/ শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর/ শ্রদ্ধাষ্পদেষু"।

৪. জমীদার দর্পণ (নাটক)

প্রকাশকাল ঃ ১লা মে ১৮৭৩ (চৈত্র ১২৭৯) কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭২/৮৪।[১০৮] উৎসর্গ "পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব পূজ্যপাদেষু"।

৫. এর উপায় কি? (প্রহসন)

প্রথম প্রকাশ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ (সম্ভবতঃ ময়মনসিংহ)। দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ৩০ জানুয়ারী ১৮৯২ (১লা কার্ত্তিক ১২৯৯), টাঙ্গাইল। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯০।

৬. বিষাদসিন্ধু (উপন্যাস)

১ম খণ্ড ঃ মহরম পর্ব। পৃষ্ঠা ১১২/২০৪[১০৯]। প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা মে ১৮৮৫ (জ্যৈষ্ঠ ১২৯১), কলিকাতা। উৎসর্গ "পূজনীয়া/ শ্রীমতী করিমননেসা খাতুন/ সমীপে"।

২য় খণ্ড ঃ উদ্ধার পর্ব। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯১। প্রথম প্রকাশ ঃ ১৪ই আগষ্ট ১৮৮৭ (১লা শ্রাবণ ১২৯৪), ময়মনসিংহ।

মন্তব্য ঃ— কপি-রাইটের রেজিষ্টারে প্রথম সংস্করণেব তারিখ ১৬ই জুলাই ১৮৮৭ খ্রী. বলে উল্লেখ আছে। দেখুন, বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩য় কোয়ার্টার, ১৮৮৭ শ্রদ্ধিপত্র।

৩য় খণ্ড ঃ এজিদ বধ পর্ব। পৃষ্ঠা-৪৩। প্রথম প্রকাশ ঃ ১০ মার্চ ১৮৯১ (১২৯৭ সাল)।

বিষাদসিন্ধু। হিন্দী অনুবাদক ঃ কবীন্দ্র বেণীপ্রসাদ বাজপেয়ী 'মঞ্জুল' ('কান্যকুব্জ' পত্রিকার সম্পাদক)। প্রকাশক ঃ নিরঞ্জনলাল ভাগাঁও, এলাহাবাদ। প্রকাশকাল ঃ ১৯৩০। গ্রন্থস্বত্ব ঃ মীর মশাররফ হোসেন।

৭. সঙ্গীত লহরী (সঙ্গীত সংকলন), ১ম খণ্ড।

প্রথম প্রকাশ ঃ ৪ আগষ্ট ১৮৮৭ (১২৯৪ সাল), লাহিনীপাড়া, কুষ্টিয়া। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৮+২, গীত সংখ্যা-৯১।

৮. গোজীবন (প্রবন্ধ)

প্রকাশকাল ঃ ৮ মার্চ ১৮৮৯ খ্রী. (২৫ ফাল্গুন ১২৯৫ সাল) টাঙ্গাইল। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৬। উৎসর্গ "পঞ্চবিংশতি

কোটী/ ভারত সন্তান করে/ গো-জীবন/ সমর্পন করিলাম।"

৯. বেহুলা গীতাভিনয় (গদ্য পদ্যে রচিত নাটক)

প্রকাশকাল ঃ ২৩ জুন ১৮৮৯ (৭ আশ্বিন ১২৯৬), টাঙ্গাইল। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩৮।

১০. উদাসীন পথিকের মনের কথা (উপন্যাস)

প্রকাশকাল ঃ ২৯ আগষ্ট ১৮৯০ (১২৯৭ সাল) লাহিনীপাড়া, কুষ্টিয়া। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৯৮।

১১. মৌলুদ শরীফ (গদ্য পদ্যে রচিত ধর্মমূলক রচনা)

প্রকাশকাল ঃ ২ নভেম্বর ১৮৯৪ খ্রী./১৯০৩ খ্রী, টাঙ্গাইল। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬০।

১২. গাজীমিয়াঁর বস্তানী, প্রথম অংশ (গদ্যে রচিত নক্সা)

প্রকাশকাল ঃ ১৮৯৯ (১৫ই আশ্বিন, ১৩০৬), কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮+৪০০।

১৩. মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা (স্কুল-পাঠ্য পুস্তক)।

প্রথম ভাগ। প্রকাশকাল ঃ ১লা অক্টোবর ১৯০৩ (১৩১০সাল)। টালিগঞ্জ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১+২৯।

প্রথম ভাগের প্রথম অংশ। প্রকাশকাল ঃ ১৯০৭খ্রী. (১২ই ফাল্গুন, ১৩১৩) ৩৬নং গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২+১৮+২।

দ্বিতীয় ভাগ। প্রকাশকাল ঃ ১৫মে ১৯০৮ (১৩১৪ সাল), কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২+৫৩

১৪. উপদেশ (হজরত লোকমানের উপদেশের পদ্যানুবাদ)

রচনাকাল ঃ ১৩০৯ সাল। প্রকাশকাল ঃ আশ্বিন ১৩১২, টালিগঞ্জ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০।

অবশ্য মোহম্মদ আবদুল কাইউম 'উপদেশ' স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। 'হজরত বেলালের জীবনী' গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই ক্ষুদ্র কাব্যানুবাদটি সংযোজিত। ('উত্তরাধিকার' মাঘ-চৈত্র ১৩৯৩, পৃষ্ঠা ২০৩-০৪)। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটি কপি সংরক্ষিত আছে বলে সেলিম জাহাঙ্গীর জানিয়েছেন।[১১০]

১৫. বিবি খোদেজার বিবাহ (কাব্য)

প্রকাশকাল ঃ ২৫শে মে ১৯০৫ (১৩১২ সাল) টালিগঞ্জ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪+১২৭।

১৬. হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভ (কাব্য)

প্রকাশকাল ঃ ১১ই আগষ্ট ১৯০৫ (১ শ্রাবণ ১৩১২)। টালিগঞ্জ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪২।

১৭. হজরত বেলালের জীবনী(কাব্য)

প্রকাশকাল ঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৫। টালিগঞ্জ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪২।

১৮. হজরত আমীর হামজার ধর্ম্মজীবন লাভ (কাব্য)

প্রকাশকালঃ ১০ নভেম্বর, ১৯০৫ (কার্ত্তিক, ১৩১২সাল)। কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২২।

১৯. মদিনার গৌরব (কাব্য)

প্রকাশকাল ঃ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯০৬ (১৩১৩) কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১২০।

২০. মোশ্লেম-বীরত্ব (কাব্য)

প্রকাশকাল ঃ ২০ জুলাই ১৯০৭। কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২+১৯৬।

২১. এসলামের জয় (গদ্যে রচিত ইতিহাস গ্রন্থ)

প্রকাশকাল ঃ ৪আগষ্ট ১৯০৮ (১৩১৫সাল) কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১+৩০৭।

২২. আমার জীবনী (আত্মচরিত)

১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ এ গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯০৮ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। প্রকাশকাল ঃ প্রথম খণ্ড-২৫সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ (১আশ্বিন ১৩১৫) এবং সর্বশেষ খণ্ড (১১শ-১২শ একসঙ্গে) প্রকাশিত হয় ২ মার্চ ১৯১০ (ফাল্গুন ১৩১৬)। কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১২ খণ্ড মিলে ৪১৫।

২৩. বাজীমাত/ বাজীমাৎ[১১১] (কবিতা)।

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ১৯০৮ (১৫ কার্ত্তিক ১৩১৫)। কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৩১।

২৪. ঈদের খোতরা (আরবী খোতবার বাংলা ও উর্দু ভাষায় পদ্যানুবাদ)

প্রকাশকাল ঃ ১২জুলাই ১৯০৯ (১৩১৬ সাল) কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪+১১৪।

২৫. আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী (জীবনী)

প্রকাশকাল ঃ ৯মে, ১৯১০ (চৈত্র ১৩১৬)। কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৬৭।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ গ্রন্থের তালিকা

নিম্নলিখিত কয়েকটি গ্রন্থ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল—কোনটি আংশিক —কোনটি সম্পূর্ণ। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

১. রাজিয়া খাতুন (উপন্যাস)

রচনাটি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর (৩০ আশ্বিন ১২৯৮) সংখ্যা (২ভাগ ১৮ সংখ্যা) থেকে 'হিতকরী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

২. তহমিনা (উপন্যাস)

১৮৯৭খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ-এপ্রিল ও মে-জুন—এই চার সংখ্যায় মাসিক 'হাফেজ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর অসমাপ্ত অবস্থায় প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এটি সম্পূর্ণ হয়ে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল কিনা জানা যায় নি। তবে 'তহমিনা' উপন্যাসের ১৬৬ পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে।[১১২]

৩. টালা অভিনয় (প্রহসন)

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল এবং মে-জুন যুক্ত সংখ্যায় 'হাফেজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কাজী আব্দুল মান্নান জানিয়েছেন যে, 'এটি সম্পূর্ণ আকারেই' প্রকাশিত হয়েছিল[১১৩] । তবে তা স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি।

৪. নিয়তি কি অবনতি (উপন্যাস)

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ, ১৩০৫) সংখ্যা (১মবর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা) এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) সংখ্যার (২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা) 'কোহিনুর' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। রচনাটি সম্পূর্ণ হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি।

'বিজ্ঞাপন'-এ প্রচারিত/পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখিত গ্রন্থ

বেশ কিছু গ্রন্থের নাম মশাররফ 'বিজ্ঞাপনে' প্রচার করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কি না তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অধ্যাপক আবদুল লতিফ চৌধুরী তাঁর 'মীর মশাররফ হোসেন' শীর্ষক পুস্তিকায় নিম্নোক্ত ১ থেকে ৬ সংখ্যক বইগুলির সন্ধান দিয়ে বলেছেন যে, এগুলি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী' গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকাশের সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল।[১১৪]

১. ভাই ভাই এই ত চাই (প্রহসন?) — আনুমানিক ১৮৯৯ খ্রীঃ

২. ফাঁস কাগজ (প্রহসন?) — আনুমানিক ১৮৯৯ খ্রীঃ

৩. এ কি? (প্রহসন?) — আনুমানিক ১৮৯৯ খ্রীঃ

৪. পঞ্চনারী পদ্য (কবিতা?) — আনুমানিক ১৮৯৯ খ্রীঃ

৫. প্রেম পারিজাত (গদ্যরচনা?)[১১৫] — আনুমানিক ১৮৯৯ খ্রীঃ

৬. বাঁধা খাতা (প্রহসন?) — আনুমানিক ১৮৯৯ খ্রীঃ

৭. গাজী মিয়াঁর গুলি (রম্যরচনা)

'নবনূর' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ঃ আষাঢ় ১৩১২) নতুন গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে 'যন্ত্রস্থ' হিসেবে একটাকা মূল্যের এই গ্রন্থটির উল্লেখ আছে।[১১৬]

৮. বৃহৎ হীরকখনি (শিশু পাঠ্য)

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগের সূত্রে জানা যায় এই 'বৃহৎ হীরকখনি' বইয়ের (প্রকাশকাল ঃ ১৫ নভেম্বর ১৯১৪ অর্থাৎ মশাররফের মৃত্যুর পর, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩২) সঙ্কলক মশাররফ-পুত্র মীর এব্রাহিম হোসেন।[১১৭]

৯. বধূমাতা (উপন্যাস)[১১৮]

১০. ওফাতে রসুল[১১৯]

১১. শবে মেরাজ

পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যান্য রচনা

মশাররফ স্ব-সম্পাদিত পত্রিকা ছাড়াও আরো বহু পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেকগুলিতে আবার নিয়মিত লেখকও ছিলেন। এই সমস্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর,' 'মিহির', 'হাফেজ,' 'আহমদী', 'নবরত্ন', 'এডুকেশন গেজেট', 'ভারত মহিলা' 'কোহিনুর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত মশাররফের অনেক রচনাই আজ দুষ্প্রাপ্য। তবু এগুলি থেকে প্রাপ্ত মশাররফ রচনার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে উল্লেখ করা হল।

১. 'মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি' (প্রবন্ধ)। 'সংবাদ প্রভাকর' ঃ মে১৮৬৫।

২. 'গোলাপ' (কবিতা)। 'সংবাদ প্রভাকর' ঃ ২৮ চৈত্র ১২৭২।

৩. 'কি ভয়ানক অত্যাচার' (নিবন্ধ)। 'মধ্যস্থ ঃ' ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০।

৪. 'সুসমাচার' (প্রবন্ধ)। 'নবরত্ন ঃ' ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬।

৫. 'আমাদের শিক্ষা' (প্রবন্ধ)। 'হিতকরী' ঃ ১ পৌষ, ১৫ পৌষ ১২৯৭।

৬. 'বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের একখানি চিত্র' (কবিতা)। হাফেজ ঃ জানুয়ারী ১৮৯৭।

৭. 'সৎ-প্রসঙ্গ' (প্রবন্ধ)। 'কোহিনুর' ঃ ভাদ্র ১৩০৫।

৮. ['বাল্য-রচনা সম্পর্কিত প্রবন্ধ']। 'কোহিনুর' ঃ ২য় কল্প, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৩১০।

৯. 'প্যারীসুন্দরী' (জীবনী-প্রবন্ধ)। 'ভারত মহিলা' ঃ বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩১৪।

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

মশাররফ হোসেনের বেশ কিছু রচনার পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় তাঁর বংশধরদের কাছে রয়ে গেছে। এ রকম কিছু রচনার হদিশ দিয়েছেন অধ্যাপক আলী আহমদ।[১২০]

১. 'ব্যক্তিগত দলিল', পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫

২. 'সুরা ইউসুফ'/ 'হজরত ইউসোফ', পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৬+৩৭৩[১২১]

৩. 'আত্মজীবনীমূলক', পৃষ্ঠাসংখ্যা- ৫০

৪. 'চোরের উপর বাটপাড়ি', পৃষ্ঠা-সংখ্যা- ৫

৫. 'মহাজন সমাচার', পৃষ্ঠা-সংখ্যা-৪

মশাররফ সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা

১. আজীজন নাহার (মাসিক/পাক্ষিক)

প্রকাশকাল ঃ বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪), চুঁচুড়া, হুগলী।

২. হিতকরী (পাক্ষিক/দাশাহিক)[১২২]

প্রকাশকাল ঃ বৈশাখ ১২৯৭ (এপ্রিল ১৮৯০), লাহিনীপাড়া, কুষ্টিয়া, পরে টাঙ্গাইল।

৩. হুগলী বোধোদয় (মাসিক?)[১২৩]

মীর মশাররফ হোসেনের সমগ্র জীবনের সাহিত্য-সাধনায় প্রধানতঃ দু ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।[১২৪]সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে তাঁর অধিকাংশ রচনাই ছিল শিল্পানুপ্রেরণা সঞ্জাত রসসাহিত্য। জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক উনিশ শতকীয় মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ লেখক নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শিল্পকেই ধ্যান-জ্ঞান করেছেন। তাই দেখা যায় 'রত্নবতী' (১৮৬৯ খ্রী.) থেকে 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী' (১৮৯৯) পর্যন্ত রচনাগুলি প্রায় সবই সাহিত্যিক রচনা। আবার জীবনের অন্তিম পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯০০খ্রী. থেকে ১৯১০ খ্রী. পর্যন্ত কালপর্বে রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কেবল 'আমার জীবনী' ও 'বিবি কুলসুম'–এর মতো দুখানি আত্মজীবনীমূলক রচনা বাদ দিয়ে প্রায় সব রচনাই ধর্মভাব প্রধান।

অবশ্য সাহিত্য সাধনায় মীরের এই বাঁকের পেছনে নানা বিষয় কার্যকরী ছিল। লেখক তখন বয়ঃভারাক্রান্ত, যে বয়সে মানুষ সাধারনতঃ ঈশ্বরমুখী হয়ে থাকে। তাঁর পূর্বের কিছু বিতর্কিত রচনার জন্যে স্বসমাজের কাছ থেকে তীব্র আঘাত প্রাপ্ত এবং সেই প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি ক্লান্ত। লেখক যুগের চাহিদা ও যুগ প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। অধিকাংশ মুসলমান লেখকই তখন ইসলামী সাহিত্য চর্চায় বেশী আগ্রহী।[১২৫]মুসলমান সম্পাদিত পত্র পত্রকাগুলির বেশীর ভাগই তখন ইসলামী ভবধারায় আন্দোলিত।[১২৬]পক্ষান্তরে হিন্দু সাহিত্যিকদের বহু রচনায়ই তখন মুসলিম বিদ্বেষ ফুটে বেরুচ্ছে। মুসলমান লেখকগণও এর প্রতিক্রিয়ায় নানা গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন। এছাড়া ছিল মশাররফের আর্থিক অনটন তথা জীবিকার্জনের তাগিদ। পুঁথির রুচি-শাসিত সাধারণ মুসলমান পাঠকদের কাছে তখন ইসলাম-ধর্মমূলক কাব্য সাহিত্যই বেশী জনপ্রিয় ছিল। এই 'সমাজের চৌদ্দ আনা লোকে'র দিকে তাকিয়ে বই বিক্রির তাড়না তাঁকে এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনায় প্রণোদিত করছে।[১২৭]এতৎসত্বেও "তিনি তাঁর সমকালবর্তী ও বয়োকনিষ্ঠ মুন্সী মেহেরুল্লা, কি শেখ আব্দুর রহিমের মতো ইসলাম প্রচারকের ভূমিকায় নেমে আসেননি; এমনকি তাঁদের মতো ইসলামী সাহিত্যও সৃষ্টি করেননি।"[১২৮] তাছাড়া তাঁর লেখায় হিন্দু-বিদ্বেষও প্রকটিত হয়নি। অর্থাৎ উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের বদলে নিছকই ধর্মভাব প্রধান হয়ে উঠেছে তাঁর শেষ জীবনের রচনাগুলিতে।

বিষয়ের দিক থেকে মশাররফ হোসেনের রচনাগুলি পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়[১২৯] ঃ—

(ক) রূপকথা ও ইতিহাসভিত্তিক রচনা ঃ রত্নাবতী, বসন্তকুমারী, বিষাদসিন্ধু, বেহুলা গীতাভিনয়।

(খ) বাস্তব সমাজ সমীক্ষামূলক রচনা ঃ জমীদার দর্পণ, এর উপায় কি? উদাসীন পথিকের মনের কথা, টালা অভিনয়, গাজীমিয়াঁর বস্তানী, গো-জীবন।

(গ) ধর্মমূলক জীবনী ও তত্ত্বকথা ঃ বিবি খোদেজার বিবাহ, মদিনার গৌরব, এসলামের জয়, মৌলুদ শরীফ, সঙ্গীত লহরী উপদেশ, মোশ্লেম-বীরত্ব, হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবনলাভ।

(ঘ) জীবনীমূলক রচনা ঃ আমার জীবনী, আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী।

(ঙ) শিক্ষামূলক বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ঃ মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা।

মশাররফের ঘটনাবহুল জীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। তাই তাঁর জীবনের নানা ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত করেও তাঁর সাহিত্যকর্মকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

প্রথম। প্রস্তুতি-পর্ব ঃ ১৮৬৫ খ্রী. থেকে ১৮৬৯ খ্রী পর্যন্ত চার বছর কাল। এই কালপর্বে রত্নবতী (১৮৬৯খ্রী.) প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর বিক্ষিপ্ত রচনা, যেমন মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি (প্রবন্ধ), গোলাপ (কবিতা) প্রভৃতি রচিত। এই সময়টিকে বলা যেতে পারে মশাররফের সাহিত্যে হাত পাকানোর কাল বা প্রস্তুতি পর্ব।

দ্বিতীয়। উন্মেষ-পর্ব ঃ ১৮৬৯ খ্রী. থেকে ১৮৭৫ খ্রী. পর্যন্ত ছয় বছর। লাহিনীপাড়ায় অবস্থানকালে ইতিমধ্যে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে। মানসিক যন্ত্রনা ও যন্ত্রনামুক্তির পূর্বাভাসের কাল। এই কালপর্বে রচিত হয়েছে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯) থেকে 'এর উপায় কি?' (১৮৭৫) পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর রচনাগুলি।

তৃতীয়। সৃষ্টিশূন্যতার পর্ব ঃ ১৮৭৬ খ্র. থেকে ১৮৮৪ খ্রী. পর্যন্ত আট বছর। এই কালপর্বে দ্বিতীয় বিবাহ মশাররফের দাম্পত্য জীবনে এনে দেয় শান্তির ছোঁয়া, কিন্তু পারিবারিক সুখ তখনও অনায়ত্ত। প্রথমা স্ত্রীর সপত্নী-দ্বন্দ্ব, পরিজনদের গঞ্জনা এবং সর্বোপরি আর্থিক অনটন প্রভৃতি কারণে অশান্তির বাতাবরণ। দেলদুয়ারে চাকুরী গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই মানসিক অস্থিরতার কালে কোন রচনাই তিনি সৃষ্টি করতে পারেননি। তাই এই বন্ধ্যা সময়টিকে আমরা সৃষ্টি-শূন্যতার পর্ব বলে অভিহিত করতে পারি।

চতুর্থ। ঐশ্বর্য পর্ব ঃ ১৮৮৫খ্রী. থেকে ১৮৯৯খ্রী. পর্যন্ত চৌদ্দ বছর। দেলদুয়ারে চাকুরীতে যোগদান থেকে শুরু করে কর্মস্থল পরিত্যাগ করার পর আরো কিছুদিন পর্যন্ত এই রেশ চলেছিল। কিছুটা অর্থ-চিন্তা-মুক্তি, লেখক হিসেবে ততদিন পাঠকমহলে পরিচিতি এবং দাম্পত্য জীবনে ফিরে পাওয়া শান্তি ও সুখের দিন তখন অন্তত কিছুদিন বজায় ছিল। এই কালপর্বে মশাররফ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। অবিস্মরণীয় ও জনপ্রিয় 'বিষাদসিন্ধু' থেকে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' পর্যন্ত রচনাগুলি এই সময়ের সৃষ্টি।

পঞ্চম। প্রৌঢ় পর্ব ঃ ১৯০০ খ্রী. থেকে ১৯০৮খ্রী. পর্যন্ত আট বছর। এই সময় মশাররফ কাটিয়েছেন কলকাতা ও পদমদীতে। জীবিকার তাড়নায়, মামলা মোকদ্দমা হাজতবাস ইত্যাদি লাঞ্ছনাময় ঘটনায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মশাররফ 'সমাজের চৌদ্দ আনা লোকের' কথা মাথায় রেখে এই পর্বে রচনা করলেন ইসলামী ধর্মভাবমূলক গ্রন্থসমূহ। 'উপদেশ'

থেকে 'এসলামের জয়' পর্যন্ত রচনাগুলি এই সময়ের। এই পর্বটিকে মীরের সৃজনপ্রতিভার পৌঢ়-পর্ব বলে চিহ্নিত করা যায়।

ষষ্ঠ। **অন্তিম পর্ব ঃ** ১৯০৮ খ্রী. থেকে ১৯৯০ খ্রী. পর্যন্ত মাত্র দু'বছর। মীরের অবস্থান কখনো কলকাতা কখনো পদমদী। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মশাররফ জীবনের হিসেব নিকেশ কষতে বা স্মৃতি রোমন্থন করতে ব্যস্ত হন। তবে এই সঙ্গে ধর্মীয় রচনার রেশ তখনও বজায় ছিল। 'আমার জীবনী' থেকে 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী' পর্যন্ত গ্রন্থগুলি এই অন্তিমপর্বের রচনা।

তথ্যসূত্র

১. মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীর খসড়া পাণ্ডুলিপি। কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে সংগৃহীত। ৩ নং খাতা। উদ্ধৃত, আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, পৃ.-১২

২. ডঃ আশরফ সিদ্দিকী 'বাংলা একাডেমী পত্রিকায়' (পৌষ ১৩৬৩) কোন উৎসের উল্লেখ না করে এই তারিখটি দিয়েছেন। প্রায় সবাই নির্বিচারে এই তারিখটিই গ্রহণ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সং ১৩৭৭, পৃ.-৪৬) বলেছেন, "১৩১৮ সালের শেষ ভাগে মীর মশাররফ হোসেন পরলোকগমন করেন।" আবদুল লতিফ চৌধুরী ('মীর মশাররফ হোসেন', ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮০) মশাররফের মৃত্যুসাল উল্লেখ করেছেন ১৯১২। ডঃ আনিসুজ্জামানও ('মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, মুক্তধারা, ১৯৭১, পৃ.-১৯৪) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান বলেছেন ('মশাররফ রচনা সম্ভার', ৫ম খণ্ড,পৃ.- ঊনষাট) নভেম্বর ১৯১১/ কার্তিক ১৩১৮। এই তারিখটিও সূত্রহীন। আবার তিনি অন্যত্র (ঐ, পৃ. একশ দুই) বলেছেন ১৯১২। আজহার ইসলাম ('বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ', আধুনিক যুগ, ঢাকা, কার্তিক ১৩৭৬, পৃ.-৭৭১) মৃত্যুসাল নির্দেশ করেছেন ১৯১২। কুমুদনাথ মল্লিক তাঁর "নদীয়া কাহিনী" গ্রন্থে (মোহিতরায় সম্পাদিত, তৃঃ সঃ, কলিকাতা, ১৩৯৩, পৃ.-১৭২) লিখেছেন, "সম্প্রতি ইঁহার (মশাররফ) মৃত্যু হইয়াছে।" "নদীয়া কাহিনী" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সালে। শামসুজ্জামান খান ('নানা প্রসঙ্গ', ঢাকা, আষাঢ় ১৩৯০,পৃ.-১) মৃত্যুসাল ১৯১১ উল্লেখ করলেও কোন তারিখ দেন নি।

৩. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্যরচনা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ভাদ্র ১৩৮২, পৃ.-১৫৬

৪. "In some of the Musalman communities there exists a class of people denoninated 'Gholams' the signification of which word seems to denote that the class so designated is in a state of slavery." Law commission on Slavery, p-40

উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্যরচনা, পৃ.-১৬৩

৫. সৈয়দ বংশ বলে পৃথক কোন বংশ-ধারার অস্তিত্ব নেই। সাধারণত হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধর বা তাঁর কন্যা ফাতেমার বংশধরেরা এই বংশ নামে অভিহিত হতেন। সৈয়দ অর্থ সর্দার, প্রভু বা মনিব।

৬. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী'র (মশাররফ রচনা সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ৫ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৫) মাতামহীর জবানীতে–"যে সৈয়দ টাকার লোভে জাত বেচিলেন তাহারও শেষ। টাকা কয়দিনের? আপন সমাজে সমান সমান ঘরে বিবাহ করা এবং দেওয়া দুই-ই ভাল।" পৃ.-১৯৮। অন্যত্র, "বড় লোক, সকলেই খুব খাতির করিলেন। কিন্তু মজলিশ করিয়া কেহই তাহার সহিত খাদ্য

খাওয়া করিলেন না। একসঙ্গে এক দস্তরখানায় খাইলেন না – চৌধুরী রহিমউদ্দিন সকলি বুঝিতে পারিলেন। ইহারা জাত্যাংশে আমা হইতে খুব বড়, তাহাতেই আমার সঙ্গে খানাপিনা করিলেন না।" পৃ.-২১৬।

৭. মীর মশাররফ হোসেন, উদাসীন পথিকের মনের কথা, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, আশ্বিন ১৩৮৩, পৃ.-৫০১

৮. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্য রচনা, পৃ.-১৪৬-৪৭

৯. দ্রষ্টব্য ঃ মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রা.লি., ১৩৮৪,

পিতামহ মীর এবরাহিম হোসেন, পিতা মোয়াজ্জেম হোসেন, পিতৃব্য জোলফিকার আলী এবং মশাররফ নিজে দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। এমনকি মশাররফের দুই শ্বশুর নাদের হোসেন এবং সদরুদ্দী একাধিক বিবাহ করেন।

১০. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্যরচনা, পৃ.-১৩৭

১১. মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) পৃষ্ঠা-২২

১২. Report of Bengal Provincial committee: Indian Education Commission, 1882, p-229. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্যরচনা, পৃ.-১৪০

১৩. উইলিয়াম হাণ্টার, দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স্, আবদুল মওদুদ অনূদিত, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হউস, জানুয়ারী, ১৯৯৬, পৃ.-১১৮-১৯

১৪. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৮৩, পৃ.-২৬১

১৫. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-১১

১৬. মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর খসড়া পাণ্ডুলিপি। আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন। পৃ.-১৪৭–১৪৮

১৭. মীর মশাররফের জন্ম সময়ে কুমারখালী পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এটি নদীয়া জেলা-ভুক্ত হয়। আমার জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-২৪৬
আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-১৪৭

১৮. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-১১

১৯. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী', শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ.-৭০

২০. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী', মশাররফ রচনা সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ৫ম খণ্ড,

পৃ.-১০৪

২১. আশরাফ সিদ্দিকী, 'মীর মশাররফ হোসেন', ঢাকা, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ ১৩৬৩, পৃ.-১৮

সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রবন্ধ বিচিত্রা, 'কুষ্টিয়া' (প্রবন্ধ), ঢাকা, আষাঢ় ১৩৭৪, পৃ.-৩৪৬

আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, মুক্তধারা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, পৃ.-১৯৪

২২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, "স্বর্ণ কুমারদেবী, মীর মশাররফ হোসেন", সাহিত্যসাধক চরিতমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সং, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বৈশাখ ১৩৭৭, পৃ. ৩৩

২৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), সপ্তম সংস্করণ, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, পৌষ ১৩৯৫, পৃ. ৭১। মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, ভূমিকা-ঊনষাট। মোহম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্যরচনা, পৃ.-৮ ও ২৪-২৫। আলী আহমদ সংকলিত, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ.-৫৯৬। আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত, বিষাদসিন্ধু, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী ১৩ নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ.-ভূমিকা-সাত। সেলিম জাহাঙ্গীর, মীর মশাররফ হোসেন ঃ জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩, পৃ.-৫৫। সিরাজুদ্দীন আমেদ, মীর মশাররফ হোসেন, নতুন দিল্লী, সাহিত্য একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ.-১। সৌমিত্র শেখর, গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ, কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, মার্চ ১৯৯৫, পৃ.-১৮

২৪. পৃথ্বীলা নাজনীন, আত্মজীবনীমূলক রচনা ঃ মীর মশাররফ হোসেন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ১৯৯২, পৃ.-১৪

২৫. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-১২

২৬. মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ.-৯

২৭. আমার জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, পৃ.-৯-১০

২৮. ঐ, পৃ.-১৩

২৯. মীর মশাররফ হোসেন, উদাসীন পথিকের মনের কথা, মশাররফ রচনা সম্ভার, প্রথম খণ্ড, পৃ.-৫৩৫

৩০. ঐ, পৃ.-৫৩৯

৩১. আবদুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-১৭

৩২. আমার জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-৮৮-৯০

৩৩. ঐ, পৃ.-৮৯

৩৪. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-১৯

৩৫. Report on the state of Education in Bengal (Second Part) William Adam, Calcutta, 1836, p-18
উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্যরচনা, পৃ.-১৩৪-৩৫

৩৬. মশাররফ হোসেন এখানে প্রথম পারার উল্লেখ করলেও এটি প্রকৃতপক্ষে কোরান শরীফের শেষ পারা। কেননা প্রথম পারা বা অধ্যায়ে কোন ছোট সুরা নেই। ঐ শেষ পারা বা আমপারাটিই শিক্ষার্থীরা প্রথম অধ্যয়ন করেন।

৩৭. আমার জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-৯৩

৩৮. ঐ , পৃ.-৯২

৩৯. মীর মশাররফ হোসেন, উদাসীন পথিকেন মনের কথা, মশাররফ রচনা সম্ভার, প্রথম খণ্ড, পৃ.-৫৭৬-৫৮৫

৪০. আমার জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-১২০

৪১. ঐ , পৃ.-১৪৬

৪২. ঐ , পৃ. -১৫৮

৪৩. ঐ , পৃ.-১৫৯

৪৪. ঐ , পৃ.-১৭৫

৪৫. ঐ , পৃ.-১৯৫

৪৬. ঐ , পৃ.-১৯৬

৪৭. ঐ , পৃ.-২২০-২১

৪৮. ঐ , পৃ.-২৩৯

৪৯. ঐ , পৃ.-২৫০

৫০. ঐ , পৃ.-২৫১

৫১. আবদুল আজীজ আল-আমান (সম্পাদিত), বিষাদসিন্ধু, ভূমিকা, পৃ.-দশ। সেলিম জাহাঙ্গীর, মীর মশাররফ হোসেন ঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ.-৫৮। বরং মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (মীর মশাররফের গদ্যরচনা, পৃ.-১৭) যথার্থই মন্তব্য করেছেন, কালীঘাট "স্কুলে ভর্তি হওয়া বা পড়াশুনা সম্পর্কে বিশেষ কিছু হলো না মশাররফের।"

৫২. আমার জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-২৭৪

৫৩. "কনের সম্মতি ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না – অথচ লতিফনের 'এজেন' (সম্মতি) না নিয়েই এ বিয়ে

হয়েছিল।" 'বিষাদসিন্ধু', আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ.-এগার।

৫৪. মশাররফের দ্বিতীয় পত্নী কুলসুমের সঙ্গে লতিফনের চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। জানা যায়, "তিনি প্রায়ই কুলসুমকে লতিফুন বলিয়া ডাকিতেন।"

মাহেনও, আগষ্ট ১৯৫২। আবদুল গফুর সিদ্দিকী ঃ "ঐতিহাসিক কনে বদল", পৃ.-৩০

৫৫. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-৪০৬

৫৬. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-১৭

৫৭. ঐ , পৃ.-২৭

৫৮. ঐ , পৃ.-২৭

৫৯. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-৪৪৬-৪৪৭

৬০. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-৩৩-৩৪

৬১. ঐ , পৃ.-৩৫

৬২. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্য-রচনা, পৃ.-২২-২৩

৬৩. "ফরিদপুর সবজজ আদালতে ১৯০৬ সালে ৩৯ নং মকদ্দমায়" তাঁর অনুজ মীর মহতেশাম হোসেন ছিলেন বাদী এবং মশাররফও তাতে জড়িত ছিলেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, ১৯০৬ সালের আগেই তিনি পদমদীর জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছিলেন। 'আমার জীবনী', মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-৯

৬৪. আবদুল লতিফ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ.-২৯

৬৫. ঐ , পৃ.-২৯

৬৬. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্য রচনা, পৃ.-২৩

৬৭. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ.-২৭৩

৬৮. এই অধ্যায়ের ২নং তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য।

৬৯. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-৩৭

৭০. কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ.-পঁচানব্বই

৭১. মীর মশাররফ হোসেন, উদাসীন পথিকের মনের কথা, মশাররফ রচনা সম্ভার, প্রথম খণ্ড, পৃ.-৩৮১

৭২. শামসুজ্জামান খান, "স্ত্রী ও পত্রিকার একই নাম আজিজান নাহার"(প্রবন্ধ), পৃ.-১৩। 'সচিত্র সন্ধানী', ৫ই ফাল্গুন ১৩৮৫/১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯।

৭৩. মশাররফ রচনা-সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-৪৫২-৫৩

৭৪. 'মধ্যস্থ', ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃ.-১৯৫-৯৬

উদ্ধৃত, আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-৪৫-৪৬

৭৫. মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-৪০২

৭৬. ঐ , পৃ.-৪০৫

৭৭. উদাসীন পথিকের মনের কথা, মশাররফ রচনা-সম্ভার, প্রথম খণ্ড, পৃ.-৪৮৭-৮৮ এবং ৫০১

৭৮. গাজীমিয়াঁর বস্তানী, মশাররফ রচনা-সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-১২৯ ও ১৫২

৭৯. হজরত মাওলানা মুফতী মহাম্মদ শফী, "তকসীরে মা-আরেফুল কোরআন", মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত দেওবন্দ, উত্তরপ্রদেশ, বাংলা ইসলামিক একাডেমি, সংখ্যা-৭, পৃ.-৩১৭-১৮ ঃ— "আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সে সব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও — দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই.....।" (সুরা নিশা, আয়াত নং-৩)। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিও কোনআন শরীফের অন্যত্র স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, "স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা কোন অবস্থাতেই সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।" (ঐ , পৃ.-৩৩১)

৮০. আমার জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-২৯৪-৯৫

৮১. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, প্রথম খণ্ড, পাদটিকা, পৃ.-২৭৩

৮২. আমার জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-২৭৯

৮৩. ঐ , পৃ.-৯৩

৮৪. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমাদের শিক্ষা' (প্রবন্ধ)

উদ্ধৃত, কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, ১ম সং, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯০, পৃ.-৩৪০

৮৫. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-৪৬-৪৭

৮৬. আমার জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-৩১৩

৮৭. ঐ , পৃ.-৯৫

৮৮. ঐ , পৃ.-১৫০-৫১

৮৯. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-৫৬

৯০. আমার জীবনী, মশাররফ রচনা-সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-১৪৯-৫০

৯১. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, ঢাকা, বাংলা-একাডেমী, ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ.-৫১

৯২. 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' (মাসিক) পত্রিকা কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ নামে পরিচিত) এটি পরে পাক্ষিক ও অবশেষে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়ে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লোপ পায়।

৯৩. আমার জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-২৯৩

৯৪. ঐ , পৃ.-২৯৩

৯৫. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, পূর্বোক্ত, পৃ.-৩৪৬

৯৬. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্যরচনা, পৃ.-২০

৯৭. কুষ্টিয়ার কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ছিলেন বাউল সাধক লালন ফকিরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কুমারখালি থেকে ছয় সাত মাইল দূরে কালীগঙ্গা নদীর তীরে ছেঁউড়িয়ায় ছিল লালন ফকিরের আখড়া। উভয়ের সম্পর্কও ছিল বেশ মধুর। খুব সম্ভব, এই লালন শাহের প্রভাবে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাঙাল হরিনাথ গড়ে তোলেন 'ফিকির চাঁদ ফকিরের দল' নামে একটি বাউল গানের দল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, দীনেন্দ্রকুমার রায়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে মশাররফও এই দলে যুক্ত ছিলেন।

৯৮. জলধর সেন, কাঙ্গাল হরিনাথ (১ম খণ্ড), কলিকাতা, আশ্বিন ১২৩০, পৃ.-৩৯

৯৯. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ.-২৬১-৬২

১০০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ.-৪৮

১০১. ঐ , পৃ.-৩৭-৪৫

১০২. আনিসুজ্জামান,পূর্বোক্ত, পৃ.-১৯৪

১০৩. আবদুল লতিফ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ.-৫-৪০

১০৪. আশরাফ সিদ্দিকী, 'মীর মশাররফ হোসেন' (প্রবন্ধ), বাংলা একাডেমী পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩, পৃ.-১৯-২০

উল্লেখ, আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-৫৮-৫৯

১০৫. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), মশাররফ রচনা-সম্ভার, ৫ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ.-বার। কাজী আবদুল মান্নান প্রদত্ত এই গ্রন্থ-সংখ্যা আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর 'মীর মশাররফ হোসেন' বইতে ২৫ বলে উল্লেখ

করেছেন।

১০৬. আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ.-৪৪৫

১০৭. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-৫৯ (তথ্যনির্দেশ-এ-১২৩ নং দ্রষ্টব্য)

১০৮. 'জমীদার-দর্পণ' নাটকের পৃ.-সংখ্যা বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (পূর্বোক্ত, পৃ.-৩৮), আবদুল আজীজ আল-আমান (বিষাদসিন্ধুর ভূমিকা, পৃ.-চব্বিশ) এবং আবুল আহসান চৌধুরী (মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-৬০) পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭২ বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে, আলী আহমদ (বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, পৃ.-৫৯৯) এবং সৌমিত্র শেখর (গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ, পৃ.-১৬১) এই সংখ্যা ৮৪ বলে লিখেছেন।

১০৯. আলী আহমদ ও সৌমিত্র শেখর-এর গ্রন্থে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১২, অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও আবুল আহসান চৌধুরীর গ্রন্থে পৃষ্ঠা-সংখ্যা-২০৪ উল্লেখ করা হয়েছে।

১১০. সেলিম জাহাঙ্গীর, পূর্বোক্ত, পৃ.-৩৬৯

১১১. কাজী আবদুল মান্নান 'বাজীমাত' ও 'বাজীমাৎ' – দুটি বানানই ব্যবহার করেছেন (মশাররফ রচনা-সম্ভার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা-পৃ.-এগার এবং ৫ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ.-আঠাশ)। তবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, আলী আহমদ, আবুল আহসান চৌধুরী প্রভৃতি লেখকগণ 'বাজীমাৎ' বানানটিই উল্লেখ করেছেন।

১১২. আলী আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.-৬০৬-৬০৭

১১৩. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ.-পনের।

১১৪. এ বিষয়ে ডঃ কাজী আবদুল মান্নান একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, "আমাদের কাছে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী' গ্রন্থের একটি কপি আছে। তাতে বিজ্ঞপ্তিটি নাই।" (মশাররফ রচনা সম্ভার, পঞ্চম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ.-বার)। তবে আবুল আহসান চৌধুরী পরবর্তীকালে জানিয়েছেন, এই সমস্ত "গ্রন্থের নাম 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায়।" (মীর মশাররফ হোসেন, তথ্যনির্দেশ, পৃ.-১৫২)।

১১৫. আবুল আহসান চৌধুরী জানিয়েছেন, "মশাররফের উত্তরপুরুষের কাছে রক্ষিত এই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে আমরা দেখেছি যথার্থই 'ইউসুফ জুলেখা' ও 'প্রেম পারিজাত' অভিন্ন রচনা।" (মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-৭০)।

১১৬. আশারাফ সিদ্দিকী, মীর মশাররফ হোসেন, (পৃ.-১৮), বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ ১৩৬৩

১১৭. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-৭১, এছাড়া সেলিম জাহাঙ্গীর (মীর মশাররফ হোসেন ঃ জীবন ও সাহিত্য পৃ.-৩৬৯) জানিয়েছেন যে, 'গাজীমিয়াঁর গুলি' ও 'বৃহৎ হীরকখনি' – গ্রন্থদুটির উল্লেখ মশাররফের অপ্রকাশিত ডায়েরীতে পাওয়া যায়।

১১৮. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী তাঁর 'মুসলিম বাংলার মনীষা' (তৃতীয়-সং, ঢাকা, মাঘ ১৩৯৩, পৃ.-৩৬) গ্রন্থে কোন সূত্রের উল্লেখ না করেই তালিকায় বইটির নাম দিয়েছেন। এর আগে কেউ এই বইয়ের নামোল্লেখ করেন নি। মীরের কোন বিজ্ঞাপনেও বইটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই এই তথ্যটি সংশয়াতীত নয়।

১১৯. 'ওফাতে রসুল' ও 'শবে মেরাজ' — গ্রন্থ দুটির উল্লেখ পাওয়া যায় মশাররফ হোসেনের পাণ্ডুলিপিতে। এই পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোফিল্ম বিভাগে সংরক্ষিত আছে বলে জানিয়েছেন সেলিম জাহাঙ্গীর (মীর মশাররফ হোসেন ঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ.-৩৬৯)।

১২০. আলী আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.-৬০৬-৬০৭

১২১. এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দ্রষ্টব্য ঃ আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, পৃ.-৬৯-৭০

১২২. অবশ্য ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হিতকরী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার হদিশ পাওয়া যায়। এটি 'ঢাকা সুলভ যন্ত্র হইতে ১ পয়সা মূল্যে প্রচারিত'। এতে সম্পাদক, প্রকাশক বা স্বত্বাধিকারী কারো নাম নেই। — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৯, ২য় খণ্ড, পৃ.-৫।

১২৩. মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ডায়েরীতে পত্রিকা প্রসঙ্গে আলোচনায় 'হুগলী বোধোদয়' নামটি পাওয়া যায়। 'আজীজন নাহার' এবং 'হিতকরী' ছাড়াও মশাররফ সম্পাদিত তৃতীয় একটি পত্রিকা সম্পর্কে পরোক্ষ কিছু সূত্র অন্যত্রও পাওয়া যায়। ১৯২০ সালের ৩০শে মে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কার্যালয়ে মীর মশাররফ হোসেনের চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী উল্লেখ করেন যে, মীর মশাররফ হোসেন দুখানি মাসিক ও একখানি সংবাদপত্র বের করেছিলেন। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কার্যবিবরণী, ষড়বিংশ বার্ষিক অধিবেশন, ৩০শে মে ১৯২০, পৃ.-৩)।

১২৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ.-১৯৫

১২৫. এই সময় যাঁরা ইসলামী গ্রন্থ-রচনায় ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখক ও তাঁদের রচনা নিম্নরূপ ঃ—

লেখক	রচনাসমূহ
মোহাম্মদ নইমুদ্দীন — (১৮৩২-১৯০৮)	জোব্দাতল মসায়েল, ফতুয়ায়ে আলমগিরী, কালেমাতুল কুফর ইত্যাদি।
মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফআলী — (১৮৫৮-১৯২০)	দুগ্ধ সরোবর, সৌভাগ্য স্পর্শমণি (অনুবাদ গ্রন্থ)
রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী —	সমাজ ও সংস্কারক, অগ্নি-কুক্কুট (এটি মশাররফের 'গো-জীবনে'র (১৮৫৯-

১৯১৯)	প্রতিবাদী রচনা), প্রবন্ধ কৌমুদী, সুরিয়াবিজয় প্রভৃতি।
শেখ আবদুর রহিম — (১৮৫৯-১৯৩১)	হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, ইসলামতত্ত্ব, নামাজতত্ত্ব, হজবিধি, ইসলাম ইতিবৃত্ত, কোরআন হাদিসের উপদেশাবলী, রোজাতত্ত্ব প্রভৃতি।
মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা — (১৮৬১-১৯০৭)	খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা, রদ্দে খ্রীষ্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম, মেহেরুল এসলাম, হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, খ্রীষ্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ, ইসলামী বক্তৃতামালা ইত্যাদি।
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ — (১৮৬২-১৯৩৩)	বোধোদয়তত্ত্ব, তোহফাতুল মোসলেমিন, এসলামতত্ত্ব, গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ, হক নসিহত, নামাজশিক্ষা ইত্যাদি।
শেখ আবদুস সোবহান	হিন্দু মোসলমান (১৮৮৮) প্রভৃতি।

১২৬. যেমন-আখবারে এসলামিয়া (১৮৮৪, করটীয়া, ময়মনসিংহ), হাফেজ (১৮৯৭, কলকাতা), হানিফি (১৯০৩-০৫, ময়মনসিংহ), ইসলাম (১৯০০-০১, কলকাতা), ইসলাম প্রচারক (১৮৯১, কলকাতা), নুর-অল-ইমান (১৯০০-০১, কলকাতা), মিহির (১৮৯২-৯৩ কলকাতা) প্রভৃতি।

১২৭. মীর মশাররফ হোসেন, বিধি খোদেজার বিবাহ, বিজ্ঞাপন, মশাররফ রচনা সম্ভার, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মাঘ, ১৩৮৬, পৃ.-৫৭৩-৭৪

১২৮. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ.-৭৩

১২৯. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ.-২৬৩

চতুর্থ অধ্যায়
মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য বিশ্লেষণ
উপন্যাস
রত্নবতী

১. পরিচয়

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১২৭৬ অব্দে) মীর মশাররফ হোসেন 'রত্নবতী' প্রকাশ করেন। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ

গাঁথিয়া কল্পনাসূত্রে নব-গল্পহার।
সঁপিলাম বন্ধুগণে নব-উপহার॥[১]

গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বললেন ঃ

> একটি কৌতুকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার রচনাকার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। আজকাল অনেকানেক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার অনুবাদের পক্ষপাতী হইয়া সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন। আমি সে পথের পথিক না হইয়া যথাসাধ্য এই গল্পটি কল্পনা করিয়াছি। ভাষাসঙ্গতি ও গল্পের বুনন যতদূর পারিয়াছি সামঞ্জস্য রাখিতে ত্রুটি করি নাই।[২]

লেখক এখানে 'রত্নবতী'র গল্পটিকে তাঁর স্বকপোল কল্পিত বলে দাবি করেছেন এবং পূর্ববর্তী রচনা থেকে স্বাতন্ত্র্যের কথাও বলেছেন। এই কারণে রচনাটির গুণাগুণ আলোচনার পূর্বে বাংলা উপন্যাস ও আখ্যানধর্মী গদ্যরচনা সাহিত্যের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত স্মরণ করা দরকার।

২. বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত

'রত্নবতী' রচনার আগে এবং তার সমকালে বাংলা যে সব গদ্যআখ্যান প্রচলিত ছিল সেগুলিকে সুকুমার সেন চারটি ধারায় শ্রেণীবদ্ধ করেছেন।[৩]

১। লোকরঞ্জক নক্‌শা
২। অদ্ভুত রসাত্মক রূপকথা
৩। ঐতিহাসিক কাহিনী
৪। খ্রীষ্টান প্রচারকদের লেখা অনুবাদ ও মৌলিক নীতিকাহিনী

এই চারটি ধারার প্রথম ধারায় বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের উন্মেষ পর্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রচনা "সমধিক উপন্যাসের লক্ষণ বিশিষ্ট"।[৪] বাস্তব জীবনের খণ্ডচিত্রগুলিকে একটি প্রধান চরিত্র অবলম্বনে লেখক একটা মোটামুটি ধারাবাহিক কাহিনীর রূপ দিয়েছেন। কিন্তু নানা কারণে তার সীমাবদ্ধতা তাকে সার্থক উপন্যাস হতে দেয়নি।

ঐতিহাসিক কাহিনী-নির্ভর রোমান্সরচনার ধারায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট লেখক। তাঁর 'ঐতিহাসিক

উপন্যাস' রোমান্টিক প্রেম কাহিনীর ধারা অবলম্বন করে রচিত। এই ধারাই পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে উপন্যাস রচনায় সার্থকতা পেয়েছে। অন্যপক্ষে খ্রীষ্টীয় নীতিপ্রচার সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ'। এই গ্রন্থের রচয়িতা (মতান্তরে, অনুবাদক) হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স। বাংলাদেশের অনুন্নত সমাজের বাঙালী খ্রীষ্টানদের জীবনচিত্র বাস্তব সম্মত ভাবে লেখক প্রকাশ করেছেন। অদ্ভুতরসাত্মক রূপকথাধর্মী রচনারও বহু দৃষ্টান্ত আছে। হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয় বসন্ত' একটি দৃষ্টান্ত। গোপীমোহন ঘোষ 'বিজয়বল্লভ' নামে একটি রচনায় ''রূপকথাকে উপন্যাসের ছাঁচে''[৫] ফেলে গল্প লিখেছেন। এই সব রচনাধারাই কোনো না কোনো ভাবে পরবর্তী বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যে মুক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ঘটলো তা ঠিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের বাস্তবতাকে অবলম্বন করে হয়নি। বরং তিনি রোমান্সের রাজপথ বাঙালী পাঠকের জন্য উন্মোচিত করেছিলেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাধারণ বাঙালী জীবনের দারিদ্র্যের ছবি ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে। কিন্তু সে গল্পও রূপকথার বা রোমান্সের ইচ্ছাপূরণের ঢঙ-এ সাজানো। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স এবং জাতীয়তাবোধ দুয়ের মিশ্রণে তাঁর গল্পরসের আকর্ষণ তীব্রতর করে তুলেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের এই সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে মুসলমান সাহিত্যকারদের রচনা-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই সেখান তেমন চোখে পড়বার মতো গ্রন্থ রচিত হয়নি। 'রত্নবতী' প্রকাশের নয় বৎসর পূর্বে শামসুদ্দীন মোহম্মদ সিদ্দিকী 'উচিত শ্রবণ' নামে একটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন। এটিই মুসলমান সাহিত্যকার রচিত প্রথম গদ্য আখ্যায়িকা। এর পর গোলাম হোসেন, শেখ আজিমুদ্দীন, মুন্সী নামদার, সুজাতআলী বা আয়েন আলী শিকদার যে সব নকশা বা প্রহসন বা গদ্য জাতীয় রচনা প্রকাশ করেছিলেন তাদের সঙ্গে 'রত্নবতীর' চরিত্রগত পার্থক্য ছিল। মীর মশাররফ যখন গদ্য আখ্যায়িকা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তার আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি বা তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি বিস্তার করেছে। উপরন্তু এই উপন্যাসগুলির মধ্যে স্পষ্ট আখ্যান রচনার একটি বিশিষ্ট রীতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই আখ্যান রচনার রীতি পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাসকারদের আদর্শ হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছে।

কিন্তু এই আখ্যান রচনারীতি সব লেখক যে আয়ত্ত করতে পেরেছেন এমন নয়। বহু লেখক রূপকথার আখ্যান অবলম্বন করে গল্প রচনা করেছেন। সুকুমার সেন তাদের বহু লেখকের নাম ও গ্রন্থনামের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া অনুবাদমূলক অনেকগুলি আখ্যায়িকাও এই সময় রচিত হয়েছে।[৬] মীর মশাররফ এসব রচনার সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল ছিলেন। ফলে তিনি যখন 'রত্নবতী' প্রকাশ করলেন তখন এই অনুবাদমূলক রচনা থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করতে ভোলেননি। মশাররফ কোন গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে 'রত্নবতী' লেখেননি। দেশীয় উপাদান উপকরণ নির্ভর করে ''শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা আর উদ্ভাবনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে'[৭] গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সুতরাং শিল্পীর কল্পনা এবং উদ্ভাবন শক্তি আর সামঞ্জস্যবোধের দাবি কতটা এই কাহিনীতে রক্ষিত হয়েছে তা বিচারযোগ্য।

৩. কাহিনী

গুজরাট নগরে এক রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র একদিন কথা প্রসঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ''ধনশ্রেষ্ঠ কি বিদ্যাশ্রেষ্ঠ'' এই প্রশ্নের উত্তরে রাজপুত্র ধনগৌরব প্রমাণ করতে চান। মন্ত্রিপুত্র বিদ্যার গৌরব প্রমাণ করতে তৎপর

হন। এই প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্য দুই বন্ধু বিদেশে ভ্রমণ করতে বেরিয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের দ্বারা এই বিতর্কের মীমাংসা করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। পথে রাজপুত্র সুকুমার অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক কপিরূপী তপস্বীর কাছে অভীষ্ট পূরণের জন্য একটি অঙ্গুরীয় লাভ করেন। তপস্বী তাঁকে সবদিকে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা দিলেও পশ্চিমে যেতে নিষেধ করেন। রাজপুত্র কৌতূহলবশত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পশ্চিম দিকেই ভ্রমণ করেন। ফলে তিনি একটি বিপত্তির মধ্যে পড়েন। তিনি ঘুরতে ঘুরতে রত্নপুর রাজ্যে উপস্থিত হন এবং রাজকুমারীর স্বয়ম্বর হবার শর্ত শোনেন। বহু রাজপুত্র ইতিমধ্যে রাজকুমারীর অসম্ভব শর্তপূরণে অক্ষম হয়ে কারাদন্ড ভোগ করছেন। সুকুমার এই রাজকুমারীকে লাভ করার জন্য তার শর্তপূরণে উদ্যোগী হন। তিনি পর পর রাজকুমারীর ধন সম্পদ ইত্যাদির প্রার্থনা পূরণ করতে পারলেন। কিন্তু রাজকুমারী কৌশলে জেনে নিলেন সুকুমার কী উপায়ে তাঁর প্রার্থনা পূরণ করছেন। রাজকুমারী বিবাহে অনিচ্ছুক। তিনি রাজপুত্রের প্রার্থনা পূরণ করবার ক্ষমতা দেখে ভীত হয়ে দাসীকে রাজপুত্রের ধন সংগ্রহ রহস্য জানতে পাঠান। দাসী রাজকুমারীকে জানান রাজপুত্র অঙ্গুরীয়কের কাছে প্রার্থনা করে সব সম্পদ আহরণ করেন। রাজকুমারী এবার রাজপুত্রকে জব্দ করার উপায় খুঁজে পান। তিনি তাঁর কাছে ঐ আংটি চেয়ে বসেন। রাজপুত্রকে রাজকন্যা যা চাইবেন তা তিনি দিতে বাধ্য নতুবা তাঁর কারাবাস অবশ্যম্ভাবী। রাজপুত্র শেষদিন রাজকন্যার প্রার্থনা পূরণ করতে পারলেন না। তিনি কারারুদ্ধ হলেন। এই পর্যন্ত কাহিনীর প্রথম অংশ।

কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে সুমন্ত্রের গল্প। মন্ত্রিপুত্র সুমন্ত্র দেশভ্রমণে বেরিয়ে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষপর্যন্ত ঐ তপস্বী কপির কাছে এসে পৌছান। রাজপুত্রের মতো তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনিও ঐ সরোবরের জল পান করতে উদ্যত হলে সন্ন্যাসী তাঁর প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। তিনি তপস্বীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেন এবং ইচ্ছামত রূপধারণ করবার বর লাভ করেন। সন্ন্যাসীর অজ্ঞাতে তিনি সরোবরের দুদিকের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জল — যার প্রভাবে মানুষও কপি রূপ ধারণ সম্ভব — সংগ্রহ করে রাখেন। তারপর যথারীতি সন্ন্যাসীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তিনি পশ্চিমদিকে ভ্রমণ করতে করতে রত্নপুর রাজ্যে এসে পড়েন। সেখানে তিনি জানতে পারেন রাজকুমারীর অন্যায় পণ পূরণে ব্যর্থ হয়ে তাঁর বন্ধু সুকুমার কারাগারে বন্দী হয়েছেন। তখন তিনি কৌশলে রাজকুমারীর স্নানের জলে সরোবরের জল মিশ্রিত করে রাজকুমারীকে বানরীতে পরিণত করেন। এরপর তিনি গণকের বেশ ধারণ করে রাজার সঙ্গে দেখা করেন। রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি জানান এক সন্ন্যাসীর প্রসাদে রাজকুমারী আবার নারীরূপ ফিরে পাবেন। তারপর তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে ঐ অলৌকিক জলের প্রভাবে রাজকুমারীকে বানরী থেকে নারীতে পরিণত করেন। রাজপুত্র সুকুমারের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়। রাজপুত্রের বাসরঘরে সুমন্ত্র স্বরূপ ধারণ করেন। বিদ্যা ও বুদ্ধির গৌরব প্রমাণিত হয়। মন্ত্রিপুত্রের সঙ্গে মন্ত্রিকন্যার বিবাহ হয়। এইভাবে গল্পের শুভ সমাপ্তি ঘটে। রাজপুত্র সুকুমার এবং মন্ত্রিপুত্র সুমন্ত্র কিছুদিন রত্নপুরে বসবাস করে নিজের রাজ্যে ফিরে আসেন।

৪. কোন শ্রেণীর রচনা

'রত্নবতী'কে মীর মশাররফ 'কৌতুকাবহ উপন্যাস'[৮] বলে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া তিনি একে 'নবগল্প' বলে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া তিনি একে "নবগল্প" এবং গল্পটিকে কল্পনামূলক বলে দাবি করেছেন।

লেখকের এই দাবি কোনো কোনো সমালোচক স্বীকার করেছেন। তাঁরা হয়তো উপন্যাসের সংজ্ঞাকে অনেকটা প্রসারিত করে এই উপন্যাসের দাবি মেনে নিয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, মুহম্মদ আবদুল হাই, সুকুমার সেন, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল লতিফ চৌধুরী প্রমুখ এই রচনাটিকে উপন্যাস বলে মনে করেছেন।[৯] উপন্যাস কথাটির অর্থ যদি হয় কল্পনামূলক কাহিনী "a fiction in prose of a certain extent"[১০] তাহলে 'রত্নবতী'কে উপন্যাস বলা যায়। অন্যদিকে আনিসুজ্জামান, মোহম্মদ আবদুল আউয়াল, কাজী আবদুল মান্নান, সিরাজুদ্দিন আমেদ, আবুল আহসান চৌধুরী প্রমুখ একে উপন্যাস বলতে চাননি।[১১] যাঁরা একে উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলে আলোচনা করতে চান তাঁরাও ব্যাখ্যা করে একে 'রূপকথা শ্রেণীর গল্প' বলে অভিহিত করেন।[১২] মুনীর চৌধুরী গল্পটিকে 'অদ্ভূতরসের উপকথা' বলেছেন।[১৩] বাংলা উপন্যাস রচনার প্রথম পর্বে অনেক রূপকথা শ্রেণীর গল্প রচিত হয়েছিল। এটিকে সেই শ্রেণীর গল্প বলে তিনি মনে করেন।

লেখক 'রত্নবতী'কে যে নবগল্প এবং কল্পনামূলক বলে দাবি করেছেন সে দাবির তাৎপর্য এই যে গল্পটি কোন গ্রন্থের অনুবাদ বা কোন প্রচলিত সূত্র থেকে গৃহীত নয়। এটি কল্পনামূলক এই কারণে যে গল্পটিতে লেখক প্রচলিত রূপকথার বুননের উপরে নিজের সৃষ্টিধর্ম আরোপ করে তাকে কিছু নবীনতা দিয়েছেন। কিন্তু নানা কারণে গল্পটি যে রূপকথার রীতি প্রকৃতির উপর স্থাপিত তা সকলেরই চোখে পড়বে। রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র যে রাজ্য থেকে উঠে এসেছেন তা রূপকথার কল্পরাজ্য। তাঁরা সাধারণ একটি বিষয়ের বিতর্ক নিরসনের জন্য যে দেশভ্রমণের মাধ্যম অবলম্বন করেছেন তা রূপকথার একটি প্রিয় বিষয়। রূপপথার রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে যান আর আমাদের গল্পের রাজপুত্র কীসে গেছেন যদিও আমরা জানিনা কিন্তু তিনি অলৌকিক অঙ্গুরীর মাধ্যমে রাজকন্যাকে প্রায় হস্তগত করে ফেলেছিলেন। কিন্তু রাজপুত্রের জয় এ গল্পে হয়নি। রাজকন্যাও রাজপুত্রের রূপ দেখে তাকে মন প্রাণ দিয়ে বসেন নি বরং বিবাহে তাঁর অরুচি বলে দাসীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি রাজপুত্রকে বন্দী করেছেন। এই হল এ গল্পের স্বাতন্ত্র্য। এরপরের অংশটুকু রূপকথার গল্পের সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। লালবিহারী দে যে বাংলার রূপকথা সংকলিত করেছিলেন তার একটি গল্পে মন্ত্রিপুত্রের বুদ্ধির বাহাদুরি সবটুকুই ছিল। সে ছিল রূপকথার কল্পরাজ্যের অলৌকিকতা। আর মীরের গল্পে আধুনিককালের রূপকথার বৈচিত্র্যটুকুই তার স্বাতন্ত্র্যের অংশ।

৫. কাহিনী বিশ্লেষণ

উপন্যাস মানুষের বাস্তব জীবন এবং তার জীবনাভিজ্ঞতার কাহিনী। মানুষের প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকবার কাজ, সামাজিক মানুষের চরিত্র স্ফুরণের কাজ[১৪] উপন্যাসের প্রিয় বিষয়। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আখ্যান রচনা উপন্যাস সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে ব্যক্তির বিকাশ। মানুষ আর সামাজিক বন্ধনে কোন নিরবয়ব মানব সত্তা মাত্র নয় সে ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ। এই ব্যক্তিবৃত্তীয় মানুষের জীবন আখ্যান রচনা হয়েছে উপন্যাস সাহিত্যে। এই নবজাগ্রত ব্যক্তিসত্তার কাহিনী রচনা করবার সাহিত্যরূপ হিসেবে উপন্যাস পূর্ববর্তী সাহিত্যরূপগুলিকে উপেক্ষা করে নিজের নিজস্ব সাহিত্যিকরূপ নির্মাণ করে নিয়েছে।

উনিশ শতকের বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা এবং ইউরোপীয় জীবনচেতনার প্রভাবে মধ্যযুগের সামাজিক জীবন ভেঙে যাচ্ছিল। বিশেষ করে কলকাতা হয়ে উঠেছিল এই নব্য ব্যক্তিবাদের বিকাশের ক্ষেত্র। ইংরেজী শিক্ষিত

মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যেই এই ব্যক্তিবোধের প্রথম উন্মেষ ঘটে। মীর মশাররফ 'রত্নবতী' উপন্যাসে যে মানুষকে পাত্রপাত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন তারা ঠিক ব্যক্তিমানুষ নয় তাদের চরিত্রে রূপকথার টাইপ এখনো আঁটোসাঁটো ভাবে লেগে আছে। এই পাত্রপাত্রী তাদের ব্যক্তিগত জীবনচেতনার কথা বলেননি কিংবা বলা যায় তাঁদের স্রষ্টার সেই জীবন চেতনার কোন প্রতিফলন তাদের উপরে পড়েনি। এমনকি ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব নির্ভর করে যে দেশ ও কাল চেতনার উপর, সেই দেশ ও কাল চেতনাও এখানে নেই। রাজ্য হিসাবে গুজরাট হয়তো একটা স্থান কিন্তু মধ্যযুগের মুকুন্দের কাল থেকে এই গুজরাট সাহিত্যে বহুবার ব্যবহার হয়ে আসছে। 'রত্নবতী' উপন্যাসের রত্নপুরও একটি নির্বিশেষ দেশনাম। অন্যপক্ষে কালের কোনো উল্লেখ এ গল্পে নেই। Ian Watt তাঁর The Rise of the Novel গ্রন্থে এই দেশ ও কালকে ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উদ্বোধনের দুটি পরিপূরক বিষয় বলে গ্রহণ করেছেন।[১৫] ব্যক্তির যে সত্তার প্রকাশ দেশ ও কালকে আশ্রয় করে ঘটে এ কাহিনীতে তা দেখা যায় না। শ্রীশ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বারংবার যে বাস্তবতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে উপন্যাসের সার্থকতা সন্ধান করেন তা এখানে অনুপস্থিত। মশাররফ রাজপুত্র বা মন্ত্রিপুত্রকে যে নামে চিহ্নিত করেছেন ব্যক্তিনাম অপেক্ষা তার চরিত্র বা শ্রেণীগত ব্যঞ্জনা অধিক। রাজপুত্রের নাম সুকুমার, তার কায়াগত সৌকুমার্যই এখানে প্রধান। মন্ত্রিপুত্রের নাম সুমন্ত্র ঃ তাতে তার সুমন্ত্রনা শক্তির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টত না হলেও লেখক বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজকুমার সুদর্শন, যা এতকাল রাজপুত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। রাজকুমারীর নাম রত্নবতী। এটিও স্থান বা ধন গৌরবের ইঙ্গিতপূর্ণ। রত্নপুরের রাজকন্যা তাই তিনি রত্নবতী কিংবা পিতৃধনে ধনী তাই তিনি রত্নবতী। মন্ত্রী মন্ত্রনাকারী – এই তার শ্রেণীগত পরিচয়। উপন্যাসে বাস্তব জীবন বর্ণনার কাজে দেশকালের পটে যে ব্যক্তিকে উপস্থাপিত করা হয় সে ব্যক্তি আর এই নাম চিহ্নধারী ব্যক্তি এক নয়। লেখক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার পরিবর্তে চিরাচরিত ধারণাকে ব্যবহার করে পাত্রপাত্রীর ব্যক্তি পরিচয়কে ক্ষুণ্ন করেছেন। রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র কিংবা রাজকন্যা বা রাজা কারো ব্যক্তি পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি।

'রত্নবতী'র কাহিনী স্পষ্টত দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে রাজপুত্রের দেশ ভ্রমণের বর্ণনা। এই ভ্রমণ বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, নয় কল্পনায় অতিরঞ্জিত। রাজকন্যার প্রার্থনা পূর্ণ করবার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন সময় তার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছারও পরিচয় আমরা পাইনা। এমনকি অঙ্গুরীয় দিয়ে কারারুদ্ধ হবার সময়ও তার কোন ব্যক্তিগত চিত্তক্ষোভ বা বুদ্ধিবিভ্রমজনিত আত্মগ্লানি এ গল্পে নেই। মন্ত্রিপুত্রের গল্প এ কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ। তিনি অবশ্য কপি তপস্বীর ক্রোধ প্রশমিত করে ইচ্ছারূপ ধারণের বর লাভ করবার সময় একটু মানবোচিত বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহার করে সরোবরের জল সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। তারপর রত্নপুর রাজ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এবং রাজপুত্রকে উদ্ধার করেছেন। গল্পের প্রথম অংশ আর দ্বিতীয় অংশ কাহিনীর কোন পারম্পর্যে নিবদ্ধ নয়। দুজন মানুষের গল্প শেষপর্যন্ত একটি উপসংহারে সংহত হয়েছে। সেদিক থেকে যাকে উপন্যাসবিদেরা loose plot বলেছেন এ তারই দৃষ্টান্ত। দুটি 'এপিসোড' নিয়ে এ গল্প গড়ে উঠেছে। লেখক এ্যারিস্টটলীয় 'Organic plot' নির্মাণ না করে এই loose plot -এ তার কাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন। এই শ্রেণীর গল্পের ঐক্য ক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে ব্যক্তির উপর।[১৬] পরবর্তী রচনাগুলিতেও দেখব মীর মশাররফ কাহিনীকে কিছুটা আলগাভাবে একাধিক এপিসোডে বিন্যস্ত করেছেন। এ কাহিনীতে একটি নিষেধের ভূমিকা আছে। আগেকার

রূপকথার নিষেধ ছিল গল্পের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির একটি কৌশল। এই নিষেধ না থাকলে কাহিনী হয়ে পড়ত এক সরলরেখায় চলমান এবং নিস্তরঙ্গ। মীর মশারফ হয়তো এই নিষেধকে রূপকথার Form থেকেই গ্রহণ করেছিলেন কিংবা তিনি বুঝেছিলেন যে কাহিনী তিনি বর্ণনা করতে যাচ্ছেন তা নিস্তরঙ্গ এবং নিরুত্তেজ। এই কারণে একটি নিষেধের অনুজ্ঞা উপস্থাপিত করে কাহিনীতে কিছুটা দ্বন্দ্বে উত্তেজিত করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু কার্যত দেখা যায় সে নিষেধ এ গল্পে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। রাজপুত্রের ক্ষেত্রে যদি মনে করা যায় সে নিষেধের কিছু মূল্য ছিল মন্ত্রিপুত্রের ক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকা নেই। রাজপুত্র নিষেধ অমান্য করে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করেছিলেন তাতে তিনি বিপত্তিতে পড়েন কিন্তু মন্ত্রিপুত্র সেই পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে বিপত্তি থেকে রাজপুত্রকে উদ্ধার করেন। ফলে গল্পটি প্রায় নির্দ্বন্দ্ব। রশীদ আলফারুকী এবং সেলিম জাহাঙ্গীর কাহিনী ও চরিত্রের এই দ্বন্দ্ব-হীনতার কথা[১৭] বলেছেন। অবশ্য কাহিনীতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই তা নয়। লেখক যে বাহ্যিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন সেগুলি অতিশয় দুর্বল এবং ক্ষীণ। যেমন রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের চিন্তাগত দ্বন্দ্ব দিয়ে কাহিনীর সূচনা হল। কিন্তু সে দ্বন্দ্ব বিশেষ তীব্রতা পেলনা। গল্পের মাঝে তপস্বীর সঙ্গে রাজপুত্র এবং মন্ত্রিপুত্রের একটা লঘু দ্বন্দ্ব আছে। আর পরে আছে রাজকুমারীর প্রার্থিত বস্তু দিতে না পারার ফলে একটি ক্ষীণ উৎকণ্ঠা। সে সব গল্পের মধ্যে যে টুকু তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার ঢেউ আমাদের মনে সাড়া জাগাতে পারেনা। ফলে যে মানব আখ্যান আমাদের কৌতূহলকে ধরে রাখে যাকে বলা যায় 'Fresh intersting and worth telling' গল্প সে রকম কিছু লেখক রচনা করতে পারেননি। রত্নবতীর কাহিনী গ্রন্থনের দুর্বলতাগুলিকে নিচের সূত্রে সাজানো চলে ঃ-

১. কাহিনী কার্যকারণ পরম্পরাহীন
২. এর ঘটনাসন্নিবেশে আকস্মিকতার প্রাবল্য। গল্পের গ্রন্থনায় কোন নৈপুণ্য নেই।
৩. লেখক গল্পের মধ্যে মানব জীবনরস পরিবেশনের চেয়ে একটি নীতি উদ্দেশ্য প্রচারকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।
৪. গল্পের কাহিনী এবং গ্রন্থনায় রূপকথার গতিভঙ্গির প্রভাব। এজন্য চরিত্রের চেয়ে গল্পের কাহিনীর জোর বেশি।

এই দুর্বলতাগুলি মনে রেখেও বলা যায় এই গল্প রচনা করে – ১. লেখক বাংলা গদ্য ভাষার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, ২. কাহিনী নির্মাণের কৌশল বুঝবার চেষ্টা করছেন, ৩. গল্পরসের আকর্ষণ ধরে রাখতে চেষ্টা করছেন। এসব সাফল্য প্রথম গ্রন্থের গ্রন্থকার হিসেবে তিনি কিছুটা অর্জনও করেছেন।

৬. মূল্যায়ন

'রত্নবতী' উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, বাস্তবতাবোধ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দীপ্তিতে উজ্জ্বল নয়। প্রায় সব সমালোচকই এ কথা কোন না কোন ভাবে বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল মশাররফ্ উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছেন তার ব্যর্থতার কারণ কি ? তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে কিনা ?

আগেই বলেছি উপন্যাস রচনার এই প্রথম প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক না হলেও এরই ভিতর থেকে তিনি ভাষার

শক্তি এবং কাহিনীরচনার কৌশল আয়ত্ত করেছেন। যত অসম্পূর্ণই হোক প্রচেষ্টা হিসেবে তা অভিনন্দনযোগ্য। বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যে তিনি একালের প্রথম বিশিষ্ট শক্তির কাহিনীকার। এই প্রচেষ্টার ফলে তিনি পরবর্তী কাহিনী রচনায় যে সাফল্য লাভ করলেন তা এক কথায় বিস্ময়কর। বিশেষত তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' এবং আরো কিছু রচনায় এই প্রথম কাহিনী রচনার পরীক্ষা নিরীক্ষাজনিত শক্তির পরিচয় ছিল।

'রত্নবতী'কে মীর মশাররফ উপন্যাসের সার্থকতা দিতে পারেননি। বাস্তবতা প্রবণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় চরিত্র রচনাও তিনি করতে পারেননি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস ঠিক বাস্তব জীবনের কাহিনী নয় বরং তা রোমান্সের কল্পনায় রঙীন। পরবর্তী কপালকুণ্ডলা বা মৃণালিনীতেও বঙ্কিমের হাতে বাস্তব পটভূমি এবং মানুষের জীবনের চেয়ে কল্পনার দূরভিসার ও প্রেমের রহস্যময়তার আকর্ষণ বেশি। আসলে বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার অক্ষমতা শুধু মীর মশাররফের নয় সেকালের বাংলা উপন্যাসের তা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মীর মশাররফ যে গ্রামীণ পটভূমিতে বসে উপন্যাস রচনা করেছেন সেখানে কলকাতা-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তশ্রেণী বা ব্যক্তিত্ব প্রধান মানব জীবনের বিকাশ তখনো বহু বিলম্বিত। কলকাতা-কেন্দ্রিক জীবনেও বঙ্কিমকে বারবার ইতিহাসের দূর প্রসারিত ভিত্তি পটের উপর মানব জীবনকাহিনীকে উপস্থাপিত করতে হয়েছে। মীর সাহেব এ কাহিনীকে উপন্যাস বলুন আর নবগল্পই বলুন কাহিনীর মধ্যে মানব জীবনরস পরিবেশন করবার চেয়ে তাঁর পক্ষে বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই ছিল মূল কথা। তিনি সাধারণভাবে বাংলাদেশের সমাজকে এবং বিশেষভাবে তাঁর পরিপার্শ্বে বিরাজমান সাধারণ দরিদ্র গ্রামীণ সমাজের মানুষকে শোনাচ্ছেন বিদ্যার গুরুত্বের কথা। যে গ্রামীণ সমাজে তখনো শিক্ষার বিশেষ কোন প্রসার হয়নি যারা মধ্যযুগীয় জীবন যাপন রীতির ধারা অনুসরণ করে চলেছে সেই সাধারণ মানুষের সমাজের কাছে তাঁর এই বার্তাজ্ঞাপনই মুখ্য হয়ে উঠেছে। আর একটু স্বাধীনতা নিয়ে বলা যায় গ্রামীণ মুসলমান সমাজের কাছেও তাঁর এই বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রয়োজন ছিল। এর মূল ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে। ঐতিহাসিক কারণে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ না করে[১৮] নিজেদের শরিয়তী সমাজের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আত্মগোপন করে দীর্ঘ কালক্ষয় করেছে। এতে মুসলমান সমাজ উন্নত হয়নি। সীমাবদ্ধ পরিসরেও যেটুকু নবজাগরণের ভাবগৌরব হিন্দু বাঙালী আয়ত্ত করেছে মুসলমান সমাজ তা থেকেও মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে দেখতে পাই এর কিছু আগে আব্দুল লতিফ, জেমস লঙ, সৈয়দ আমীর আলী, প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজকে মনোযোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। ১৮৬৩খ্রী. আব্দুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটী' নামে সমিতি গঠন করে মুসলমান সমাজকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার দিকে আগ্রহী হতে আহ্বান করেছেন। এর কিছুপরে সৈয়দ আমীর আলীও মুসলমান সমাজে প্রগতিচেতনা জাগ্রত করবার কাজ করছেন। অর্থাৎ মীর মশাররফ তাঁর উপন্যাসে বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের যে কাজ করেছেন তা সামাজিক একটি প্রচেষ্টারই সাহিত্যগত রূপায়ণ। তিনি বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকটন করবার দ্বারা মুসলমান সমাজকে আধুনিক জীবনে এনে দিতে চান। সামাজিক প্রচেষ্টার এই বাণীরূপ রচনা — একটি কল্যাণমূলক গুরুত্বপূর্ণ করে গোটা সমাজের কাছে তার ভাবগত উদ্দেশ্য প্রচার তাঁর কাছে বেশি জরুরি। এর সঙ্গে একটি আপাত তাৎপর্যহীন ঘটনাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যার স্বাধীনতা গ্রহণ করতে চাই। আমরা আগেই দেখেছি মীর মশাররফ তপস্বীর মাধ্যমে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রকে একটি নিষেধাজ্ঞা শুনিয়েছিলেন। তপস্বী তাদের পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছিলেন। আমরা কাহিনীর মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞার কোন তাৎপর্য খুঁজে পাইনা। এজন্য মনে করি মীর মশাররফ এই নিষেধটি রূপকথা থেকে গ্রহণ করে ছিলেন কিন্তু

তাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারেননি।

অধুনাতন সাহিত্যবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় লেখক যা রচনা করেছেন তার অন্তর্নিহিত বিন্যাস ভেঙে ভেঙে দেখা হয়। মনে করা হয় রচনার মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তিগুলি বিশিষ্ট অর্থকে আড়াল করে রাখে তার স্পষ্টতাকে ঢেকে রাখে "Conflicting forces within the text itself inevitably dissipate the seeming definiteness of its structure and meanings into an indefinite array of multiplex, incompatible and undecidable possibilities"[১৯] এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে মনে করি পশ্চিম সম্বন্ধে লেখকের একটি দ্বিধারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর আখ্যানে। মনে রাখতে হবে, মুসলমান সমাজ তখন ইংরেজি শিক্ষাবিমুখ। ইংরেজি ও পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মুসলমান সমাজের মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মীরসাহেব তাঁর 'আমার জীবনী'তে লিখেছেন ঃ

> ইংরেজী পড়িলে পাপ ত আছেই। আর মরিবার সময় গিডীমিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ রসুলের নাম মুখে আসিবেনা। তাহার পরেও আত্মীয় স্বজন গুরুজনগণের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংরেজী পড়িলেই একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়।[২০]

এ ধারণা মীর মশাররফের নয়, কিন্তু দীর্ঘদিনের লালিত এ ধারণা সমাজ মানসিকতাকে আক্রান্ত করেছিল। মীর মশাররফ সেই সমাজ মানসিকতার অবরুদ্ধ নিষেধ বাণীটিকেই, মনে করি, পশ্চিম ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা রূপে ব্যবহার করেছেন। আসলে পশ্চিম ভ্রমণ সম্বন্ধে নিষেধ সেকালেরই সামাজিক অনুজ্ঞা যাকে প্রথাগতভাবে সমাজ থেকে নিয়ে মীর মশাররফ পরীক্ষা করেছেন, বিপদে পড়েছেন আবার সেখান থেকেই স্বর্ণোজ্জ্বল রাজকন্যাকে লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার/সেথা হতে সবে আনে উপহার"।[২১] মীর মশাররফ মুসলমান সমাজে প্রচারিত পশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞানের জগৎ ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞাকে এইভাবে ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর রচনায় কাজ করেছে সমাজমনের – তাঁর নিজেরও অবচেতন মনের – একটি ভাবপ্রতিজ্ঞা। অন্যপক্ষে সচেতন সমাজ কল্যাণ কামী শিল্পী হিসেবে মীর মশাররফ্ এই অবচেতনার ভাবকে প্রতিরুদ্ধ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন রাজপুত্র বা মন্ত্রিপুত্র কেউই তপস্বীর নিষেধ গ্রাহ্য করেননি। তাতে রাজপুত্র হয়তো সাময়িক বিপত্তি ভোগ করেছেন কিন্তু আধুনিক জীবনের দরজা তাদের কাছে খুলে গেছে। রাজপুত্র বন্ধু মন্ত্রিপুত্র সুমন্ত্রের বুদ্ধিকৌশলে রাজকন্যা রত্নবতীকে লাভ করে যশস্বী হয়েছেন। মন্ত্রিপুত্র সুমন্ত্রেরও সুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভ ঘটেছে। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা হিসেবে যা গল্পে বিশেষত্বহীন তা সামাজিক ও মানসিক স্তরান্তরে ভিন্নতর অর্থবহতার সন্ধান দেয়। এবং লেখকেরও প্রতিভার পরিচয় জানিয়ে দেয়।

প্রসঙ্গত বহুনিন্দিত রূপকথার গ্রন্থনভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। মশাররফ যে উপন্যাসের বাস্তবতাকে ব্যবহার করতে পারলেন না তা তাঁর নিজস্ব সৃজনীশক্তি হীনতার প্রমাণ। কিন্তু যথার্থ আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় চরিত্রের অভাব তাঁর সমাজে ছিল। যে ব্যক্তিত্ব তিনি দেখেছেন তাদের রূপ পরে 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে রূপায়িত করেছেন। সে মীর লেখক হিসেবে আরো পরিণত এবং আত্মসচেতন। সে মীর বস্তুবর্ণনা সক্ষম বাস্তব জীবনবোধ দীপ্ত। অন্যপক্ষে রূপকথার আখ্যান প্রণালী মীরকে কিছু বেশি সাহায্য করেছে 'রত্নবতী' উপন্যাসে। এখানে এবার একটি কথা বলা যায়। গল্প রচনার চেয়ে, মানুষের জীবনকথার সুখ দুঃখপূর্ণ আখ্যায়িকা

নির্মাণের চেয়ে মীর সাহেবের কাছে বেশি জরুরি ছিল বিদ্যার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা। সুতরাং কাহিনীটি এই নীতিকথা প্রচারের কাঠামো মাত্র। সেদিক থেকে গল্পটি দুর্বল উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনরস বঞ্চিত। কিন্তু যে পাঠক সমাজ চিরাচরিত মধ্যযুগীয় আখ্যানে অভ্যস্ত, রূপকথার বা উপকথার আঙ্গিক তাদের পক্ষে যত সহজে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব তা অন্য পদ্ধতির আখ্যানে সম্ভব ছিলনা। মীর মশাররফ কোন নূতন আঙ্গিক রচনা করতে পারেননি কিন্তু রূপকথার আঙ্গিককে গ্রহণ করে তিনি তার মধ্যে নূতন কালের ভাবগর্ভ বাণী প্রকাশ করেছেন। রূপকথার রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রের উপর নির্ভরশীল কথনশৈলী তাঁর এই বক্তব্যকে যতটা আন্তরিকভাবে জনমনে প্রচার করে দিতে পেরেছে তার সার্থকতা অন্য আঙ্গিকে সম্ভব হত না। ইউরোপীয় সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে তার সাহিত্য শিল্পেরও নূতন রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। অন্যপক্ষে বাঙলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যরূপের পরিবর্তন এমনভাবে জড়িত নয়। বরং পশ্চিমী সাহিত্যরূপের একান্ত অনুসরণে আমাদের নবীন কাব্য উপন্যাস সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। সে রীতির তুলনায় প্রচলিত রূপকথার কাঠামোর গল্প-কথন এবং উদ্দেশ্যধর্মী গল্পকথনের সাফল্য বেশি। নূতন রীতি যে মীর ব্যবহার করতে পারলেন না তার পিছনে তাঁর সৃজনীশক্তির ক্ষীণতা যেমন দায়ী তেমনি দায়ী সেই নবজাগরণের শক্তিহীনতা যা বাংলার বিস্তৃত জীবনের বদ্ধজলাকে একটা বেগবতী স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে পারল না। সুতরাং মশাররফ যেমন আধুনিক রীতির সন্ধান পাননি, কোন আদর্শ অনুসরণ করতে পারেননি তেমনি জাতীয় জীবনের একটা সীমাবদ্ধতাও তাঁর গল্পকথনের এই সীমাবদ্ধতার কারণ। উদ্দেশ্য যদি প্রবল হয়ে গল্পকে তার বশবর্তী করে তোলে তবে তাকে সার্থক সাহিত্যিক রচনা বলা দুষ্কর। মীর মশাররফের গল্পে বিদ্যার বৈশিষ্ট্য প্রমাণই প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিপুত্র সুমন্ত্রের বুদ্ধি বলে রাজকন্যা লাভ যখন সম্ভব হল তখন আমরা গল্পরসের আকর্ষণেই মগ্ন থাকি। তখন ভালো করে বিশ্লেষণ করে বুঝতে হয় বিদ্যার গুরুত্ব কীসে প্রকটিত হল। বস্তুত 'রত্নবতী' উপন্যাসে বিদ্যার গুরুত্ব কী, কিংবা কী বিদ্যার গুরুত্ব তা খুব স্পষ্ট নয়। সুমন্ত্র যে শক্তি বলে রাজপুত্রকে উদ্ধার করেছেন তা বুদ্ধিবল। এ বল আমাদের পুরানো গল্পের বহু চরিত্রের বিশিষ্ট ধর্ম। সুতরাং বলা যায়, লেখক যাই ভেবে থাকুন তাঁর লেখার উদ্দেশ্য গল্পের ভিতরে প্রচ্ছন্নই ছিল। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। John Halperin তাঁর একটি প্রবন্ধে ঊনবিংশ শতকের উপন্যাস তত্ত্ব সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন তাঁর প্রধান আগ্রহ পাঠক ও পাঠ্যের মধ্যে সম্পর্ক রচনা "interested in the relationship between the reader and the text."[২২] এই সম্পর্ক প্রধানত পাঠকের নৈতিক উন্নতি। Thomas Hardy কিংবা George Henry Lewis -এর মতে তা প্রধানত 'mental enlargement'[২৩]। তাই দেখা যায় ঊনবিংশ শতকের উপন্যাস বাস্তবতা এবং নৈতিকতার মধ্যে দোলাচল। ঊনবিংশ শতকের এই উপন্যাসচেতনা আমাদের বাংলা সাহিত্যেও প্রচলিত। বঙ্কিমচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় – (যিনি সাধারণজীবনের বর্ণনার জন্য প্রশংসিত), রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত লেখকদের সকলেই বাস্তবতা ও নীতিবাদিতার মধ্যে চলাচল করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় মীর মশাররফ্ তাঁর 'রত্নবতী'তে পাঠক ও পাঠ্যের মধ্যে এই উনিশ শতকের নৈতিক সম্পর্কই গড়ে তুলেছিলেন। কাজের দিক থেকে তিনি যুগধর্মকেই বহন করেছেন – তাই ছিল তখনকার মূল্যচেতনা।

'রত্নবতী' উপন্যাসে ব্যক্তিচেতনার বিকাশ হয়নি কিন্তু ব্যক্তিবোধের উন্মেষের দুটি একটি ইঙ্গিত আছে। রাজকুমারী রত্নবতী সুকুমারকে দেখে মদনবিহ্বল হয়ে পড়েননি — যা মধ্যযুগীয় নায়িকাদের ধর্ম। বরং তিনি তাকে

বিবাহ করতে চান না। এর মূলে কাজ করেছে তাঁর আত্মগর্বিতা ঃ—

> আর তিনদিবস প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিলেই আমার গর্ব্ব সম্পূর্ণরূপে খর্ব হইবে, সুতরাং বিবাহ করিয়া রাজনন্দন যে, আমার অহংকার চূর্ণ করিতে সর্ব্বাগ্রে সযত্ন হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব যাহাতে মানরক্ষা হয়, এরূপ উপায় কর।[২৪]

এ বাক্য কোন মধ্যযুগীয় রমণীর মুখে উচ্চারিত হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষত নারীর এই গর্ব এবং অহংকার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে বিরল। রত্নবতী রাজকুমারকে দেখে তাঁকে আত্মদান করবার চেয়ে নিজের মানরক্ষার কথা বেশি ভেবেছেন। নারীর এই প্রবল স্বাতন্ত্র্য-দীপ্তি মীর মশাররফের নারী চরিত্রের একটি বড় গুণ। পরে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে আমরা এরকম স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত নারীর সাক্ষাৎ পাবো।

বিষাদসিন্ধু

১. ভূমিকা

"বিষাদসিন্ধু" মীর মশাররফ হোসেনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং পরিচিত রচনা। মীর মশাররফ আর 'বিষাদসিন্ধু' প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। বাংলা ভাষার ইসলামী ইতিহাসের কাহিনীকে তিনি যে রকম রসনিবিড় করে প্রকাশ করেছেন তা এক কথায় অতুলনীয়। কাজী আবদুল মান্নান ঠিকই বলেছেন, বাঙালী সমাজে 'বিষাদসিন্ধু' আর মীর মশাররফ নিবিড় ভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে।[২৫] 'বিষাদসিন্ধু' লেখার আগে মশাররফ আরো কয়েকটি রচনা প্রকাশ করেছেন। এগুলি তাঁকে প্রকাশক্ষমতা ও গল্পকথন নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে সমর্থ করেছে। সুতরাং বলা যায় তিনি কিছুটা তৈরী হয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই গ্রন্থটি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রত্নবতী' প্রকাশের প্রায় ষোল বছর পরে প্রকাশিত হয়। মোট ছ'বছরেরও কিছু বেশি সময় নিয়ে তিনি গল্পটি লিখেছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম পর্ব, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পর্ব এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পর্ব রচিত হয়। তারপর বিভিন্ন সংস্করণে তিনি গ্রন্থটিকে পরিমার্জিত এবং পরিবর্দ্ধিত করেছেন। এ রকম রদবদলের কথা তিনি নিজেই বলেছেন।[২৬] অন্যগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে তাঁর যে মনোযোগ 'বিষাদসিন্ধু' যেন তার অতিরিক্ত কিছু যত্ন পেয়েছিল। তাঁর জীবৎকালে গ্রন্থটির আটটি সংস্করণ হয়েছিল। লেখক বলেছেন, "প্রতি সংস্করণেই 'বিষাদসিন্ধু' উন্নত অবস্থায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।"[২৭] এ থেকে বোঝা যায় গ্রন্থটির পরিমার্জনায় তিনি কতো যত্নবান ছিলেন।

'বিষাদসিন্ধু' ইসলামী ইতিহাসের বিখ্যাত কারবালার করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মশাররফ 'মহরম' পর্বের প্রথম সংস্করণের 'মুখবন্ধে' লিখেছেন ঃ

> চান্দ্রমাসের বৎসরের প্রথম মাসের নাম মহরম। হিজরী ৬১ সালের ৮ই মহরম তারিখে মদিনাধিপতি হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালা ভূমিতে উপস্থিত হন; এবং এজিদ প্রেরিত সৈন্যহস্তে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন; সেই শোচনীয় ঘটনা মহরম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ ঘটনার মূল কি, এবং কি কারণে সেই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বোধ হয়, অনেকেই অনবগত আছেন। পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদসিন্ধু' বিরচিত

> হইল। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণের রচনাকৌশল এবং শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। . . . তবে মহরমের মূল ঘটনাটী বঙ্গভাষাপ্রিয় প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য।[২৮]

লক্ষণীয় লেখক এখানে দুটি কথা বলেছেন। প্রথম কথা, পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ থেকে মূল ঘটনার সারাংশ নিয়ে তিনি গ্রন্থটি লিখেছেন। আর দ্বিতীয়ত পাঠককে মহরমের ঘটনা বুঝিয়ে দেওয়া তাঁর লক্ষ্য। কোন্ পাঠক তাঁর লক্ষ্য ছিলেন তা বোঝা যায়। বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষিত মুসলমান পাঠক তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এর পর লক্ষ্য গল্পপাঠক সাধারণ রসিক সমাজ। লেখক মূল আরব্য ও পারস্য সাহিত্য থেকে কাহিনী আহরণ সম্বন্ধে যে দাবী করেছেন পরবর্তীকালে তা গ্রাহ্য হয়নি। মুনীর চৌধুরী বলেছেন, মীরের এই দাবী বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি প্রধানত কারবালার কাহিনী বিষয়ক জনপ্রিয় পুস্তক অবলম্বন করেই এই গ্রন্থ রচনা করেন।[২৯] কাজী আবদুল ওদুদ[৩০], মুস্তাফা নূরউল ইসলাম[৩১] এবং আনিসুজ্জামান[৩২] প্রমুখ সমালোচকেরা 'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনীর উৎস হিসাবে পুঁথিসাহিত্য বিশেষত জঙ্গনামা শ্রেণীর পুঁথির কথা বলেছেন। রমাপ্রসাদ দে বলেছেন, আরব্য বা পারস্য গ্রন্থের সাহায্য নিলেও পুঁথি সাহিত্যের সঙ্গেই এর যোগ ঘনিষ্ঠ।[৩৩] আরবী ফারসী কিছুটা পড়লেও এ বিষয়ে তাঁর অধিকার যে খুব কম—-আরবী-ফারসী গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবার মতো দক্ষতা যে তাঁর বিশেষ ছিল না সে কথা মশাররফ নিজেই আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।[৩৪] তাই একথা মনে করা সংগত যে পরোক্ষভাবে আরবী ফারসী উৎস থেকে কাহিনীর মূল বিষয়ে অবহিত থাকলেও তিনি পুঁথি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই এ গ্রন্থ রচনা করেন।

২. কাহিনী

মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদসিন্ধু'র 'উপক্রমণিকা' অংশে ঈশ্বরের অভিলাষ, ভবিতব্য এবং অনিবার্য পরিণামের কথা উল্লেখ করে মূল কাহিনী আরম্ভের পূর্বে পূর্ব-ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিররণ দিয়েছেন।

একদা হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ইদোৎসবের দিনে তাঁর সহচরদের কাছে উপদেশ-প্রদান করছিলেন। এমন সময় তাঁর দুই দৌহিত্র হাসান ও হোসেন তাঁর কাছে যথাক্রমে সবুজ ও লাল রঙের পোশাক বায়না করেন। তখনই ফেরেস্তা জিবরাইল এসে মোহাম্মদ (সঃ) কে এই দুই রঙের পোষাক দুটির মর্মান্তিক পরিণতির প্রতীকী ইঙ্গিত দিয়ে চলে যান। অর্থাৎ সবুজ পোষাকের দাবীদার হাসান বিষপ্রয়োগে এবং লাল পোষাকের দাবীদার হোসেন অস্ত্রাঘাতে মারা যাবেন। উপস্থিত সহচরগণের প্রবল অনুরোধ ও কৌতূহলের উত্তরে মোহাম্মদ (সঃ) জানালেন যে অচিরে তাঁর অন্যতম সহচর মাবিয়ার এজিদ নামে এক পুত্র জন্মাবে এবং সে হাসান-হোসেনকে বধ করবে। মাবিয়া একথা শুনে দুঃখিত হন এবং বিবাহ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু দৈবক্রমে তাঁর যৌনরোগ দেখা দিলে তিনি অশীতিবর্ষীয়া জনৈক বৃদ্ধা মহিলাকে বিবাহ করেন যাতে তাঁর কোন সন্তানাদি না হয়। কিন্তু ঈশ্বরের লীলায় সেই বৃদ্ধারও পুত্র সন্তান হয়। নাম রাখা হয় এজিদ। পুত্র এজিদের প্রতি মাবিয়ার অপার স্নেহ। কিন্তু মাবিয়া দৈববাণী স্মরণ করে এবং অমঙ্গল আশঙ্কায় হাসান হোসেনের পিতা হজরত আলীর অনুমতি নিয়ে মদিনা ত্যাগ করে দূরবর্তী দামেস্ক নগরের শাসনকর্তা হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এদিকে স্বল্পকাল মধ্যে হজরত মোহাম্মদ

(সঃ) এবং হজরত আলী ও হাসান হোসেন-জননী বিবি ফাতেমা পরলোকগমন করেন। কালক্রমে হাসান মদিনার সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্যদিকে দামেস্কে এজিদ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মূল কাহিনী আরম্ভ হয়।

প্রথম খণ্ড বা মহরম পর্ব্বে দামাস্কাসের শাসনকর্তা মাবিয়ার পুত্র এজিদের প্রণয়াসক্তি, ব্যর্থতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ বর্ণিত হয়েছে। এজিদ জয়নাব নামে জনৈকা বিবাহিতা মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হন। জয়নাব ছিলেন জনৈক অর্থলোভী, দুর্বলচিত্ত আবদুল জাব্বারের স্ত্রী। এজিদ মন্ত্রী মারওয়ানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জয়নালের স্বামীকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান এবং 'কাসেদ' (সংবাদ বাহক) দিয়ে জয়নাবের কাছে বিবাহের পয়গাম পাঠান। কিন্তু বিবাহবিচ্ছিন্না জয়নাব হজরত মোহাম্মদের (সঃ) দৌহিত্র হাসানকে বিবাহ করেন। এই সংবাদে এজিদ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে হাসানবধের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এদিকে আবার মাবিয়ার মৃত্যু হলে এজিদ দামাস্কাসের সিংহাসনে আরোহণ করে হাসানকে তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে বলেন। কিন্তু হাসানের অনুগামীরা তা অগ্রাহ্য করে। সে কারণে এজিদের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী মদিনা আক্রমণ করে, কিন্তু তারা পরাস্ত হয়। সম্মুখযুদ্ধে বিফল হয়ে এজিদ কৌশলে হাসানকে নির্মূল করতে উদ্যোগী হন। এ কাজে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ও সহায়ক ছিলেন কুচক্রী মন্ত্রী মারওয়ান।

হাসানের তিন স্ত্রীর মধ্যে মধ্যমা জায়েদা সপত্নী জয়নাবের প্রতি এমনিতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। হাসানের পারিবারিক জীবনের এই দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে মারওয়ান মায়মুনা নামে এক বৃদ্ধা নারীর সহায়তায় জায়েদাকে আরো উত্তেজিত করে তোলে। এছাড়া হাসান জয়নাবকে বিবাহ করার পর থেকেই জায়েদার সঙ্গে তাঁর ভুল বোঝাবুঝি চলছিল। মায়মুনা-জায়েদার সপত্নীর ঈর্ষায় আরো ইন্ধন যুগিয়ে নানা প্রকার প্রলোভন এমনকি দামেস্কের রাজরানী হওয়ার লোভ দেখিয়ে হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে প্ররোচিত করে। জায়েদা প্রথমে এমন অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও ক্রমে মায়মুনার উপর্যুপরি প্ররোচনায় কৃতসংকল্প হয়। জায়েদা তার স্বামী হাসানকে বিষপ্রযোগে হত্যা করে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জায়েদা পুরস্কার লাভের আশায় এজিদের দরবারে গেলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। হাসানের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনকে এজিদ প্রধান প্রতিপক্ষ মনে করেন। কেননা এজিদের রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রধান প্রতিবন্ধক ছাড়াও হোসেন ছিলেন তাঁর কামনার ধন জয়নারের আশ্রয়দাতা। এই সময় হোসেন অধিকাংশ সময়েই হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র সমাধিস্থানে থাকতেন। এজিদের মন্ত্রী মারওয়ান হোসেনকে কু-পরামর্শ দিয়ে যথাশীঘ্র মদিনা ত্যাগ করতে বলে। সে জানায় এজিদ বাহিনী তাকে আক্রমণ করবে। হোসেনেরও বিশ্বাস ছিল তাঁর মৃত্যু ঘটবে কারবালা প্রান্তরে। তিনি মদিনা ত্যাগ করার সংকল্প করেন। অন্যদিকে কুফার শাসনকর্তা আনুগত্য দেখিয়ে হোসেনকে আমন্ত্রণ জানায়। হোসেন কুফায় মোসলেম নামে জনৈক দূতকে অগ্রে প্রেরণ করেন। পরে হোসেন তাঁর পরিবার ও অনুচরসহ ষাট হাজার লোক নিয়ে কুকার পথে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে ভুলক্রমে তাঁরা কারবালা প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হন। কারবালার বিজন মরুপ্রান্তরে হোসেন ও তাঁর সঙ্গীরা নানা অলৌকিক ও অশুভ লক্ষণ দেখতে পান। যেমন–অশ্বপদ মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়ে যাওয়া, জনমানবহীন মরুভূমির চর্তুদিকে 'হায় হায়' রব ধ্বনিত হওয়া, বৃক্ষ থেকে শোণিত নির্গত হওয়া প্রভৃতি। হোসেন তাঁর জীবনের অন্তিমক্ষণ ভেবে শিউরে ওঠেন এবং প্রায় নিশ্চিত হয়ে যান। এখানে ফোরাত নদীর তীরে এজিদের সৈন্যবাহিনী তাঁদের আক্রমণ করে।

উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধক্ষেত্রেই পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হোসেনকন্যা সখিনার সঙ্গে হাসান-পুত্র কাসেমের বিবাহ হয়। যুদ্ধে কাসেম মৃত্যুবরণ করেন। এই যুদ্ধে হোসেনের সঙ্গীরা পরাস্ত হন। হোসেন বহু শত্রু নিধন করে একাকী ফোরাত নদীর জল পান করতে যান। কিন্তু আত্মীয় পরিজন অনুচর, নারী শিশুর পিপাসার্ত করুণ মুখচ্ছবি মনে পড়তেই জলপান থেকে বিরত হয়ে যান। এবং সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করে উদভ্রান্তের মতো হাঁটতে থাকেন। নিরস্ত্র হোসেনকে এজিদের অনুচর সীমার আক্রমণ করে হত্যা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু হোসেনের গলদেশে তাঁর মাতামহ মোহাম্মদ (সঃ)-এর চুম্বনস্পর্শ থাকায় সীমারের তরবারী তাঁর মস্তক ছেদন করতে ব্যর্থ হয়। শেষে হোসেনেরই নির্দেশিত পথে তাঁর স্কন্ধদেশে তরবারি চালিয়ে সীমার তাঁকে হত্যা করে। তবে মৃত্যুকালে হোসেন সীমারকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে তিনি তাঁকে না নিয়ে স্বর্গবাসী হবেন না। অতঃপর সীমার হোসেনের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে দামাস্কাস অভিমুখে গমন করে।

দ্বিতীয় খণ্ড বা 'উদ্ধার পর্ব্বে' হোসেনের পরিবারের অন্যান্য লোকজন কিভাবে রক্ষা পায় এবং ক্রুদ্ধ পরাক্রান্ত বীর মোহাম্মদ হানিফা কিভাবে হোসেনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন তার বিবরণ।

দামাস্কাস গমনরত সীমার পথিমধ্যে হোসেনের ছিন্ন মস্তক নিয়ে আজর নামে জনৈক অমুসলমান ব্যক্তির গৃহে রাত্রিযাপন করেন। হোসেনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত তাঁর মস্তকের এই অবমাননায় মর্মাহত হয়ে আজর সেই মস্তক সীমারকে ফেরৎ দিতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু সীমার অর্থ লোভের আশায় আজর পরিবারের সবাইকে হত্যা করে সেই ছিন্ন মস্তক নিয়ে এজিদের দরবারে হাজির হন। দামাস্কাসের রাজপ্রাসাদে এজিদ হোসেনের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে হোসেন পরিবারের সামনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার সময় মস্তকটি হঠাৎই অন্তর্হিত হয়ে যায়। এরপর হোসেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটি দৃশ্যে লেখক স্বর্গলোক থেকে সমস্ত নবীদের কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত হওয়া এবং প্রার্থনা শেষে স্বর্গলোকে ফিরে যাওয়ার বিররণ দিয়েছেন। এদিকে যুদ্ধশেষে হোসেনের একমাত্র জীবিত সন্তান জয়নাল আবেদীনকে এজিদ বশ্যতা স্বীকার করতে বলেন। কিন্তু জয়নাল তাতে সম্মত না হলে তাঁকে অন্য পরিজনসহ বন্দি করা হয়। বন্দি অবস্থায় সালেমা জয়নালকে জানালেন যে, তিনি কারবালার যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আম্বাজ-রাজ মোহাম্মদ হানিফাকে এ বিপদের কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। মোহাম্মদ হানিফা হলেন হোসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। হানিফা এই সংবাদ পেয়ে মদিনাবাসীদের অনুপ্রাণিত করে প্রতিশোধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি এজিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সীমার, ওতবে ওলীদ, মারওয়ান প্রভৃতি মন্ত্রী ও সেনাপতিগণকে খতম করেন। এজিদ তখন রাজপ্রাসাদে মদ্যপানে বিভোর। নেশার ঘোরে তিনি জয়নাবের 'জ্বলন্ত রূপরাশি'র কথা স্মরণ করছেন এবং এই মহাপ্রলয়ের জন্য যে তাঁর রূপতৃষ্ণাই দায়ী—এ অনুশোচনায় তিনি দগ্ধ হচ্ছেন। এমন সময় হানিফা দামাস্কাস আক্রমন করলে বন্দি জয়নাল আবেদীন মুক্ত হয়ে হানিফার সঙ্গে মিলিত হয় এবং এজিদ প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করেন। হানিফাও তাঁর দুলদুল অশ্ব নিয়ে এজিদের পশ্চাদ্ধাবন করেন।

তৃতীয় খণ্ড বা 'এজিদ বধ' পর্ব্বে কারাগারে বন্দিদের দুর্দশার চিত্র এবং এজিদের করুণ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। বন্দিগৃহে অনুশোচনা-দগ্ধ জয়নাবও স্বগত-ভাষণে জানিয়েছেন, তিনিই 'বিষাদ সিন্ধু'র মূল, মহাপ্রলয় কাণ্ডের মূল কারণ। হানিফা রাজ প্রসাদ আক্রমণ করলে সমস্ত প্রহরী পলায়ন করে এবং বন্দি হোসেন পরিবারের

অবশিষ্ট সকলেও মুক্ত হয়। পলায়নরত এজিদ ভূর্গভস্থ এক গুপ্ত কক্ষে আশ্রয় নেন। বিপদাপন্ন অবস্থায়ও এক লহমার জন্য জয়নাব-রূপবহ্নি তাঁর হৃদয়ে আঁচড় দিয়ে যায়। হানিফা এজিদের সন্ধান না পেয়ে বহু নিরীহ নাগরিককে হত্যা করতে থাকেন। এমন সময় এক দৈববাণীতে হানিফা জানতে পারেন, এজিদ তাঁর বধ্য নয়। তাছাড়া যেহেতু তিনি অসংখ্য নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন, তাই তাঁকে দুই পাহাড়ের মধ্যে চিরকাল বন্দি হয়ে থাকতে হবে। অন্যদিকে এজিদও ঐ গুপ্তকক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে অনন্তকাল দগ্ধ হতে থাকবেন। এই সঙ্গে জয়নাল আবেদীনের রাজ্যলাভের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।

উপসংহারে সত্যের জয় এবং পাপের পরিণামে শাস্তিভোগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন লেখক।

৩. কাহিনীর ঐতিহাসিকতা

ক. ইতিহাসে কারবালার কাহিনী

আল দিনাওয়ারী, আল ইয়াকুবী, আলতাবারী, আল মাসউদী, আলবালাজুরী প্রমুখ বিখ্যাত আরবী ঐতিহাসিকগণ হাসান এবং হুসাইন-এর জীবন-কাহিনী ও কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে ম্যুর, পি.কে. হিট্টি এবং সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ যে বিবরণ দিয়েছেন এবং 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম' গ্রন্থে যে বর্ণনা রয়েছে তাকে অনুসরন করে হাসান হোসাইনের সঙ্গে ইয়াজিদের[৩৫] সংঘর্ষের কাহিনীটি লিপি বদ্ধ করা হল।

আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়া বা মাবিয়া যিনি হজরত মোহাম্মদ-এর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন তিনি ওমরের খেলাফতকালে (৬৩২-৪৪ খ্রীঃ) সিরিয়ার শাসনকর্তা (গভর্নর) নিযুক্ত হন। খলিফা ওসমানের সময় তিনি বহাল ছিলেন। হজরত আলী খলিফা (২৩ জন, ৬৫৬) হওয়ার পর তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করে সেখান থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি নানা কারণে মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার রাজ্যপাল হিসাবে বহাল রাখতে অস্বীকার করেন।[৩৬] মুয়াবিয়া বিদ্রোহী হয়ে পরবর্তীকালে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। এই দ্বন্দ্ব চলছিল। এমতাবস্থায় ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে (৪০ হিজরী) হজরত আলী কুফায় জনৈক আততায়ীর হাতে নিহত হলেন।[৩৭] ইরাকের অধিবাসীরা কুফায় হজরত আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র হাসানকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। ফলে মুয়াবিয়ার সঙ্গে তাঁর বিরোধের উপক্রম হয়। হাসান ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকৃতির এবং "সিংহাসন অপেক্ষা হারেমে গৃহমধ্যে আলহাসানের আগ্রহ ছিল বেশী। রাজ্য পরিচালনায় তিনি তেমন উৎসাহী ছিলেন না।"[৩৮] এছাড়া শান্তির পূজারী হাসান যুদ্ধে রক্তপাত এড়াতে[৩৯] মুয়াবিয়ার হাতে খিলাফতের দাবি ত্যাগ করলেন। 'নিরুদ্বেগ ও পরিতৃপ্ত জীবন যাপনের জন্য' তিনি সপরিবারে মদিনায় ফিরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। তবে তার আগে সন্ধি অনুযায়ী মুয়াবিয়ার অনুমোদনে হাসানের জন্যে একটি মোটা অঙ্কের ভাতার ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে এই চুক্তির একটি শর্তের কথা জানা যায়, যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমীর আলী প্রমুখ ঐতিহাসিকদের

মতানুযায়ী "একটি চুক্তি হল যাতে মুয়াবিয়াকে জীবনভরের জন্য হস্তান্তর করা হল খলিফার পদ তাঁর মৃত্যুর পর যা হজরত আলি (রাঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর উপর বর্তাবে।"[৪০] ঐতিহাসিক তাবারীর বর্ণনায় এই সন্ধির কথা থাকলেও সেখানে এরূপ কোন শর্তের উল্লেখ নেই।[৪১] যাই হোক কিছুকাল পরে কোন এক ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে হাসান সম্ভবতঃ বিষপ্রয়োগে (মতান্তরে দীর্ঘ রোগ-ভোগে) মাত্র ৪৫ বছর বয়সে মারা যান (হিজরী ৪৯/৬৬৯ খ্রীঃ)।[৪২] কারো মতে, এই ষড়যন্ত্র ছিল পারিবারিক[৪৩] কারো মতে রাজনৈতিক[৪৪]। এজন্য শিয়া মুসলিমগণ যে মুয়াবিয়াকে দায়ী করেন তা হিট্টি উল্লেখ করেছেন[৪৫], কিন্তু আমীর আলী মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়েজিদের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন।[৪৬]

পক্ষান্তরে ৪০ হিজরী (৬৬০/৬৬১খ্রীঃ) সনে মুয়াবিয়া ছলে বলে কৌশলে খলিফা হয়ে গেলেন। তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী কুফার—পরিবর্তে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ম্যুর বলেন "মুয়ারিয়ার দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ খেলাফতের সমাপ্তি এবং রাজতন্ত্রের সূচনা করে।"[৪৭] মুয়ারিয়ার শাসনকালে হজরত আলীর কনিষ্ঠপুত্র হুসাইন বা হোসেন সপরিবারে মদিনায় বাস করছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মুয়ারিয়া তাঁর পুত্র ইয়াজিদ বা এজিদকে খেলাফতের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। তাঁর এই পরিকল্পনায় দু'জন মদতদাতা ছিলেন—একজন বসরার শাসনকর্তা মুগিরা এবং অন্যজন জিয়াদ ইবন আবিহ[৪৮]। হোসেনসহ মক্কা ও মদিনাবাসী শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের অনেকেই এটাকে মেনে নিতে পারলেন না। কেননা খলিফাপদ উত্তরাধিকার সূত্রে কাউকে দেওয়া যায়না। তখন জনগণের ইচ্ছানুযায়ী নির্বাচক-মণ্ডলীর মাধ্যমে এই পদ পূরণ করা হত।

মুয়াবিয়া প্রায় ২০ বছর রাজত্ব (৬৬১খ্রী-৬৮০খ্রী) করার পর ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মারা গেলে ইয়াজিদ পিতার উইল অনুসারে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে ইরাকী তথা কুফাবাসীরা ইয়াজিদের খেলাফতকে অগ্রাহ্য করে হুসাইনকে খলিফা হিসাবে সমর্থন করে বার বার পত্র দেন এবং কুফায় যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানান।[৪৯] "দুরাকাঙ্খী, হিংস্র ও উদ্যমী কুফাবাসীদের চরিত্রে অধ্যবসায় ও স্থিরতার চূড়ান্ত অভাব ছিল।"[৫০] একটা সময় তারা সিফ্ফিনের যুদ্ধে হোসেনের পিতা হজরত আলীকে পথে বসিয়েছিল। এ কারণে তাদের আন্তরিকতা ও আনুগত্য পরীক্ষা করবার জন্যে হোসেন তাঁর আপন চাচাত ভাই মোমলেমকে কুফায় প্রেরণ করেন। মোসলেম কুফাবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে নিশ্চিত হলেন যে, পরিস্থিতি হোসেনের অনুকূলে। মোসলেম তখন হোসেনকে কুফায় আসার জন্যে গোপনে পত্র পাঠালেন এবং নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন। ইতোমধ্যে বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসীদের দ্বারাই এই গোপন খবর ইয়াজিদের কর্ণগোচর হয়। তিনি তৎক্ষনাৎ জিয়াদের পুত্র উবায়দুল্লাহকে কুফার শাসনকর্তা করে পাঠান। উবায়দুল্লাহ মোসলেম ও তাঁর আশ্রয়দাতা জনৈক হানিকে বন্দী করে প্রকাশ্যে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

এদিকে হোসেন এই হত্যাকাণ্ডের কোন খবর পেলেন না, বরং পূর্বের সেই পত্রে লিখিত অনুকূল অবস্থা চিন্তা করে নিজ পরিবারবর্গ, কিছু আত্মীয়স্বজন ও কয়েকজন ভক্ত, অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে কুফার দিকে যাত্রা করলেন। এজিদ এ সংবাদ পেয়েই হোসেনকে নিরস্ত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কুফার শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেন।[৫১] নির্দেশ পেয়েই উবাইদুল্লাহ ইরাক সীমান্ত বরাবর সৈন্য মোতায়েন করলেন। পক্ষান্তরে ইরাকের মাটিতে পা

দেওয়া মাত্র হোসেন মোসলেমের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলেন এবং সমূহ বিপদের আশঙ্কা করলেন। এ ছাড়া সাহায্যকারী হিসাবে কুফাবাসীদের কেউ এগিয়ে না আসায় তিনি প্রমাদ গুণলেন।[৫২] তবু বিচলিত না হয়ে হুসাইন এগিয়ে চললেন। বাধা পেয়ে হুসাইন কুফা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ২৫ মাইল দূরে ফোরাত নদীর (ইউফ্রেটিস) তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে শিবির স্থাপন করলেন। উবাইদুল্লাহর বিখ্যাত সেনাপতি সাদ ইবন-আবি ওয়াক্কাসের পুত্র উমরকে অশ্বারোহী সৈন্যসহ প্রেরণ করলেন এবং উমর হুসাইন ও তার সঙ্গীদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন। ফোরাত নদীর জল তাঁদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। নারী শিশুসহ হুসাইনের দলবল তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকে।[৫৩] তবু হোসেন আত্মসমর্পণ করতে চাইলেন না। অবশেষে ১০ই মহরম ৬১ হিজরী সনে[৫৪] (১০ অক্টোবর, ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ) একটি অসমযুদ্ধে হোসেন ও তাঁর দলবলকে হত্যা করা হয়। এ সময় উবাইদুল্লাহকে শামীর (শিয়াগণের কাছে সীমার বলে পরিচিত) নামক জনৈক কুখ্যাত যোদ্ধা কুপরামর্শ দেন এবং উবাইদুল্লাহ তাকে নির্দেশ দেন—হোসেনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় হাজির করতে। শামীর হুসাইন ও তাঁর মহিষীদের তাঁবু জ্বালিয়ে দেয়।[৫৫] হুসাইন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকেন। যুর্‌য়া বিন শরীফ তাঁকে বল্লম ও তলোয়ারের আঘাতে বধ করেন।[৫৬] খাওয়ালি বিন ইয়াজিদ আসবাহী তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে কেঁপে উঠলে (যাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল) সিনান বিন আনাস বিন আমর নাখয়ী নামে জনৈক সৈন্য নিজেই ঐ কাজ সমাধা করলেন।[৫৭] খাওয়ালি সেই খণ্ডিত মস্তক কুফায় নিয়ে গেলে উবাইদুল্লাহ তা দামেস্কে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে হুসাইনের নাবালক পুত্র জয়নুল আবেদীন এবং বোন জয়নাব রক্ষা পান। ছিন্নমস্তক দেখে ইয়াজিদ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে অতি সত্বর তা পুত্র ও ভগ্নীর কাছে ফেরৎ পাঠান। কারবালা প্রান্তরে সেই দেহ ও খণ্ডিত মস্তক সমাধিস্থ করা হয়।[৫৮] জীবিত শিশু স্ত্রীলোকগণকে ইয়াজিদ সসম্মানে মদিনায় প্রেরণ করেন।

কারবালার এই মর্মান্তিক ও নৃশংস হত্যা-কাণ্ডের পর ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় ইয়েজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও দেখা দেয়। এর মধ্যে মক্কা ও মদিনার বিদ্রোহ প্রধান। ইয়েজিদ তাঁর বিশাল সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে মদিনার বিদ্রোহ দমন করেন। অন্যদিকে এই সময় মক্কায় আব্দুল্লাহ-ইবন-জুবাইর নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করলে তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযান চালানো হয়। সেখানে তাঁকে পরাস্ত করে এজিদ-বাহিনী মক্কার কাবাশরীফের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। যখন এই আক্রমণ চলছিল তখন ইয়াজিদের মৃত্যু হয়। ফলে তাঁর সিরীয়-বাহিনী দ্রুত দামাস্কাসে প্রত্যাবর্তন করে। মাত্র সাড়ে তিন বছর রাজত্ব করার পর ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩ বছর বয়সে ইয়াজিদ মারা যান।[৫৯]

খ. কারবালার ইতিহাস ও 'বিষাদসিন্ধু' ঃ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বা পরিবর্তনের পরিমাণগত বিশ্লেষণ

সাদৃশ্য

১. 'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলি যেমন, হাসান, হোসেন, মাবিয়া, এজিদ, মারওয়ান প্রভৃতি ঐতিহাসিক। এছাড়া অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে জায়েদা, সখিনা, জয়নাল আবেদিন, মোহাম্মদ হানিফার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

২. হজরত মোহম্মদ (সঃ)-এর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হজরত হাসানের একাধিক বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল বলে ইতিহাসে জানা যায়। এজন্য তিনি 'মিতলাক' (বিবাহ-বিচ্ছেদকারী) আখ্যাও পেয়েছিলেন।[৬০] তাঁর এই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে জনৈক আশাস-এর কন্যা জায়দা হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। মুয়াবিয়া জায়দাকে অর্থলোভ ও ইয়াজিদের সঙ্গে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ কাজ করিয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে। অন্যদিকে সিয়া মতাবলম্বীদের মতে এই নেতৃস্থানীয় ইয়েমেনী আশাস ছিলেন মুয়াবিয়ার অনুগত ও হাসানের বিরোধী। হাসান তাঁর হত্যাকারীর কথা বুঝতে পারলেও নিরীহ ব্যক্তিদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করা হতে পারে ভেবে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনকে তা বলেন নি।[৬১] এ সমস্তই ইতিহাস-অনুমোদিত।

৩. হাসান-হুসাইনের সঙ্গে ইয়াজিদের বিরোধের জেরে কারবালায় সংঘটিত মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিষয়।

ইতিহাসের মূল ঘটনাগুলিকে অক্ষুন্ন রেখে মীর মশাররফ তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' উপাখ্যানকে উপন্যাসের আঙ্গিকে গ্রথিত করেছেন। সেজন্য ঘটনাগুলিকে তিনি কতকগুলি কল্পনাসূত্রে সাজিয়েছেন। তাতে মূল ঘটনা অপরিবর্তিত রেখে কাহিনীর আকর্ষণ তীব্রতা পেয়েছে।

বৈসাদৃশ্য বা পরিবর্তন

১. ইতিহাসের বর্ণনায় দেখা যায়, ইয়াজিদের সঙ্গে হাসান হোসেনের বিরোধ ও সংঘাত মূলতঃ রাজনৈতিক, রাষ্ট্রক্ষমতা (খেলাফত) দখলই ছিল এই দ্বন্দ্বের মূল কারণ। কিন্তু 'বিষাদসিন্ধু'তে লেখক এজিদের সুতীব্র নারীরূপ-তৃষ্ণাকেই বিরোধের কেন্দ্র হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে এজিদ 'রাজসিংহাসনের আকাঙ্ক্ষীও নহেন'।[৬২] তাঁর স্বগতোক্তিতে প্রকাশ — "জয়নাব এই মহাপ্রলয়কাণ্ডের মূল কারণ।"[৬৩] এইভাবে নারীরূপ-তৃষ্ণাকে মূল কাহিনী-কেন্দ্রে উপস্থাপিত করার ফলে ইতিহাসের কাহিনী প্রথমেই প্রেম এবং তার ব্যর্থতাজনিত প্রলয় ঘটানোর ক্ষমতা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

২. হোসেনকে আক্রমণকারী হিসেবে 'শামীর' নামে জনৈক সৈনিকের নাম পাওয়া যায়। শিয়াগণ যাকে 'সীমার' বলতেন।[৬৪] 'বিষাদসিন্ধু'তে সীমারকে হোসেনের হত্যাকারী বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হোসেনের শিরচ্ছেদ করেছিল যে সৈনিকটি তার নাম সিনান-বিন-আনাস-বিন-আমর আল নাখয়ী।[৬৫] 'বিষাদসিন্ধু' তে দেখা যায়, সীমার সহজে হোসেনের শিরচ্ছেদ করতে পারেননি। কারণ হজরত মোহাম্মদের (সঃ) চুম্বনজনিত কারণে হোসেনের কণ্ঠদেশ দুশ্ছেদ্য বলে লেখক বর্ণনা করেছেন। হোসেনই সীমারকে মস্তকচ্ছেদ করবার উপায় বলে দিয়েছেন। এইভাবে হোসেন এক মহৎ এবং ট্রাজেডির করুণ পরিণতি বিশিষ্ট নায়ক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। এই ধরণের মহৎ রূপান্তর জনচিত্তে মোহিনীশক্তি সঞ্চার করেছে।

৩. চরিত্রগুলির নামের বানানে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন- মুয়াবিয়া–মাবিয়া, ইয়াজিদ–এজিদ, হোসাইন বা হুসাইন–হোসেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত বানানকেই গ্রহণ করেছেন। তবে একটি চরিত্রের বানানের তফাৎ পাঠকদের কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তির সৃস্টি করতে পারে। সেটি হল উবাইদুল্লাহ ইবনে জেয়াদ অর্থাৎ জেয়াদের পুত্র উবাইদুল্লাহ। কিন্তু

'বিষাদসিন্ধু'তে তার নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে 'আব্দুল্লাহ জেয়াদ' বলে।

৪. ইতিহাসের মুয়াবিয়া ''ধূর্ত, অবিবেচক, তীক্ষ্নবুদ্ধি, কৃপণ অথচ প্রয়োজনে সীমাহীন উদার, বাহ্যিকভাবে সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্যে নিষ্ঠাবান, কিন্তু পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় সাধনে কোন মানবিক বা ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যাভিচার তিনি মানতেন না।''[৬৬] হজরত আলীর সময় থেকেই খলিফাপদের জন্য উচ্চাভিলাষী ও কুচক্রী মাবিয়া তৎপর ছিলেন। তিনিই পুত্র ইয়াজিদকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। অন্যদিকে 'বিষাদসিন্ধু'র মাবিয়া সৎ, উদার এবং যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরোধী। হজরত আলীর প্রতি কৃতজ্ঞ। পুত্র এজিদের কথায় অসন্তুষ্ট পিতা মাবিয়া বলেন ঃ

> এ রাজ্য তোর পিতার নহে। সেই হাসানের পিতা আলী অনুগ্রহ করিয়া—ভৃত্যের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু যেমন কিছু দান করেন—সেইরূপ তোর পিতাকে কেবল মাত্র ভোগের জন্য এই রাজ্য দান করিয়াছেন।[৬৭]

আবার অন্যত্র তিনি পত্রে হাসান হোসেন কে জানাচ্ছেন ঃ

> আমি স্থির সংকল্পে মনস্থ করিয়াছি—আপনাদের এই পৈতৃক দামেস্করাজ্য আপনাদিগকে প্রত্যর্পণ করিব, আমার আর রাখিবার সাধ্য নাই। . . . আপনাদিগকে এই সিংহাসনে বসিতে দেখিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে।[৬৮]

এইভাবেই ইতিহাসের একটি প্রধান চরিত্রকে তিনি পরিবর্তন করে নিয়ে সার্থকভাবে গল্পরস জমিয়ে তোলার পরিবেশ সৃজন করেছেন।

৫. কুফা অভিমুখে যাত্রার সময় হোসেনের সঙ্গে পরিবার ও অনুচরসহ যোদ্ধা ঠিক কতজন ছিলেন তার ঠিক হিসেব না মিললেও এই সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। ঐতিহাসিক তাবারী ও বালাজুরির সূত্র উল্লেখে একটি বর্ণনায় আছে, "about fifty men – relatives and friends able to bear arms.",[৬৯] অন্য একটি বিবরণে জানা যায় এই সংখ্যা ছিল সর্বাধিক ২০০ জন।[৭০] 'বিষাদসিন্ধু'তে বর্ণিত হয়েছে, 'হোসেন সপরিবারে ষষ্টি সহস্র সৈন্য লইয়া নির্বিঘ্নে কুফায় যাইতেছেন।'[৭১] এখানেও লেখক গল্পরসের খাতিরে ইতিহাসের চাইতে কল্পনাকেই বেশি আশ্রয় করেছেন।

৬. হাসানের এক পুত্র কাসেম হোসাইনের এক কন্যাকে বিবাহ করেন।[৭২] এই কন্যার নাম বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায় যেমন—ফাতেমা, সুকাইনা, সকিনা। প্রকৃত নামটি সুকাইনা হওয়া সম্ভব। কোন কোন ঐতিহাসিক সুকায়নার সঙ্গে আব্দুল্লাহর—কাসেম নয়—বিবাহের কথা অস্বীকার করেন। সুকায়না দীর্ঘজীবী মহিলা ছিলেন এবং বলা হয়েছে যে, তিনি একাধিকবার বিবাহ করেছিলেন। খলিফা দ্বিতীয় উমরের এক ভাই সুকায়নাকে বিবাহ করেন।[৭৩]

৭. হজরত আলীর এক পুত্রের নাম মোহাম্মদ আলহানিফ বা আলহানাফিয়া ('বিষাদসিন্ধু' তে হানিফা) পাওয়া যায়।[৭৪] হোসেন হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল—এজিদের নয়—উবায়দুল্লাহ বিন জেয়াদের প্রাণের বিনিময়ে। তবে এই প্রতিশোধ নিয়েছিলেন কুফার সাকীক গোত্রের আবু উবায়দার পুত্র মুখতার (৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে)।[৭৫]

৮. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মারওয়ান ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন মুয়াবিয়ার জেঠতুতো ভ্রাতা এবং

উমাইয়াদের মধ্যে বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি। মুয়াবিয়ার আমলে হিজাজের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনিই পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করার জন্য পিতা মুয়াবিয়াকে পরামর্শ দেন। পরবর্তীকালে মক্কা ও মদীনা আক্রমণের জন্যে ইয়াজিদকেও পরামর্শ দেন। আরো পরে ইয়াজিদের পুত্রকে কৌশলে সরিয়ে নিজে খলিফাও হন (৬৮৫–৭০৫ খ্রীঃ)।[৭৬] 'বিষাদসিন্ধু'তে ইয়াজিদের মৃত্যুর পূর্বেই এই কুপরামর্শদাতা মন্ত্রী মারওয়ানের হানিফার হাতে মৃত্যুবরণের কথা বলা হয়েছে।

৯. এ ছাড়া কিছু অনৈতিহাসিক প্রধান-অপ্রধান চরিত্র ও উপকাহিনী এতে রয়েছে। যেমন, জয়নব চরিত্র এবং আজরের কাহিনী অনৈতিহাসিক।

৪. পুঁথি সাহিত্যের প্রভাব

হোসেনের মৃত্যুবরণ তথা কারবালায় শহীদ হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে শিয়াপন্থী মুসলমানগণ এর পর থেকে মহরম মাসের প্রথম দশ দিন 'শোকদিবস' হিসাবে পালন করেন। প্রতি বছর দুটি ভাগে এর আবেগময় পুনরভিনয় করে দেখানো হয়— একটির নাম আশুরা (দশম্ দিবস) এবং অন্যটির নাম 'মস্তকের প্রত্যাবর্তন'। শুধু তাই নয় এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমকালে ও পরবর্তী সময়ে নানা কিংবদন্তী ও অলৌকিকতার জন্ম হয়। যেমন—যখন হোসেন কারবালায় পৌছান তখন আকাশ লাল হয়ে যায় এবং সেখান থেকে রক্তের ধারা বর্ষিত হতে থাকে; জ্বিনের মহিষীগণ দুঃখে বিলাপ করতে থাকেন; হোসেনের ছিন্নমস্তক দামাস্কাসে নিয়ে যাওয়া হলে একটি রহস্যময় পালক দেওয়ালে সতর্কবানী লিখতে থাকে (অনুরূপ কাহিনী বাইবেলেও পাওয়া যায়); ছিন্ন মস্তকটি কোরাণ শরীফ আবৃত্তি করতে থাকে; হোসেনের প্রতি অন্যায়কারী ব্যক্তিরা কেউ নিহত কেউ অন্ধ, কেউ বা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হন প্রভৃতি।[৭৭] মধ্যপ্রাচ্যে এ রকম নানা অলৌকিক কাহিনী জনগণ সৃষ্টি করেছিল।

এই শোকাবেগ, গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে তখন থেকেই আরবী ও ফারসী ভাষায় বহু কাব্য-নাটক রচিত হয়। পরবর্তীকালে ইংরেজী ভাষায়ও এই ধরণের কাব্যনাট্য লেখা হয়েছিল।[৭৮] এ বিষয়ে শিয়া মতাবলম্বী লেখকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আরবী ফারসী সাহিত্যের এই ধারা ভারতবর্ষে উর্দু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায়ও প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই দেখা যায়, মধ্যযুগের বাংলা পুঁথিসাহিত্যের এক বিশাল অংশ দখল করে আছে মহরম-কেন্দ্রিক কাব্যরচনা। এগুলির মধ্যে মোহাম্মদ খানের 'মকতুল-হোসেন', সেখ ফয়জুল্লাহর 'জয়নালের চৌতিশা', হায়াত মামুদের 'জঙ্গনামা বা মহরমপর্ব', ফকীর গরীবুল্লাহর 'জঙ্গনামা', সৈয়দ হামজার 'জঙ্গনামা', সাদ আলীর 'শহীদে কারবালা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। এগুলিকে সাধারণভাবে জঙ্গনামা (বা যুদ্ধের বর্ণনা) শ্রেণীর রচনা বলা হত।

মশাররফ হোসেন 'বিষাদসিন্ধু' রচনার অনেক আগে থেকেই যে এই সমস্ত পুঁথি-সাহিত্যের সঙ্গে বেশ সুপরিচিত ছিলেন তা তাঁর আত্মজীবনী থেকেই জানা যায়।[৭৯] সুতরাং এই জঙ্গনামা শ্রেণীর পুঁথি-সাহিত্যের প্রভাব 'বিষাদসিন্ধু'র উপর যে পড়েছিল তা মনে করা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষতঃ গরীবুল্লাহর 'জঙ্গনামা'র সঙ্গে মীরের মিল বেশ লক্ষ করার মতো। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল ব্যক্তি ও স্থানের নামের পরিবর্তন করেছেন।

১. জিব্রাইল ফেরেস্তা এসে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে হাসান ও হোসেনের জীবনের মর্মান্তিক পরিণাম বিষয়ে পূর্বাভাস দিয়েছেন।

২. এজিদ যাতে জন্মগ্রহণ না করে সেজন্য মরিয়ার বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত, প্রস্রাবের অসুস্থতা এবং শেষে বৃদ্ধা রমনীকে বিবাহ করা।

৩. হজরত মোহাম্মদের প্রাণ নিতে মানব-রূপী আজরাইলের আগমন ও ফাতেমার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

৪. জয়নাবের রূপে এজিদের মোহাচ্ছন্নতা।

৫. মারিয়ার অগোচরে এজিদের ষড়যন্ত্র, জাব্বার কর্তৃক জয়নাবকে পরিত্যাগ।

৬. জয়নাবের কাছে বিয়ের পয়গাম নিয়ে দূত প্রেরণ, পথে আক্কাস ও হাসানের সঙ্গে দেখা, তাঁদেরও অনুরূপ পয়গাম এবং হাসানের পয়গাম গ্রহণ।

৭. নারীর প্রলয়ঙ্কর রূপ-শক্তির মহিমা।

৮. 'জঙ্গনামা'য় মায়মুনার ভূমিকা জীবন্ত। এখানে জায়েদা চরিত্র নেই—তার পরিবর্তে একই ভূমিকায় রয়েছে কদবানু চরিত্র।

৯. হাসান চরিত্রের উদারতা—বিষদানকারীর নাম প্রকাশে অনীহা।

১০. কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে মোসলেমকে কুফায় প্রেরণ—আবুল্লাহ জেয়াদের আক্রমণ ও প্রাণদান।

১১. ভুল করে কারবালায় পৌঁছে হোসেনের অশুভ লক্ষণ দর্শন।

১২. কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে কাসেমের সঙ্গে সখিনার বিবাহ এবং যুদ্ধে কাসেমের শহীদ হওয়া।

১৩. যুদ্ধ-সজ্জায় হোসেনের রসুল ও পয়গম্বরগণের বিভিন্ন পোষাক পরিধান।

১৪. শত্রুকে পরাস্ত করে হোসেন কর্তৃক ফোরাত নদীতে তৃষ্ণা নিবারণে উদ্যত হয়েও তৃষ্ণা না মেটানো।

১৫. আহত হোসেনের শির কাটতে ব্যর্থ সেমর লেইন ('বিষাদসিন্ধু'তে সীমার)। কারণ গলায় ছিল মহাম্মদের চুম্বন-স্পর্শ। শেষে হোসেনেরই পরামর্শে গ্রীবায় ছুরি চালিয়ে শিরচ্ছেদ। মৃত্যুর পূর্বে হোসেনের প্রতিশ্রুতি, তাকে না নিয়ে তিনি স্বর্গে যাবেন না।

১৬. হোসেনের একটি দাস মৃত হোসেনের কোমরবন্ধ থেকে 'অমূল্য মানিক' চুরি করার চেষ্টা করলে তিনি তার হাত চেপে ধরেন তখন সে তাঁর হাতটিকে কেটে ফেলে। পরে হজরত মহাম্মদ (সঃ) স্বর্গ থেকে কারবালায় হোসেনের জানাজা পড়তে এলে তাঁর কাছে সে ক্ষমা চায়। এতে মহাম্মদ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর গালে চড় মারেন। শেষে সে মক্কার কাবায় গিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে অনুতাপ করেছে। 'বিষাদসিন্ধু'তে এটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁর গালে চড় মেরেছে মৃত হাসানের হাত এবং সে মদিনায় গিয়ে মহাম্মদের সমাধিস্থানের কাছে অনুতাপ করতে থাকলে তার কাছ থেকে প্রথম মদিনাবাসী কারবালার ঘটনা জানতে

পারে। লেখক এইভাবে মদিনাবাসীকে কারবালার ঘটনা জানালেন।

১৭. কারবালা প্রান্তরে হোসেনের জানাযায় স্বর্গীয় দেবদূত (ফেরেস্তা) এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রসুলদের আগমন।

১৮. দামেস্ক শহরের জনৈক অমুসলিম 'চন্দ্রভান' ছিন্নমস্তক বহনকারী জেয়াদকে আশ্রয় দেয়। রাতে হোসেনের শির তাকে মুসলমান করেছে। পরদিন চন্দ্রভান হোসেনের শির রক্ষার্থে স্ত্রী ও সাত পুত্রসহ প্রাণদান করেছে। মশাররফ এই কাহিনীটিকে সামান্য পরিবর্তন করেছেন। সেখানে চন্দ্রভানের ভূমিকায় আজর।

১৯. দামেস্কে এজিদ হোসেনের ছিন্নশিরের অপমান করার সময়ই ফেরেস্তারা তা অদৃশ্যভাবে আসমানে তুলে নিয়ে যায়।

২০. এজিদের আদেশ সত্ত্বেও জয়নাল আবেদিন তাঁর নামে মসজিদে খোতবা পড়েননি। বিবি উম্মে সালমা জয়নালকে হানিফার জন্মবৃত্তান্ত বলেছেন এবং তাঁর সাহায্যে এমামের পরিবার মুক্তি পাওয়ার আশ্বাস শুনিয়েছেন।

২১. পরাজিত এজিদ হানিফার ভয়ে পালাতে গিয়ে এক ধোঁয়াচ্ছন্ন কুয়োয় পতিত হন। ক্রুদ্ধ হানিফা নির্বিচারে নিরীহ মানুষদের হত্যা করতে থাকলে হঠাৎ এক পাহাড়ের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বন্দী হন।[৮০]

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মশাররফ হোসেন ইতিহাসকে খুব সামান্যই অনুসরণ করেছেন। তুলনায় অধিক নির্ভর করেছেন পুঁথিসাহিত্যের উপর। আবার 'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনী বর্ণনায় অতিরঞ্জন বা অতিপ্রাকৃতের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুঁথিসাহিত্যের প্রভাবকে অস্বীকার না করেও বলা যায়, এর সবটাই পুঁথি-সাহিত্য কেন্দ্রিক ছিল না। প্রথমত মশাররফ নিজে যে 'দৈব বলের অদ্ভুতত্ত্বে' বিশ্বাসী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনীতে এবং 'গাজীমিয়ার বস্তানী'তে।[৮১] দ্বিতীয়ত কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমকালে ও পরবর্তীকালে আরব ও পারস্য দেশে মুসলমানদের মধ্যে – বিশেষত শিয়াপন্থী মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরণের অলৌকিকত্ব আরোপের কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।[৮২] উদাহরণস্বরূপ, হোসেনের খণ্ডিত মস্তকের অলৌকিক আচরণের কথা উল্লেখ করা যায়। হিট্টি বর্ণনা করেছেন, শিয়া সম্প্রদায় কারবালার হৃদয়বিদায়ক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বার্ষিক 'প্যাশান প্লে' (Passion Play)-র আয়োজন করে তার প্রথমাংশে 'আশুরা'য় কারবালার ঘটনা বর্ণিত হলেও দ্বিতীয়াংশের বিষয় 'মস্তকের প্রত্যাবর্তন'।[৮৩] আর এ গুলির রূপায়ণ ঘটেছে তৎকালীন আরব্য পারস্য সাহিত্যে।

সুতরাং মশাররফ অন্ততঃ পরোক্ষ ভাবে আরবী ফারসী গ্রন্থের উৎসের এবং প্রত্যক্ষভাবে বাংলা পুঁথি-সাহিত্যের উপর নির্ভর করে 'বিষাদসিন্ধু' র উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল মুসলিম সমাজে প্রচলিত ধারণা, তাঁর আপন বিশ্বাস ও কল্পনার জগৎ। তবে উপকরণ যেখান থেকেই সংগ্রহ করে থাকুন না কেন, এই গ্রন্থের কাহিনী-নির্মাণ ও চরিত্র-রচনা ছিল লেখকের একান্ত নিজস্ব।

৫. 'বিষাদসিন্ধু'র সাহিত্য ধর্ম

মীর মশাররফ হোসেন ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক জীবনের কথাকার। তাঁর গদ্য আখ্যান রচনার আগেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আর্বিভাব হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের কাহিনীকে রোমান্সধর্মী রচনায় সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে মশাররফের কথা বিবেচনা করতে হয়।

উপন্যাস আসলে মানবজীবনের আখ্যান। তার রস মানবরস। বাস্তব ঘটনা বা ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনা করতে গেলে তাকে মানবকাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হয়। কোন ঘটনা পরম্পরাকে মানবজীবনের কাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে তার মধ্যে প্রধান করে তুলতে হয় মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। মীর মশাররফ যে কারবালার কাহিনীকে 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনারূপে চিত্রিত করেছেন তার ঘটনা পরম্পরা ঐতিহাসিক। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে কারুণ্য নিহিত আছে। বিশেষত ফোরাত নদী বন্ধ করে দেবার ফলে যেভাবে তৃষ্ণার্ত হোসেন ও তাঁর পরিজনেরা কষ্ট সহ্য করে মৃত্যুবরণ করলেন তার কারুণ্য মানুষের মনকে চিরকাল বেদনা-বিহ্বল করবে। মীর মশাররফ এই কাহিনী বেছে নেবার ফলে ইসলামী দুনিয়ার কথাবৃত্তকে আমাদের কাছে সহজ করে বলতে পারলেন। কিন্তু তিনি ইতিহাসের এই ঘটনাবৃত্তকে মানুষের গল্পে রূপান্তরিত করলেন।

পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় যুদ্ধগুলির মূলে ছিল নারী কিংবা রাজ্যের উপর ক্ষমতা বিস্তারের আগ্রহ। ভারতীয় রামায়নী-কথা কিংবা মহাভারতের কাহিনী উভয় ক্ষেত্রেই নারী এবং রাজ্য দুই জিনিস ছিল। রামায়ণের যুদ্ধের মূলে ছিল নারীর উপর অধিকার বিস্তার আর মহাভারতে নারী বা রাজ্যই ছিল যুদ্ধের মূল। ঠিক এই রকম এক নারীই ছিলেন ইলিয়াড কাহিনীর সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে। হেলেনের অপহরণ এবং গ্রীক সৈন্যদের ট্রয় অবরোধ এবং পরিশেষে ট্রয় নগরীর ধ্বংস সাধন ও হেলেনের পুনরুদ্ধার — ইলিয়াড কাহিনীর মূল কথা।

মীর মশাররফ যে কাহিনীটি অবলম্বন করেছিলেন তাতে যুদ্ধ, প্রতিহিংসা, হত্যা ইত্যাদির অভাব নেই। তবু এই কাহিনীটিকে উপন্যাসের প্লটে পরিণত করবার জন্য লেখককে কাহিনীর সজ্জা বা বিন্যাস কিছু পরিবর্তিত করতে হয়েছে। পরিচিত ঘটনাকে সাহিত্যের সম্ভাব্যতার সূত্রে গেঁথে তুলতে হয়েছে। এই কারণে কেবল রাজ্যলাভ, যুদ্ধ, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা—এসব ঘটনা থেকে মানব সম্বন্ধের আভ্যন্তর ক্রমে গেঁথে বিন্যস্ত করতে হয়েছে। মীর মশাররফ কারবালার যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাকে অক্ষত রেখে তার কারণ হিসেবে — এজিদের প্রতিহিংসাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার কারণ হিসেবে— জয়নাবের প্রতি প্রেম এবং ব্যর্থতাকে উপস্থিত করেছেন। জয়নাবকে লাভ করবার জন্য এজিদের কৌশল—জয়নাবকে তালাক দেওয়া — জয়নাবের কাছে দূত প্রেরণ—জয়নাবের হাসানকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ—এরই প্রতিক্রিয়াই এজিদের ক্রোধ—রাজ্য আক্রমণ—হাসানকে কৌশলে বিষ প্রয়োগে হত্যা সব ঘটনাকে সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি মূল ইতিহাসের কিছু ঘটনা ও চরিত্রকে লেখক পরিবর্তিত করে নিয়েছেন।

এজিদের পিতাকে লেখক হজরত মহম্মদের একনিষ্ঠ অনুচররূপে কল্পনা করেছেন। তিনি নিজে বিবাহ ও পুত্রোৎপাদন করতে অনাগ্রহী ছিলেন। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় নিতান্ত বাধ্য হয়ে তিনি বিবাহ করেন। এজিদ সেই

বিবাহের ফল। মাবিয়া এজিদকে হাসানের সঙ্গে বিরোধ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু এজিদ সে নির্দেশ মান্য করেননি। তিনি ছিলেন জয়নাবের রূপ সৌন্দর্যে মত্ত এবং সেই কারণে অন্য কোন যুক্তিচিন্তা করবার চিত্তস্থিরতা তাঁর ছিল না। এইভাবে একদিকে এজিদের চিত্তকে রূপোত্তেজিত করে লেখক প্রণয় ও রূপ-তৃষ্ণাকেই এ কাব্যের মূল নির্ধারক শক্তি রূপে পরিগণিত করেছেন। একদিকে এজিদের এই রূপোন্মত্ত চিত্তের একমুখী প্রণয় পিপাসা এবং ব্যর্থতাজনিত ক্রোধ অন্যদিকে হাসানের নিরুত্তেজ শান্ত ধর্মনির্ভর ঈশ্বর বিশ্বাসী জীবনবোধ — এই দুয়ের একটা দ্বন্দ্বে এই উপন্যাসের কাহিনী গঠন করা হয়েছে। সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন, 'বিষাদসিন্ধু'র চরিত্রগুলি কামক্রোধলোভ হৃদয়বত্তা ও ধর্মাদর্শ নিয়ন্ত্রিত মানুষ সে কথা ঠিক। এই দ্বিমুখী মানব চরিত্রের গড়ন তিনি পুরাণ সাহিত্য রামায়ণ বা মহাভারত থেকেও পেতে পারেন। অথবা পুঁথিসাহিত্য থেকেও তা তিনি গ্রহণ করতে পারেন। কয়েকটি সূত্রাকারে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে ঃ—

১. প্রণয়কে বিরোধের মূল বলে আরম্ভ করা হয়েছে এবং স্ত্রীর সপত্নী ঈর্ষাকে কাজে লাগিয়ে এজিদপক্ষ প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হাসানকে বধ করেছে। কাহিনীকে ইতিহাসের তথ্য থেকে মানবিক গুণ সম্পন্ন করবার কারণে লেখক প্রথমে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে প্রেমের দ্বন্দ্বে পরিণত করেছেন এবং ব্যর্থ প্রেম ও রাজনীতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার কাজে লাগিয়েছেন। এই প্রেমসূত্রে ঘটনাকে গ্রথিত করে উপন্যাসের কাহিনীরূপ দেওয়া হয়েছে।

২. কাহিনীতে মানবিকতা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে লেখক গভীর অনুভূতিশীলতা, মানবিকবোধ, হজরত এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি জনগণের নির্ভরতা ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়েছেন।

৩. ইতিহাসে ফোরাত নদীর তীরে তাঁবু ফেলা আর উপন্যাসে দৈবক্রমে ফোরাত নদীর তীরে উপস্থিত হওয়া ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি এ বিষয়ে সংস্কারকে কাজে লাগিয়েছেন।

৪. মূল কাহিনীর হাসান চরিত্র অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। উপন্যাসে তিনি ধর্ম, ন্যায় ও সততার মূর্তিরূপে উপস্থাপিত। বস্তুতপক্ষে এই ধর্মবোধ এবং প্রেমচেতনা এই উপন্যাসের দুটি প্রধান সূত্র যার দ্বারা কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। ধর্মবোধ এখানে যেমন একদিকে হাসান হোসেনের ধর্মবিশ্বাস, ন্যায়পরায়ণতা এবং ঈশ্বরনির্ভরতা তেমনি প্রজাগণেরও তাঁদের প্রতি বিশ্বাস। এই সূত্রেই পুঁথি সাহিত্যের অলৌকিকতা এসেছে। তারা কাহিনীবিন্যাস বা গঠনকে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ করেনি, কেবল লোকবিশ্বাসকেই প্রভাবিত করেছে।

'বিষাদসিন্ধু'র প্রকরণ প্রকৃতির বিচারে সমালোচকদের মধ্যে নানা মতভেদ লক্ষ করা যায়। গ্রন্থরচনায় মশাররফের কৃতিত্ব স্বীকার করেও আনিসুজ্জামান একে মিশ্রভাষারীতির 'একটি সাধু গদ্যরূপ'[৮৪] বলে অভিহিত করেছিলেন। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম[৮৫] এবং রশীদ আলফারুকী[৮৬] বলেছেন এটি 'উপন্যাস'। আবদুল লতিফ চৌধুরী[৮৭], মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল[৮৮] ও ওয়াকিল আহমদের[৮৯] মতে, এটি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। আবার আবদুল আজীজ আল-আমান[৯০] ও সিরাজুদ্দীন আমেদ[৯১] একে 'ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস' বলে মত প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে হরনাথ পাল চিহ্নিত করেছেন 'historical romance'[৯২] বলে এবং ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন

" 'বিষাদসিন্ধু' গদ্যেলেখা মহাকাব্য এবং বিষাদসিন্ধু একটি ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স।"[৯৩] এ বিষয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ—

> 'বিষাদসিন্ধু' খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, জীবনচরিতও নয়, তেমনি আঁটঘাট বাঁধা বিধিবদ্ধ 'Organic plot' -এর উপন্যাসও নয়। এ ইতিহাস উপন্যাস, সৃষ্টিধর্মীয় রচনা ও নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ববিধ সংমিশ্রণে রোমান্টিক আবেগমাখানো এক সংকর সৃষ্টি।[৯৪]

আবার সুদূর আরব দেশের ধর্মীয় পটভূমিকায় কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত বলে 'বিষাদসিন্ধু'কে গ্রামবাংলার অজস্র সাধারণ মুসলিম সমাজ ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবেও বিবেচনা করে থাকেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই একে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলেও মনে করেছেন। সুতরাং আমাদের সামনে প্রশ্ন এসে যায়, এটি ধর্মীয়গ্রন্থ, না ইতিহাস, না ঐতিহাসিক রোমান্স, না উপন্যাস, না ঐতিহাসিক উপন্যাস ? নাকি গদ্যে লেখা মহাকাব্য ?

আমাদের বিবেচনায়, 'বিষাদসিন্ধু' জঙ্গনামা ও এই জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সাধুভাষায় রূপান্তর মাত্র নয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, 'বিষাদসিন্ধু'র নিছক কাহিনী রচনায় মশাররফ হোসেনের মৌলিক অবদান তেমন নেই। কেননা কারবালা-কাহিনী বহুকাল থেকেই মুসলিম পাঠক সাধারণের কাছে পরম আদর ও আকর্ষণের বস্তু। 'শহীদে কারবালা', 'মকতুল হোসেন', 'জঙ্গনামা' প্রভৃতি পূর্ববর্তী মিশ্রভাষারীতির কাব্য তার নিদর্শন। আমরা ইতিপূর্বে পুঁথি সাহিত্যের একটি গ্রন্থের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় দেখেছি যে, 'বিষাদসিন্ধু'তে পুঁথির প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মশাররফের রচনারীতি তাঁকে পুঁথিকারদের থেকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। কাহিনী বর্ণনার শিল্প-কৌশলটি তাঁর নিজস্ব। ঘটনার চমৎকারিত্ব আরোপ এবং নাটকীয় ভঙ্গীতে কাহিনীর রহস্য উন্মোচনে তাঁর পারদর্শিতা বিস্ময়কর। তাছাড়া তাঁর প্রতিভার আর একটি মূল পরিচয় হল, তাঁর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ছবি আঁকার ক্ষমতা। তাঁর স্বর্গ-মর্ত্য সবই বাস্তব, দৃষ্টিগ্রাহ্য, স্পর্শগ্রাহ্য — কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি নিভৃত গৃহকোণে। ইলিয়াড বা মহাভারতের মতো দেবতা সেখানে বারবার ইন্দ্রিয়সীমার মধ্যে চলে আসছে। দেহ ও দেহাতীতের মধ্যে তফাৎ প্রায় কিছুই নেই। এখানেও মনে হয় দেহাতীতের জায়গা নেই। এ কারণেই দীর্ঘকাল যাবৎ অতি পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও কারবালা কাহিনী রসরূপের সম্পূর্ণ নতুন এক আস্বাদন নিয়ে আধুনিক কালের পাঠকের নিকট উপস্থিত হয়েছে।[৯৫] তাই একে কেবলমাত্র পুঁথির 'একটি সাধু গদ্যরূপ' বলা যায় না।

সাধারণ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মুসলমানের কাছে 'বিষাদসিন্ধু' ধর্মীয় অনুভূতির আবেগ সৃষ্টি করলেও কোরাণ শরীফ বা হাদিস শরীফ যে অর্থে ধর্মীয় গ্রন্থ তার কোন চিহ্নই এখানে উপস্থিত নেই। প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি নামের উচ্চারণ, কিছু ঘটনার পারম্পর্য বা কিছু কথোপকথন ছাড়া এতে ধর্মের আর কোন গৌণ প্রমাণ বা চিহ্ন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মশাররফও কোন ধর্মীয় প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে এটি রচনা করেননি। হাসান হোসেন বা হানিফার দ্বারাও ধর্মের মহিমা কীর্তিত হয়নি — বরং ধর্মদ্রোহী এজিদের হৃদয়-বেদনা শিল্পীর লেখনীতে সু-অঙ্কিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, গ্রন্থমধ্যে মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার তিনি করেছেন তাও স্বেচ্ছায় নয়। "শাস্ত্রানুসারে, পাপ ভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য"[৯৬] হয়েই। বরং বলা যায়, 'ধর্মবোধ সম্বন্ধে অতি-অকিঞ্চিতকর ধারনার পরিচয়'[৯৭] তিনি অনেক জায়গায় দিয়েছেন। সুতরাং 'বিষাদসিন্ধু'কে কোন অর্থেই ধর্মীয় গ্রন্থের মর্যাদা

দেওয়া যায় না।

কারবালার বিষাদময় ইতিহাস মশাররফের কতটুকু জানা ছিল তা আমরা জানিনা, তবে লিখতে বসে তিনি যে ইতিহাসের যথার্থ অনুসরণ করেননি তা আমরা পূর্বের তুলনামূলক আলোচনাতেই দেখেছি। ইতিহাসে হাসান হোসেনের সঙ্গে এজিদের বিরোধ যেখানে রাজনৈতিক সেখানে 'বিষাদসিন্ধু'তে এর মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে জয়নাবের প্রতি এজিদের প্রেম-তৃষ্ণা। হাসান, হোসেন, মাবিয়া, এজিদ, মারওয়ান প্রভৃতি চরিত্র এখানে অনেকটা ভিন্নরূপে চিত্রিত। কোন কোন ইতিহাসে আলীর পুত্র হিসেবে মোহাম্মদ হানিফার নাম আছে মাত্র, কিন্তু লেখক হানিফাকে যেভাবে এঁকেছেন ইতিহাসে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। তাছাড়া 'বিষাদসিন্ধু'তে হোসেনের ছিন্নমস্তকের শোণিত বিন্দুর ধারায় এজিদের পরিণাম আরবীতে লিখিত হওয়ার মতো অনেক অলৌকিক এবং কাল্পনিক বিবৃতিও রয়েছে। সে কারণে এটি ইতিহাস গ্রন্থও নয়।

তাহলে 'বিষাদসিন্ধু' কি উপন্যাস না রোমান্স ? রোমান্সের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন ঃ—

> রূপকথা ও বাস্তবতার মাঝামাঝি আর একটি সাহিত্যের জগৎ আছে—যাহা রূপকথার মত বাস্তবের সহিত একেবারে সম্পর্কশূণ্য নয়, আবার কঠিন বাস্তবের মত যাহার শিকড় একে মাটির মধ্যে প্রোথিত নয়। ঐ মধ্যবর্তী জগতের নাম রোমান্সের জগৎ।[৯৮]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি এত প্রবল বা সর্বগ্রাসী নহে।'[৯৯] সমালোচক কেনেডি বলেন,

> a novel is a book length story in prose, whose author tries to create the sense that while we read we experience actual life . . . A romance had no such limitations.
>
> . . . the labels of novel and romance may be useful to distinguish between the true to life story of useful people in ordinary places and the . . . life story of daring deeds and high adventure, set in the past or future or in some time less land.[১০০]

এদিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যায়, 'বিষাদসিন্ধু'তে 'ঐতিহাসিক রোমান্সের প্রধান ধর্ম'[১০১] রয়েছে। ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও এতে লেখক ঘটনা উদ্ভাবনে ও বিন্যাসে, পরিস্থিতি তৈরি করায় এবং চরিত্র-রচনায় লেখক প্রভূত কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। 'বিষাদসিন্ধু'তে যুদ্ধের ঘটনাগুলি বিশালতায়, গাম্ভীর্যে অতীতের কণ্ঠে এত সোচ্চার যে তা উপন্যাসকে ছাপিয়ে রোমান্সের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তবে সমকালের রোমান্সে—বিশেষত বঙ্কিমের রচনায় অতিলৌকিকতা মাঝে মাঝে বিস্মিত করে, সমালোচকদের ভাবায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই মনস্তাত্ত্বিকতা, প্রাচীন ঋষি-প্রজ্ঞা প্রভৃতির আশ্রয়ে বাস্তবতার বিভ্রম আনতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, " 'বিষাদসিন্ধু'র অতিলৌকিকতা বঙ্কিমী ছাঁদে নয়, মহাকাব্যের মেজাজে সাধা—যেন বিশ্ববিধানের অনিবার্য সত্য — বাস্তবতার বিচার সেখানে নীরব।"[১০২]

'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাস কিনা এবং উপন্যাস হয়ে থাকলে তা কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাও বিচার্য। 'বিষাদসিন্ধু'র অলৌকিক অংশগুলির কথা স্মরণে রাখলে একে ঠিক উপন্যাস বলে গ্রহণ করা যায় না। কেননা বাস্তবতা উপন্যাসে শিল্পের অন্যতম প্রধান শর্ত। সেখানে 'actual life' ই প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। তবে এ গ্রন্থে অলৌকিকতার আমদানী বিষয়ে লেখকের কৌশল সম্পর্কে দুটি কথা বলা যায়। প্রথমত 'বিষাদসিন্ধু'র ঘটনাস্থান ও ঘটনাকাল সপ্তম শতাব্দীর আরব দেশ। 'বিষাদসিন্ধু'র বিচারকালে সেই যুগের ও মানুষের বিশ্বাসের কথাটি মনে রাখতে হবে। কাজেই হজরত মোহাম্মদের (সঃ) বংশধরেরা যদি দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী হন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দ্বিতীয়ত মশাররফ তাঁর সমকালের গ্রামীণ মুসলমান পাঠকের চাহিদাকেও মনে রেখেছিলেন। বরং তিনি পুঁথির পাঠকদের অলৌকিকতার প্রতি আকর্ষণকে যতটা সম্ভব কমিয়ে শিক্ষিত মার্জিতরুচি পাঠকদের উপযোগী করতে অলৌকিকতার ব্যবহারে মাত্রাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। "এই মাত্রাবোধ আমরা (বলতে মুসলমান সাহিত্যিক) মীর সাহেবের কাছ থেকে প্রথম পেয়েছিলাম এবং সেই মাত্রাবোধই মুসলমানী সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিকের দিক নির্দেশক।"[১০৩]

'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনীতে অলৌকিকতা আছে কিন্তু সে অলৌকিকতা মূল কাহিনীর নির্ধারক কিনা তাই বিচার্য। যদি লেখক অলৌকিকতাকে এই রচনায় নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করেন তাহলে বলা যাবে কাহিনী অলৌকিকতা প্রভাবিত।

প্রথম অংশে মহরম পর্বে সে ধরণের অলৌকিকতা নেই। যখন নিয়তিতাড়িত হয়ে হোসেন ফোরাৎ নদীর তীরে পৌছান তাকে অলৌকিক অভিযান না বলে ভ্রান্তিজনিত পথবিভ্রম বলা যায়। লেখক অবশ্য নানা অতিপ্রাকৃত দৃশ্য বর্ণনা করে হোসেনের পতনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু হোসেন সেই অলৌকিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হননি। দৈবতাড়িত মানুষের মতো সমস্ত শক্তি বলে নিজের মানবিক শক্তির বিকাশ সাধন করেছেন। তিনি ফোরাৎ নদীতে নেমে জল পান করেন নি কোন অলৌকিক কারণে নয়—পুত্র কন্যাদের পিপাসার্ত মুখচ্ছবি স্মরণ করে। এটি তাঁর মানবিক ধর্মেরই প্রকাশ।

সীমার যে তাঁর মাথা কাটতে পারেনি তা কোনোভাবে কাহিনীর নিয়ন্ত্রক শক্তি নয় বরং হোসেন যে তাঁর শিরচ্ছেদ করবার উপায় বলে দিয়েছেন তাই যথেষ্ট করুণ রস সৃষ্টি করে। সীমার—মশাররফ বর্ণনা করেছেন—টাকার জন্য হোসেনের মাথা নিয়ে যাচ্ছেন এজিদের কাছে। এবং এজিদের সভায় তিনি তাঁর আত্মীয়বর্গের সামনে তাদের বিদ্রূপ করছেন। এখানে কোনো অলৌকিকতার বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই।

অবশ্য 'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনীর মধ্যে কোনো অলৌকিকতা নেই তা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অলৌকিকতা কাহিনীর পরিচালিকা শক্তি নয়—তাই আমরা বলতে চেয়েছি। পুঁথি-সাহিত্যের অলৌকিকতা থেকে বরং মশাররফ বাস্তব-বোধের দিকে গল্পকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। এইখানে তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

এই সমস্ত বাদ দিয়েও 'বিষাদসিন্ধু' কে বিচার করলে দেখা যায়, এতে একটি কাহিনী (Plot) রয়েছে এবং সে কাহিনীকে কেন্দ্র করে বহু উপকাহিনী গড়ে উঠেছে—যা উপন্যাসের একটি প্রধান লক্ষণ।[১০৪] অবশ্য লেখক

কোন কোন ক্ষেত্রে অতিকথনের দরুন কাহিনীগুলিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। সাধারণভাবে পাঠ করলে এতে ধর্মের প্রাধান্য আছে বলে কখনো মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে এখানে "মীর মশাররফ হোসেনের মানবপ্রীতি ও শিল্পবোধ"[১০৫]ই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। এই 'মানবপ্রীতি ও শিল্পবোধ' 'বিষাদসিন্ধু'র অন্যান্য ত্রুটিকে অতিক্রম করে একে একটি উপন্যাসের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

'বিষাদসিন্ধু' যদি উপন্যাসই হয়ে থাকে তাহলে তা ঐতিহাসিক উপন্যাস কিনা? ঐতিহাসিক উপন্যাসকে একজন লেখক বলেছেন, 'Claims a basis in fact' এবং 'a detailed reconstruction of life in another time, perhaps in another place.' [১০৬]। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, এ গ্রন্থ রচনায় লেখক যতটা না ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন, তার চেয়ে বেশি অনুসরণ করেছেন নানা কিংবদন্তীপূর্ণ উপাখ্যানমূলক পুঁথিসাহিত্যকে। এই গ্রন্থের প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত। অপ্রধান চরিত্রগুলির অধিকাংশই ইতিহাস বহির্ভূত—হয় পুঁথি সাহিত্য থেকে নেওয়া, নয়তো লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি। বলাই বাহুল্য, ইতিহাসে হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের বিরোধ যেখানে রাজনৈতিক, 'বিষাদসিন্ধু'তে সেখানে তার মূল উৎস প্রেম। এক্ষেত্রে তাই নিজস্ব জীবনবোধ, আবেগপ্রবণতা এবং রসযুক্ত মানবিক কাহিনী-সৃষ্টির প্রবল কামনা লেখককে ইতিহাসের তথ্য থেকে বার বার দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। সুতরাং এদিক থেকে একে পুরোপুরি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। তাঁর জয়নাব সত্য হোক, মিথ্যা হোক আবেগের মানবিক তীব্রতায় আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল এবং রূপের প্রভায় বঙ্কিমের বহু জ্যোতির্ময়ী চরিত্রের (যেমন--কুন্দনন্দিনী, রোহিনী, শৈবলিনী প্রভৃতি) স্মৃতিকে বহন করে। এ কারণে মুহাম্মদ আবদুল হাই 'বিষাদসিন্ধু' কে "ইতিহাস-আশ্রিত এক জটিল বিপুল রোমান্টিক উপন্যাস"[১০৭] বলেই গ্রহণ করেছেন।

'বিষাদসিন্ধু'র পটভূমিকা বিশাল, আয়তন, বিষয়বস্তু, তার সূচনা ও পরিণতি মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। এটি কেবল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষের কাহিনী নয়—দুই নৃপতির লড়াই। আর এই লড়াই-এ জড়িত ছিল বহুলোকের ভাগ্য। বহুসংখ্যক পাত্রপাত্রী সম্বলিত— কাহিনী—শাখা কাহিনী। রামায়ণ মহাভারত ছাড়া এরকম বিশাল পটভূমিকা ছিল একমাত্র মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'। প্রসঙ্গত স্মরনীয় যে মধুসূদন কারবালার ঘটনা নিয়ে মহাকাব্য রচনা করা যায় বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।[১০৮] মাইকেলের এই মতামতে মশাররফ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে তিনি 'মেঘনাদবধে'র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা যায়। 'মেঘনাদবধকাব্য' ১৮৬১খ্রীঃ প্রকাশিত হওয়ার চব্বিশ বছর পরে 'বিষাদসিন্ধু' প্রকাশিত হয়। এই সময়কালে তিনি যে 'মেঘনাদবধকাব্য' পড়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র দ্বাদশ নথিতে বেগম ও আকালের বঁধু নিজেদের জন্য সৃষ্ট একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'মেঘনাদে'র প্রমীলা ও মেঘনাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে।[১০৯] এছাড়াও মধুসূদনের প্রতি মীরের মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'আমার জীবনীতে'।[১১০] যাই হোক এই সাদৃশ্যের কথা মনে রেখে কাজী আবদুল ওদুদ বলেছিলেন, "মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বর্ণনার ছায়া যে মাঝে মাঝে 'বিষাদসিন্ধু'র উপরে পড়েছে শুধু তাই নয় 'মেঘনাদবধে'র দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনার সঙ্গে এর দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনার গভীর মিল রয়েছে।"[১১১]

তবে গ্রন্থদ্বয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকা সত্বেও পরিণতি এক নয়। রাবণের তুলনায় এজিদের পরিণতি ভয়াবহ।

এখানে এজিদ শক্তিধর হয়েও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছেন। এখানেই মীরের মানসদ্বন্দ্ব। মাইকেল খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে হিন্দুধর্মের কোন আবেগের দ্বারা পরিচালিত না হওয়া তাঁর পক্ষে এমন কিছু নয়। কিন্তু মীরের মানসিকতা যাই থাক না কেন, তাঁর পক্ষে পারিবারিক ঐতিহ্য, পরিবেশ ও ধর্মবোধ অস্বীকার করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব ছিলনা। এই ধর্মীয় আবেগই 'বিষাদসিন্ধু'র শেষে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কেননা, হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা কি তা তিনি জানতেন। এ কারণেই তাঁকে এজিদের ভয়াবহ পরিণতির চিত্র আঁকতে হয়েছে—নিজ হাতে গড়া সোনার প্রতিমাকে নিজ হাতেই বিসর্জন দিতে হয়েছে। অবশ্য এই অংশে খাঁটি মুসলমান মীরের কাছে শিল্পী মীরের পরাভব ঘটেছে।

রামায়ণে যেমন সীতা, ইলিয়াডে যেমন হেলেন তেমনি 'বিষাদসিন্ধু'তেও সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে রয়েছে একটি নারী – জয়নাব। মহাকাব্য 'বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।' মীর তাঁর উপন্যাসের জন্য নির্বাচন করেছেন স্বশ্রেণীর গৌরবগাথা যা 'বৃহৎ বনস্পতির মতো' অসংখ্য মানুষকে দীর্ঘকাল 'আশ্রয়ছায়া' দান করেছে। এই কাহিনীতে পাওয়া যায় কেনেডি কথিত 'totality of the beliefs of a people'।[১১২] তবে মশাররফ 'মেঘনাদবধে'র দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি আধুনিক মহাকাব্যের আদর্শ অনুসরণ করেন নি। তাঁর অবলম্বন ছিল প্রাচীন বা মৌখিক মহাকাব্যের আদর্শ। 'বিষাদসিন্ধু'র যৌথপাঠ আজও বহু শ্রোতার আনন্দের অভিজ্ঞতা। ভাষার যে সারল্য ও স্পষ্টতা যৌথপাঠের পূর্বশর্ত, 'বিষাদসিন্ধু' তা মেটায়। 'The form of novel lies in the rhythmical movment of the sequence of events.'[১১৩] জর্জ টমসনের এই উক্তিতে এটা সুস্পষ্ট যে, উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ বিন্যাসেরও ছন্দ আছে। 'বিষাদসিন্ধু'তে মীর ব্যবহৃত তরঙ্গ 'প্রবাহ', 'সিন্ধু' শব্দাবলী বুঝিয়ে দেয় উপন্যাসে ঘটনাবলীর ছন্দিত রূপায়ণ সম্পর্কে তিনি কতটা সচেতন ছিলেন। মৌখিক মহাকাব্যের রীতি অবলম্বন করলেও মীর সামগ্রিক কাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে দেন নি। 'বিষাদসিন্ধু'র তিনটি পর্ব অ্যারিস্টটল-কথিত মহাকাব্য-কাহিনীর আদি, মধ্য ও অন্ত।

'বিষাদসিন্ধু'র ঘটনগুলি যেন চোখের সামনেই ঘটছে। এ রকম ধারাবিবরণী পাওয়া যায় মৌখিক মহাকাব্যে। এ রকম বহু দৃষ্টান্তের একটি হল, মহরম পর্বে ষড়বিংশ প্রবাহের অন্তর্গত সীমারের বর্ণনা ঃ "পাঠক! এই সেই সীমার ! সুধার খঞ্জর হস্তে সেই সীমার, ঐ হোসেনের বক্ষের উপর বসিয়া গলা কাটিতে উদ্যত হইল।" – লেখক যেন একটু দূরে দাঁড়িয়েই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন। 'সম্বোধন' এই প্রত্যক্ষীকরণের একটি শিল্পসম্মত প্রক্রিয়া। ইলিয়াডে আকিল্লেসের সঙ্গে হোমার নিজের কণ্ঠস্বর মিলিয়েছেন। 'বিষাদসিন্ধু'র উদ্ধার পর্বের চতুর্থ প্রবাহে মীরও অনুরূপভাবে আবদুল ওহাবকে প্রশ্ন করেছেন — "ঐ যে শিরশূন্য মহারথী দেহ ধূলায় পড়িয়া আছে . . . হায় ! হায়! তুমি কি আবদুল ওহাব?" – এ ছাড়া মৌখিক মহাকাব্যের যুগে কাহিনী-কথনে বর্ণনাকারী আশ্রয় নিতেন পুনরুক্তির। পুনরুক্তি শ্রোতাদের ম্লান হয়ে আসা স্মৃতিকে উসকে দিত। 'বিষাদসিন্ধু'তে এই রীতির অনুসরণ আছে বহুক্ষেত্রে। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কারণেই একে কেউ 'গদ্যে রচিত মহাকাব্য'[১১৪] এবং কেউবা "বাংলা সাহিত্যে 'বিষাদসিন্ধু'ই সম্ভবত মৌখিক মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র উপন্যাস"[১১৫] বলে অভিহিত করেছেন।

সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে বলা যায়, 'বিষাদসিন্ধু'তে নানাবিধ সাহিত্যিক লক্ষণের সমাবেশ

ঘটেছে। তবে সর্বোপরি প্রাধান্য লাভ করেছে রোমান্সেরই ধর্ম। ইতিহাসের কাহিনীর মূল কাঠামোকে অবলম্বন করলেও নানা অলৌকিকতা, অভাবনীয়তা এবং আকস্মিকতা—এই গল্পবর্ণনার বাস্তব পরম্পরাকে ক্ষুন্ন করেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে-'Claims a basis in fact' 'বিষাদসিন্ধু' সম্বন্ধে 'Basis in fact' রক্ষিত হয়নি। তাই একে ঐতিহাসিক রোমান্স বলাই সঙ্গত।

চরিত্র চিত্রণ

'বিষাদসিন্ধু' একটি চরিত্রপ্রধান উপন্যাস। এতে মুখ্য ও গৌণ চরিত্রের এক মহামিছিলের সমাবেশ ঘটেছে। এই চরিত্রগুলিকে সাধারণভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একদিকে অত্যন্ত সৎ এবং মহৎ চরিত্র। এই শ্রেণীতে রয়েছেন হাসান, হোসেন, মোসলেম, কাসেম, আব্দুল ওহাব, হানিফা, গাজী রহমান, হামান প্রভৃতি। এঁরা প্রত্যেকেই নিয়তি ও ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অন্যদিকে রয়েছে মারওয়ান, আব্দুল্লাহ জেয়াদ, সীমার, মায়মুনা জাতীয় চরিত্র যারা পাষণ্ড, কুৎসিত ও নীচ—নৈতিকতার দৃষ্টিতে অসৎ প্রকৃতির। উভয় শ্রেণীর চরিত্রগুলিই সমান্তরাল একপেশে। সমানভাবে বিকশিত হয়নি। এঁদের সব চরিত্রই কাহিনীর প্রয়োজনে অপরিহার্যও নয়। 'বিষাদসিন্ধু'তে দুটি চরিত্রে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে এবং মানবিক আবেগ অনুভূতি আরোপিত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা হল—এজিদ এবং জায়েদা।

'বিষাদসিন্ধু'র চরিত্রগুলিব মধ্যে হজরত মোহাম্মদের বংশধরগণ সকলে এবং অন্যান্য চরিত্রের কয়েকজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তবে এ সমস্ত চরিত্র ইতিহাসে যেভাবে চিত্রিত মশাররফ হোসেন তাঁদের সেভাবে অঙ্কন করেন নি। ইতিহাসকার বা পুঁথিসাহিত্যিক পূর্বসুরীদের যাঁর কাছ থেকেই তিনি উপকরণ সংগ্রহ করে থাকুন না কেন সমস্ত চরিত্রগুলিই তাঁর লেখনীতে হয়ে উঠেছে নতুন সৃষ্টি। এছাড়া তাঁর কাল্পনিক চরিত্র সৃজন তো রয়েছেই। তবে তাঁর এই সমস্ত চরিত্রগুলিব মধ্যে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাঁদের মনোজগতে কোন দোলাচলতা নেই। কখনই একই মানুষের মধ্যে দুই বিরোধী অনুভবের আলো ও ছায়া খেলা করে না। 'I hate and love/you ask how that can be? / I do not know but know/it tortures me/ — Catullus-এর এই কবিতার[১১৬] মতো মিশ্র অনুভূতির রক্তাক্ত যন্ত্রনা নেই কোন চরিত্রে।

তবু চরিত্র সৃজনে মশাররফের কৃতিত্ব যে অন্যত্র তা ধরা পড়েছে মুনীর চৌধুরীর এই বিশ্লেষণে—

> মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনার জীবনবিমুখ আচ্ছন্নতাকে অপসারিত করে ইহলোকের ইন্দ্রিয়পরবশ মানব মানবীর হর্ষশোকের মহামূল্যকে তিনি যে কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই জন্যই 'বিষাদসিন্ধু'র প্রধান চরিত্র সমূহ, কিস্সা কাহিনীর ক্রোড়োদভূত হয়েও অনেক দূর পর্যন্ত মৃত্তিকা-সংগল্ন, প্রিয়পরিজনবেষ্টিত, শত্রুমিত্র পরিবৃত, সজীব নরনারী।[১১৭]

'বিষাদসিন্ধু'র সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, উজ্জ্বল এবং প্রধান চরিত্র এজিদ। এজিদের কামনা বাসনা, কার্যকলাপ কে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের সূচনা এবং তার মর্মভেদী পরিণতির মধ্যেই কাহিনীর সমাপ্তি। সমগ্র কাহিনীই তার ক্রিয়াকলাপে আলোড়িত ও পল্লবিত। রিপু-শাসিত একজন রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে যাবতীয় দোষগুণ নিয়ে সে

এখানে উপস্থিত। "নীতিবিদের দৃষ্টিতে এজিদের ক্রিয়াকর্ম যত গর্হিত ও অভিশপ্ত বিবেচিত হোক না কেন, চরিত্র বিচারের সাহিত্যিক মানদণ্ডে এজিদের মতো প্রাণময় পূর্ণাবয়ব পুরুষ সমগ্র উপন্যাসে দ্বিতীয়টি নেই"।[১১৮] এজিদ চরিত্রাঙ্কনে লেখক যতটা মনোযোগী ছিলেন, অন্যান্য চরিত্রে তিনি ততটা তন্ময় হতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ–

> যে ধর্মবোধ সেদিনের রাজনৈতিক ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিলো তাকে নির্দ্বিধায় অতিক্রম করে এমন একটি প্রাণস্পর্শী, আবেগময় ও বীর্যবান চরিত্র নির্মাণ করা কম কথা নয়। এই এজিদ যেন সেদিনের ইমামহন্তা এজিদ নন, তিনি একজন প্রাণবান পুরুষ–যিনি বিচক্ষণ রাজনীতিতে, দক্ষ কূটনীতিতে, কুশল ও অকুতোভয় সমরক্ষেত্রে, প্রেমিক ব্যক্তিগত জীবনে, দানশীল তাঁর প্রজাদের ক্ষেত্রে।[১১৯]

এ জন্যই তাঁর পরিণতি পাঠককে অভিভূত করে।

'নব্য সাহিত্যের মর্মমূলে নিহিত মানব নিষ্ঠা' প্রধানত এজিদ চরিত্রকে অবলম্বন করেই 'বিষাদসিন্ধু'তে অভিব্যক্ত। এজিদ রূপবান তরুণ এবং হৃদয়বান প্রেমিক। হাসান-হোসেনের সঙ্গে তার রাজনৈতিক বিরোধের কথা লেখক সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি। হাসানের কথায় তার সাক্ষাৎ মেলে–

> সেই বিধর্ম্মী এজিদ মদিনার খাজনা আমার নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমি তাহার উত্তর দিই নাই; সেই আক্রোশে এবং বিবি জয়নাব আমার সহধর্ম্মিনী হইয়াছে, সেই ক্রোধে এজিদ আমার প্রাণবধ করিবে। [১২০]

কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধের চেয়ে জয়নাবের রূপমুগ্ধ এজিদের অন্তর্দ্বন্দ্বই লেখকের শিল্পদৃষ্টিকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এই রূপজ মোহেই এজিদ দগ্ধ হয়েছে সারা জীবন এবং তার করুণ পরিণতির জন্যই দায়ী তার রূপজ মোহ।

এজিদের এই রূপতৃষ্ণাই আধুনিক জীবনবোধের মহাবাণী। এই ইন্দ্রিয় রূপময় জগতের তৃষ্ণা দেখি কবি মধুসূদনে। এই রূপতৃষ্ণার রূপই পাই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায়। কপালকুণ্ডলার রূপবর্ণনায় লেখকচিত্ত যেমন নন্দিত হয় তেমনি হয় ঔরঙ্গজেবের মুখে নির্মলকুমারীর রূপ প্রশংসার সংসক্তিতে। উনিশ শতকের বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের এই রূপতৃষ্ণা একটি বড় দিক। মশাররফের 'রত্নবতী'তে সুকুমার এই রূপতৃষ্ণার আগুনে আত্মবলি দিয়েছে। রেবতীর রূপই রাজার হৃদয়কে মোহাচ্ছন্ন করেছে। এজিদের মধ্যেও এই রূপতৃষ্ণা। সুতরাং মশাররফ তাঁর সাহিত্যে রূপতৃষ্ণাকে একটি প্রবল শক্তি হিসেবে দেখেছেন।

'বিষাদসিন্ধু'র মহরমপর্বের প্রথম প্রবাহে বর্ণিত –

> এজিদ রাজ্যের প্রয়াসী নহেন, সৈন্যসামন্ত এবং রাজমুকুটেরও প্রত্যাশী নহেন, রাজসিংহাসনের আকাঙ্ক্ষীও নহেন। তিনি যে রত্নের প্রয়াসী, তিনি যে মহামূল্য ধনের প্রত্যাশী, তাহা তাঁহার পিতার মনের অগোচর, বুদ্ধির অগোচর।[১২১]

এই 'মহামূল্যধন' যে জয়নাব এবং সেই জয়নাব লাভের প্রবল আকাঙ্খা ও প্রেমাসক্তিই যে এজিদের ধ্যান-জ্ঞান

লেখক এর পরেই উল্লেখ করেছেন–

> যেদিন জয়নাবকে দেখিয়াছে, জয়নাবের অজ্ঞাতে যেদিন এজিদের নয়ন চকোর জয়নাবের মুখচন্দ্রিমার পরিমলময় সুধা পান করিয়াছে, সেই দিন এজিদ জয়নাবকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জয়নাব-রূপ সাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে; জয়নাবকেই জপমালা করিয়া দিবানিশি জয়নাব নাম জপ করিতেছে। জয়নাব ধ্যান জয়নাব জ্ঞান।[১২২]

জয়নাব-মোহে মুগ্ধ এজিদ, অথচ জয়নাব বিবাহ করেন হাসানকে। তিনি তাই প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হাসানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। এ কারণেই আবেগ কণ্ঠে মন্ত্রী মারওয়ানকে হাসান-হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে বলেন, "যদি এজিদের জয়নাব-লাভের আশা-তরী বিষাদসিন্ধু হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তবে এখনই অগ্রসর হও আর পশ্চাতে ফিরিওনা।"[১২৩]

এজিদ চরিত্রাঙ্কনে মশাররফ যে প্রখর জীবনবোধ ও সৌন্দর্য-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় উদ্ধার পর্বে। এজিদ যথার্থ প্রেমিকের মতোই তাঁর ব্যূহে বন্দিনী জয়নারের কাছে প্রেমনিবেদন করেছেন, যদিও তিনি জয়নার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন– "এ ভীষণ সমর কাহার জন্য ? এ শোনিতের প্রবাহ কাহার জন্য? কি দোষে এজিদ আপনার ঘৃনার্হ ?"[১২৪] যাবতীয় ক্ষমতার অধীশ্বর হয়েও এজিদ এখানে প্রেমের কাছে নতজানু। তাঁর মধ্যে ক্ষোভ আছে, বেদনা আছে–কিন্তু কাপুরুষতা নেই।

এজিদ চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বেরও পরিচয় রয়েছে কাহিনীর শেষে। যে জয়নাব লাভের জন্যে তিনি নৈতিকতা, মানবিকতা বোধ বিসর্জন দিয়ে চরম নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই জয়নাবকে তিনি করায়ত্ত তো করতে পারেন নি, বরং এতে বহু নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ গেছে। সে কারণে অনুশোচনায় বলেছেন–"কেন হেরিলাম ? সে জলন্ত রূপরাশির প্রতি কেন চাহিলাম ? হায় ! হায় ! কত প্রাণ–ছি! ছি! কতপ্রাণ বিনাশ হইল।"[১২৫] এই অনুশোচনাবোধের পাশাপাশি বিবেকবোধেরও পরিচয় কখনো কখনো দেখা দিয়েছে। আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে পূর্ণ সাহায্য করলেও হাসানের বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী জায়েদাকে বধ করার মধ্যে এবং বন্দি জয়নালকে বধ করতে উদ্যত হয়েও নিরস্ত হওয়ার মধ্যে এই সুপ্ত বিবেকবোধ জাগ্রত হতে দেখা যায়।

এজিদ চরিত্র পরিকল্পনায় 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাবণ চরিত্রের প্রভাব রয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১২৬] উনিশ শতকীয় নবচেতনায় উদ্দীপ্ত দুই মহৎ শিল্পীর হাতে পুরাণ ও ইতিহাসের এই দুই প্রতিনায়ক চরিত্র নতুন তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েও এই দুই চরিত্রের নিয়তি নির্ধারিত ট্রাজিক পরিণতি মানবিক ও করুণার উদ্রেককারী। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যেমন রামের পরিবর্তে রাবণই তেমনি বিষাদসিন্ধুতে হোসেনের পরিবর্তে এজিদ কেন্দ্রীয় চরিত্র। কাজী আবদুল ওদুদও এজিদ চরিত্র পরিকল্পনায় রাবণ-চরিত্রের 'গভীর মিল' ও প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এজিদের সঙ্গে রাবণের তুলনা কতদূর সঙ্গত তা বিচার করবার আগে কয়েকটি ঘটনা মনে রাখা দরকার ঃ–

১. রাবণ মধুসূদনের কবিচিত্তের সহানুভূতি পেয়েছিল। রামকে তিনি ঘৃণা করেন–রাবণকে Grandfellow বলে মনে করেন।

২. একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে মীর মশাররফ হাসান হোসেনের প্রতি সশ্রদ্ধ। তাঁদের অলৌকিক শক্তি বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। এজিদকে তিনি পাপী বলে মনে করেন।

৩. মধুসূদন সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন। নবজাগরণের মানবতা ছিল তাঁর সহায়। মীর মশাররফ মুসলমানদের পবিত্র পুরাণকে কোথাও পরিবর্তন করতেও চাননি। এমনকি ইতিহাসের ঘটনাকেও যে কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু কিছু কারণে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তাতে লৌকিক ভক্তিরসের সঞ্চার সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া মধুসূদনের রাবণ চরিত্রের ট্রাজেডির নায়কের যে মহিমা, মশাররফ তাঁর এজিদ চরিত্রে সেই মহিমা পরোপুরি আরোপ করতে পারেননি। এই উপন্যাসের অন্তিমপর্বে এজিদের প্রাণভয়ে পলায়নের যে দৃশ্য তাতে একটি কাপুরুষের চিত্রই ফুটে ওঠে। এর আগের কাহিনী অংশ যে নায়কোচিত বীরমূর্তির পরিচয় পাই এই অংশে তার অপমৃত্যুই ঘটেছে বলা যায়। এ কারণে পরাজয়ের মধ্যেও ট্রাজেডির নায়কের যে মহিমা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এজিদ চরিত্রে তার অভাব। জনৈক সমালোচক যথার্থই বলেছেন ঃ—

> মধুসুদনের বেলায় ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও শৈল্পিক দৃষ্টি-ভঙ্গির কোনো বিরোধ ঘটেনি—পক্ষান্তরে মশাররফ হোসেন শিল্পী ও ব্যক্তি-চৈতন্যের টানাপোড়েনে ক্ষত বিক্ষত, রক্তাক্ত। একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে অন্যায় সমরে হোসেনের মৃত্যুতে তিনি ব্যথিত, বেদনাতুর—আবার শিল্পী হিসেবে এজিদ চরিত্রের বিচিত্র সম্ভাবনা উপেক্ষা করতেও তিনি অপারগ।[১২৭]

এজিদই এই কাহিনীর একমাত্র প্রাণবন্ত পুরুষ যার বিকাশ ও বিবর্তন আছে। এজিদ 'বিষাদসিন্ধু'র কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং সমগ্র কাহিনীর নিয়ন্ত্রক শক্তি। প্রণয়-বঞ্চিত, নিয়তি-লাঞ্ছিত এই এজিদেরই শোকাবহ পরিণতির কাহিনী হয়ে উঠেছে 'বিষাদসিন্ধু'। "ইতিহাসের মরুপ্রান্তর নয়, এজিদের প্রেমদীর্ণ হৃদয়ই এখানে কারবালায় রূপান্তরিত হয়েছে।"[১২৮]

এজিদ ব্যতীত 'বিষাদসিন্ধু' 'উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত মানবী'[১২৯] এবং উজ্জ্বল চরিত্র জায়েদা। ধর্মের নয় শিল্পী মনের এক সুতীক্ষ্ম অভিব্যক্তি ঘটেছে জায়েদা চরিত্রে। তাঁর চরিত্রে মানবিক অনুভূতি আরোপ করা হয়েছে। তাঁকে কেন্দ্র করেই একটি 'প্রেমিক নারীর ঈর্ষা এবং সপত্নীদ্বেষের তীব্র রূপ'[১৩০] প্রকাশিত হয়েছে।

রূপজ-মোহের পরেই 'বিষাদসিন্ধু'র অন্যতম উপাদান সপত্নীবাদ। এর আগে 'বসন্তকুমারী' নাটকেরও উপজীব্য ছিল এই সপত্নীবাদ। সেখানে এই সপত্নীবাদের যে প্রকাশ তার পরিণত শিল্পসম্মত রূপায়ণ ঘটেছে 'বিষাদসিন্ধু'র জায়েদা চরিত্রে। এছাড়া মশাররফের পরবর্তীকালের রচনায় এর ছাপ রয়েছে।

জায়েদা চরিত্রাঙ্কণে মীরের ব্যক্তি-জীবনের যে ছায়ার কথা বিভিন্ন সমালোচক[১৩১] উল্লেখ করেছেন তা যথার্থ বলেই মনে হয়। কেননা মশাররফের পারিবারিক ঐতিহ্যে সপত্নীবাদের যে ভূমিকা ছিল তার পরোক্ষ প্রভাব এবং ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এ চরিত্র রূপায়ণে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল।[১৩২] এর সঙ্গে ইতিহাসের সমর্থন ও প্রচলিত পুঁথির অনুমোদন ছিল বলে মুসলিম সমাজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঐ হাসান পরিবারের এরূপ অন্দর মহলের 'মানবীকরণে'র

চিত্র তুলে ধরা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

জায়েদা ইমাম হাসানের দ্বিতীয়া স্ত্রী, প্রথমা হাসনেবানু আর তৃতীয়া হলেন জয়নাব। জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতায় শিল্পীর অনুভূতি– "সপত্নীবাদ কোথায় না আছে ?"[১৩৩] জায়েদা হাসানকে ভাল বাসতেন। প্রথমা স্ত্রী সকলের মাননীয়া হাসানেবানুর প্রতি জায়েদার আন্তরিক বিদ্বেষভাব ছিল। তবে এতদিন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। কিন্তু তার ভালবাসার পাত্র হাসান যখন জায়েদার ভাবনা চিন্তার বাইরে গিয়ে নতুন বিবাহ করলেন তখন একদিকে যেমন হাসানের প্রতি মনে মনে তাঁর ক্ষোভের সঞ্চার হল তেমনি – "হাসানেবানুর ভয়ে যে আগুন এতদিন চাপা ছিল, ক্রমে ক্রমে জয়নাবের রূপরাশিজ্যোতিঃ তেজে উত্তেজিত হইয়া সেই আগুন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল।"[১৩৪] লেখক এরপর জানাচ্ছেন, "এক অন্তরে দুই মূর্তির স্থাপন হওয়া অসম্ভব। ইহার পর তিনটি যে কি প্রকারে সঙ্কুলান হইল, সমভাবে সমশ্রেণীতে স্থান পাইল, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসিল না।"[১৩৫] এখান থেকেই জায়েদার অন্তরে দ্বন্দ্বের সূচনা। "জায়েদা বাঁচিয়া থাকিতে স্বামী ভাগ করিয়া লইবে না"[১৩৬] এই বোধ থেকে ক্রমে তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় ঈর্ষা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা। একই সঙ্গে মায়মুনার সঙ্গে কথোপকথনে স্বামীপ্রেম-বঞ্চিতা এক নারীর করুণ আর্তিও শোনা যায়– "যে আমার হইল না, আমার মুখের দিকে যে ফিরিয়া তাকাইল না, তাহাকে ঔষধে বশ করিয়া লাভ কি ?"[১৩৭]

অসুখী জায়েদার চিত্তে মায়মুনা সুকৌশলে যে ঈর্ষার বীজ বপন করে, তাই ক্রমে বিষবৃক্ষে পরিণত হয়। স্বামী হত্যার বিষয়ে মায়মুনার প্রস্তাবে জায়েদা প্রথমে দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমে তীব্র হতে থাকে– "সপত্নী-বিষম বিষে আরও যদি জর্জরিত হই, পরমায়ুর শেষ পর্যন্তও যদি এই দুঃখের শেষ না হয়, তাহা হইলেও উহা পারিব না।"[১৩৮] কিন্তু ক্রমাগত প্রলোভন আর প্ররোচনায় জায়েদার দ্বন্দ্ব তীব্র আকার লাভ করে, –

> একদিকে রাজভোগের লোভ অপর দিকে স্বামীর প্রণয়, . . . তথাচ স্বামীর প্রাণের দিকেই বেশী ভারী হইল। কিন্তু জয়নাবের নাম মনে পড়িবা মাত্রই পরিমাণদণ্ডের যেদিকে স্বামীর প্রাণ, সেই দিকে একেবারে লঘু হইয়া উচ্চে উঠিল।[১৩৯]

জায়েদার এই গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব স্বামী হাসানকে বিষ-প্রয়োগের সময়ও দেখা দিয়েছে। একদিকে 'তাঁর অন্তরে প্রজ্জ্বলিত প্রেমানুভূতি' আর অন্যদিকে তীব্র ঈর্ষা এবং লোভ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে ঈর্ষা ও লোভ। প্রথম দুবার ব্যর্থ হওয়ার পর তৃতীয়বার যখন সাফল্য এসেছে, তখন জয়নাবের করুণ আর্তনাদ শুনে তাঁর ঈর্ষা চরিতার্থতা লাভ করেছে। তিনি বলে ওঠেন—

> তোকে কাঁদাইতেই এই কাজ করিয়াছি। . . . যদি জায়েদা বাঁচিয়া থাকে, তবে দেখিস জায়েদার মনের দুঃখের পরিমাণ কত ? . . . কেবল তোমারি জন্য জায়েদা আজ স্বামী-ঘাতিনী বলিয়া চিরপরিচিত হইল। আজ আবার তোমারি জন্য জায়েদা এই স্বামী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল।[১৪০]

এখানে একই সঙ্গে সপত্নী-দ্বেষের পাশাপাশি স্বামীর প্রতি সুপ্ত অভিমানও ব্যপ্ত হয়েছে। এখানেই জায়েদা চরিত্রের মানবীয়তা।

হাসান হত্যার দৃশ্য বর্ণনায় লেখক অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে জায়েদা চরিত্রে পাপ ও পাপীকে প্রতিভাত

করেছেন। হাসানের জন্য তাঁর যত চিন্তা, ঠিক ততখানি জায়েদার জন্যও। এ কারণেই জঘন্য পাপীয়সী জেনেও জায়েদার জন্যে আমাদের চিত্ত সমবেদনায় ব্যাকুল হয়। লেখকের বর্ণনাগুণে পৈশাচিকতাও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আমাদের আচ্ছন্ন মানসকে অভিভূত করে। এর পর জায়েদার বাস্তববোধ ও জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করবার স্বাভাবিক প্রবণতাই তাঁকে এজিদের পাটরানী হতে প্ররোচিত করে। এজিদ 'বিশ্বাসঘাতিনী' নারীকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করলেও জায়েদার ঐ জীবন-তৃষ্ণা মিথ্যা হয়ে যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিনী চরিত্রের যে জীবন-তৃষ্ণা প্রকাশিত মশাররফের জায়েদা চরিত্রেও ভিন্ন আকারে অনুরূপ জীবন-তৃষ্ণাই প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং 'রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে মাটিতে দাঁড়ান এখন জীবন্ত ও বাস্তব চরিত্র বাংলা সাহিত্যের নরনারীর ভিড়ে খুব বেশী প্রত্যক্ষ করা যাবে না।'[১৪১]

এবার এজিদপক্ষীয় কয়েকজন অপ্রধান 'মন্দ' চরিত্রগুলির আলোচনা করা যেতে পারে। এ গুলির মধ্যে মারওয়ান, মায়মুনা এবং সীমার এর কথা উল্লেখ করা যায়–অন্যান্যগুলি তেমন উল্লেখ্য নয়।

মারওয়ান মাবিয়ার জীবৎকালেই এজিদের গোপন পরামর্শদাতা এবং সব দুষ্কর্মের সহায়ক।

> "মারওয়ান যদিও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু এজিদের বুদ্ধি, বল, সহায়, সাহস যত কিছু কার্য সকলই মারওয়ান। প্রধানমন্ত্রী হামান কেবল রাজকার্য ব্যতীত সাংসারিক অন্য কোন কার্যে মারওয়ানের মতে বাধা দিতে পারিতেন না; কারণ তিনি এজিদের প্রিয়পাত্র।'[১৪২]

প্রথম পরিচয়েই তাঁকে প্রচণ্ড কুটকৌশলী হিসেবে দেখা যায়। ধুরন্ধর মারওয়ানই কৌশল ও গভীর ষড়যন্ত্রের সাহায্যে জব্বার ও জয়নাবের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। মারিয়ার মৃত্যুর পর এজিদ নিজের সুবিধার্থে অন্যায়ভাবে হামানকে সরিয়ে মারওয়ানকে প্রধান মন্ত্রী করেন। জয়নাব-লাভের জন্যে যাবতীয় উপায় নির্ধারণ করতে এজিদকে সাহায্য করেছেন মারওয়ান। এজিদের শত্রু হাসানকে সংহার করবার জন্যে মায়মুনাকে আবিষ্কার তাঁরই কীর্তি। তার বিচক্ষণতাও কম ছিলনা। সে বন্দী জয়নাল আবেদীনকে হত্যা না করতে বা হানিফার সঙ্গে সন্ধি করতে এজিদকে পরামর্শ দিয়েছে। নির্মম পাষণ্ড ও হীন চরিত্র হলেও মারওয়ান মাঝে মধ্যে সদগুণেরও পরিচয় দিয়েছে। মৃত হোসেনের পরিবারবর্গের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছে। প্রভুভক্ত হয়েও এজিদের সব অপকর্মকে সে মনে মনে সমর্থন করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত প্রভু এজিদের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেই হানিফার হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আবার মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁর দ্বারা কৃত অন্যায় কাজের জন্য তাকে অনুশোচনা করতেও দেখা যায়। সামান্য হলেও লেখক মারওয়ান চরিত্রে এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

সীমার এই উপন্যাসের সাহসী বীর, পাষণ্ড, নীচ, লোভী, এবং নীতিহীন মনুষ্যত্ববর্জিত চরিত্র। অর্থ এবং নৃশংসতাই তার জীবনের মূলমন্ত্র। একটি আরেকটির সঙ্গে যেন হাত ধরাধরি করে চলেছে। অর্থের জন্যে সে যেমন যে কোন নীতি আদর্শকে বিসর্জন দিতে পারে, তেমনি কোন নৃশংস কাজ করতেও তার বাধে না। এই বোধ থেকে সে যেমন হোসেন-হত্যা ও তাঁর শিরচ্ছেদ করেছে, তেমনি পরিবারসহ আজরেরও প্রাণ হরণ করেছে। হানিফার হস্তে তাঁর মৃত্যু ঘটল বটে কিন্তু কৃতকর্মের জন্যে তার কোন অনুশোচনা ছিলনা। লেখক বহু চরিত্রকে 'শয়তান' হিসেবে

আখ্যায়িত করলেও একমাত্র সীমারই 'শয়তান' হিসেবে চিত্রিত। "চরিত্র হিসাবে সীমারের অবশ্য কোনো বৈশিষ্ট্য ফোটেনি, সে যেন নিয়তির হাতের যন্ত্রমাত্র।"[১৪৩]

সীমারের মতোই লোভী ও পাপিষ্ঠ নারী চরিত্র মায়মুনা। তারও মতে, 'অর্থই সকল'[১৪৪]। এই অর্থলোভের কারণে জায়েদার মনে সে সপত্নীবাদের ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়েছে, স্বামী-হত্যায় প্রবোচিত করেছে এবং কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত সে পিছুপা হয়নি। সে যে কোন ধরণের অপকর্ম করতে সিদ্ধহস্ত তা তার কথাতেই স্পষ্ট – "যেখানে অস্ত্রের বল নাই, মহাবীরের বীরত্ব নাই, সাহস নাই, সাধ্য নাই, সেইখানেই এই মায়মুনা। শত অর্গলযুক্ত দ্বারও অতি সহজে খুলিয়া থাকি।"[১৪৫] প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই এই চরিত্রের সৃষ্টি। তার কাজ শেষ হয়ে গেলে সে অন্তর্হিত হয়ে যায়। মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে বিশেষত চণ্ডীমঙ্গলের দুর্বলা দাসীর সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। অর্থের জন্যে কী জঘন্য পাপ সে করেছিল, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তা সে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল।

এজিদপক্ষীয় হয়েও কিছুটা ভিন্নধর্মী চরিত্র হলেন মাবিয়া, অলিদ ও হামান। মারিয়া এজিদের পিতা হলেও পুত্রের সব অন্যায় ও দুস্কর্মই তিনি অনুমোদন করেন নি। তাঁর সচেতন বিবেকের পরিচয় পাওয়া যায় 'মহরম পর্বে'র ষষ্ঠ প্রবাহে। এজিদ-সেনাপতি অলীদ চরিত্রেও বিবেকবোধ ও বিবেচনা শক্তির পরিচয় আছে। এ রকমই একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র হলেন হামান। কেননা হামান এজিদের সভাসদ হলেও অন্যান্যদের মতো তিনি কুটিল, স্বার্থপর ও হীনচরিত্র নন। তাঁর চরিত্রে লেখক সুকৌশলে মানবিক অনুভূতি আরোপ করেছেন। হামান এজিদের অন্যায় কাজকে সমর্থন করতে পারেননি বলে মন্ত্রীত্ব থেকে বরখাস্ত হয়েছেন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। বন্দীগৃহে তাঁর স্বগতোক্তি একজন প্রকৃত স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিকের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—

> রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজবিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, . . . কিন্তু স্বাধীনতাধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও আর সে মহামূল্য-রত্ন হস্তগত হয় না। স্বাধীনতা-সূর্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা।[১৪৬]

আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর অনুভূতিও স্বচ্ছ এবং অগ্রগামী। কারণ তাঁর চেতনায়—

> রাজা আর রাজ্য এই দুইটি পৃথক কথা– পৃথক ভাব– পৃথক সম্বন্ধ। রাজা নিজ বুদ্ধিদোষে অপদস্থ হউন, সদযুক্তি সুমন্ত্রনায় অবহেলা করিয়া পর পদতলে দলিত হউন, স্বেচ্ছাচারিত্ব দোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি? . . . . রাজা প্রজা রক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক এবং কর গ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা। দায়িত্ব প্রজারই অধিক।"[১৪৭]

এই উপলব্ধি একজন আধুনিক সচেতন মানুষের। এ কারণেই এজিদের হাতে নির্যাতিত হয়েও তিনি এজিদের জন্যে চিন্তিত এবং এজিদের ভয়াবহ পরিণতির কথা জেনে "দেখিবার মধ্যে দেখা গেল চক্ষের জল আর শুনিবার মধ্যে শুনা গেল দীর্ঘ নিঃশ্বাস।"[১৪৮] হামান চরিত্রটি মশাররফ হোসেনের দেশপ্রেম আর পরিচ্ছন্ন ও প্রাগ্রসর চিন্তাচেতনার স্বাক্ষর বহন করে।

কাহিনীর ধর্মীয় পটভূমির কথা মনে রাখলে দেখা যায়, হাসান হোসেনের পক্ষভুক্ত চরিত্র সবাই সৎ, ধার্মিক ও ঈশ্বর-নির্ভর। এদের সম্পর্কে সাধারণ মুসলিম সমাজের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও স্পর্শকাতর অনুভূতির কথা মশাররফ হোসেন খুব ভালভাবেই অবগত ছিলেন। এই সমাজ-বাস্তবতা ও শাস্ত্রবিধিকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীন কল্পনায় এই শ্রেণীর চরিত্র অঙ্কন তার পক্ষে সম্ভব হয়নি'[১৪৯] বলে চরিত্রগুলি নির্দিষ্ট ছকের বাইরে যেতে পারেনি। ফলে তা হয়ে গেছে সরলরৈখিক ও অবিকশিত।

ধর্মপ্রাণ হাসান চরিত্রে সদগুণাবলীর অনুশীলন ও পরিচয় স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত। কিন্তু চরিত্র বিকাশের পথ উন্মুক্ত নয় বলে এবং তা বিশ্বাসজাত পূর্ব নির্ধারিত ছকে রুদ্ধ বলে হাসানের স্বগতোক্তিতেই তিনি একজন স্ববিরোধী, আত্মকেন্দ্রিক ও ভীরু চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। যে হাসান নিজেই জানেন জায়েদা সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টি বিধানে তৎপর থাকতো তিনি যে কেন তাঁকে বিষ দিতে উদ্যত হয়েছেন তার বিচার না করেই নিশ্চিত হচ্ছেন যে জায়েদা কোনো আশায় বা কুহকে ভুলেছে। আবার স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে তিনি ভাবেন, জায়েদার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'এ বিষ জয়নাবকে দিলেই ত সম্ভব।'[১৫০] অন্যদিকে তিনি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে শুধু দেহ ভিন্ন তার কোনো পার্থক্য দেখতে পান না। যদি তাই হয় তাহলে স্ত্রী তার এক প্রাণ ও এক মন যেখানে স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দিতে পারেন না সেখানে স্বামী কি করে তাঁর ঐ একই প্রাণ ও মন একাধিক স্ত্রীকে দিতে সক্ষম হন ? সে জন্যই হাসানের স্বগত-চিন্তায় যেখানে 'আমারও এক আত্মা এক প্রাণ' — এর পরে যেখানে স্বাভাবিক ছিল 'এক স্ত্রী' উচ্চারিত হওয়া সেখানে তা হয়ে যায় 'এক প্রাণ স্ত্রী'। বাস্তবতাকে উন্মোচন করতে চাননি বলেই লেখক হাসানের স্বগত-চিন্তায় বিষয়টি উল্লেখ করেও তার সত্যিকার কারণ নির্দেশ করেননি। চরিত্র বিকাশের অযৌক্তিকতাই হাসান বা হোসেন কাউকেই বিকশিত হতে দেয়নি। সে কারণেই তাঁর প্রাণঘাতিনী স্ত্রী জায়েদাকে মৃত্যুর পূর্বে ক্ষমা করে যাওয়ার বিষয়টিতে শুধু তাঁর চারিত্রিক ঔদার্য ও মহত্বকে প্রকাশ করে, চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

হোসেনও ধর্মপ্রাণ সৎ চরিত্র। তাঁর মধ্যে কর্তব্যবোধ, নির্ভীকতা, আবেগপ্রবণতা, ক্ষমাশীলতা ও সরলতার প্রকাশ আছে। বীরযোদ্ধা ও সাহসী পুরুষের মতোই তিনি মদিনা থেকে এজিদ-সৈন্য বিতাড়ন করেন এবং কারবালায় অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে হোসেনের চরিত্রের ব্যক্তিত্ব কিছুটা বিকশিত হলেও বা স্ফূর্তি পেলেও এক রৈখিকতার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা তারও ভূমিকা পূর্ব নির্ধারিত, ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ঘাতক সীমারকে ক্ষমা করে হাসানের মত তিনিও তাঁর চারিত্রিক ঔদার্য ও মহত্বকে প্রকাশ করেন। তবুও অকল্পনীয় মানসিক সঙ্কটকালে যখন অস্তিত্ব বিপন্নপ্রায় তখন চিন্তা ও আচরণে হোসেন অনেক বেশী সজীব ও প্রাণ-চঞ্চল।

'বিষাদসিন্ধু'তে মোহাম্মদ হানিফার আবির্ভাব আকস্মিক। হোসেন পক্ষের বিপর্যয়ের মুহূর্তে জানা গেছে তাঁর জন্ম ও জীবনের নেপথ্য কাহিনী অর্থাৎ উদ্ধার পর্বের পঞ্চম প্রবাহে। তিনি হাসান হোসেনদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, আম্বাজ-অধিপতি এবং অসম সাহসী বীর। তাঁর চরিত্রে একদিকে যেমন উচ্ছাসপ্রবণতা , ধর্মে ও আপন কার্যে গভীর আস্থা, অন্যদিকে তেমনি হয়েছে প্রতিহিংসায় হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যতা এবং বিবেচনা শক্তি ও সংযমের একান্ত অভাব। হোসেনের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এজিদ ও মারওয়ান তার নামে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনিও দৈবের হাতের ক্রীড়নক। দৈব কারণেই হাতের কাছে পেয়েও হানিফা এজিদকে বধ করতে পারেননি। তবে

নিয়তির বিধানকে অলঙ্ঘ্য জেনে অধিকাংশ চরিত্রই যেখানে সংগ্রাম-বিমুখ সেখানে হানিফাচরিত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। 'এজিদ কাহারও বধ্য নহে'— এই দৈববাণী উচ্চারিত হওয়ার পরেও হানিফা ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প ত্যাগ করতে পারেন নি। দেববাণী প্রভাবিত হলেও এই চরিত্র উন্মোচনে নাটকীয়তার অবকাশ ছিল। গ্রীক ট্রাজেডিতে যেমন নিয়তিকে অস্বীকার করতে গিয়েই মানব-মহিমার দ্যুতিময় স্ফুরণ ঘটে, এ চরিত্রে অনুরূপ নাটকীয় সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু সম্ভবত পরিনামের দিকেই লেখক বেশী মনোযোগী ছিলন বলেই তার যথাযথ রূপায়ণ ঘটেনি।

নারীচরিত্রের মধ্যে জয়নাব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বিষাদসিন্ধু'র সমস্ত ঘটনাই জয়নাবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। একদিক থেকে জয়নাবই এজিদ ও হাসান-হোসেনের সংঘর্ষের এবং ধ্বংসাত্মক পরিনতির মূল কারণ। তাঁর সঙ্গে হোমারের গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিয়াডে'র হেলেনের তুলনা মনে পড়ে যায়। জয়নাব সতীসাধ্বী স্ত্রী। প্রথম স্বামী জব্বার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে দ্বিতীয়বার পরিণীতা হন হাসানের সঙ্গে। স্বামী হাসানের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ জয়নাব। সপত্নী-সংসারে বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরানীর প্রফুল্লর মতোই স্বামীর ভালবাসা ভাগ করে নিতে আপত্তি নেই তাঁর। কিন্তু তাঁরও ভাগ্য বিড়ম্বনার শেষ নেই। তাঁরই কারণে হাসানের মৃত্যুর পর পুনরায় বিধবা হয়ে তিনি এজিদের কারাগারে বন্দিনী হন। এই চরিত্রটির পরিকল্পনাতেও 'মেঘনাদবধকাব্যে'র সীতা-চরিত্রের সাদৃশ্য রয়ে গেছে বলে মনে হয়। সমালোচক বলেছেন—

> মেঘনাদবধের সীতা-চরিত্রের মাধুর্য ও কোমলতার অনেকখানি সমাবেশ ঘটেছে 'বিষাদসিন্ধু'র জয়নাব চরিত্রে। গ্রন্থের শেষের দিকে জয়নাবের যে দীর্ঘ আত্মবিলাপ রয়েছে তার সঙ্গে সীতা ও সরমার কথোপকথনের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।[১৫১]

তবে প্রকৃতপক্ষে যে জয়নাবের জন্যে এত ধ্বংস যজ্ঞের আয়োজন তিনি উপন্যাসে প্রায় অস্পষ্ট এবং কাহিনীর নেপথ্যে অন্তর্হিত।[১৫২] অথচ গুরুত্ব বিচারে এজিদের পরেই জয়নাবের স্থান। কিন্তু এজিদের সঙ্গে অথবা জায়েদার পাশে জয়নাব চরিত্র নিস্প্রভ। ফলে ব্যক্তি হিসেবে পাঠক-হৃদয়ে জয়নাব জীবন্ত চরিত্র নন।

চরিত্র-চিত্রণে মশাররফ হোসেনের সাফল্য ও দুর্বলতা বিষয়ে কাজী আবদুল ওদুদ যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে,

> "বিষাদসিন্ধুর চরিত্র সমূহ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে পারেনি মূলত লেখকের রোমান্টিক কবিসুলভ ভাবোচ্ছাসের জন্য। ধর্মপ্রাণ ও আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রসমূহ রক্তমাংসের মানুষ না হয়ে হয়ে উঠেছেন 'কথা ও ধর্মাচারের সমষ্টিমাত্র'। তবে যাঁরা দোষে-গুণে মানুষ হিসেবে চিত্রিত তাঁরা 'স্বাভাবিক মানুষ' রূপেই প্রকটিত হয়েছেন।[১৫৩]

৭. 'বিষাদসিন্ধু'র সমকালীন সমালোচনা

'বিষাদসিন্ধু' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত পাঠক ও সমালোচক মহলে বিশেষ

আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সে সময়ের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পত্রপত্রিকায় এর সমালোচনা বের হয়।[১৫৪] অধিকাংশই সমালোচনাই ছিল প্রশংসামূলক। এই সমালোচনাগুলি পর্যালোচনা করলে কতকগুলি বিষয় লক্ষ করা যায় ঃ—

প্রথমত, উর্দুচর্চারত বাঙালী মুসলমানদের উন্নাসিকতার মধ্যে মশাররফের বাংলা ভাষার দক্ষতাকে প্রায় সব সমালোচকই প্রশংসা করেছেন। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' বলে, এ গ্রন্থ 'মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি মুসলমানদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে।'[১৫৫] 'চারুবার্ত্তা' উল্লেখ করে — "ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, মধুর ও লালিত্যপূর্ণ।"[১৫৬] 'ভারতী' মনে করে, এই বাংলা ভাষা চর্চার মধ্যদিয়ে 'উভয় জাতির মধ্যে ক্রমে একটা সখ্যতা স্থাপন হইতে পারে।'[১৫৭]

দ্বিতীয়ত, 'বিষাদসিন্ধু'র অন্তর্নিহিত বেদনার ইতিহাস লক্ষ করে 'সুলভ সমাচার' লেখে, "ইহার ঘটনারাশি ইতিহাস মূলক — কিন্তু ঠিক যেন উপন্যাসের ন্যায় আমরা পাঠ করিলাম।"[১৫৮] 'ভারতী'রও মতে 'ইহা মহরেমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস'।[১৫৯] 'সময়' পত্রিকা মন্তব্য করে, 'মুসলমান কর্ত্তৃক লিখিত বাঙ্গালায় এরূপ রচনা — চাতুর্য আমরা কখনও দেখি নাই।'[১৬০]

তৃতীয়ত, অনেকে কিভাবে এ গ্রন্থপাঠে আপ্লুত হয়েছিলেন তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। 'প্লাবনী-করুণা রসে টলটল' 'বিষাদসিন্ধু' অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে 'বিচলিত করিয়াছিল।'[১৬১] আবার সাহিত্যিক ও পত্রিকা-সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম মন্তব্য করেন — "'বিষাদসিন্ধু'র বিষাদমাখা সুর .... কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে।"[১৬২]

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে'র বার্ষিক প্রতিবেদনে 'বিষাদসিন্ধু'র উদ্ধার পর্ব সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অতি সংক্ষেপে তিনি এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগুলি এবং মশাররফের শিল্প-প্রতিভার মূল্যায়ন নির্দেশ করেন—

> Mir Masharaf Hossain's Bishad sindhu, based on the events before and after the great battle of karbala, is one of the best works in the Bengali Language. The earnestness and pathos of the works, its elevated moral tone and dignified diction, raise it to a high level, and mark a distinct departure, both in matter and in manner, from the current examples of imaginative writing in Bengali.[১৬৩]

'বিষাদসিন্ধু'র সমাদর প্রশংসার পাশাপাশি বিরূপ সমালোচনাও তখন হয়েছে। কায়কোবাদ তাঁর 'মহরম শরিফ' (১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় 'বিষাদসিন্ধু'র যে সমালোচনা করেন তা প্রকৃতপক্ষে নিন্দাবাচক। সমালোচনাটি মশাররফের মৃত্যুর পর রচিত হলেও কায়কোবাদ তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিক। তাছাড়া কায়কোবাদ 'বিষাদসিন্ধু'তে ধর্মাদর্শের অবমাননা ও অনৈতিহাসিকতার অভিযোগ তুলে 'মহরম শরিফ' রচনা করেন। তিনি বলেন — "'বিষাদসিন্ধু'তে অনেকবার ডুব দিয়াছি রত্নও পাইলাম না, রত্নের পরিবর্তে কতগুলি কাঁচ পাইলাম।"[১৬৪] তাঁর অভিযোগ, "মীর মশাররফ হোসেন কল্পনা রাজ্যের কতকগুলি অবান্তর কথা লিখিয়া ঘটনা উপন্যাস আকারে সাজাইয়া ইসলামের হৃদয়-পঞ্জরে তীব্র শেলাঘাত করিয়াছিলেন।"[১৬৫] কিন্তু দুভার্গ্যের বিষয়—

> এরূপ সদুদ্দেশ্য থাকা সত্বেও কায়কোবাদের কাব্যের মান উন্নত হতে পারেনি, চিন্তার উচ্চতা

প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জীবনের গভীরতর সত্যের যে আস্বাদন 'বিষাদসিন্ধু'র অধর্মীয় অনৈতিহাসিকতার মধ্যে লভ্য, 'মহরম শরীফ' কাব্যের অকারণ ইতিহাসনিষ্ঠা ও অকিঞ্চিৎকর দার্শনিকতার মধ্যে তা অনুপস্থিত।[১৬৬]

৮. 'বিষাদসিন্ধু'র ত্রুটি

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস পাঠ সমাপ্ত হবার পর লেখক শোতৃবর্গের কাছে এর ভাষাগত ত্রুটি সম্বন্ধে মন্তব্য শুনতে চেয়েছিলেন। শ্রোতারা গল্পরসে এমন নিবিড়ভাবে মজ্জিত ছিলেন যে তাঁরা কেউই প্রায় এ বিষয়ে মন দিতে পারেন নি। 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসের পক্ষে অনুরূপ মত প্রকাশ করা যায়। মীর সাহেব বাঙালী পাঠককে যে কাহিনী বলতে এসেছেন সে কাহিনী বলবার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল। উপন্যাসের মূলে অন্যান্য উপাদানের যাই অবদান থাকুক তার মূল শক্তি গল্প বলবার শক্তি। এই গল্প বলতে না পারলে উপন্যাসের সার্থকতা ক্ষুন্ন হয়। মানবরসের কাহিনী যিনি রসিক পাঠককে শোনাতে পারেন তিনিই একজন শিল্পী। মীর মশাররফ কারবালার ইতিহাসের করুণ কাহিনীকে আকর্ষনীয় করে বলতে পেরেছেন। বাঙালী রসিক পাঠক তাঁর গল্প মন দিয়ে শুনেছেন। কিন্তু সেই গল্প বলতে গিয়ে তিন হয়তো গঠনগত শৃঙ্খলা সব সময়ে মানেননি। সমালোচকেরা তাঁর সেই সীমাবদ্ধতাকে এখন খুঁটে খুঁটে দেখাচ্ছেন।

আধুনিক কালের মানুষকে একালের মতো করে মহরমের গল্প বলতে গিয়ে তিনি তাকে নীতি ও ধর্মীয় আবেগ থেকে পৃথক করতে চাননি। এই কারণেই একাধিক প্রসঙ্গে তাঁর লেখায় আকস্মিকতা, অভাবনীয়তা এবং বিস্ময়কর ঘটনা সন্নিবেশ হয়। এই আকস্মিকতা তাঁর রচনার অন্যতম ত্রুটি। যেমন বলা যায়, হোসেনের মৃত্যুর পর মোহাম্মদ হানিফার ঘটনা সংযোজন সম্পূর্ণতই আকস্মিক। কারণ ইতিহাসে যদিও এজিদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল কিন্তু উপন্যাসে তাঁর কথা পূর্বপ্রস্তুতিহীন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা পূর্বাপর সঙ্গতিবিহীন এবং আকস্মিক। এই কাহিনীর আকস্মিক সংযোজন রোমান্সের কল্পলোকে আমাদের নিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, একাধিক উপকাহিনীর সমাবেশ 'বিষাদসিন্ধু'র অন্য ত্রুটি। আব্দুল্লাহ জেয়াদের ষড়যন্ত্রে নিহত মোসলেমের কিশোর পুত্রদ্বয়ের জন্যে অর্থলোভী হারেস কর্তৃক স্ত্রী ও সন্তান হত্যা এবং সীমারের হাত থেকে হোসেনের পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্যে পৌত্তলিক আজরের সপরিবারে আত্মাহুতি—এমন দুটি উপকাহিনী মূল কাহিনীর সঙ্গে অনিবার্য কার্যকারণসূত্রে যুক্ত নয়। মূল কাহিনীর মৌল আবেগে নতুন কোন শিহরণ যোগ করে না—বরং হাসান অথবা হোসেনের মৃত্যুতে জাগ্রত গভীর শোকের উপলব্ধিকে সংহত হওয়ার অবকাশ দেয় না। ফলে রসপরিণাম বার বার ব্যাহত হয়।

তৃতীয়ত, আধুনিক সাহিত্যের মানবতাবাদী চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বলাই বাহুল্য, মশাররফের শিল্পবোধে পুথির প্রভাব ছিল গভীর। পুঁথির অলৌকিকতা ও আকস্মিকতা 'বিষাদসিন্ধু'তে লক্ষণীয়। হানিফা-ভ্রাতা ছদ্মবেশী বাহরামের বিপন্নতা ও অব্যাহতি কিংবা জয়নাল আবেদীনের বার বার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া—এই আকস্মিকতারই উদাহরণ। এইসব আকস্মিকতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রযত্ন মশাররফ স্বীকার করেন নি। ফলে সচেতন

পাঠকের বিচার-বুদ্ধি সংশয়িত ও পীড়িত হয়।

চতুর্থত, এই গ্রন্থের অন্যতম ত্রুটি অতিকথন ও আবেগাতিরেক। কখনো কখনো কথকতার স্রোতে লেখক কাহিনীর কেন্দ্র থেকে নিজেই ভেসে গেছেন দূরে। লেখকের স্বগত-কথনের যে-রীতি বঙ্কিম অত্যন্ত সংযত ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছিলেন মশাররফ তার অনুসরণ করেছেন—কিন্তু সেই অনুসৃতিতে বঙ্কিমের সংযম নেই। সপত্নী বিদ্বেষ, মদ্যপান, অর্থ, আশার কুহক ইত্যাদি সম্পর্কে অসংবৃত বর্ণনা লেখকের গভীর জীবনবোধের পরিচায়ক হলেও কাহিনীর কেন্দ্রীয় মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে।

পঞ্চমত, রোমান্টিক কবির মত ভাবোচ্ছ্বাস 'বিষাদসিন্ধু'র 'শক্তি ও দুর্বলতার কারণ'। উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যের জন্য গ্রন্থে বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ করেও লেখকের দ্বারা 'পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-সৃষ্টি কমই সম্ভবপর হয়েছে।"[১৬৭]

৯. 'বিষাদসিন্ধু'র অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ

'বিষাদসিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের বহুল প্রচারিত এবং জনপ্রিয় গ্রন্থ। সমাদৃত এই গ্রন্থটি বাঙালী পাঠক সমাজে সর্বাধিক বিক্রিত ও পঠিত পুস্তকেরও তালিকাভুক্ত। এ পর্যন্ত ঠিক কতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তার সঠিক হিসেব না মিললেও আনুমানিক ত্রিশটির অধিক সংস্করণ প্রকাশিত এবং দেড়লক্ষেরও বেশী কপি বিক্রি হয়েছে।[১৬৮] এতেই অনুধাবন করা যায়, গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা কত তুঙ্গে ছিল। এক সময় প্রতিটি শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত বাঙালী মুসলিম-ঘরে এ গ্রন্থ পাওয়া যেত। তাঁদের কাছে যেমন এটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা পেত, তেমনি, 'জাতীয় মহাকাব্য' রূপেও গণ্য হত। এই জনপ্রিয়তার কারণেই এর একটি হিন্দী সংস্করণের খবরও জানা যায়। 'কান্যকুব্জ' পত্রিকার সম্পাদক বেণীপ্রসাদ বাজপেয়ী মঞ্জুল কর্তৃক হিন্দীভাষায় অনূদিত এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ থেকে মুদ্রিত হয়।[১৬৯] গ্রন্থটির এই জনসমাদরের নানাবিধ কারণ রয়েছে ঃ—

ক. কাহিনীগত দিক ঃ 'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনীর মূলে একটি ধর্মীয় আবেশ বিদ্যমান। ইসলাম ধর্মের প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র হাসান হোসেন ও এজিদের বিরোধের ফলে সৃষ্ট কারবালা বা মহরমের কাহিনী বাঙালী মুসলমান পাঠক সমাজকে স্বভাবতই গভীরভাবে আকৃষ্ট করে এবং ধর্মসম্পর্কিত এই স্পর্শকাতর কাহিনী-পাঠে তাঁরা যেমন মর্মপীড়িত হতেন, তেমনি স্বর্গীয় তৃপ্তিলাভও করতেন। এ কারণে—

> বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যেমন এককালে পঠিত হইয়াছিল, 'বিষাদসিন্ধু' তেমনই আজও পর্যন্ত জাতীয় মহাকাব্য রূপে বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয় . . . .।[১৭০]

খ. ভাষাগত দিক ঃ মশাররফ হোসেনের পূর্বে বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনা মিশ্রভাষারীতিতে রচিত হত। তাতে আরবী ফারসী শব্দের এত আধিক্য থাকত যে তাকে বাংলা ভাষায় রচিত বলে মনে করা কঠিন হত। ভাষার ক্ষেত্রে মশাররফ হোসেন প্রথম এই প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে ইসলাম ধর্মের কাহিনীকেও বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচনা করেন। ফলে কেবল বাঙালী মুসলমান সমাজে নয়, শিক্ষিত হিন্দু পাঠকদের কাছেও তা আদৃত হল।

বঙ্কিমচন্দ্রসহ বহু গুণিজন তখন মশাররফের এই 'বিশুদ্ধ বাংলা' ভাষাচর্চার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন এবং 'বিষাদসিন্ধু'র প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

গ. মুসলিম পাঠক-রুচির পরিবর্তন ঃ ক্ষমতাচ্যুত , হতাশাগ্রস্ত, আত্মাভিমানী বাঙালী মুসলমান সমাজ একটা সময় পর্যন্ত পুঁথির মধ্যে তাঁদের মনের খিদে মেটাতেন। পরবর্তীকালে রূঢ় বাস্তবের আঘাতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তাঁদের একাংশের রুচি পরিবর্তন ঘটল। ফলে "রুচির পরিবর্তনে সাহিত্যরীতিরও পরিবর্তন ঘটে গেল। উদীয়মান শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের খিদে পুঁথি মর্সিয়া দিয়ে মিটল না।"[১৭১] কোথায় যেন একটা অভাব রয়ে গেল। মশাররফ হোসেনের আবির্ভাবে এবং 'বিষাদসিন্ধু'র মাধ্যমে সেই অভাব সর্বপ্রথম পূর্ণ হয় বলা যায়।

ঘ. বিস্ময়কর রচনা গুণ ঃ

১. 'বিষাদসিন্ধু'র যাদুকরী রচনাগুণ এর ঈর্ষনীয় জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ। এর কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রয়ী হলেও এতে লেখক আধুনিক মানুষের হৃদয়ানুভূতির গভীর দ্বান্দ্বিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই উপন্যাসটি কেবল ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি মাত্র হয়ে থাকেনি। জয়নাবের রূপে মুগ্ধ এজিদ ও তার পরিণামে বহু মানুষের ধ্বংসের কথা বর্ণিত হওয়ায় তা সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে। ধর্মাশ্রিত ও ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীর এই মানবিকীকরণই 'বিষাদসিন্ধু'র সর্বজনীন জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। প্রকৃতপক্ষে,

> . . .নব্য সাহিত্যের মর্মমূলে নিহিত মানব-নিষ্ঠা মশাররফের শিল্পী চৈতন্যে যে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলো—তার প্রয়োগেই 'বিষাদসিন্ধু' পুঁথি সাহিত্যের উপাদান আশ্রিত হয়েও আধুনিক জীবন-বেদে রূপান্তর লাভ করেছে।[১৭২]

২. মশাররফ এই কাহিনীর সর্ববিস্তারী আবেদনসৃষ্টির লক্ষে পাঠকের সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ যোগস্থাপনের কৌশল অবলম্বন করেছেন। পাঠক এখানে কেবল দ্রষ্টামাত্র নন, কাহিনীর সুখ দুঃখ বেদনার সঙ্গী। এটিও জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

৩. কোন কোন ক্ষেত্রে শুদ্ধতাসন্ধানী ধর্মবুভুক্ষু পাঠকদের কাছে এটি শাস্ত্রবিরোধী বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু অল্প ও অর্ধশিক্ষিত পাঠকদের কাছে জনপ্রয়িতার কারণ ছিল—

> 'বিষাদসিন্ধু'র অশাস্ত্রীয় বিজাতীয় লিপিচাতুর্য এবং ইন্দ্রিয় সীমার মধ্যে ক্ষুধিত পাঠক বা শ্রোতার জন্য দৃশ্য, আস্বাদ্য ও দৃশ্যখাদ্য সাজিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। 'বিষাদসিন্ধু'র লেখক কখনই ভুলে যান না যে, আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব মরজগতে নিমজ্জিত এবং অমর্ত্যলোক যদি থাকেই, একমাত্র মরলোকের নিয়মেই তাকে বোঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব।[১৭৩]

১০. পরবর্তী লেখকদের উপর মশাররফের প্রভাব

মশাররফ হোসেন তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী লেখকদের উপর তাঁর সাহিত্যকৃতি বা জীবন-ভাবনার ছাপ রাখতে পেরেছিলেন। "তাঁর সমকালবর্তী কবি কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, দাদ আলী প্রমুখ তাঁর কাছ থেকেই

পৌরাণিকতায় আস্থাবান হয়েও বাস্তব জমীনের ওপর দাঁড়িয়ে জ্ঞানবিমুখতা ও গোঁড়ামি বর্জনের শিক্ষা নিয়েছিলেন।"[১৭৪] এছাড়া তাঁর 'বিষাদসিন্ধু'র প্রভাব ও প্রেরণায় কুমুদবন্ধু ঘোষ রচনা করেন 'মহরমের ইতিবৃত্ত'। 'ভারতী' পত্রিকায় 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' শীর্ষক স্তম্ভে এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়– "এই ইতিবৃত্ত শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত বিষাদসিন্ধুর সার সংকলন। পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে।" (ভারতী, আশ্বিন ১৩০০, পৃ. ৩৭৭)।

উদাসীন পথিকের মনের কথা

১. ভূমিকা

মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যিক জীবনের ঐশ্বর্য-পর্বের ফসল 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'। দেলদুয়ারে অবস্থান কালে তাঁর সৃষ্টিগুলির অন্যতম এই রচনা। এর আগের জনপ্রিয় গ্রন্থ 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসে কারবালার প্রচলিত কাহিনীকে "তিনি ধর্মীয় সংবিধান থেকে মুক্ত এবং ঐতিহাসিক চোরাবালি থেকে উদ্ধার করে হৃদয়বৃত্তির সরসভূমিতে রোপন করেছিলেন।"[১৭৫] পরবর্তী এই গ্রন্থ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় মশাররফের পৃথক আরেকটি সাহিত্যিক সত্তার পরিচয় উন্মোচিত হয়। এখানে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন সুদূর অতীতের ঐতিহাসিক জগৎ থেকে নেমে এসে বাস্তব জীবন-ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'-র 'প্রথম স্তর' (১ম খণ্ড)১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯৭ বঙ্গাব্দ) কলকাতা থেকে মুদ্রিত এবং কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রাম থেকে মীর মহতাব আলি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের প্রচ্ছদে লেখকের নাম ছিল না, তবে স্বত্বাধিকারী হিসেবে মশাররফের নাম মুদ্রিত হয়। 'মুখবন্ধে'র শেষে মশাররফ 'উদাসীন পথিক' ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁরই সাহিত্যিক ছদ্মনাম। পরবর্তীকালেও এই নাম তিনি ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অভিপ্রায় লেখকের ছিল। গ্রন্থের শেষে 'পথিকের নিবেদন'-এ তিনি জানান – "মনের কথার প্রথম স্তর মন খুলিয়া দেখাইলাম। . . . যত সত্বরে সম্ভব ২য় স্তর প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।"[১৭৬] কিন্তু তাঁর অঙ্গীকৃত '২য় স্তর' বা খণ্ড আর প্রকাশিত হয়নি।

গ্রন্থটির অধ্যায় সংখ্যা হল বিয়াল্লিশ।[১৭৭] অধ্যায়গুলিকে লেখক 'তরঙ্গ' নামে অভিহিত করেছেন এবং প্রতিটি তরঙ্গের বিষয়-জ্ঞাপক একটি করে শীর্ষনামও দিয়েছেন। যেমন – প্রথম তরঙ্গ - 'নীলকুঠী', দ্বিতীয় তরঙ্গ – 'মীর সাহেব কে ?' ইত্যাদি।

লেখক গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' জানিয়েছেন যে মনের কথা অকপটে প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। তিনি সংসারী মানুষ, তাই নানা বাধা বিঘ্ন বা জীবন-সংশয়ের সম্ভাবনা। তবু বুকে পাথর বেঁধে যা শোনাবার তা তিনি শুনিয়ে যাবেন। এ ছাড়া লেখক উল্লেখ করেছেন যে, "শোনা কথাই পথিকের মনের কথা"।[১৭৮] লেখক মনের কথা বলতে চাইলেও আসলে বলেছেন সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁর মনে যে স্তর-পরম্পরা সৃষ্টি হয়েছে তার কথা। এদিক থেকেই এ উক্তির যথার্থতা। কারণ

তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে পথিক যখন তাঁর জন্মের আগের এবং অব্যবহিত পরের কয়েক বছরের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতে বসলেন, তখন মনের কথামত না চলে উপায় কি।"[১৭৯]

তবে মনের কথা বলতে গিয়ে মশাররফ হোসেন সাধ্য মতো মনগড়া কথা এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। 'বসন্তকুমারী', 'বিষাদসিন্ধু', 'জমীদার-দর্পণ' ইত্যাদি রচনায় লেখক ভিন্ন আধারে নিজের কথা বলেছেন। সে কথা বলবার সময় তিনি প্রাণমন খুলে দেখাতে পারেননি। এখানকার কথা সেই মন খুলে দেখানোর কথা। আগেকার রচনাগুলির আধারে লেখককে নিজের মনের পছন্দ-অপছন্দ জানাতে হয়েছিল। সেখানকার বক্তব্যের উপরে তাই যেন একটা প্রচ্ছন্ন পর্দা টানা ছিল। এবার লেখকের কাছে কোন আবরণ নেই। তাঁর বিষয় প্রকাশই মুখ্য। তাই নিজের মনের কথার প্রকাশ অবারিত।

২. পটভূমি

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'-র কাহিনীর পটভূমিতে ঐতিহাসিক ঘটনা, চরিত্র বা অনুষঙ্গ রয়েছে অর্থাৎ স্থান-কাল পাত্র বাস্তব ভিত্তিক।[১৮০] ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলায় নীলকর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ব্যাপক আকারে দেখা গিয়েছিল তারই একটি অংশ এ গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। মশাররফ হোসেন এখানে বিশেষতঃ কুষ্টিয়া অঞ্চলের নীলকরের অবাধ অত্যাচারের চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। মেঃ টি.আই কেনী, ভৈরববাবু, প্যারীসুন্দরী, মীর মোয়াজ্জেম হোসেন, দৌলতননেসা, সা-গোলাম প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাসের বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নীলকর কেনীর অত্যাচারের কাহিনী কিংবা প্যারীসুন্দরীর সঙ্গে তার বিবাদ ইতিহাসের তথ্য। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল তাঁর "মীর মশাররফের গদ্যরচনা" গ্রন্থের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' প্রবন্ধে। মহামতি লাট বাহাদুরের পাবনা ভ্রমণের বৃত্তান্তটিও ঐতিহাসিক সত্য। তবে প্যারীসুন্দরী সুন্দরপুরের জমিদার ছিলেন না, বাস্তবে তিনি ছিলেন সদরপুরের জমিদার। লেখক সম্ভবতঃ নামের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্যে স্থানের নাম লিখেছেন – 'সুন্দরপুর'।[১৮১] গ্রন্থে বর্ণিত বিবরণ অনুসারে অনুমান করা যায়, 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত[১৮২] বাংলায় নীলচাষ-কেন্দ্রিক সংঘটিত ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল। অন্যদিকে মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে সা-গোলামের বিরোধ, সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়া, মীর সাহেবের আমোদ ফূর্তি এবং তাঁর পত্নীর অকাল-মৃত্যু – প্রভৃতি মশাররফের 'আমার জীবনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মশাররফ নিজের জীবন সম্পর্কে কোন বিবরণ এখানে দেননি। নীলকর এবং নীলবিদ্রোহের সঙ্গে লেখকের পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন, সাগোলাম এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন জড়িত ছিলেন। ফলে ইতিহাস-কেন্দ্রিক গ্রন্থের এই কাহিনীর সঙ্গে লেখকের পারিবারিক ইতিহাসও কখনও কখনও যুক্ত হয়ে পড়েছে।

৩. কোন শ্রেণীর রচনা

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর অন্য একটি গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থটিকে 'অতি আশ্চর্য-উপন্যাস' বলে অভিহিত করেছেন।[১৮৩] সমকালীন পত্রিকা 'ভারতী ও বালক' (বৈশাখ, ১২৯৮) মন্তব্য করে, — "সমালোচ্য পুস্তকখানি ঠিক উপন্যাস নহে, ইহা উপন্যাসাকারে নীল অত্যাচারের কাহিনীপূর্ণ।"[১৮৪]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একে 'উপন্যাস' হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।[১৮৫] কিন্তু এর বিষয়বস্তু বা রচনার কোনপরিচয় দেন নি। অন্যদিকে মুনীর চৌধুরীর মতে, এটি 'আত্মজীবনীমূলক রচনা।'[১৮৬] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতও তাই।[১৮৭] আর ডঃ ওয়াকিল আহমদ বলেছেন, গ্রন্থটি "গদ্যে রচিত আত্মজীবনী"।[১৮৮] দুই ভিন্নধর্মী মতামতের সমন্বয়ে সিরাজুদ্দীন আমেদ মন্তব্য করেছেন – এটি "একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।"[১৮৯] এ বিষয়ে ক্ষেত্র গুপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁর বক্তব্য এই বলে উল্লেখ করেছেন – " 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'কে যাঁরা উপন্যাস না বলে আত্মজীবনী বলেছেন তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া গেল না।"[১৯০]

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'-র কাহিনী কাঠামো নির্মিত হয়েছে প্রধানতঃ দুটি বাস্তব ও ইতিহাসভিত্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই কাহিনীর একদিকে রয়েছে শালঘর মধুয়ার নীলকুঠীর দোর্দণ্ড প্রতাপ নীলকর সাহেব মেঃ টি.আই কেনী – তার অত্যাচার – সেই অত্যাচারে নিষ্পেষিত অসহায় দরিদ্র কৃষকদের চিত্র – নিপীড়িত প্রজাদের পক্ষাবলম্বনকারী সুন্দরপুরের মহিলা জমিদার প্যারীসুন্দরীর সঙ্গে কেনীর দ্বন্দ্ব। কাহিনীর দ্বিতীয় ধারাটিতে রয়েছে মীর সাহেব মীর মোয়াজ্জেম হোসেন এবং তাঁর স্ত্রী দৌলতননেসার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা বিজড়িত দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা – এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মীর সাহেবের সঙ্গে তাঁরই জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার পিতৃ-হীনা কন্যার স্বামী সা-গোলামের বিষয় সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে তিক্ত সম্পর্কের ঘটনা। এদিক থেকে বলা যায়, কাহিনীর প্রথম ধারাটির ক্ষেত্র মূলত বহির্জগতের এবং দ্বিতীয়টির এলাকা অনেকটাই পারিবারিক।

আত্মজীবনীর অন্যতম প্রধান শর্তই হচ্ছে এতে লেখক স্বয়ং গ্রন্থের নায়ক। "আত্মজীবনীর লেখক এমনভাবে নিজেকে তুলিয়া ধরিবেন যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের বা প্রতিভার ক্রমোন্নতির সঙ্গে অনায়াসে পাঠকের পরিচয় ঘটিতে পারে।"[১৯১] এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' বা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী কিন্তু সেই বিচারে মশাররফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'কে আত্মজীবনীর মর্যাদা দেওয়া যায় না। মশাররফও 'আমার জীবনী' এবং 'বিবি কুলসুম' নামক দুটি গ্রন্থে নিজ জীবন কথা বিবৃত করেছেন। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' এবং 'গাজী মিয়ার বস্তানী' লেখার সময়ও সরাসরি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এখানে 'উদাসীন পথিক' বলতে লেখক স্বয়ং এবং 'মনের কথা' অর্থাৎ 'জীবনস্মৃতি'-—কাজেই এটি আত্মজীবনী এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। কেননা উদাসীন পথিক হিসেবে লেখকের দুএকটি মন্তব্য স্থান পেলেও এই গ্রন্থের মূল কাহিনীর কোন চরিত্র তিনি নন। তাছাড়া ঘটনাবলীর দ্রষ্টা ও ভাষ্যকাররূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাও এতে নেই। কেনীর সঙ্গে বন্ধুত্বে ও নীলকরদের সমর্থন ও সাহায্য করার মধ্যে মীর সাহেবের যে পরিচয় তাতে লেখকের বাবার জীবনের প্রতিবিম্বন। নীলকর মিঃ কেনী, মহিলা জমিদার প্যারীসুন্দরী প্রভৃতি ব্যক্তি এবং নীল বিদ্রোহের বিবরণ লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে নেওয়া হলেও একে ঠিক পুরোপুরি 'আত্মজীবনী' হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

আবার আত্মজীবনী রচনার জন্যে যে সত্যকথনের একান্ত আবশ্যক, তাতে লেখক মাঝে মাঝে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে "সত্যকথন অবিমিশ্র না হওয়ায় আত্মজীবনী হিসেবে এর মূল্য কমেছে।"[১৯২] সে জন্যেই অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন — "এ জীবনকথা যথার্থ জীবনী নয়।

জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে সাহিত্যরসে মেজে ঘষে সঙ্গতির সূত্র গেঁথে পাঠকের দরবারে হাজির করা হয়েছে। এটি আনন্দের সঙ্গে পড়ে ফেলা যায় . . . ।"[১৯৩]

অন্যদিকে বাস্তব ঘটনার পটভূমিকায় রচিত এই গ্রন্থকে উপন্যাসধর্মী রচনা বলা যায়। মশাররফ একটি সুশৃঙ্খল কাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। সমান্তরালভাবে বহমান কেনী ও মীর সাহেবের দুটি কাহিনী কখনো কখনো সমন্বিত হয়েছে। মীর সাহেব এই দুই কাহিনীর মিলনসেতু। মীর সাহেব নীলকর কেনীর সুহৃদ ও সুখদুঃখের সহায় হিসেবে প্রথম ধারার সঙ্গে যুক্ত আবার দ্বিতীয় ধারার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি। মীর সাহেবের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কে এবং বিষয় সম্পত্তি কেন্দ্রিক বিবাদের সূত্রে সা-গোলাম দ্বিতীয় ধারায় যেমন আছেন, তেমনি আবার নীল বিদ্রোহের নেতা হিসেবে প্রথম প্রবাহেও অনিবার্যসূত্রে জড়িত। আপাতদৃষ্টিতে কাহিনী দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও এর গঠনভিত্তি মূলতঃ কেনী-কেন্দ্রিক। কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিচারে তা হয়ে উঠেছে কেনী-কাহিনী। বিভিন্ন চরিত্র এবং বহুমুখী নানা ঘটনার সমাবেশে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে এই গ্রন্থে। মশাররফ তাকে একটি মূল কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে 'সুকৌশলে গেঁথে তুলেছেন'[১৯৪] নিঃসন্দেহে। চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনায় কখনো কখনো কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'কে আত্মজীবনীর সত্যকথন-আশ্রিত একনিষ্ঠ বাস্তবতা থেকে ক্রমশঃ উপন্যাসের শৈল্পিক বিমুক্তির দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

তথাপি 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়েনি। প্লটবিহীন কাহিনীর বন্ধনে আলগাভাব উপন্যাসের মধ্যে একটা প্রত্যাশিত ঐক্যসূত্র গঠিত হতে পারেনি। সে কারণেই 'ভারতী ও বালক' (বৈশাখ ১২৯৮) একে 'উপন্যাসাকারে নীল অত্যাচারের কাহিনী' বলে বর্ণনা করে মন্তব্য করে — 'অত্যাচারের বিবরণ বেশ হইয়াছে — তবে গল্পের ভাগ তেমন পরিপাটি হয় নাই'।[১৯৫] মুনীর চৌধুরীর বক্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য — "। . . কল্পনা অবাধ হতে না পারায় এর গল্পরসে ঘাটতি পড়েছে।"[১৯৬] এছাড়া ঔপন্যাসিক নির্লিপ্ততা এবং সুগভীর কোন্ জীবন-জিজ্ঞাসা এখানে সুষমামণ্ডিত বাণীরূপ লাভ করেনি। সে কারণে তাঁরা একে উপন্যাস বলে গ্রহণ করতে চান নি। আবার অনেকে যাঁরা একে উপন্যাস বলেন না তাঁরা আর একভাবে — 'শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর বাস্তব ঘটনার আলেখ্য' হিসেবে নির্দেশ করতে চান।[১৯৭] মনে হয় এ ভাবে গ্রন্থটিকে পরিচায়িত করা যায়।

তবে নানা কারণে এই পরিচায়িকা গ্রন্থটির পক্ষে সুপ্রযুক্ত নয়। প্রথম কারণ উপন্যাস মানুষের বাস্তব জীবনের প্লট বিধৃত আখ্যান। সুতরাং বাস্তব ঘটনার আলেখ্যই উপন্যাসধর্মী হয়ে উঠতে পারে যদি তা প্লটে গ্রথিত হয়ে প্রকাশ পায়। যদি তা সময়পটে কোনো মানুষের বা মানব সমাজের জীবন-কাহিনীকে ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়। সুতরাং কাহিনী-গঠন এবং চরিত্র রচনায় যদি কোনো গ্রন্থ সার্থকতা লাভ করে তাকে উপন্যাস না বলার যুক্তি নেই। বাস্তব জগতের সত্যঘটনাকে বা কোনো মানুষের জীবনের তথ্যকে ব্যবহার করেও একালে ভালো উপন্যাস (যেমন - — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়') লেখা হচ্ছে। সেই দিক থেকে মশাররফের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'কে উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই।

৪. দৃষ্টিভঙ্গি

মীর মশাররফ এর আগে 'জমিদার দর্পণ' নাটক রচনা করেছিলেন। সেখানে তাঁর সহানুভূতি ছিল দরিদ্র অত্যাচারিত প্রজাদের দিকে। জমিদারদের তিনি জানোয়ার বলেছেন। তাদের পাশববৃত্তি সেখানে তিনি উদ্ঘাটন করেছেন। কিন্তু তিনি বিষাদের সঙ্গে লক্ষ করেছেন প্রজাদের পক্ষে সুবিচার পাওয়ার কোনো আশা নেই। যাদের হাতে অর্থ এবং সমাজ শাসনের কর্তৃত্ব তারাই বিচারকে নিজের দিকে নিয়ে আসতে পারে। আবুর পক্ষে তাই বিচার পাওয়া সম্ভব হয়নি। শক্তিমানেরাই সব বিচারকে করায়ত্ত করে।

মীর মশাররফ্ এই শক্তির প্রতাপ দেখেছেন। সমাজে শক্তিমানের এই প্রতাপ তাঁকে কুণ্ঠিত করেছিল। এক হিসেবে দেখতে গেলে বলা যায় মীর মশার্‌রফের সাহিত্য এই শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ ঘোষণা। 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন ন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তির অন্যায় করবার শক্তি। হাসান হোসেনের প্রতি সেখানে তাঁর সহানুভূতি স্পষ্ট। তাঁদেরই সঙ্গে লেখকের সহানুভূতির যোগ। কিন্তু সেই ন্যায় ও ধর্ম সেখানে ভূলুণ্ঠিত বলে যেন ধর্মের উপরে, ন্যায়ের উপরে স্থির বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। আর এই কারণেই ধার্মিক লেখকের শুভবাদী সাহিত্যকারের, সমাজ কল্যাণব্রতী সাহিত্য শিল্পীর ভিতরে গভীর এক আত্মজিজ্ঞাসার বিষাদ। এই জীবনই দুঃখময় — বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপলব্ধি তাঁর মধ্যেও ভিন্ন ভাবে দেখা দিয়েছে। তিনি এই বিষাদ নিমজ্জিত সত্তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন তাঁর সাহিত্য রচনাবলীতে। 'বিষাদসিন্ধু'র মধ্যে যে বিষাদ তা কোন সাধারণ বিষাদ নয়। ন্যায় ও ধর্মের অপ্রতিষ্ঠাজনিত প্রতিক্রিয়ার বিষাদ।

'জমীদার দর্পণে' লেখক সূত্রধার ও নটের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনাকে প্রেরণ করেছিলেন। নুরন্নেহার মৃত্যুর আগে ক্ষীণ কণ্ঠে ইংলণ্ডেশ্বরীর কাছে সুবিচার প্রার্থনা করেছিল। আমরা দেখতে পাই পরবর্তী বিচার দৃশ্যের প্রহসন সেই সুবিচার প্রার্থনাকে যেন ব্যঙ্গ করে বলে গেছে দুর্বলের পক্ষে বিচার প্রার্থনা বৃথা। অন্যপক্ষে মীর মশাররফ ঈশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা করেছিলেন 'বিষাদসিন্ধু'তে সে প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। লেখকের নবজাগ্রত ব্যক্তিসত্তা একই সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি এবং ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে প্রত্যখ্যাত হয়েছে। আর তাই সমাজ প্রতিবাদী উচ্চকণ্ঠ নাট্যকার এবার ক্ষীণকণ্ঠে কেবল বিষন্নভাবে – উদাসীনভাবে — যেন আত্মদুঃখ মোচন করবার কাজ করছেন। তিনি উদাসীন পথিক। জীবন যাপনের নানা গ্লানিতে তাঁর চিত্ত দীর্ণ। কিন্তু বেদনার হাহাকার তীব্র নয়। তিনি কিঞ্চিৎ নির্লিপ্তভাবে উদাসীন ভঙ্গিতে সামাজিক মানুষের সংকটের কথা, তাদের অসহায়তার কথা এবং প্রচণ্ড শক্তির কাছে তাদের অক্ষম আত্মসমর্পণ বা দুর্বল প্রতিরোধের কাহিনী বর্ণনা করে চলেছেন। এই কারণেই 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' এমন বিষন্ন, এমন নির্লিপ্ত এবং এমন উদ্দীপনাবিহীন। লেখক দেখেছেন 'জমীদার দর্পণ' নাটক এমনকি সারাদেশে বিশেষ সাড়াই জাগাতে পারেনি। শ্রেণী-স্বার্থের নানা টানাপোড়েন এই নাটককে চোখের আড়ালে সরিয়ে দিয়েছে। সেখানকার নাট্যভাষা ছিল স্পষ্ট প্রতিবাদী। তার উচ্চারণ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রদীপ্ত। কিন্তু 'বিষাদসিন্ধু' অতিক্রম করে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় তা কিছুটা ক্লান্তিময়।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় লেখক একই বৃত্তের মধ্যে যে দুটি কাহিনীকে গেঁথে দিয়েছেন তার

আপাত সঙ্গতিহীনতার বাইরে আছে এক অন্যতর সঙ্গতি। কাহিনীর শুরু কেনীর প্রসঙ্গ দিয়ে। তার সঙ্গে এসে জুড়েছে মীরের কাহিনী। কেনীর কাহিনীর আবার দুটি বা তিনটি মুখ ঃ— ১. জকি, ২. প্যারীসুন্দরী এবং ৩. ভৈরববাবুর গল্প। এই তিনটি গল্পের পারস্পরিক কোন যোগসূত্র নেই। অন্যপক্ষে মীরের কাহিনীর সঙ্গে এই তিন কাহিনীরও কোনো যোগ নেই। যাকে আমরা পারস্পরিক সঙ্গতিময় কাহিনী-রচনা বলি এখানে সে রকম বৃত্তরচনা (Plot) হয় নি। এখানকার Plot কে ঠিক Organic বলা চলে না। বলা যায় উপবৃত্তময়। ক্রিয়ার উপরে Plot গঠনের জোর না দিয়ে তিনি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে তুলেছেন। এতে লেখকের বৃত্তগঠন-শক্তির বা বৃত্ত গঠন সম্পর্কে মনোভঙ্গির পরিচয় স্পষ্ট হয়।

কিন্তু এই দুটি উপবৃত্তে তিনি যে বিষয়টি দেখাচ্ছেন তার মূল কথাই শক্তির দম্ভ বা প্রতাপ। কেনী রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা পোষিত। সে ইংরেজ। এই কারণেই এদেশের মানুষের কাছে তার শক্তি অপরিসীম। সে নীলকর। মানুষের শুভাশুভ অপেক্ষা ব্যক্তিগত লাভালাভে তার অধিক আগ্রহ। সে যে কোন রকম অত্যাচারে বা পীড়নে অকুণ্ঠিত। প্রজাদের উপর অত্যাচার করবার শক্তিই প্রধান শক্তি। এই অত্যাচারের ক্ষেত্রে সে কৌশলী। কৌশলের শক্তিতে সে প্যারীসুন্দরীকে পরাস্ত করেছে। প্রজাদের পক্ষে যে ক্ষীনতম আশ্রয়টুকু লাভও সম্ভব ছিল প্যারীসুন্দরীকে সর্বস্বান্ত করে তা সে নষ্ট করে দিয়েছে। এখানে 'জমীদার দর্পণে'র ছকই যেন মীর মশাররফ আবার উপস্থিত করেছেন। বিচার এখানে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের এবং ইংরেজ নীলকরের ইচ্ছাধীন। সুতরাং পীড়ন অকুণ্ঠিত। পীড়নের শক্তি এবং শাসক শ্রেণীর সমর্থনই কেনীর মূল শক্তি। অন্য উপকাহিনীটিতেও পাই অন্যায়ভাবে মীরকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে গৃহহীন করবার কাহিনী। সেখানে দেখতে পাই এই অন্যায়ের প্রতাপ। দুটি কাহিনীর মূলেই পাই এই ন্যায় অন্যায়ের দ্বান্দ্বিকতা এবং পরিণতিতে অন্যায়ের প্রবল উপস্থিতি। একটা সময় পর্যন্ত সেই শক্তির দম্ভই এই গ্রন্থে উপস্থাপিত। যে মানুষের বিষাদবেদনা 'জমীদার দর্পণে' তিনি উপস্থিত করেছেন সেই বেদনাই 'বিষাদসিন্ধু'তে তারই রূপায়ণ 'উদাসীন পথিকের মনের কথায়'।

৫. চরিত্র

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় প্রধান-অপ্রধান মিলিয়ে অনেক চরিত্রের ভিড়। এদের মধ্যে অধিকাংশ চরিত্রই তাদের ঘৃণা-বিদ্বেষ, সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ নিয়ে পাঠককে আকর্ষণ করে। তবে কোন কোন চরিত্র যেমন — মীরসাহেব, প্যারীসুন্দরী বা ভৈরববাবু প্রভৃতি তাঁদের ব্যক্তিক অনুভূতি হারিয়ে অনেক সময় প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। চরিত্রগুলির আকর্ষণী শক্তি বা লেখকের মুন্সিয়ানার কথা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, একমাত্র কেনী চরিত্র ছাড়া অধিকাংশ চরিত্রই ফ্লাট বা সরলরৈখিক। মশাররফের চরিত্র-নির্মাণ অপেক্ষা কাহিনী-বর্ণনাতেই বেশী মনোযোগ ছিল। কাহিনীও কয়েকটি আপাত যোগসূত্রহীন কাহিনীর সমাহার। ফলে কাহিনীতে চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেবার অবকাশ কমই ছিল। একরৈখিক কাহিনী বর্ণনার দিকে নজর ছিল বলে চরিত্রগুলির দিকে তেমন গুরুত্ব দিতে পারেন নি।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় মশাররফ তাঁর পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন ও মাতা দৌলতন্‌নেসার

চরিত্রাঙ্কনে তাঁর শৈল্পিক শক্তিমত্তা ও মর্মানুভূতি যথাসম্ভব ঢেলে দিয়েছেন। মীর মোয়াজ্জেম হোসেন এখানে 'মীর সাহেব' হিসেবে বর্ণিত। উভয়ক্ষেত্রেই লেখকের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে। 'অকপট সত্যকথনে'র পাশাপাশি কখনো কখনো আবেগের প্রাবল্যও পরিদৃষ্ট হয়।

'মীর সাহেব গৌরবর্ণ', স্থূলকায়, চক্ষুবিস্ফারিত, ললাট বিশাল, মিষ্টভাষী, সরল প্রকৃতি এবং ঘোর আমোদী।"[১৯৮] এই 'ঘোর আমোদী' মীর সাহেব উচ্চবংশজাত জমিদার এবং সংসার বিরাগী। তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু অথবা সাংসারিক বা মনস্তাত্ত্বিক অন্য কোন কারণ তাঁকে সংসার বিরাগী করে তুলেছিল কিনা তার কোন ব্যাখ্যা লেখক দেননি। তবে লেখক খুব সততার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের দুটি গুরুতর দিকের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। প্রথমত, তাঁর নাচ-গান ও মদ্যাসক্তি এবং দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক নীল বিদ্রোহের বিরোধিতা। তৎসত্ত্বেও লেখকের আবেগময় বর্ণনা — "মীর সাহেব মোসলমান সমাজের সমুজ্জল রত্ন।"[১৯৯]

নৈতিক দিক থেকে শিথিল চরিত্রের অধিকারী তিনি। উনিশ শতকীয় সামন্ত শ্রেণীর যাবতীয় দোষ, যেমন – নারীসংসর্গ, মদ্যাশক্তি, নাচগান প্রভৃতি তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত। যেমন —

> মজলিস জমিয়া গিয়াছে। মীর সাহেব স্বয়ং সেতার বাজাইতেছেন, গোপাল ঢোলক বাজাইতেছে। দেশীয় নর্তকীদ্বয় নৃত্য করিতেছে। মহফেলের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন[২০০]

দ্বিতীয় স্ত্রী অর্থাৎ মশাররফ-জননী জীবিত থাকাবস্থায়ও যে তাঁর এই আমোদ-ফূর্তির হ্রাস হয়নি তার বড় প্রমাণ রক্ষিতা রূপসী। এই রূপসীর কারণেই যে দৌলতননেসা মারা যান তাও জানিয়েছেন মশাররফ।

মীর সাহেবের চরিত্রের একটি গুরুতর বিষয় হল, নীল বিদ্রোহের বিরোধিতা। এ ক্ষেত্রে কেনীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা এবং ব্যক্তিগত গভীর সম্পর্ক তাঁকে কেনীর বিপদে-আপদে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু এতে তাঁকে আরো বেশী কেনীর পক্ষভুক্ত করেছে ঘরের শত্রু সা-গোলাম নীলবিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ায়। তবু তাঁর মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি তা নয়। কেনী প্যারীসুন্দরীর বিরুদ্ধে অত্যাচার ও বিজয়ের কথা জানিয়ে যখন মীর সাহেবকে পত্র দেন তখন — "মীর সাহেব প্যারীসুন্দরীর প্রজাগণের দুরবস্থার কথা শুনিয়া মহা দুঃখিত হইলেন। কি করিবেন দায়ে পড়িয়া কেনীর সহিত বন্ধুত্ব। নিজের সম্পত্তি, মান, সম্ভ্রম রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।"[২০১] এতে একদিকে দেশীয় জমিদারবর্গ কীভাবে নীলকরদের সাহায্য করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেন তা যেমন তাঁর চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে তাঁর মানস-দ্বন্দ্বটিও কিঞ্চিৎ হলেও অনাবৃত হয়েছে।

মীর সাহেব চরিত্রের একটি মহৎ দিক হল, সা-গোলামকে ক্ষমা করা। এই অবাধ্য জামাতাই বৈষয়িক কারণে তাঁর প্রতি অশোভনীয় আচরণ করে তাকে পথে বসিয়েছিল। মীর সাহেবের এই সৌজন্যবোধ এবং উদার সহনশীলতা 'বিষাদসিন্ধু'র এমাম হাসান চরিত্রের সৌজন্য বোধের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মীর সাহেবের দ্বিতীয়া পত্নী দৌলতননেসা মশাররফ-জননী। এই চরিত্রাঙ্কনে মশাররফের আবেগ অনিয়ন্ত্রিত।

দৌলতননেসার রূপ সম্পর্কে লেখক বলেছেন — "সে পবিত্র রূপের বর্ণনা করা পথিকের অসাধ্য।"[২০২] এই বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি হজরত মোহাম্মদ-এর বিবিগণ, স্মরণীয় মুসলিম রমণী ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ নারী চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে অন্যান্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তাঁর বর্ণনায় "দৌলতননেসা পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী এবং আজীবন চিরসতী।"[২০৩] এরূপ তুলনামূলক আলোচনায় তাঁর মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গেলেও তা ঔচিত্যবোধের কাছে পীড়াদায়ক।[২০৪] এই গ্রন্থে দৌলতননেসার সহনশীলতা ও আমুদে স্বামীর প্রতি ক্ষমার মনোভাব বর্ণিত হয় — "আজীবন এক স্বামীপদ কায়মনে সেবা করিয়া, সেই স্বামীপদ প্রান্তে মস্তক রাখিয়া জগৎ কান্দাইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন।"[২০৫] অথচ মশাররফের 'আমার জীবনী'তে এই ত্যাগের মহিমা অস্বীকৃত হয়েছে।[২০৬] যাই হোক 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কাহিনীতে দৌলতননেসার ভূমিকা যেমন গৌণ তেমনি চরিত্রটিও নির্দ্বন্দ্ব। অবশ্য রূপসী নামে রক্ষিতার চক্রান্তে তাঁর মৃত্যু তথা করুণ পরিণতি বেদনাদায়ক নিঃসন্দেহে।

সা-গোলাম চরিত্রটি দোষে-গুণে এ গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। চরিত্রটি এখানকার দুটি কাহিনীর সংযোজক সেতু হিসেবে কাজ করেছে — উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকা সক্রিয়। কিন্তু পিতৃ-শত্রু হওয়ায় এবং বৈষয়িক ব্যাপারে লেখকের পিতাকে হেনস্থার কারণ স্বরূপ হওয়ায় লেখক এই চরিত্রাঙ্কনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি।

সা-গোলামের দুটি বিপরীতমুখী স্বভাব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। একদিকে তিনি কপট লোভী, অবিবেচক, বিশ্বাসঘাতক এবং অন্যদিকে নীল বিদ্রোহের সাহসী নেতা, প্রজাদরদী ও কোন কোন ক্ষেত্রে উদার চরিত্রের অধিকারী।

সা-গোলাম মীর সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জামাতা। "ঘর জামাই" হিসেবে মীর সাহেবের সাঁওতার বাড়ীতে তাঁর বসবাস। তিনি সংসারে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁরই প্রচেষ্টাতে মীর সাহেবের সংসারে উত্তরোত্তর বিষয়-বৈভবে উন্নতি হয়। কিন্তু চরিত্র হিসেবে তিনি যে খল, তার পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে থাকে লোভ-জালে আটকানোতে এবং সেই সূত্রে নানা কার্যকলাপে। দলিলচুরি, দলিলজাল, বিষ-প্রয়োগে মীর সাহেবকে হত্যার চক্রান্ত, জালিয়াতির দ্বারা মীর সাহেবকে তাঁর ভদ্রাসন থেকে উৎখাত ইত্যাদি তাঁর এই খলতা, কপটতা, বিশ্বাসখাতকতা ও লোভেরই পরিচায়ক। তাঁর এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথা সা-গোলাম নিজেই বলেছেন –

> আমি না পারি জগতে এমন কোন কার্য্য নাই। সংসার চালাইতে আমি ভাল জানি — সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিতে আমার বেশী সময় আবশ্যক করে না। ধর্ম্মভয় আমার অতি কম।[২০৭]

এই কপটতা, ক্রূরতা ও অবিশ্বস্ততার বিপরীতে সা-গোলাম নীল বিদ্রোহের নেতা হিসেবে চিত্রিত। 'সা-গোলামের চরিত্র এক নিকৃষ্ট ভিলেনের গণ-নায়কে উত্তরণ ও রূপান্তরের ইতিহাস।'[২০৮] 'মীর সাহেব নীলকরের পক্ষ, সা-গোলাম প্রজার পক্ষ' — এটি তাঁর পক্ষে গৌরবের কথা। তিনি কারাদণ্ডের মতো শাস্তির ঝুঁকি নিয়েও কেনীর

বিরুদ্ধে নীলচাষীদের সংগঠিত করে তাঁর পতন ঘটিয়েছেন।

তাঁর কিছু মহৎ গুণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রতিপক্ষ ও কেনীর পৃষ্ঠপোষক মীর সাহেবকে জব্দ করার সুযোগ পেয়েও বৃহৎ আন্দোলনের স্বার্থে তা গ্রহণ না করা, মীর সাহেবের দ্বিতীয় পত্নী দৌলতননেসাকে তাঁর অধিকৃত সাঁওতার বসত বাটীতে কবরস্থ করার ক্ষেত্রে আপত্তি না করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই মানবিক মহত্ত্ব আরোপিত হয়েছে। চরিত্রটির মধ্যে পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর জন্যে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে।

মে.টি.আই. কেনী ঐতিহাসিক চরিত্র এবং সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চরিত্র। কাহিনীর সূচনা, বিকাশ ও সমাপ্তি কেনীকে কেন্দ্র করেই। সুতরাং তাঁকে কেন্দ্রীয় চরিত্রও বলা যেতে পারে। এই চরিত্রাঙ্কনে লেখক তুলনামূলকভাবে অধিকতর শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। লেখকের পিতার বিশিষ্ট সুহৃদ ও একান্ত হিতৈষী — এমনকি লেখকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও এখানে কেনী অত্যাচারী ও প্রবঞ্চক রূপেও চিত্রিত হয়েছেন।

কেনীর পরিচয় লেখক এভাবে দিয়েছেন —

> সে সময় কুষ্টিয়া অঞ্চলে কেনীই রাজা, কেনীই প্রায় হর্ত্তাকর্ত্তার মালিক। যা করে কেনী। . . . কেনীর দৌরাত্ম্য আগুনে দেশের লোক জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল। কুঠীর নাম শুনিলেই হৃদয় কাঁপে।[২০৯]

এছাড়াও আবার "কেনীর অনারারী ম্যাজিষ্টারের ক্ষমতা ছিল।"

অত্যাচারী নীলকরের বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রে। লেখকের বর্ণনা প্যারীসুন্দরীর জবানীতে

> কৃষি প্রজার জমাজমী কাড়িয়া লইয়া নীল বুনানী করিল। কত তালুকদারের তালুক, কত জোতদারের জোত জব্‌রাণে লিখিয়া লইল। কাহারও যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া একেবারে পথের কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িয়া দিল। . . . . ইহার পর আবার সময় সময় হাত পা বান্ধিয়া গাছে লটকাইয়া চাবুকে পীঠের খাল তুলিতেছে।[২১০]

কেনীর কয়েদখানা অমানবিক অত্যাচারের আরেক দৃষ্টান্ত —

> "এ গুদাম — বড় ভয়ানক কয়েদখানা। . . . সেখানে শুইবার বিছানা নাই, বালিস কাঁথা কম্বলের নাম নাই। ভাতের মুখ দেখিবার ভাগ্যই নাই। আহারের ব্যবস্থা ধান। — ধান বাছ, চাল বাহির কর, জলে মিশিয়ে গিলে ফেল।"[২১১]

এসব কারণেই প্যারীসুন্দরীর কার্য্যকারক রামলোচন বলেছেন — "কেনী চামার অপেক্ষাও অধম, মেথর অপেক্ষাও নীচ।"[২১২]

এরূপ অত্যাচার ও হীন-স্বভাবের বর্ণনা থাকলেও 'নীলদর্পণ'-এর উড্ বা রোগ সাহেব-এর মতো নিষ্ঠুর, পাপিষ্ঠ চরিত্র তিনি নন। পরস্ত্রী ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তাতে জঘন্য কামুকতা নেই। 'জমীদার দর্পণে'র

হায়ওয়ান আলীর মতো জোর করে নয়, বরং নানা প্রলোভনে চাষী বউকে বশ মানাতে তিনি সক্ষম। তাই মুনীর চৌধুরী মন্তব্য করেন,

> ""'উদাসীনে'র নীলকর সাহেব টি. আই. কেনী মহাপাপিষ্ঠ রূপে চিত্রিত হয়নি। কখনও কখনও সেরূপ বিশেষণে ভূষিত হলেও নৃশংস আচরণের দ্বারা সে আমাদের ঘৃণা অর্জন করে না।"[২১৩]

ময়নাকে উচ্ছিষ্টের মতো ফেলে দেননি। কেনী বরং ময়নার জীবন সংশয় হলে তিনি বিচলিত ও ব্যথিত হন।

কেনীর মধ্যে ইন্দ্রিয়পরবশ্যতা সত্ত্বেও পত্নীপ্রেমের অভাব ছিল না। মিসেস কেনী বিলেত গেলে তাঁর অবর্তমানে কেনীর মানসিক প্রতিক্রিয়ায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। বিলেত থেকে মিসেস কেনী ফিরে এলে ময়নাজনিত অপরাধবোধে কষ্ট পেতে দেখা যায় কেনীকে। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত কেনীর করুণ পরিণতি আমাদের মনে ঘৃণার পরিবর্তে সমবেদনারই উদ্রেক করে।

কেনী চরিত্রে আবার সদগুণাবলীর অনুশীলন না হলেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। নীল বুনানীর সময় মুসলমানদের কবরস্থানের উপর চাষ করতে নিষেধ করা অথবা চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ কেনী বিনামূল্যে তাঁর কুঠীর ঔষুধ সাধারণ লোকদের অসুখে দান করার মধ্যে এই মানবিক গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং কেনী প্রজাপীড়ক, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর নন, বরং রিপু-শাসিত একজন মানবরূপে চিত্রিত।

মিসেস কেনী এ গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তিনি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং স্বদেশানুরাগী। তিনি কেবল কেনীর সহধর্মিনীই ছিলেন না, সহকারিনী হিসেবেও ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রূপ যেমন অপরূপ তেমনি উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহসেরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্যারীসুন্দরীর লেঠেল বাহিনী আক্রমণ করতে গিয়ে মিসেস কেনীর দিকে "... যে মুখ তুলিয়া তাকাইল সে তাকাইয়া রহিল।" আর আঘাত করতে সাহস হল না। আবার তিনি কয়েক তোড়া টাকা ছিটিয়ে দিলে আক্রমণকারীরা নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয় এবং সেই সুযোগে কেনীর লেঠেল-বাহিনী তাদের আক্রমণ করে বিতাড়িত করে। মামলা সাজাতে আপন ঘরের আসবাব বা ঘরের জানালা ভাঙচুর করে রাখেন। এতে তাঁর সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যায়।

বিলাসবহুল জীবনযাপনে আগ্রহ ছিল মিসেস কেনীর। 'হোমে'র প্রতি টানও আছে। কিন্তু 'হোম' অর্থাৎ বিলেতে গিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেও পারেন নি। চাকর-বাকর শোভিত ভারতবর্ষই তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনে। স্বামী কেনীর কাছে পুনরায় ফিরে এসেছেন। তাঁর মধ্যে চিরন্তন নারীর মতোই স্বামীর ভাবান্তর নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা ও শাশ্বত সন্দেহ জেগেছে। মিসেস কেনী লোভ-লালসা বা নীচতা মুক্ত নন। কেনী চিকিৎসার কারণে কলকাতা গেলে তাঁর অবর্তমানে সোনারূপার অলঙ্কার 'অনেক সরাইলেন।' তাই দেখা যায়, আড়ম্বরপ্রিয়, বিলাসী, কিঞ্চিৎ লোভী ও স্বার্থসচেতন সাধারণ নারী হিসেবেই মিসেস কেনী চিত্রিত।

প্যারীসুন্দরী ও ভৈরববাবু চরিত্রাঙ্কনে লেখক বেশ নিপুণতার ছাপ রেখেছেন। উভয়েই বাঙালী জমিদার।

এবং উভয়েই কেনীর প্রতিদ্বন্দ্বী। সুন্দরপুরের মহিলা জমিদার প্যারীসুন্দরী। প্যারীসুন্দরী প্রজাদরদী সামন্ত-রমনী। প্রজাদের সুখ-দুঃখে কাতর, তাদের কল্যাণই তাঁর জীবনের ব্রত। এ রকম দৃষ্টান্ত বাস্তবক্ষেত্রে খুব কম দেখা যায়। প্যারীসুন্দরী প্রজাদের বাঁচাতে কেনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি নির্ভীক ও সাহসী। তাই উচ্চকণ্ঠে বলতে পেরেছেন—"আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, সাহেবের কুঠী লুটিয়া আনিয়াছি ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে!"[২১৪] আবার প্যারীসুন্দরী চরিত্রে অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবাপন্ন জননেত্রীকেও দেখা যায়। দেশাত্মবোধও প্রবল। তাই বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন—

> হিন্দু মুসলমানকে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা, দেশের মঙ্গল জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই।[২১৫]

ঐতিহাসিক চরিত্র হয়েও ইতিহাসে উপেক্ষিতা এই তেজস্বিনী বীরনারী 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় উজ্জ্বল চরিত্র হিসেবে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

পাংশার জমিদার ভৈরববাবু অভিজাত বংশের শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কেনী ভৈরববাবুর খাজনার চালান লুঠ করবার ফন্দি আঁটলেও ভৈরববাবুর কৌশলী বুদ্ধির কাছে হার মানতে বাধ্য হন। কেননা

> তিনি নিতান্তই কৌশলী, দাঙ্গা ফসাদে অগ্রসর হইতে চাহেন না, বিষয়াদি লিখিয়া দিতেও অস্বীকার হন না। অথচ এরূপ ভাবে লিখিত পড়িত করিতে চাহেন যে, আমি তাঁহার একটা তহশীলদার মাত্র থাকি।[২১৬]

ভৈরববাবুর চারিত্রিক দৃঢ়তা বাঙালীর মর্যাদাবোধকেই উজ্জ্বল করেছে।

এ ছাড়া অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে জকি, ময়না, রূপসী, হরনাথ, দেবীপ্রসাদ, রামলোচন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কেনীর গাড়োয়ান ও ময়নার 'লোভী' স্বামী জকি চরিত্রটি এখানে অর্থলোলুপ, হৃদয়হীন, পাষণ্ড মানুষ হিসেবে চিত্রিত। "তিনি না করিতে পারেন, এমন কোন কার্য্য দুনিয়ায়ই নাই। মানুষে যাহা কখনই করিতে পারে না তিনি তাহা টাকার লোভে অনায়াসে করিতে পারেন।"[২১৭] জকির সঙ্গে অনেকটা 'বিষাদসিন্ধু'র জয়নাব-এর পূর্বতন স্বামী আবদুল জাব্বারের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

জকির সুন্দরী স্ত্রী ময়না গ্রাম্য সরলা বধু। সপত্নী সংসারে স্বামীপ্রেমসুখবঞ্চিতা এক হতভাগিনী নারী। তবু সে পতিগতপ্রাণা। কিন্তু সেই অভাগা নারী যখন স্বামীরই সহায়তায় কেনীর কামনা-বহ্নির শিকারে পরিণত হয়ে আপন সতীত্বকে হারাতে হয় তখন তার মর্মবেদনা হাহাকারে ফেটে পড়ে। ময়নার খেদোক্তি —

> একদিকে স্বামী, অন্যদিকে দুরন্তবাঘ। বাঘ হা করিয়া ধরিতে আসিল, স্বামী রক্ষা না করিয়া আরও বাঘের মুখে ধরিয়া দিল। আর বাঁচি কি করিয়া যাই কোথা – কে রক্ষা করে?[২১৮]

তার পাপবোধ ও সুতীব্র অন্তর্জ্বালা তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়।

ময়নার বিপরীতে যেন প্রতিষ্ঠিত ষড়যন্ত্র নিপুণা বাইজী রূপসী। সে মীর সাহেবের রক্ষিতা। এই রূপসীর ষড়যন্ত্রের কারণেই মীর সাহেবের পতিভক্তিপরায়ণা নিরপরাধা দ্বিতীয় স্ত্রী এবং মশাররফ-জননী দৌলতননেসাকে অকালে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছে। এই চরিত্রটি বিষাদসিন্ধু'র জায়েদা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-এর হীরা চরিত্র দুটিকে মনে পড়িয়ে দেয়। তবে তাদের তুলনায় চরিত্র হিসেবে রূপসী নিষ্প্রভ এবং নির্দ্বন্দ্ব।

আমলা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখানে উপস্থিত হরনাথ ও দেবীপ্রসাদ। দুজনেই চতুর, স্বার্থপর, লোভী, সুযোগসন্ধানী ও প্রয়োজনে অবিশ্বস্ত। কিন্তু পক্ষান্তরে রামলোচন প্যারীসুন্দরীর আজ্ঞাবহ একজন দেশপ্রেমিক।

৬. সমাজ চেতনা

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় লেখক মীর মশাররফ হোসেনের সমাজ-চেতনা ও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

ইংরেজ নীলকর সাহেবরা এদেশীয় হিন্দু মুসলিম কৃষকদের মধ্যে ভেদাভেদের বাতাবরণ তৈরী করে তাদের মধ্যে একটা অনৈক্য তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিল। সেই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে কৃষক ও অন্যান্য প্রজাদের দিয়ে নীলচাষ করানো থেকে শুরু করে নানা অপশাসন ও শোষন যন্ত্রে পীড়ন করত এই নীলকররা। এই প্রেক্ষাপটে দেশবাসীর ভূমিকা যে ছিল নেতিবাচক তা মশাররফের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে স্পষ্টভাবে। এই গ্রন্থের কাহিনীর মধ্যে প্যারীসুন্দরীর জবানীতে আপন মতাদর্শকেই তিনি যে ব্যক্ত করেছেন তা আমরা অনুধাবন করে নিতে পারি। তিনি বলছেন —

> দেশের লোকেই দেশের শত্রু, দেশের অনিষ্টকারী। কেনী বিলাত হইতে লোকজন সঙ্গে করিয়া এদেশে আসেন নাই। দেশের লোক দিয়াই স্বদেশীয়ের সর্ব্বসান্ত করিতেছেন।[২১৯]

এ দেশের একটা অংশ স্বার্থ তথা অর্থের কারণে বিদেশী নীলকরদের পক্ষভুক্ত, আবার জনগণের অন্য অংশ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন।

মশাররফ উপলব্ধি করেছিলেন নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করতে হলে প্রজাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত জরুরী। প্যারীসুন্দরীর মাধ্যমে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে লেখক বলেছেন —

> যাহাতে সকলের মন এক হয়, তাহার উপায় করা চাই। প্রকাশ্যে যাহাই করুক, হিন্দু মুসলমানকে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র । জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা দেশের মঙ্গল জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই।[২২০]

নীল-আন্দোলন সার্বিক না হলেও একটা পর্যায়ে যে বাঙালীদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল সেটা

বুঝতে পেরে লেখক নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারেননি —

> হিন্দু মুসলমান একত্রে একযোগে পূর্ণ উৎসাহে বক্ষ বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিল। কাহারও কোন কথা কানে করিল না। . . . . সকলেই যেন জেল হইতে খালাস পাইয়াছে।[২২১]

তবে প্রকৃত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় অথবা সামগ্রিকভাবে সমাজকে বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ করবার ক্ষেত্রে তাঁর সীমাবদ্ধতা থাকায় মীর মশাররফ কেনীর মতো নীলকর সাহেবদের ইংরেজ শাসনের সঙ্গে একাত্ম করেননি। বরং তাঁদেরকে কয়েকজন বিচ্ছিন্ন দুষ্কৃতকারী হিসেবেই দেখেছেন। কিন্তু এর পেছনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ বুদ্ধিই যে কার্যকর ছিল সে কথা উপলব্ধি করতে পারেননি। অবশ্য দীনবন্ধু মিত্রও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেছেন। তাই লক্ষ করা যায়, উভয়েই নীল বিদ্রোহী কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন করেও ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার মাহাত্ম্যকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। মশাররফ উল্লেখ করেছেন —

> মাননীয় হর্সেল বাহাদুর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আকাশে পূর্ণ জ্যোতি সহকারে, পূর্ণ কলেবরে, পূর্ণ চন্দ্ররূপে দেখা দিয়েছেন। প্রজার দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। প্রজার আর্ত্তনাদে বঙ্গেশ্বরের আসন পর্যন্ত টলিয়াছে। মহামতি লাট বাহাদুর প্রজার দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য নীলকরের দৌরাত্ম্য স্বয়ং তদন্ত জন্য . . . মফস্বলে বাহির হইয়াছেন।[২২২]

এই ধরণের আস্থা প্রকাশে উনিশ শতকের নব সৃজ্যমান মধ্যবিত্ত মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে।

কিন্তু ইংরেজ-শাসনব্যবস্থার প্রতি আন্তরিক আস্থা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি-কামনা ও ঐক্য স্থাপনের যে প্রেরণা লেখক দিয়েছেন তা সমকালীন সামাজিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এই বোধ থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে স্বদেশ-প্রেমের চেতনা —

> 'হোম' যে কি জিনিস, 'হোম' কথাটি যে কত মিষ্টী তাহা বিলাতী অন্তর না হইলে আমাদের অনুভব করার সাধ্য নাই। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের 'হোম'কে আমরা কেবল পদতলেই দলিত করিতে শিখিয়াছি। কি প্রকারে পূজিতে হয় তাহা জানিনা। এই হোমেই যে স্বর্গসুখ ভোগ করা যায়, তাহাও স্বীকার করি না। . . . . আমাদের মন স্বাধীন। হোমের আবার নির্দ্দিষ্ট কি ? জগৎময় হোম। সমুদয় জগৎ আমাদের হোম। কনষ্টান্টিনোপল কি আমাদের নহে ? সেন্টপিটার্সবর্গ কি আমাদের হোম নহে ? হোম কি আমাদের হোম নহে ? যে দেশ, যে স্থান ভাল সেই আমাদের হোম। . . . . হোমের জন্য পথিকের মন কাঁদে।[২২৩]

এ দেশের সকল সম্প্রদায়কে যেমন দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনি এখানকার বাঙালী মুসলমানগণ যে তখন বঙ্গদেশকে মাতৃভূমি বা স্বদেশ ভাবতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তাকেও পরোক্ষে ইঙ্গিত করে ঠিক দিশা দিয়েছেন তাও অনুভব করা যায়।[২২৪] এ তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তাচেতনারই পরিচয়।

গাজীমিয়াঁর বস্তানী

১. ভূমিকা

'গাজীমিয়াঁর বস্তানী' মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য সাধনার ঐশ্বর্যপর্বের শেষ স্মরণীয় কীর্তি। এখানে তিনি বাস্তব জগৎকে আরো কাছ থেকে ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবন ও সমাজ লব্ধ অভিজ্ঞতাকে আর একটি আঙ্গিকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

'গাজী মিয়ার বস্তানী'র প্রথম অংশ (প্রথম খণ্ড) ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (ইং. ১৮৯৯ খ্রীঃ) কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই প্রকাশকাল নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে।[২২৫] প্রকাশক শ্রী মমিনউদ্দীন আহম্মদ কর্তৃক প্রদত্ত 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায়, যে বওড়ার সৈয়দ অলিওল্লার কাছে মশাররফ 'মখমল' জড়ানো 'বস্তানী'র পাণ্ডুলিপি ১৩০৩ সালের ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে প্রদান করেন। আবার 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী'তে মশাররফ লিখেছেন, "বস্তানী ছাপাখানায় প্রায় ৫ বৎসর পড়িয়া ছিল।"[২২৬] এর থেকে বোঝা যায়, 'বস্তানী' প্রকাশিত হওয়ার বেশ কয়েক বছর পূর্বেই রচিত হয়েছিল। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' দুখণ্ডে সর্বমোট চব্বিশটি পরিচ্ছদে বিভক্ত। পরিচ্ছেদগুলি এখানে 'নথি' হিসেবে চিহ্নিত। প্রথম খণ্ডে কুড়িটি 'নথি' সন্নিবেশিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ড আর স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়নি। তবে 'বস্তানীর' অগ্রন্থিত কিছু অংশ কুড়ি সংখ্যক 'নথি'র পরিশিষ্ট রূপে এবং একুশ ও বাইশ সংখ্যক 'নথি' মীরের 'আমার জীবনী'র পরিশিষ্টে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তেইশ ও চব্বিশ সংখ্যক নথি এবং পরের কিছু অংশ অপ্রকাশিত থেকে গেছে। প্রকাশকের 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায় ঃ—

> বস্তানী ২৪ নথীতে শেষ। নথীর পর গাজী মিয়াঁর আত্মপরিচয়, বস্তানী প্রাপ্তির বিবরণ ও অপর হস্তে অর্পণের কারণ, 'ফলশ্রুতি', 'পরিণাম', সর্বশেষে 'বিদায়' অতিআশ্চর্য্যরূপে চিত্রিত হইয়াছে। পাঠকগণের অনুগ্রহ না হইলে ঐ সকল বিষয় ক্রমে পচিয়া গলিয়া মাটিত মিশাইয়া যাইবে।[২২৭]

মশাররফ হোসেন 'উদাসীন পথিক' ছদ্মনামে 'বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের একখানি চিত্র' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা 'হাফেজ' পত্রিকায় (জানুয়ারী ১৮৯৭) প্রকাশ করেন। কবিতাটিকে তিনি 'বস্তানী'র চতুর্বিংশ নথির শেষাংশ বলেছেন।[২২৮] যদিও কবিতাটি 'বস্তানী'র আগেই প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রন্থের প্রচ্ছদে বা আখ্যাপত্রে লেখক হিসেবে মশাররফের নাম দেওয়া হয়নি, তবে স্বত্বাধিকারী হিসেবে 'উদাসীন পথিক'-এর নাম পাওয়া যায়। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থের মুখবন্ধে মীর 'উদাসীন পথিক' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। 'বস্তানী'র কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে সমকালীন বাস্তব ঘটনার সম্পর্ক ছিল বলে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় লেখক হয়তো নিজ নামে আত্মপ্রকাশ করতে চাননি।

'গাজীমিয়া' যে স্বয়ং মীর মশাররফ হোসেন তা লেখক 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী' তে

স্পষ্টতই জানিয়েছেন,

> . . . গাজী মিয়াঁ আপন বস্তানিতে কুলসুম বিবির অনেক কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন— 'বউ' আখ্যা দিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন।[২২৯]

'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে গাজীমিয়া ও ভেড়াকান্ত যেখানে একই ব্যক্তি সেখানে মীর তাকে দুটি স্বতন্ত্র সত্তা ও চরিত্রে ভাগ করে দেওয়ার কারণ কি ? ভেড়াকান্ত এ রচনায় একটি চরিত্র। সে তার অদূরদর্শিতার কারণে অন্যের কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছে। এবং এই রচনায় দেখি তার শাস্তিভোগও হয়েছে। ভেড়াকান্ত কথাটির অর্থ ভেড়ার মতো বুদ্ধিহীন। বুদ্ধিহীন অর্থে চাতুর্যের অভাব, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যখন যা দরকার তা করবার অক্ষমতা। এই কারণে ভেড়াকান্ত নামকরণ। আর 'গাজীমিয়াঁ' এই কাহিনীর কথক। গাজীমিয়াঁর যে সত্তা এই রকম চাতুর্যহীনতার জন্য কষ্ট ভোগ করে সেই ভেড়াকান্ত। অপর পক্ষে গাজীমিয়াঁ সেই সত্তা যে নিজের ত্রুটি বিচ্যুতিকে দূর থেকে দেখে কতকটা সময়ের দূরত্বে – কতকটা বা ঘটনা থেকে ব্যবধানের কারণে যেভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বস্তুকে বর্ণনা করা সম্ভব হয় এও সেই রকম। গাজী মিয়াঁ সেই বর্ণক। ভেড়াকান্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত চরিত্র — ঘটনার তাৎক্ষনিকতার সঙ্গে যুক্ত। ঘটনার গতিপ্রকৃতি সে বুঝতে পারেনি। সে স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষ। আর গাজী মিয়াঁ সেই একই মানুষ হলেও বিচারসহ দৃষ্টিতে সে নিজেকে দূর থেকে দেখে—নিজেকেই সে বিশ্লেষণ করে। যে সত্তা এই বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করে সেই গাজীমিয়াঁ—যে স্রোতে ভেসে গিয়েছিল সেই ভেড়াকান্ত— সে কিন্তু গাজীমিয়াঁ নয়।

লেখক এই গ্রন্থের ষষ্ঠ নথিতে 'বস্তানী'র বিষয় ও প্রকৃতি সম্পর্কে আভাস দিয়ে লিখেছেন,—

> গাজীমিয়াঁর বস্তানীর মধ্যে না আছে এমন কথা নাই। দুনিয়া জাহানে যাহা আছে, সংসার ক্ষেত্রে যত প্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, গাছা, আগাছা, পরগাছা, বিশাল রসাল, মিষ্ট, কটু, কষায়, টক, অম্ল, মধুর, বড়, সর্ব্বাঙ্গ কণ্টক, সর্বাঙ্গ মধুমাখা, নয়নমনের তৃপ্তিকর, বিরক্তিকর, যাহা যাহা আছে, গাজীমিয়ার বস্তানীতে তাহার অভাব নাই। নথিসূত্রে প্রত্যেক নথি পৃথক পৃথক গাথা। আবার সূত্রে সূত্রে সংযোগ। নথি সাজান। একটু চিন্তা করিয়া নথি উল্টাইলেই বুঝিতে পারিবেন।[২৩০]

গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' শ্রীমমিনদ্দীন আহম্মদ একে 'অতীত কালের একখানি বৃহৎ দর্পণের নমুনা' এবং 'সমাজের বর্তমান সময়ের একখানি বৃহৎ চিত্র' বলে অভিহিত করেছেন।

২. পটভূমি

'ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ'-এ (২য় খণ্ড, পৃ. ১০) 'বস্তানী'র পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয় - – "A tale depicting life amongst Muhammadans in the North-Eastern districts of Bengal"[২৩১] ৩১ অক্টোবর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'Calcutta Gazette'–এ এর যে সমালোচনা বের হয় তাতে বলা হয়— 'It is a story relating mainly to the quarrel between two female and muhammadan Zamindars in North Bengal."[২৩২] 'ক্যালকাটা গেজেটে'র এই মন্তব্য প্রসঙ্গে মীর মশাররফ হোসেন 'আমার জীবনী'র পরিশিষ্টে 'প্রেরিতপত্র' শিরোনামে জানান—

> চক্ষু থাকে ত চাহিয়া দেখ। আমাদের মহামাননীয় ব্রিটিশরাজ সরকারী গেজেটে ১৯০০খ্রীঃ ৩১ শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতা গেজেটে আমার বস্তানী সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন? দুশ বাহবা দিয়া লেখকের বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন—রঙ্গপুর অঞ্চলের কোন মুসলমান জমিদারের ঘটনার ছায়া অবলম্বন করিয়া গাজীমিয়াঁ চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন।[২৩৩]

কিন্তু এই কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবের স্থান-কাল-পাত্র মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, এর কেন্দ্রভূমি তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত দেলদুয়ার জমিদারি এষ্টেট। 'ক্যালকাটা গেজেট' এর কেন্দ্রভূমি উত্তরবঙ্গ এবং সেই জের ধরে লেখক কর্তৃক 'রঙ্গপুর' নামোল্লেখের কারণ রহস্যাবৃত। তবে অনুমান করা যায়, প্রবল বিরুদ্ধপক্ষের আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই হয়তো তিনি এই ঘটনাস্থানের বিষয়ে বিভ্রম সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয় কালের ক্ষেত্রেও যেন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয় সেজন্যে তিনি সতর্ক ছিলেন এবং তা পাঠকদের জানাতে ভোলেন নি——

> এ সকল কথা আজ প্রায় ১২/১৩ বছরের কথা – এখনকার কথা নহে। একালের সঙ্গে আমার বস্তানীর কোন সংশ্রব নাই। ১৩০৫ সালে বস্তানী প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু ঘটনার কার্য্যকথা তাহার এক যুগ আগের। প্রকাশ হইতেছে এ সময় বলিয়া কেহ যেন বর্ত্তমান সময়ের কোন ঘটনার সহিত ইহার সংযোগ মিলন না করেন।[২৩৪]

তবে প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে, 'পয়জারন্‌নেসা' বা 'বেগম সাহেবা' হিসেবে চিত্রিত দেলদুয়ার এষ্টেটের শরিক বেগম রোকেয়ার জ্যেষ্ঠা ভগিনী করিমননেসার পিতৃভূমি রঙ্গপুর এবং তাঁরাও জমিদার পরিবার।

মশাররফ ১৮৮৪ খ্রী. (বাংলা ১২৯১) থেকে আনুমানিক ১৮৯৪ খ্রী. পর্যন্ত প্রায় দশ বছর কাল টাঙ্গাইলে বসবাস করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথমদিকে প্রায় আট বছর দেলদুয়ারের জমিদার করিমননেসার এস্টেটে ম্যানেজার হিসেবে ছিলেন। এই সময়ের জীবনই 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র বর্ণনীয় বিষয়। এ কারণেই কাজী আবদুল মান্নান বলেন,

> বস্তানীর ঘটনা এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে মশাররফ হোসেনের সংযোগ ছিল। তিনি একথা কোথাও গোপন করেননি। বস্তানীর মধ্যে তিনি নিজের ছদ্মনাম 'ভেড়াকান্ত' রেখেছেন বলেও জানিয়েছেন।"[২৩৫]

'গাজীমিয়ার বস্তানী'র সম্পাদক আশরাফ সিদ্দিকী নানা প্রামান্য তথ্য দলিল ও অন্যান্য সূত্রের সাহায্যে জানিয়েছেন- — "বস্তানীর মূল রঙ্গভূমি দেলদুয়ারই এবং পাত্রপাত্রীর কমবেশি বাস্তব ভিত্তি আছে।"[২৩৬] মুনীর চৌধুরীর অভিমতও তাই– "'বস্তানী'র পটভূমি স্পষ্টত দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।"[২৩৭] 'বস্তানী'র কাহিনীর যে সত্য-ভিত্তি রয়েছে এবং এর কেন্দ্রবিন্দু যে দেলুদয়ারই তা মশাররফ পরবর্তীকালে 'আমার জীবনী' ও 'বিবি কুলসুম'-এ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। 'আমার জীবনী'তে 'আমার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি কথা'শীর্ষক বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন- — "আমার জীবনীর সহিত গাজী মিয়াঁর বস্তানীর শেষ অংশে বিশেষ সংশ্রব আছে।"[২৩৮] 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনীর 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লিখেছেন– "বার বৎসর পূর্ব্বে গাজীমিয়া আপন বস্তানিতে কুলসুম বিবির

অনেক কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—'বউ' আখ্যা দিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন।"[২৩৯] এই 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থেই 'চতুর্থ কথা' অধ্যায়ে দেলদুয়ার বাসের কথা প্রসঙ্গে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র 'মধ্যস্থিত কথা' থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২৪০] আবার দেলদুয়ার এষ্টেটের নেপথ্যে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশ' (৭ ফাল্গুন ১৩০০/১৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪) পত্রিকায় মীরের প্রতিপক্ষের তরফ থেকে যে বিবরণ প্রকাশ করা হয় তা কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ।[২৪১] 'বস্তানী'র কাহিনীর বাস্তবভিত্তি সম্পর্কে এই বিবরণ আরো নিঃসন্দিগ্ধ করে তোলে।

মীর মশাররফ কর্মসূত্রে দেলদুয়ারে থাকাকালে দেলদুয়ারের জমিদার মোয়াজ্জেমুদ্দিন আলী খানের দুই কন্যা নজমন্‌নেসা খানম ও নুরুন্‌নেসা খানম জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর দুই পুত্র আবদুল আজিজ খান এবং আবদুল হাকিম খান মারা যান। আবদুল আজিজের একমাত্র পুত্র নাবালক থাকায় জমিদারী দেখাশোনার ভার পড়ে স্ত্রী রাহাতননেসার ওপর। অন্যদিকে আবদুল হাকিম খানের দুই পুত্র নাবালক থাকায় জমিদারির দায়িত্ব বর্তায় স্ত্রী করিমননেসার ওপর। কিছুদিনের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক আব্দুর রহমানের সঙ্গে নজমন্‌নেসা খানমের মেয়ে সুরাইয়া খাতুনের বিয়ে হয়। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে রাহাতননেসা ও পুত্র আবদুর রহমানের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। এ ছাড়া জমিদারির অন্যান্য শরিকদের পরস্পরের মধ্যেও সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। এই সুযোগে জমিদারের বহু অসৎ কর্মচারী এবং হাকিম, উকিল প্রভৃতি সরকারী-বেসরকারী কর্মচারীদের ইন্ধনে পরিবারটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। এতে মশাররফ ব্যথিত হন। উক্ত শরিকদের আভ্যন্তরীণ কলহের সমালোচনা করে তিনি টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত তাঁর 'হিতকরী' (১০ ভাদ্র ১২৯৯) পত্রিকায় একটি নিবন্ধ রচনা করেন। পরবর্তীকালে এই কলহের আরো নিন্দা করে এবং টাঙ্গাইলের সরকারী কর্মচারীদের সমালোচনা করে কিছু প্রচারপত্র রাস্তায় রাস্তায় টাঙিয়ে দেন। ফলে মীরের বিরুদ্ধে মহকুমা হাকিমের এজলাসে একটি মামলা দায়ের করা হয়। অবশ্য তিনি যে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে কোনও কারণে করিমননেসার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। পারিবারিক বিরোধের ফলে রাহাতননেসা এবং করিমননেসা দেলদুয়ার ত্যাগ করতে বাধ্য হন।[২৪২] অনুমান করা যায়, এরূপ পরিস্থিতিতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সংবেদনা শিল্পী মীরের চিত্তে যে আলোড়নের সৃষ্টি করে তাই তাঁকে এ ধরণের একটি গ্রন্থ রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে।

বাস্তব ঘটনা, চরিত্র ও স্থানকে মনে রেখে লেখক 'বস্তানী'র চরিত্র ও স্থানের গুণগত নাম রচনা করে নিয়েছেন। 'বস্তানী'র ভেড়াকান্ত লেখক মশাররফ নিজে। বিবদমান তিন মুসলিম মহিলা জমিদার পয়জারননেসা ওরফে বেগম সাহেবা ওরফে বেগম ঠাকুরানী হচ্ছেন করিমননেসা, সোনাবিবি রাহাতননেসা এবং মনিবিবি হলেন নজমননেসা। জয়ঢাক – আবদুর রহমান এবং ছিঁড়িয়া খাতুন – সুরাইয়া খাতুন, ভোলানাথ—টাঙ্গাইলের মহকুমা হাকিম শিবচন্দ্র নাগ (ভোলানাথ আর শিব একই অর্থবোধক)। দাগাদারী – কবিলেখক আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী।[২৪৩] এছাড়া স্থান-নামগুলিও অনুরূপভাবে চিত্রিত। 'বস্তানী'তে টাঙ্গাইল হয়েছে অরাজকপুর, দেলদুয়ার-—যমদ্বার, নসিরাবাদ (ময়মনসিংহ)– নচ্ছারপুর, পাথরাইল – পাতালগ্রাম, সলিমনগর—কুলকুচনগর প্রভৃতি। দেলদুয়ারে বেগম করিমননেসার বাড়িটির নাম ছিল 'শান্তিকুঞ্জ' – মশাররফ প্রদত্ত নাম। 'বস্তানী'তে 'শান্তিকুঞ্জ' রূপান্তরিত 'কুঞ্জনিকেতন'-এ।[২৪৪]

এখানে এই স্থান-নাম ও ব্যক্তি-নামের ক্ষেত্রে লেখকের ব্যঙ্গ-দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। নামকরণ থেকেই তাদের উদ্দেশ্য-প্রবণতা স্পষ্ট বোঝা যায়। উপরিউক্ত, নামগুলি ছাড়া আরো ব্যঙ্গাত্মক নাম হল— জমিদারের নাম – 'সাবলোট চৌধুরী', তাঁর মোসাহেব 'কালারায়' কট্টালাহিড়ী, আলকাতরা সান্যাল, ঘরভাঙ্গা সান্যাল। সোনাবিবির পক্ষভুক্ত—বেআক্কেল, ধড়িবাজ এবং মনিবিবির পক্ষে—মাথাপাগলা রায়, ধামধরা সরকার। এ ছাড়া জ্বালাতননেসা, চাঁদবদনী, লালআলু, শিকলি কাটা টিয়ে প্রভৃতি। স্থান-নামের ক্ষেত্রে থানার নাম হাতপাতা, খামখেয়ালীগঞ্জ, নেংটিচোরা প্রভৃতি।

স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, লেখক কি তাহলে শুধু ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা জ্বালার প্রেরণায় লেখনী ধারণ করেছিলেন—তার পেছনে কি কোন সাহিত্যিক প্রেরণা কার্যকরী ছিল না? আসলে শুধুমাত্র বহির্প্রেরণা নয় – বহির্জগত ও জীবনের কুৎসিত রূপ একজন শিল্পীর চেতনালোকে যে নাড়া দেয় তার থেকে উঠে আসে গভীর আন্তরসত্য। চেনাজগতের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় থেকে এই অন্তর-রহস্যের আবিষ্কারের নেশাই শিল্পীকে প্রেরণা যোগায়। তখন তা শুধুমাত্র বাস্তব থাকে না, হয়ে ওঠে বাস্তব জগৎ থেকে জাত এক নতুন সৃষ্টি। তখন রচনার স্থান নাম স্ব-স্ব অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে এক ভিন্ন মাত্রা পায়। এটিই লেখকের অভীষ্ট এবং তা'ই মীরকে প্রেরণা যুগিয়েছে।

৩. কোন শ্রেণীর রচনা

'গাজীমিয়ার বস্তানী' কোন শ্রেণীর রচনা তা নিয়ে সমালোচক-গবেষকদের মধ্যে নানা মতভেদ রয়েছে। সমকালেই এই গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন, "গাজী মিয়ার বস্তানী একখানি বিচিত্র সমাজচিত্র সুশোভিত সুলিখিত উপন্যাস।"[২৪৫] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একে 'উপন্যাস' বলে উল্লেখ করেছেন।[২৪৬] কিন্তু মুহাম্মদ আবদুল হাই-এর মতে এটি "উপন্যাসজাতীয় রসরচনা, সুলিখিত উপন্যাস নয়।"[২৪৭] মুনীর চৌধুরীর অভিমত, এটি "স্বজীবনীমূলক রচনা হলেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনা।"[২৪৮] আবদুল লতিফ চৌধুরী একে বলেছেন– –'বহু রেখাসমন্বিত সমাজ-জীবনের সমালোচনামূলক নক্সা'।[২৪৯] মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল একে "বহু শাখা প্রশাখায়িত দীর্ঘ একটি" "শিথিল বদ্ধ উপন্যাস" বলে অভিহিত করেছেন।[২৫০] রশীদ আলফারুকী একে উপন্যাস বলতেই রাজী নন। তাঁর মতে, "গাজী মিয়ার বস্তানী উপন্যাস নয়, একটি রসরচনা"।[২৫১] আবার ক্ষেত্র গুপ্তের বিবেচনায়, 'বস্তানী' অল্পাধিক 'নকশার লক্ষণ' যুক্ত 'ব্যঙ্গোপন্যাস'।[২৫২]

রচনাটির স্বরূপ ও আঙ্গিক বিষয়ে মীরের কী ভাবনা ছিল তা জানা যায় 'বস্তানী'তে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত তাঁর উক্তি থেকে। ষষ্ঠ নথিতে তিনি লিখছেন – "নথিসূত্রে প্রত্যেক নথি পৃথক পৃথক গাথা। আবার সূত্রে সূত্রে সংযোগ। নথি সাজান"।[২৫৩] এরপরেই দ্বাদশ নথিতে তিনি সচেতন ভাবে জানাচ্ছেন যে,

> এক সময়ে এক মুখে তিনটি গল্প করা মানুষের অসাধ্য। একের অন্ত, অপরের আদি। . . . কাজেই এক সময়ের ঘটনা কার্য্য কথা পর পর না বলিলে উপন্যাসের রস থাকে না, শুনিতেও ইচ্ছা করে না।[২৫৪]

তবু লেখককে 'বাধ্য হইয়া মূলকথা ছাড়িয়া অন্য কথা পাড়িতে' হয়েছে।[২৫৫] আবার বিংশ নথিতে এসে তিনি পাঠকদের জানিয়ে দিচ্ছেন– "আমাদের উপন্যাসের যৌবনদশা উত্তীর্ণ হইয়া এই নথিতে মধ্য দশায় ঠেকিয়াছে।"[২৫৬] লেখকের এই সমস্ত ইঙ্গিত থেকেই আমরা বুঝতে পারি, তিনি গ্রন্থটিকে 'উপন্যাস' হিসেবেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে গঠন কাঠামো বিষয়ে মন্তব্য থেকে আরো জানা যায়, তিনি যে উপন্যাস-শিল্প গড়ে তুলতে চেয়েছেন তা 'বাধ্য হইয়াই' ঢিলেঢালা রকমের। লেখক একের পর এক নথি গেঁথে এমন এক শিল্প-কাঠামো নির্মাণ করেছেন যা অভিনব। সৈয়দ আলী আহসান তাই খুব সঙ্গত কারণেই 'বস্তানী'কে loosely strung বা 'দুর্বলভাবে গ্রথিত' বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৫৭]

আবার দ্বাদশ নথিতেই পয়জারন্নেসা ও উকিল আকালের বঁধুর কথোপকথনের মধ্যে মীর 'বস্তানী'কে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সমগোত্রীয় বলে ইঙ্গিত করেছেন। সেখানে বেগম ঠাকরুণ আকালের বঁধুকে একখানি বই পড়তে দিয়ে বলেছেন 'দেখবে কত মজা আছে।' পুস্তকটি নিয়ে উকিলবাবু বলেন— "নামটি তো বড় রগড়ের ---'গাজীমিয়ার বস্তানী', বাবা! কমলাকান্তের দপ্তরের উত্তর নাকি?"

'গাজীমিয়ার বস্তানী' মূলত ভেড়াকান্ত এবং বাংলার তিনজন মুসলিম মহিলা জমিদার – পয়জারন্নেসা, সোনাবিবি এবং মনিবিবির কাহিনী। মশাররফ তিনটি গল্প বলতে যে তিনটি কাহিনীর কথা বলেছেন তাহল, ক. বেগম সাহেবার কাহিনী, খ. মনিবিবি-সোনাবিবির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কাহিনী এবং গ. ভেড়াকান্তের কাহিনী। তবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এতে প্রকৃতপক্ষে মূলকাহিনী দুটি। এর একটি হল– 'কুঞ্জনিকেতনে'র বেগম পয়জারন্নেসার সঙ্গে অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ ও অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কাহিনী আর অন্যটি হল– যমদ্বারের জমিদার সোনাবিবি ও তার বেয়ান মনিবিবির পারস্পরিক বিবাদের কাহিনী। সোনাবিবি এবং মনিবিবির সম্পর্ক বৌদি ননদ। আবার সোনাবিবির পুত্র জয়ঢাকের সঙ্গে মনিবিবির কন্যা ছিড়িয়া খাতুনের বিয়ে হয়েছে। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মায়ের সঙ্গে জয়ঢাকের বিরোধ। মনিবিবি এই বিরোধে জয়ঢাকের পক্ষে। এই জয়ঢাককে কেন্দ্র করেই কাহিনী জট বেঁধেছে। কাহিনীর অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে জয়ঢাকের সম্পত্তি দখল নিয়ে সোনাবিবি আর মনিবিবির সংঘর্ষ। কাহিনী দুটির যোগসূত্র রক্ষা করেছে ভেড়াকান্ত। সম্পর্ক সূত্রে ভেড়াকান্ত এঁদের নন–তবু ঘটনার জালে উভয় কাহিনীর চরিত্রগুলির পারস্পরিক উত্থান পতনের সঙ্গে ভেড়াকান্তের ভাগ্যও জড়িয়ে গেছে। ভেড়াকান্তও তাঁর সক্রিয়তা দ্বারা তাঁদের ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কাহিনী দুটির মধ্যে স্থানগত ঐক্যও রয়েছে। তাঁরা সবাই একই অঞ্চলের – অরাজকপুর ও যমদ্বার-এর – বাসিন্দা। 'বস্তানী'র যাবতীয় ঘটনা এই দুটি গ্রামে সংঘটিত হয়েছে। অরাজকপুরের কুঞ্জনিকেতনে থাকেন পয়জারন্নেসা আর হাকিম ভোলানাথ। সোনাবিবি ও মনিবিবি যমদ্বারের জমিদার। আবার অরাজপুরের বাসিন্দা ভেড়াকান্তের যোগাযোগ সোনাবিবির সঙ্গে। অরাজকপুরেই যাবতীয় মামলা মোকদ্দমার কাজ কারবার।

তবে কাহিনী দুটির পরিণতি দু'দিকে। বেগম পয়জারন্নেসার কার্যকলাপের সঙ্গে সোনাবিবি মণিবিবির দ্বন্দ্বের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই।

উপন্যাস যে শ্রেণীর রচনা 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'কে সেই শ্রেণীভূক্ত করা যায় না। উপন্যাসে থাকে কাহিনীর সুসংবদ্ধতা, দ্রুত বিস্তার, ক্লাইম্যাক্স (Climax) এবং পরিণতি। তা এখানে নেই।[১৫৮] যাঁরা একে উপন্যাস বলতে চান তাঁরা এর বাস্তব ঘটনা এবং সমাজ-মনস্কতার কথা বেশি করে বলেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার উপন্যাসের ঘটনার বাস্তবতার অর্থ যা জগতে ঘটেছে তাই নয়। ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে কাহিনীরূপে রচনা করে উপন্যাস লেখা সম্ভব। কিন্তু তাই উপন্যাসের একমাত্র বাস্তব নয়। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ করেন। সে কাহিনীর সত্যঘটনা হবার দরকার নেই। তাকে হতে হয় সৃজনশীলতার বাস্তবতা।

'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'র কাহিনী সত্যঘটনা অবলম্বনে রচিত। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তার কোনো কাহিনী আছে কি? আসলে ঘটে যাওয়া কতকগুলি ঘটনার চিত্রণ উপন্যাসের বাস্তব কাহিনী নয়। ঘটনাকে প্লটে সাজিয়ে গল্পের রূপ দিতে হয়। তার মধ্যে জীবনের রূপ ফুটিয়ে তুলতে হয়। 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে চরিত্রগুলির উপর লেখকের চোখ আছে, কিন্তু যে সৃজনকারী মন সব ঘটনা আর চরিত্রকে সংবদ্ধ করে কোনো ভাবনার ঐক্যসূত্রে – – তা নেই। এখানে আছে স্থানিক-কালিক ঐক্য কিন্তু ক্রিয়াগত ঐক্য নেই। এজন্য 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'কে উপন্যাস বলা যায় না। বরং তাকে নক্‌শা বলাই শ্রেয়।

মশাররফের পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই রচিত বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু জনপ্রিয় নকশা জাতীয় রচনার আদর্শ তাঁর সামনে ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), নববাবুবিলাস (১৮২৩) ও নববিবি-বিলাস (১৮২৩), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), কালী প্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) প্রভৃতি এইসব নক্‌শাজাতীয় রচনা কোনো না কোনোভাবে হয়তো তাঁর প্রেরণার উৎস হয়ে থাকতে পারে। তাই সামাজিক নক্‌শা হিসেবে 'বস্তানী'কে 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা', এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র সমজাতীয় রচনা বলা যায়। মশাররফ যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' এবং 'কমলা কান্তের দপ্তর'-এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা তাঁর 'বস্তানী'তে দ্বাদশ নথির উক্তি থেকেই বোঝা যায়।[১৫৯] 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই কটু, তিক্ত, অম্ল ও মধুর রস পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কমলাকান্ত চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন, তেমনি মশাররফও নিজেকে 'গাজীমিয়াঁ' এবং 'ভেড়াকান্ত' চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছেন। তবে কমলাকান্তের জীবন-সমালোচনার পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং স্বচ্ছ হাস্যরসিকতা 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে নেই। গাজীমিয়াঁ জীবনের সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরতে চাননি—সমালোচকের দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত করেছেন কেবল তার ত্রুটি আর অপূর্ণতা। তিনি যা পচ্ছন্দ করেন না তাকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন এবং সমাজের গ্লানিময় দিকটির উপর তীব্র কষাঘাত করাই যেন তাঁর একমাত্র কাজ। আবার সমজাতীয় হলেও 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সঙ্গে এর তুলনাও নিষ্ফল। কারণ 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা উপন্যাসের প্রথম প্রচেষ্টা—প্রচেষ্টা হিসেবে তার মূল্য; সে শিথিল বিন্যস্ত হলেও একটি কাহিনী রচনা করতে পেরেছে। আর বাংলায় বঙ্কিমের এবং আরো কারো কারো উপন্যাসগুলি রচিত হয়ে যাবার পর যে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' প্রকাশিত হলো তাতে গল্প তৈরীর কোনো চেষ্টাই নেই—আছে আলাদা আলাদা করে কতকগুলি ঘটনার চিত্র। সেই কারণে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সঙ্গেও তার তুলনা হয়না। প্যারীচাঁদ গল্প তৈরী করতে

পারেননি, চেষ্টা করেছেন— মীর মশাররফ এ লেখায় গল্পই তৈরী করার কথা মনে করেন নি।

মূল ঘটনাধারার পরিণতির সঙ্গে অসম্পৃক্ত বহু অপ্রধান চরিত্রের সমাবেশ এবং 'বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্রের ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা' 'বস্তানী'কে নক্শার লক্ষণাক্রান্ত করে তুলেছে।

অবশ্য কেউ কেউ একে সামাজিক নক্শা জাতীয় রচনা ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র মতো গভীর জীবন-সমালোচনার সমাহার বলে মনে করেন।[২৬০] আবার কারো মতে এটি ব্যঙ্গোপন্যাস। তিনি বলেন—

> সচরাচর ব্যঙ্গোপন্যাসে নক্শার লক্ষণ অল্পাধিক থাকে। এই বইয়েও আছে। গল্প-কথন ও চরিত্র-রচনা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে সমাজ-সমালোচনা কোথাও কিছু কিছু করা হয়েছে। তবে বেশির ভাগ ব্যঙ্গাত্মক সমাজচিত্র কাহিনী সংশ্লিষ্ট। যদিও এর ফলে মূল গল্প কিছু ধীরগতি ও শিথিলবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেটাই এই উপন্যাসের শিল্পরূপ।[২৬১]

'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'কে মশাররফের ঠিক আত্মজীবনী বলা না গেলেও তা আত্মজীবনীমূলক রচনা। গল্পের আবেদনকে ব্যাপকতাদানের উদ্দেশ্যে, কোন কোন চরিত্রের চোখে ধুলো দেবার মতলবে এবং সম্ভবতঃ নিজের নিরাপত্তার জন্যে লেখক এ গ্রন্থের স্থান ও পাত্রপাত্রীদের নানা ছদ্মনাম বা কাল্পনিক নাম ব্যবহার করেছেন। এর একটি তুলনামূলক আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। এই কাল্পনিক নাম ব্যবহার আত্মজীবনীর আদর্শের বিরোধী। কিন্তু মশাররফের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে পরিচয় থাকলে ছদ্মনামের আড়ালে কে কি ভূমিকায় আছেন তা চিনতে অসুবিধা হয় না। মীরের কর্মস্থল দেলদুয়ারের জীবন এবং জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে নিয়েই রচিত 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'। কাজেই এটি আত্মজীবনীমূলক রচনা।[২৬২] এইভাবে বিচার বিবেচনা করেই হয়তো ভূদেব চৌধুরী একে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলেই গণ্য করেছেন।[২৬৩]

আবার 'বস্তানী' আত্মজীবনীমূলক রচনা হলেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনা। এর 'মূল ফ্রেম ব্যঙ্গের'[২৬৪]। 'পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও রুষ্ট মীর-মানসের এক প্রতিশোধাত্মক দপ্তর'।[২৬৫] ব্যঙ্গ ও রম্য রচনার স্বাদ মিশ্রণ করে লেখক সমকালীন সমাজের অনাচার ব্যভিচার বা সরকারী আমলাদের দুর্নীতি বিষয়ে পাঠকদের সচকিত করে 'বস্তানী'কে উপভোগ্য শিল্প-বস্তুতে পরিণত করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'বস্তানী'র মধ্যে উপন্যাস, নক্শা, আত্মজীবনীমূলকতা, রম্যরচনা ও ব্যঙ্গ—এইসব বৈশিষ্ট্যই মিশ্রভাবে আছে—কোনো বিশেষ উপাদানের একক প্রাধান্য নেই।

আসলে যাঁরা 'গাজীমিয়ার বস্তানী'র মধ্যে কোনো একটা সাহিত্য-ধর্ম দেখে একে আত্মজীবনী বা উপন্যাস বলতে চান তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া গেল না। কারণ, সামাজিক নক্শা বলতে যে রকম রচনা বোঝায় তার মধ্যে লেখকের আত্মজীবনী, প্রখর সমাজদৃষ্টি এবং কিছু কিছু উপন্যাস-লক্ষণ থাকেই। কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'কে কি উপন্যাস বলে আলোচনা করার চেষ্টা হয়নি? অথচ তা নিশ্চয় উপন্যাস নয়—নক্শাই। নক্শার মধ্যেই থাকে এইসব প্রায় উপন্যাসের লক্ষণ। কিন্তু লক্ষণ দেখেই সাহিত্যের সব প্রকৃতি বিচার হয় না। উপন্যাস একটা

Organic whole— তা হয়ে ওঠে– তার রচনার পেছনে থাকে যে শিল্প-ধর্ম তাই তার সৃজনশীলতার মূল। এই 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে সেই উপন্যাস ধর্ম নেই।

প্রথম কথা 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে মূল কাহিনী কোনটি? কোন্ কাহিনীর পরম্পরাময় পরিণতি লেখক এখানে দেখালেন? এখানে লেখক তিনটি কাহিনী[২৬৬] নিয়ে কাজ করেছেন। প্রথম কাহিনী বেগম সাহেবার, দ্বিতীয় ভেড়াকান্তের এবং তৃতীয়টি মনিবিবি-সোনাবিবির। আবার এই কাহিনীগুলির মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা 'উপন্যাসোচিত একটি সমস্যা'[২৬৭] যা উপন্যাসের সঙ্গে নক্শার পার্থক্য রচনা করে দেয় তা এখানে নেই। আর লেখক তো এখানে কোন কেন্দ্রীয় সমস্যা বা প্রধান চরিত্রের জীবনবৃত্তের রূপায়ণের কাজ করেন নি। কিংবা কোনো 'জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা মানসদৃষ্টি'[২৬৮] নিয়েও গল্প বলতে বসেননি। বরং যে সব ঘটনা তাঁরই জীবনে একদা ঘটেছিল যাতে তিনিও অন্যায়ভাবে জড়িয়ে পড়ে বিব্রত হয়েছিলেন—যার প্রতি লেখকের একদা তীব্র বিরূপতা ছিল—সেই ঘটনা ও বৃত্তান্তকে কিছুটা কাছ থেকে দেখে (এখনো তাঁর মনের বিরাগ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে এমন মনে হয় না) তাকেই এ গল্পে রূপ দিচ্ছেন। এর উদ্দেশ্য কতটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং সমালোচনা। যে বড়বাড়ির অন্তঃপুরের নানা কিস্সা এর বিষয়—উপন্যাসে যে জীবন-সমালোচনা —এ সে রকম নয়। সুতরাং আমরা একে উপন্যাস বলতে কুণ্ঠিত।

লেখক নিজে অবশ্য কখনো কখনো একে 'উপন্যাস' নামে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু 'উপন্যাস' বলতে অভিনব কাহিনীই লেখকের উদ্দিষ্ট ছিল বলে মনে হয়। লেখক নিজে ষষ্ঠ নথিতে যা বলেছেন (আগে উদ্ধৃত) তা থেকে এর বর্ণনীয় বিষয় এবং গ্রন্থনকৌশল বোঝা যায়। লেখক বলেছিলেন তিনি জগতের তাবৎ বস্তু এর মধ্যে সংহরণ করে এনেছেন। আর বর্ণনা কৌশল বোঝাতে বলেছিলেন এর প্রত্যেকটি ঘটনা পৃথক হলেও তা মালার মতো গাঁথা। এ থেকে বোঝা যায়, মালার মতো গাঁথা প্রত্যেকটি কাহিনী স্বয়ং স্বতন্ত্র। এই গ্রন্থে যে ঘটনা সন্নিবেশ হয়েছে তা বিচিত্র এবং স্বয়ং স্বতন্ত্র কিন্তু কোনো একটি মুখ্য কাহিনীর সূত্রে সংগ্রথিত নয়। সেই দিকে নজর ছিল বলেই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' একে 'বৃহৎচিত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। লেখকও একথা জানতেন বলে দ্বাদশ নথিতে বলেছেন, একসময়ের ঘটনা পর পর না বললে উপন্যাসের রস থাকে না। লেখক বহু চরিত্রের বিরাট শোভাযাত্রা এখানে দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তারা কেউ ব্যক্তি মানুষ নয়। তারা নামে এবং ধর্মে টাইপ। উপন্যাসের বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Ian watt বলেছিলেন মানুষকে এই ব্যক্তিনাম দ্বারা চিহ্নিত করবার দ্বারাই উপন্যাস বাস্তবতার একধাপ আয়ত্ত করেছিল। অন্যপক্ষে লেখক এই গ্রন্থের পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিনাম ঘুচিয়ে তাদের গুণগত নামে পরিচায়িত করেছেন। কেউ ভেড়াকান্ত, কেউ দাগদারি, কেউ বা জয়ঢাক, কারোর নাম পয়জারন্নেসা। এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই উপন্যাস রচনার প্রতিবন্ধক। আসলে গ্রন্থটি তো উপন্যাস নয়, লেখকও চাইছেন সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের কলহের কিছু স্বার্থপর মানুষের অন্তর্কলহের ছবি এঁকে তাদের নৈতিক স্খলনের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও সমালোচনা করতে। এ কি উপন্যাস-লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ? তাই একে উপন্যাস বলা যায় না। এটি নক্শা শ্রেণীরই রচনা।

৪. চরিত্র

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' একটি ঘটনাপ্রধান গ্রন্থ। ঘটনা-বাহুল্যের কারণে এতে অনেক চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই "কাহিনীর আয়তন বৃদ্ধি ও কাহিনীকে বর্ণবহুল করা"[২৬৯] ছাড়া আর কিছু করেনি। এসব চরিত্রের সবগুলির দিকে লেখক মন দেবার সুযোগও পাননি। আজকাল সাহিত্যে চরিত্র রচনার গুরুত্ব বেশি, ঘটনা বর্ণনার চেয়ে চরিত্র রচনার উপরেই লেখকের কৃতিত্ব নির্ভর করে। 'বস্তানী'র নথিগুলি প্রধানত তিনটি নারী চরিত্রকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। এরা হলেন তিন মুসলমান বিধবা জমিদার – পয়জারন্নেসা, মনিবিবি ও সোনা বিবি। এই নারী চরিত্রগুলিই এই গ্রন্থের মুখ্য পাত্রী। প্রধান এই নারী চরিত্রগুলির পাশে কতকগুলি পুরুষ চরিত্র আছে, তারা এই গ্রন্থের মুখ্য পাত্র নন। পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাকিম ভোলানাথ, জমিদার সবলোট চৌধুরী, ঋতুরাজ, ভেড়াকান্ত, দাগাদারী, জয়ঢাক প্রমুখ। আরও আছে পুলিশ, দারোগা, উকিল, মোক্তার, হাকিম, পেশকার প্রভৃতি। এরা নারী চরিত্রগুলির তুলনায় নিষ্প্রভ।

লক্ষণীয় এই যে চরিত্রগুলির কেউই ব্যক্তি নামাঙ্কিত চরিত্র নয়। সকলে হয় গুণনির্দেশিত কিংবা পেশা নির্দেশিত। উপন্যাসের কাহিনীর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ হল তাদের বাস্তবতা, অথচ জয়ঢাক, দাগাদারী, ভেড়াকান্ত, পয়জারন্নেসা এই নামগুলি এই চরিত্রের বাস্তবতাকেই ক্ষুন্ন করে। লেখক ইচ্ছে করলেই প্রকৃত নামের অনুরূপ কোনো স্থাননাম বা ব্যক্তিনাম ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। করেননি কারণ তিনি বাস্তবের অনুরূপতা বা চরিত্রের বিশেষ পরিণাম রচনা করে দেখাতে চান না। তিনি বরং বাস্তবের বিভ্রম সৃষ্টি করতে চান। বাস্তবকে তিনি রূপকাশ্রিত করে দেখাতে চান। (যাতে লোকে বুঝবে অথচ গায়ে আঁচ লাগলেও কিছু বলতে পারবে না) এই কারণে তিনি ব্যক্তি বা স্থাননাম রচনার ক্ষেত্রে এই রূপক ব্যবহার করেছেন।

মশাররফ চরিত্রগুলিকে ভালোমন্দের মাপকাঠিতে বিভাজিত করে দিয়েছেন। নারী বা পুরুষ চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে তিনি মোটের উপর "two dimensional" চরিত্র-রচনার উপরেই নির্ভর করেছেন। এসব চরিত্র "a single idea or quality" [২৭০] নিয়ে গড়ে উঠেছে। তিনি চরিত্রগুলিকে একটি গুণ বা ধর্মবিশেষের দ্বারা নির্দেশ করবার ফলে আমরা তাদের সামগ্রিক মানব-মনের পরিচয় জানতে পারি না। যে শক্তি মানুষের বাইরের আচরণের ভিতর থেকে সত্তার গভীরে অবতরণ করে তার ব্যক্তিত্বের রহস্য উন্মোচন করে মীর মশাররফের যে শক্তি তেমন ছিল না। তিনি অবশ্য চরিত্রগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য দুটি কাজ করেছেন। প্রথমত, তাদের ক্রিয়া এবং আচরণ নিজের মতো করে বর্ণনা করছেন। আর দ্বিতীয়ত, তাদের মুখ দিয়েও কিছু কিছু কথা বলিয়েছেন। কিন্তু মুখ্যত লেখকের চোখ দিয়েই আমরা তাদের চিনি।

পয়জারন্নেসার কাহিনী দিয়েই 'বস্তানী'র কাহিনীর সূচনা। তাকে লেখক 'বেগমসাহেবা' বা ব্রাহ্মভ্রাতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে 'বেগম ঠাকরুণ' নামেও চিহ্নিত করেছেন। পয়জারন্নেসা নামটি ব্যবহার করে লেখক তার মনোভাব বুঝিয়েছেন।

বেগম সাহেবার কাহিনী লেখক একটু একটু করে উন্মোচন করেছেন। তার মধ্যে ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে তার

বিলাস, পুরুষ সঙ্গ, কামনা বাসনার দুটি একটি দিক। তবে বেগম সাহেবার প্রতি লেখকের কোনো আন্তরিক সহানুভূতি ছিলনা। বেগম সাহেবার বালবৈধব্য তাঁর জীবনের বাসনাকে দূর করেনি, তিনি তাঁর রূপ সৌন্দর্য ও কামনার টানে অনেক মানুষকে প্রবল আকর্ষণে টেনেছেন এবং শেষ পর্যন্ত কারো সহানুভূতি বা ভালোবাসা পাননি। এই জীবনের কারুণ্য তাঁর মনকে টানেনি। এই দিকটি অবলম্বন করে লেখক তাঁর অন্তঃসত্তার উন্মোচন ঘটাতে পারতেন। তা তিনি করেননি। বরং নারীর এই আচরণ যে তাঁর অপছন্দের তাই যেন তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। সমালোচকের যে ভূমিকা নক্‌শাকারের থাকে, সেই ভূমিকা থেকে তিনি তাকে দেখিয়েছেন।

বেগম সাহেবা অল্প বয়সেই বিধবা হবার পর আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা ও নাগরিক হাবভাব আয়ত্ত করেছিলেন। মুসলিম মহিলা হলেও তিনি অবরোধ প্রথা মানতেন না এবং পুরুষোচিত পদ্ধতিতে বন্ধু এবং গুণমুগ্ধদের সঙ্গে নৃত্য-গীত মুখরিত আসরে সময় কাটাতে বেশী পছন্দ করতেন। এই সব কারণে তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে কামনা বাসনা এবং নিজস্বার্থ সংরক্ষণের দিকটিও কিছু উগ্র হয়ে উঠেছিল। লেখক তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ—

> আমাদের বেগম সাহেবা বনিয়াদি বেগম নহেন, কোন নবাবের ভগ্নী নহেন, শাহজাদার জননী নহেন, নামমাত্র বেগম। কাজেই বেগম সাহেবের মত হাত দারাজ, মুখ দারাজ, পা দারাজ, নজর দারাজ, গলা দারাজ না দেখাইলে যেন তেন প্রকারেণ জাঁদরেল ভাব না ধরিলে বেগমত্ব বজায় থাকে না। এই হইল মূল বৃত্তান্ত, খাঁটি খবর। বেগম সাহেবার কাণ্ড কারখানা কার্য্যপ্রণালী, ব্যবহার, ব্যয়বিধান সকলেই অতিরিক্ত। বড় মানুষি দেখানই স্বভাব। বনিয়াদী চাল। (তয় নথি)।

এই উদ্ধৃত অংশে চরিত্রের ত্রুটি দুর্বলতা নির্দেশ করে করে সমালোচনা করাই লেখকের লক্ষ্য। এ দৃষ্টি সমাজ সংস্কারকের। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জীবন চেতনায় পার্থিব ভোগবিলাসের মূল্য খুব বেড়ে গিয়েছিল। সেই ভোগপ্রবণ মন আমরা বহু পুরুষ চরিত্রে লক্ষ করেছি। মীর এই রচনায় এরকম এক নারীর চিত্র এঁকেছেন। এতে বুঝতে পারি উচ্চবিত্ত মুসলমান পরিবারে এই ভোগপ্রবণতার ঢেউ এসেছে। জীবনকে নানা অনুশাসনে রুদ্ধ করে রাখা নয় — তার তাৎক্ষণিক মূল্য সম্পূর্ণভাবে আদায় করে নেওয়া—এই দৃষ্টিভঙ্গি একালের। এই কারণে বেগম সাহেবার প্রকৃতি বর্ণনায় লেখক দেখান তিনি ঋতুরাজ বাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে 'গায়ের বডী ও পায়ের বিনামা' ফেলে আসেন। কিংবা এক প্রমোদ সঙ্গীকে সঙ্গ দিয়ে অন্যের সঙ্গিনী হবার আগে তাঁর কথা "একটু অপেক্ষা করুন। বোতাম কটা লাগিয়ে নিই।" (১২শ নথি)। একাধিক পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক কোনো সমাজই কোনদিন ভালো চোখে দেখেনি। মীরও দেখেননি। সমাজ নারীকে সব সময় ভোগ নিরুদ্ধ জীবন যাপনের বিধান দিয়েছে। অবশ্য নবাব বেগমদের ক্ষেত্রে সেই বিধান মেনে চলবার কথাই নয়। সেই নবাব পরিবারের হারেমগুলির রীতি ও আচার বাইরের সমাজ-শাসিত নয়। বিশেষত অর্থ-কৌলিন্যে জমিদার হওয়ার সূত্রে এই ভোগবাদকে বেগমসাহেবার পক্ষে গ্রহণ করাটা কিছু নূতন নয়।

তবু এই বেগম সাহেবা তাঁর যাবতীয় দোষগুণ নিয়ে কাহিনীর নায়িকা চরিত্রের কাছাকাছি। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'বস্তানী'র নায়িকার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সম্ভবতঃ এই বেগমসাহেবাকে কেন্দ্র করেই। তিনি লিখেছেন ঃ

> গাজীমিয়াঁর নায়িকা সুন্দরী—বড়ই সুন্দরী -- কিন্তু মিছরীর ছুরী, মিষ্ট অথচ প্রাণনাশক তাঁহার মন্ত্র —স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ কার্যোদ্ধার। . . . . . সর্ব্বাঙ্গে সভ্যতার আবরণ আছে, অথচ চরিত্র নিতান্তই উলঙ্গ, বীভৎস—চাহিবামাত্র চক্ষু ফিরাইয়া লইতে হয়, কেবল দেশের খাতিরে, ভদ্রতার অনুরোধে, পদগৌরব মাহাত্ম্যে সম্মুখে সেলাম না করিয়া সরিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই।[২৭১]

এই চরিত্রটির পরিণতি বিষাদকরুণ। একদিন যৌবনের গৌরবে যে ভোগজীবন তিনি যাপন করেছিলেন তা অবসিত হয়েছে। প্রায় বিত্তহীন অবস্থায় তাঁর এককালের প্রমোদসঙ্গীরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। যাঁরা তাঁর প্রসাদপ্রার্থী ছিলেন তাঁরা যে কেউ প্রেমিক নন -- কেবল ভোগলিপ্সু -- তা তিনি নিজেও বুঝেছেন। নৌকোর মাঝিদেরও টাকা দেবার শক্তি তাঁর নেই। নিজে গভীর রাতে নৌকো ছেড়ে নেমে যাচ্ছেন এবং যেখানেই সাহায্যের জন্য হাত বাড়াচ্ছেন ব্যর্থ হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত অন্য এক নারীর সাহায্যে তাঁর শেষ দিনগুলি কিভাবে কেটেছে তা আমরা কল্পনা করতে পারি। এইভাবে লেখক চরিত্রটির পরিবর্তন দেখিয়েছেন। কিন্তু এই পরিবর্তন যতখানি বাইরের অবস্থাজনিত সে রকম অন্তরের প্রকৃতিগত নয়। এর ফলে চরিত্রটির সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারেনি।

বিধবা সোনাবিবির চরিত্ররচনায়ও লেখক দোষগুণের দুই কোটির মধ্যে ঘুরেছেন। সোনাবিবির স্বামী যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি অন্তঃপুরচারিনী ছিলেন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালক পুত্রের সম্পত্তি দেখাশোনা করবার জন্য তাঁকে বাইরে আসতে হয়। ফলে নানা মানুষের সংসর্গে তাঁর চরিত্রে কিছু নতুন ছায়া পড়ে। কারো কারো সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতাও ঘটে। এইসব লেখক দেখিয়েছেন।

সোনাবিবি চেয়েছিলেন তাঁর মাসতুতো বোন মনিবিবির মেয়ে ছিঁড়িয়া খাতুনকে পুত্রবধূ করে এনে তাঁর সমূহ সম্পত্তি আত্মসাৎ করবেন। এইভাবে মনিবিবিকে নিজের অনুকূলে এনে তার দীর্ঘদিনের ঈর্ষা চরিতার্থ করবেন। অথচ মনিবিবি জামাতাকে হস্তগত করে সোনাবিবির উপর টেক্কা দিলেন। এমন কি তাঁরই পুত্র নিজের মাকে দাগাদারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাবশত সন্দেহ করে—তার নৈতিকতাকে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়। বাড়ি থেকে চলে যাবার সময় তাঁর নিজেরই পুত্র তাঁর দেহ তল্লাসি করে দেখে নেয় তিনি কিছু লুকিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন কিনা।

যে দাগাদারীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল সেই দাগাদারী আসলে সোনাবিবির কাছে কিছু টাকাকড়ির প্রত্যাশী ছিলেন। সোনাবিবির কাছে তিনি মাসিক একশত টাকা ভাতার বন্দোবস্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দাগদাগীর এই কাজে সোনাবিবি অসন্তুষ্ট হন। পুত্রের আচরণ, দাগাদাগীর ব্যবহার—এসব দেখে কষ্ট পেয়ে তিনি মক্কাযাত্রা করেন।

গাজীমিয়াঁ সোনাবিবির ভেতরে প্রত্যক্ষ করেছেন 'বিঘোর দুনিয়ার মার পেঁচ চক্র'তে হতবুদ্ধি এক 'অবোধ সরল মূর্খ' মুসলমান রমনীকে। সোনাবিবির চরিত্রাঙ্কনে গাজীমিয়াঁর আক্রোশ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অপেক্ষাকৃত কম, বরং কিছু সহানুভূতির রেশ অনুভূত হয়।

মনিবিবিকেও লেখক নীতিদুষ্ট চরিত্র হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি স্বামীর প্রতি বিরূপ ছিলেন। স্বামীর জীবিত কালেই তাঁর চরিত্রে অন্যাসক্তি দেখা গিয়েছিল। লেখক তাঁর এই ভোগকলঙ্কিত জীবনের কথাটি তুলে ধরেছেন।

মনিবিবির সঙ্গে সোনাবিবির ঈর্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ লেখার প্রথম থেকেই ফুটে উঠেছে। তারা দুই বোন তদুপরি একে অন্যের ননদ ও ভ্রাতৃবধূ, আবার পরস্পরের বেয়ান। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ট হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ততই তীব্র হয়েছে। সোনাবিবি তাঁর সম্পত্তি হস্তগত করতে তাঁর কন্যাকে পুত্রবধূ করেছিলেন অথচ মনিবিবিই তাঁর উপর টেক্কা দিয়ে তাঁরই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছেন।

তাঁর প্রতি লেখকের করুণার অভাব ছিল বলেই মনে হয়। তিনি মনিবিবির করুণ পরিণতির চিত্র এঁকেছেন। মনিবিবি গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। লেখক তাঁরই মুখে মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর পাপ স্বীকার করিয়েছেন। তিনি বিকারগ্রস্তভাবে লক্ষ করেন 'নরকের ছায়া চক্ষের উপর পড়িতেছে।' তিনি বলেন ঃ

> দেখ! তুমি মাপ করো। তোমাকে ঠকায়ে তোমাকে ভুলায়ে তোমার চক্ষে ধুলা দিয়ে, কত পাপ করেছি, পাপ সাগরে ডুবেছি। . . . . . ঐ অগ্নিময় সাপ। ও! উহু অগ্নিময় অজাগর—হাঁ হাঁ রবে জিহ্বা বার করে আসিতেছে।[২৭২]

নারীচরিত্রগুলিকে লেখক প্রধানত দুটি গুণ-বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম কথা তাঁরা সকলেই নীতি-স্খলিত আর দ্বিতীয়ত তাঁরা প্রত্যেকেই সম্পত্তি এবং বিত্ত রক্ষায় বা অর্জনে তৎপর। গাজীমিয়াঁ এই তিন নারীর চরিত্রকে এই দুই বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছেন। প্রত্যেকটি নারীর নীতি-স্খলিত জীবনের বর্ণনা ভিন্ন, কিন্তু তাদের প্রতি লেখকের মনোভাব একই রকম। আর এই মনোভাব সহানুভূতিপূর্ণ নয়। উনিশ শতকের কোনো ধর্মনিষ্ঠ লেখকের পক্ষে অবশ্য নারীর স্বাধীন জীবনাকাঙ্ক্ষা স্বীকার করা দুষ্কর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলি তার দৃষ্টান্ত। মীর মশাররফ এই তিন নারী-জীবনের অন্তর্বেদনাকে দেখেননি। তিনি সেই সহানুভূতি নিয়ে নারীকে অঙ্কিত করেননি। বরং ধর্ম ও সমাজ অনুশাসনকে ক্ষুণ্ণ করবার পাপে তাদের পাপীয়সী করে এঁকেছেন।

এঁদের মধ্যে আগেই বলেছি, কেবল সোনাবিবির প্রতি তাঁর কিছু সহানুভূতি ছিল। এর কারণ আমরা জানি না। এমন সম্ভব যে সোনাবিবির পুত্রের আচরণে ব্যথিত হয়েছিলেন বলে লেখক তাঁর প্রতি কিঞ্চিত সহানুভূতি দেখিয়েছেন। মনিবিবি বা বেগম সাহেবা হয়তো ভাবতেন অন্য কথা। কিন্তু আমাদের মনে হয় নীতির অনুশাসনের প্রভাবের ফলে কোন নারী চরিত্রকেই তিনি সহানুভূতি দিয়ে দেখেন নি। শিল্পীর সহানুভূতি সমুদ্রের মতো। পাপের প্রতিও তাঁর সহানুভূতির অভাব হয়না। কিন্তু মীর এই গ্রন্থে সমাজ-শাসক — সমাজ-প্রকাশক নন। এই কারণে দেখি নারীদের করুণ পরিণতির চিত্র এঁকে তিনি ভবিষ্যতের মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন। বেগম সাহেবা সর্বস্বান্ত এবং পরিত্যক্ত। তিনি অন্যের কৃপাপ্রার্থী। মনিবিবির পরিণতিই সবচেয়ে করুণ। তিনি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত এবং মৃত্যুকালের প্রলাপে নিজেকে তিনি পাপী বলে স্বীকার করেছেন। এই পাপের মূল — মীরের মতে, তাঁর নীতিস্খলিত জীবনের অন্যায় আচরণ। এঁদের মধ্যে কেবল সোনাবিবিকেই তিনি মক্কা প্রেরণ করেছেন। অন্যদের নয়। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন চিত্রে তিন নারীর ভোগবাসনার অন্যায়কে তিনি শাসিত করেছেন। এখানে শিল্পী অপেক্ষা মশাররফের সংস্কারক সত্তা অধিক প্রকট।

নারীদের নীতিদুষ্টতার প্রতি বিদ্রূপপরায়ণ হলেও পুরুষচরিত্রগুলির প্রতি কিন্তু লেখকের মনোভাব এমন কটূ

নয়। সবলোট চৌধুরীর নূতন নূতন নারীসঙ্গ না হলে চলে না, দাগাদারী সোনাবিবির ঘনিষ্ঠ, ভেড়াকান্ত সোনাবিবির বক্ষের ব্যথা স্পর্শ করে বোঝেন, এমনকি তাঁর যৌবনের পদস্খলনও পর্যন্ত লেখক ক্ষমার চোখে দেখেছেন। নারীদের মতো পুরুষ চরিত্রগুলিও এই ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দোষে দুষ্ট। অরাজকপুরের হাকিম সাহেব বেগম সাহেবার কটাক্ষের জন্য অধীর, ঋতুরাজবাবু বেগম সাহেবার দেহলোভী। হাকিম সাহেব এক নারীর অনুরোধে বিচার যেমন খুশী করতে পারেন। সবলোট চৌধুরী ভোগী ও লম্পট, লালআলু অর্থলোভী এবং ইন্দ্রিয়-লিপ্সু। অথচ এই সব চরিত্রের কোন দুঃখময় পরিণতি লেখক দেখাননি। এইসব চরিত্রগুলি সম্বন্ধে লেখক নারী চরিত্রের মতো কোনো বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেন নি। নারী ও পুরুষ চরিত্র চিত্রায়নে তাঁর দ্বিমুখী মানসিকতা, পুরুষদের তুলনায় নারীর প্রতি অনুদারতা--তদানীন্তন সমাজের মানসিকতাই প্রকাশ করে।

পুরুষ চরিত্রগুলিরও বৈচিত্র্য নেই। তারাও প্রধানত দুটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্দেশিত। প্রথমত তারা এই নারী চরিত্রগুলির বিবাদের পটভূমিকায় লালিত এবং তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা এই পারিবারিক বিরোধের সুযোগে নিজেদের কার্য সিদ্ধি করে। এরা কেউ নারীর আসঙ্গ কেউবা বস্তুগত লাভের মুখোপেক্ষী। লেখক তাদের নামও দিয়েছেন ঘরভাঙ্গা সান্যাল, মাথাপাগলা রায়, ভেড়াকান্ত কিংবা লালআলু। মনে হয় এই সব চরিত্রগুলির লোকপ্রচলিত এই নামকরণই লেখক ব্যবহার করেছেন। সুতরাং পুরুষ চরিত্রগুলি কাহিনীর স্রষ্টা নয়— কাহিনীর সৃষ্টি। তারা কোনো ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। বরং ঘটনার সুযোগের ব্যবহার করেছে। তারাও নীতিদুষ্ট এবং স্বার্থপরায়ণ। কিন্তু নারীদের নৈতিকতা বিষয়ে যতটা বিদ্রূপপরায়ণ তাদের সম্বন্ধে ততটা নন।

'বস্তানী'র একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র ভেড়াকান্ত। লেখক তাঁর একটি সৎ ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি রচনা করেছেন। গাজীমিয়াঁ যে মানুষগুলিকে দেখিয়েছেন তারা নারী পুরুষ নির্বিশেষে ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং অর্থ ও সম্পত্তি লোভে দুষ্ট। অথচ গাজীমিয়াঁ ভেড়াকান্তকে ব্যতিক্রমী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। ভেড়াকান্ত ইন্দ্রিয়দোষে একদা দোষী হলেও বর্তমানে পত্নীনিষ্ঠ এবং সন্তান-বৎসল। বর্তমানে সে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করছে। এই ভেড়াকান্তের চরিত্রে লেখক নানাগুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যে ভেড়াকান্ত সংসারে অমনোযোগী সেই আবার যথেষ্ট বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন। ঘুষ দিয়ে সে পুলিশকে বশীভূত করে। ষড়যন্ত্রে ও কূটকৌশলে সে পাকা। লালআলু মনিবিবির বিরুদ্ধে মামলা করলে ভেড়াকান্ত সোনাবিবির সুবিধে হবে ভেবে তাকে মামলা প্রত্যাহার না করতে পরামর্শ দেয়। এই ভেড়াকান্ত অন্যায়ের প্রতিকার করতে চায়। বিবাদ বিরোধ মীমাংসায় আগ্রহী। সেইজন্য মনিবিবি ও সোনাবিবির বিবাদে সে জড়িয়ে পড়েছে। তাকে জ্বালাতননেসার অনুরোধে বেগম সাহেবা জেলে পুরেছেন। তার জন্য আদালতে উপস্থিত মানুষেরা চোখের জল ফেলেছে।

ভেড়াকান্তের চরিত্রে পরস্পর-বিরোধী গুণের সমাবেশ হয়েছে। তার চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে কেউ কেউ পক্ষপাত, পরস্পর বিরোধিতা ও অতিরঞ্জন লক্ষ করেছেন।[২৭৩] অবশ্য সকলে এই অভিযোগ মানেন নি। শান্তনু কায়সার লিখেছেন,

> বস্তানী রচনার সময় মীর যে ব্যক্তিগত পক্ষপাত দ্বারা চালিত হননি তা নয় কিন্তু শিল্পীর তৃতীয় নয়ন তাকে পরিশ্রুত করে এক নৈর্ব্যক্তিক চারিত্র অর্জনে সহায়তা করেছে। সেজন্য তাঁর নিজের

কিংবা পক্ষভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছে নগ্ন এ নিষ্ঠুর সত্য, অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তিগত অপছন্দের চরিত্রও অর্জন করেছে মানবিক স্পর্শ ও বিবেচনা।[২৭৪]

শান্তনু কায়সারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হওয়া গেল না। আমরা বরং মুনীর চৌধুরীর কথা মানতে পারি। শান্তনু কায়সার একই সঙ্গে পরস্পর বিরোধী দুটি সিদ্ধান্তকেই পাশাপাশি রেখে দিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন লেখক এই গ্রন্থে ব্যক্তিগত পক্ষপাত দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, আবার বলেছেন তাঁর শিল্পীসত্তা তাকে পরিশ্রুত করে নৈর্ব্যক্তিকতা দান করেছে। যে মানুষ পক্ষপাত দ্বারা পরিচালিত তারই শিল্পীমনকে তিনি নিরপেক্ষ মহিমা দিতে চান। এমনটা অসম্ভব না হতে পারে, কিন্তু মীরের ক্ষেত্রে যে তা হয়নি তার প্রমাণ আছে। প্রথম প্রমাণ নারীচরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্রের প্রতি পক্ষপাত। দ্বিতীয় প্রমাণ একমাত্র ভেড়াকান্তের চরিত্রের দুর্বলতাকে কম গুরুত্ব দিয়ে তার মহত্ত্বের উপর জোর দেওয়া। ভেড়াকান্তের প্রতি সহানুভূতি ছিল বলে সোনাবিবির প্রতি কিঞ্চিৎ কারুণ্য প্রদর্শন। শান্তনু কায়সার যাকে বলেছেন শিল্পীর নিরপেক্ষতা তা প্রধানত সেইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে চরিত্রগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করে। থ্যাকারে বলেছিলেন তিনি কোন চরিত্রকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করেন না, "I don't control my character." তিনি তাদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে ক্রিয়া করতে দিয়েছিলেন "I am in their hands and they take me where they please,"[২৭৫] ; চরিত্র যেখানে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয় সেখানে শিল্পীর নিরপেক্ষতা থাকে অবিসংবাদিত। তারা ঘটনার ক্রিয়া এবং পরিপার্শ্বের দ্বারাই মাত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যপক্ষে নক্‌শাশ্রেণীর সমাজ সংশোধনমূলক রচনায় চরিত্রের সে স্বাধীনতা থাকে না। তারা লেখকের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং চালিত। সুতরাং ব্যক্তিমীরের পক্ষপাত শিল্পী গাজীমিয়াঁর নিরপেক্ষতায় পরিণত হয়েছে—একথা স্বীকার করা কঠিন।

ভেড়াকান্তের চরিত্রে লেখক নানা বিপরীত ধর্মের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যে মানুষ সংসারে নির্লিপ্ত সেই আবার ষড়যন্ত্র পটু। যে ভেড়াকান্ত একদা নিজেই অন্য নারী আসক্ত সেই অন্যের সমলোচক। সুতরাং মুনীর চৌধুরীর মন্তব্য গ্রহনযোগ্য।

৫. মূল্যায়ন

'গাজীমিয়াঁর বস্তানী' মীর মশাররফের একটি বিশিষ্ট রচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে অভিজাত জমিদারদের অন্তঃপুরের অমিতাচার, সাধারণ মানুষের উপর হাকিমদের বিচারের নামে প্রহসন, বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগের বিভিন্ন কর্মচারী বিশেষত পুলিশ-দারোগা, জেল-কর্মচারী, জেল-ডাক্তারদের উৎকোচ গ্রহণ, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব সংশয় সততার অভাব— 'বস্তানী'র জগৎকে স্বার্থসঙ্কুল দ্বন্দ্বময় ও ক্লেদাক্ত করে তুলেছে। সর্বত্র যেন এক হতাশা ও নৈরাশ্যের কালো ছায়া। বাংলাদেশের একটি কালের হতাশাগ্রস্ত, বেদনার্ত ও ক্লিন্ন জীবনের চিত্র বাণীরূপ লাভ করেছে 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে। গাজী মিয়াঁ এই জীবনের দর্শক এবং জীবনের সমলোচক। তৃতীয় নথিতে তিনি বলেছেন "কথার দোকানদারী করিয়া জীবন কর্ত্তন করাই গাজীমিয়াঁর জীবনের উদ্দেশ্য।"[২৭৬] শুধু জীবন-কর্ত্তন নয়, জীবনের নানা ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচনা তাঁর আর একটি লক্ষ্য। এই জন্য নগ্ন সত্যের প্রকাশে তিনি নির্মম। গাজী মিয়াঁ মানুষকে স্বার্থ সিদ্ধি পরায়ণ, ইন্দ্রিয় লিপ্সু এবং ভোগী মানুষ

হিসেবে দেখেছেন। এখানে তাঁর নির্মম জীবন বর্ণনার দৃষ্টি কারো প্রতি কোমলতা দেখায়নি। তিনি সুস্থ জীবন চান, তাই বিকারের প্রতি তাঁর ক্রোধ। তাঁর এই ক্রোধ আমাদের শেকড়ে এসে টান দেয়।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'প্রদীপ' পত্রিকায় যে সমালোচনা লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন, "গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী" তাই "শ্রুতিকটূদোষ" পরিহার করতে পারেননি। তাছাড়া তিনি গ্রন্থকারের চরিত্র রচনা পটুত্ব এবং কাহিনীবিন্যাস কৌশলেরও প্রশংসা করেছিলেন।[২৭৭] এই সমালোচনা প্রবন্ধে যে যে বিষয়ের গুণ নির্দেশ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে দুটি বিষয় নিয়ে পরে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। লেখক যে কাহিনী বিন্যাসে কৌশলী নন[২৭৮] কিংবা রক্ত মাংসের মানুষ যে তাঁর গ্রন্থে অঙ্কিত হয়নি সে নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন।[২৭৯] লেখক এই বইতে কাহিনী যেভাবে সাজিয়েছেন তা অত্যন্ত অবিন্যস্ত এবং অসংলগ্ন। যে কোনো লেখকের প্রথম কাজ কাহিনী বিন্যাসে পরিপাটি। কিন্তু লেখক যেন কোন কেন্দ্রীয় কাহিনী গড়তে চাননি। কেবল অবিন্যস্তভাবে কিছু ঘটনা কয়েকটি পরিচ্ছেদে সাজিয়েছেন। আর এই কাজে তিনি পরিমিতি বোধের দ্বারা পরিচালিত হননি। লেখকের আত্মকথন প্রবণতা, বৈচিত্র্যহীন বর্ণনার দীর্ঘতা বরং বিরক্তিকর বলেই মনে হয়। শিল্পের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি।

গাজীমিয়া 'বস্তানী'তে যে জীবনচিত্র দেখাচ্ছেন তা বর্ণনার সময় সর্বদা রুচির মুখ রক্ষা করতে পারেননি। মনে করি এটি নক্‌শা সাহিত্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কারণ নক্‌শায় মানুষের মহত্ত্ব নয়, তার চরিত্রের স্থূলতাই দেখানো হয়। মানুষের এই রূপরচনা করতে গাজীমিয়াঁ যে সব বর্ণনা বা আলোচনা উপস্থিত করেছেন তা আধুনিক সাহিত্য-পাঠকের রুচিকে পীড়িত করে। আগে চরিত্র আলোচনায় আমরা গাজীমিয়াঁর চরিত্রাঙ্কনে ইন্দ্রিয়পরতা দোষের বাহুল্যের কথা উল্লেখ করেছি। যাঁরা এই রুচির বিকারের কথা বলেন তাঁরা এই ইন্দ্রিয়পরতা দোষের দিকেই গুরুত্ব দেন। ছিঁড়িয়া খাতুন যে ভাষায় শৈশবের কৌতূহল ও বয়ঃসন্ধির বর্ণনা দেয় (যেমন – "দুই তিনজন সমবয়সী ছুঁড়িদের কাছে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা কল্লেম, ওলো। তোর দুধ হয় নাই কেন? বড়দের কাছে, তোর এত বড় কেমন করে হলো?" (১৩শ নথি),[২৮০] আবার পরক্ষণেই অন্যত্র ঃ "মনের মধ্যে দিনরাত আগুন বর্ষাচ্ছে, আগুন বয়ে যাচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জ্বালাচ্ছে, পোড়াচ্ছে, দগ্ধাচ্ছে।" (১৩শ নথি),[২৮১] কিংবা বেগম সাহেবা দাগাদারীকে সোনাবিবি – ভেড়াকান্তের সম্বন্ধে যা বলে— (যেমন "স্ত্রীলোকে অপর পুরুষের হাত আপন হাতে টেনে এনে বেদনা দেখাতে কোরতার মধ্যে হাত লয়ে গিয়ে দেখায়। ..... আচ্ছা মানলাম, কোন স্থানে ফুললে হাতে টের পাওয়া যায়। সে ফুলো দেখতে কতক্ষণ সময় লাগে? আধ আণ্টার মধ্যে কি আর স্থান খুঁজে পাওয়া গেল না।[২৮২]) সেসব রুচির মুখ রক্ষা করেনা। তাই মুনীর চৌধুরী তাঁর লেখায় 'গ্রাম্য স্থূলতা' ও 'নোংরামি' দেখতে পান।[২৮৩] এছাড়াও বর্ণনাগত অসংগতি লক্ষ করা যায়। কখনো চরিত্রের প্রকৃতি পরিচয়ে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য দেখা যায়। যেমন – সোনাবিবির বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক একবার মুসলমান রমনীদের মধ্যে এর সুযোগের অভাবের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছেন।[২৮৪] আবার অন্যত্র সোনাবিবি খুব মন দিয়ে Culture আয়ত্ত করেছেন বলে তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন।[২৮৫] কোথাও কোথাও নামকরণে ছোটখাট অসঙ্গতিও ঘটেছে।[২৮৬]

এ প্রসঙ্গে অবশ্য দু একটি কথা বলবার আছে। চরিত্রের নামকরণে যে ত্রুটি তা সহজেই পরিহার করা

যেত। মনে হয় লেখক একই চরিত্রকে একাধিক নামে কাহিনীর মধ্যে এনেছেন। সে ত্রুটি খুব বড় কিছু নয়। কাহিনীর রসগ্রহণে তা বাধা সৃষ্টি করে না। রুচিবিকার সম্বন্ধে মুনীর চৌধুরী অত্যন্ত কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে গ্রাম্য স্থূলতার পাশে 'নোংরামি' ও ক্লেদ দেখেছেন। এই বিষয়ে প্রথমেই নোংরামি সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যায়। নোংরামি সাহিত্য নয়। কোনো রচনায় যদি ইচ্ছাপূর্বক নোংরামি দেখানো হয় তাকে আর যাই হোক নিরপেক্ষ মানুষের সাহিত্যরচনা বলা যায় না। মীর মশাররফকে এবং তাঁর 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'কে আমরা ইচ্ছাকৃত নোংরামির অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চাই না। কিন্তু স্থূলরুচি ও গ্রাম্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় মীর সত্য সত্যই গ্রাম্যরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। সেকালের বহু লেখকই এই দোষে দোষী। কিন্তু এ শুধু তাঁর দোষ নয়। আমরা আগে বলেছি 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'র একটি নক্‌শাধর্মিতা আছে, আর নকশায় এই স্থূলতাকে যথার্থতার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। কারণ নক্‌শার ঘটনা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ স্থূল ঘটনা—তার পাত্রপাত্রী সাধারণ গ্রাম্যরুচির মানুষ। আর লেখকের দায়িত্ব এই মানুষের রুচিসমেত তাদের কাহিনীতে উপস্থিত করা। সেই কারণে ছিঁড়িয়া খাতুনের বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় এমন গ্রাম্যতা, লালআলুর দরখাস্ত সম্বন্ধে ঋতুরাজ ও বক্কেশ্বরের কথোপকথনে এমন অশালীনতা। লেখক এই বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর নিজের রুচির বিকার দেখাননি, পাত্রপাত্রীর বাস্তব চিত্রণ করেছেন–তাঁদের মানসিক অবস্থার পরিচয় সমেত চরিত্রটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন। এইজন্যই তাঁর লেখায় বেগম সাহেবা নিজে স্ত্রীলোক হয়েও দাগাদারীর সঙ্গে সোনাবিবির সম্বন্ধে এমন আলোচনা করতে পারেন। এই বর্ণনা সেকালের গ্রামীণ মানুষের রুচি এবং মনস্তত্ত্ব সমেত মানুষটিকে আমাদের সামনে এনে দেয়। এই কারণে মীর মশাররফের চরিত্র-রচনায় কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয়। স্থূলতা তাঁর বর্ণনীয় নয়, উপাদান মাত্র।

তবে এই সম্বন্ধে আমাদের একটি অন্য অভিযোগ আছে। মীর মশাররফ অবশ্য এই বর্ণনা দ্বারা মানুষগুলির মনোচিত্র আমাদের দেখিয়েছেন। তাঁর সেই ছবিতে দেখি মানুষগুলি বিকৃতকামা। সে বিকৃতি ছিঁড়িয়া খাতুনের তুলনায় বেগম সাহেবা কিংবা ঋতুরাজেরই বেশি (অবশ্য লেখককে সেই বিকৃতি স্পর্শ করেছিল কিনা বলা যায় না)। কিন্তু যে কথা বলতে চাই তাহল এই যে—যেভাবে গ্রামীণ বালিকা ছিঁড়িয়া খাতুন মনের কথা বোঝায় সেই একই ভাবে শহরের শিক্ষিত হাকিম ঋতুরাজ কী করে কথা বলে? ঋতুরাজের কথায় যে শালীনতা এবং মর্যাদার প্রকাশের প্রয়োজন ছিল তার পরিচয় কিন্তু পাওয়া গেল না। বেগম সাহেবা বহু পুরুষ বিলাসী। তার কথায় এরকম শব্দ উঠে আসতেও পারে। কিন্তু ঋতুরাজ কিভাবে বক্কেশ্বরের সঙ্গে এ রকম কথা আলোচনা করে? এই দিক থেকে তাই বলা যায় চরিত্রের যথাযথতা বা চরিত্র অনুযায়ী বর্ণনা লেখক করতে পারেননি। তাঁর চরিত্রেরা প্রায় একই রকম গ্রাম্যতা দেখায়, একই বিষয়ে আলোচনা করে, একই মনোভাবের দ্যোতনা করে। সেই কারণে চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য তাঁর রচনায় নেই। এটি সাহিত্যে লেখকের চরিত্র-সৃজনের ত্রুটি।

'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে সমাজের চিত্রধর্মী পরিচয় আছে। লেখক সমাজের অবস্থা দেখানোর প্রয়োজনে দু তিনটি পরিবার এবং কিছু চরিত্র বেছে নিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য সমাজের প্রতিচিত্র রচনা। সেই কারণে দেখি হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্র বাস্তবানুমোদিতভাবে তিনি এখানে দেখিয়েছেন। বড়বাবু এক জায়গায় বলেছেন ঃ

> ভায়া। নেড়ে জাত আমার চক্ষের শূল। আমার ক্ষমতা থাকলে বাঙ্গলা দেশ থেকে সব মুসলমানগুলোকে তাড়িয়ে দিতাম।[২৮৭]

এই উক্তি তৎকালীন গ্রামীণ হিন্দু মুসলমান সমাজের সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। তিনি দেখিয়েছেন সেকালে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক থাকলেও তার ভিতরে অবিশ্বাসও ছিল। অবশ্য এই অবিশ্বাস কতটা ব্যক্তিগত কতটা সাম্প্রদায়িক তা বলা যায় না। অনেক হিন্দু ভদ্রলোক সম্বন্ধে লেখকের স্ত্রীর জবানীতে যে কথা পাই—

> এ সকল গ্লাসের বন্ধু। এ সকল মালাধারী, পৈতেধারী, বন্ধুবান্ধব আমার চিনতে বাকী নাই। খেয়ে মুখটি পুচে, গেট পার হয়েই বলে যে, বেটাকে খুব ফাঁকি দিয়েছি।[২৮৮]

—এই উক্তিকে ঠিক সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাসের নিদর্শন বলা যায় না। বরং এক গ্লাসের বন্ধুরা ব্যক্তিকে ফাঁকি দেবার ব্যাপারে যে চতুরতা দেখিয়েছে তাকে সাম্প্রদায়িক না বলাই উচিত। তবে মীর মশাররফ এ লেখায় সত্যিই যে হিন্দুদের সম্বন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার প্রমাণ বেশ কিছু উক্তিতে আছে। যেমন পরিশিষ্টে 'বর্তমান মুসলমান সমাজের একখানি চিত্র' শীর্ষক পদ্যে হিন্দু কর্মচারীদের সম্বন্ধে লিখেছেন—'চিরকাল হিন্দুগণ/করিতেছে নির্যাতন' কিংবা 'প্রতি মুসলমান ঘরে/চাকুরীর সাজ পরে/সর্বনাশ করিল সবার'।[২৮৯] এসব উক্তি যতোটা সাম্প্রদায়িক তার চেয়ে বেশী হিন্দু কর্মচারীদের প্রতি ক্ষোভ।

অন্যান্য লেখার মতো এখানেও মশাররফ ইংরেজ-রাজের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি, প্রদর্শন করেছেন। ভারতেশ্বরীর প্রতি আস্থাও অবিচল। 'এ ব্রিটিশ রাজ্য, এখানে অবিচার হতে পারে না।'[২৯০] ইত্যাদি উক্তিতে সেই আস্থার প্রমাণ আছে।

দেখা যায়, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' দোষেগুণে এককালের মানুষেরই জীবনচিত্র। তবে এই জীবনচিত্র রূপায়ণে লেখকের শৈল্পিক ত্রুটি পাঠকের মনকে বিড়ম্বিত করে। কাহিনীর বাঁধুনি খুবই ঢিলেঢালা। ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে কাহিনীর উত্তরণ অত্যন্ত অবিন্যস্ত। এই অসংলগ্নতার জন্যই কাহিনীতে সংহতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক অপ্রাসঙ্গিক চরিত্রও বর্জন করা যেত। লেখকের অতিকথন প্রবণতা ও পরিমিতিবোধের অভাব একে শিল্পের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তবু মুহম্মদ আব্দুল হাইয়ের কথায় বলা যায়, "জীবন-সমালোচনাই যদি সাহিত্যের নামান্তর হয় তবে সেদিক থেকে 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী' সার্থক সৃষ্টি।"[২৯১] সমাজ সম্বন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি সামাজিক মানুষের দোষত্রুটি চিত্রিত করেছেন। তাঁর লক্ষ্য মানুষের উন্নত চিত্তবৃত্তির স্ফূরণ। সেই দৃষ্টি একজন সামাজিক নক্‌শাকারের। সেই হিসেবে 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী' ভাল রচনা।

মীর মশাররফ হোসেন এ ছাড়া আরও কয়েকখানি উপন্যাস বা আখ্যান জাতীয় গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। কিন্তু সেগুলির কোনটি হয় সম্পূর্ণ হয়নি—নয়তো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এ শ্রেণীর মধ্যে কোনটি পত্রপত্রিকায় আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল—কোনোটি বা পাণ্ডুলিপি আকারে রয়ে গিয়েছিল। এ রকম কয়েকটি রচনা হল ঃ 'রাজিয়াখাতুন', 'তহমিনা', 'নিয়তি কি অবনতি' এবং 'হজরত ইউসোফ' বা 'প্রেমপারিজাত'।

রাজিয়া খাতুন

'রাজিয়া খাতুন' উপন্যাসটি টাঙ্গাইল থেকে মীর মশাররফ হোসেনের সম্পাদিত 'হিতকরী' পত্রিকায় (১৬অক্টেবর ১৮৯১/৩০ আশ্বিন ১২৯৮ ঃ ২ ভাগ ১৮ সংখ্যা থেকে) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটি সম্পূর্ণ হয়েছিল কিনা বা সম্পূর্ণ হলেও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি।

তহমিনা

'তহমিনা' নামে একটি উপন্যাস শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত 'হাফেজ' পত্রিকার প্রথম থেকে চারটি সংখ্যায় (জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ-এপ্রিল ও মে-জুন) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[২৯২] কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি। এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের কোন সংবাদ জানা যায় না।

মীর মশাররফ কেবল তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' বা 'গাজীমিয়ার বস্তানী' ছাড়া উপন্যাস রচনায় সমকালের জীবনকে খুব বেশী আশ্রয় করেননি। যখনই তিনি উপন্যাস জাতীয় কোন রচনায় হাত দিয়েছেন তখনই দুর অতীত জগতে পাড়ি জমিয়েছেন। 'বিষাদসিন্ধু'র মতো সার্থক ও জনপ্রিয় রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর আশ্রয় হয়েছে সুদূর আরব জগতের ইতিকথা। সেই ধারাপথ বেয়েই এই 'তহমিনা' রচনার ক্ষেত্রেও লেখক বিচরণ করেছেন অতীতকালের পারস্য পুরাণ-ইতিহাসের জগতে। অতীতচারিতা ও কাল্পনিকতা যা রোমান্সের লক্ষণ তাই এই উপন্যাস রচনায় মীরের মানস জগৎকে বেষ্টন করে আছে।

পারসী কবি ফেরদৌসীর বিখ্যাত মহাকাব্য 'শাহনামা'র অন্তর্গত সোহরাব-রোস্তমের কাহিনী থেকে 'তহমিনা' উপন্যাসের উপাদান গৃহীত। লেখক নিজেই কাহিনী উৎস সম্পর্কে বলেছেন— "কবিগুরু ফেরদৌসী মহোদয়ের পদাঙ্ক চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াই এই তহমিনা।"[২৯৩] পারস্য বীর রোস্তম এবং সামান-গাঁ রাজ্যের রাজকন্যা তহমিনার প্রণয়-কাহিনীই এই উপন্যাসের উপজীব্য।

সামান-গাঁ রাজের একমাত্র রূপবতী কন্যা তহমিনা পারস্য সম্রাটের প্রধান সেনাপতি রোস্তমের গুণ ও বীর্যবত্তার কথা শুনে তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবেন না বলে স্থির করেন। তাঁর এই ইচ্ছার প্রতি স্নেহপ্রবণ পিতামাতারও সায় ছিল। ঘটনাক্রমে একদিন রোস্তম মৃগয়া উপলক্ষে সামান-গাঁ রাজ্যের সীমানায় এসে উপস্থিত হন এবং রাতে গাছের নীচে অশ্ব রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এ সংবাদে তহমিনার কৌশলে রোস্তমের অশ্বটি রাজবাটীতে আনীত হয়। অশ্বদর্শনে তহমিনার প্রণয়ের আকর্ষণ তীব্র হয় এবং অশ্বটিকে সযত্নে রেখে দেন। এদিকে পরদিন ঘুম ভেঙ্গে রোস্তম জানতে পারেন তাঁর অশ্ব অপহৃত হয়েছে। তৎক্ষনাৎ তরবারী হাতে ক্রুদ্ধ রোস্তম অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ করে সামান-গাঁয়ের দিকে গমন করেন। প্রজারা ভয়ে এদিক ওদিক পালাতে থাকে। ভীত সামান-গাঁ-রাজ তাঁকে সবিনয়ে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁর দাবী মতো অশ্ব ফেরৎ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। রাজার ব্যবহারে ও অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে রোস্তম এক রাত থাকতে স্বীকৃত হন। জ্যোৎস্না-শোভিত সেই মোহময় রাতে রাজপ্রাসাদে বিশ্রামরত রোস্তমের কক্ষে তহমিনা গিয়ে তাঁর প্রেম নিবেদন করেন। রোস্তমও তাঁর রূপ-দর্শনে বিমোহিত হন এবং তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। উভয়ে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ

হবার জন্যে সামান-গাঁ রাজের কাছে প্রস্তাব দেন। এখানেই চতুর্থ পরিচ্ছদের কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছদের বিষয় যে 'বিবাহ বিবরণ' সেই ইঙ্গিতও লেখক এখানে দিয়েছেন।[২৯৪]

'তহমিনা' যেহেতু অসম্পূর্ণ রচনা তাই এর সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয় বা প্রাসঙ্গিকও হবে না। তবে এই অংশ বিশেষের উপর ভিত্তি করেই সমালোচক মন্তব্য করেছেন— "এটি ঐতিহাসিক কাহিনীমূলক রোমাণ্টিক প্রেম উপাখ্যান"[২৯৫] এবং এতে "লেখক পল্লবিত ভাষায় অবাধ কল্পনার স্ফূর্তি সাধন করেছেন।"[২৯৬] বস্তুত 'তহমিনা'র কাহিনী পরিকল্পনায় কোন নূতনত্ব নেই। প্রচলিত পুরাণ কাহিনীকেই তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় এবং স্বচ্ছন্দ-ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। চরিত্রগুলির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির প্রচেষ্টা নেই। কাহিনীর সরল গতিতে অভীষ্ট লক্ষে এগিয়েছে।

নিয়তি কি অবনতি

আরব্য-পারস্য পুরাকথা নিয়ে নাটক উপন্যাস লেখার প্রতি যেমন মশাররফের একটা আকর্ষণ ছিল, তেমনি সমকালের কোন বাস্তব ঘটনা বা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট কোন বিষয়কে নিয়ে নাটক-উপন্যাস রচনায়ও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। আর সেই চোখে দেখা বিষয় যদি হয় জমিদার-কেন্দ্রিক তাহলে তো কথাই নেই। কেননা ইতোমধ্যে দেখেছি 'জমীদার দর্পণ', উদাসীন পথিকের মনের কথা' বা 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে জমিদার শ্রেণীর বিচিত্ররূপ। বিশেষতঃ 'জমীদার দর্পণে' জমিদারের অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন ও লম্পটের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেই জমিদারেরই আরেক রূপ অঙ্কনের প্রয়াস রয়েছে তাঁর অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'নিয়তি কি অবনতি'তে।

লেখক স্বয়ং 'নিয়তি কি অবনতি' কে চিহ্নিত করেছেন "সম্পূর্ণ সত্য ঘটনামূলক জীবন্ত উপন্যাস"[২৯৭] হিসেবে। এটি এস.কে.এম মহম্মদ রওশন আলীর সম্পাদিত 'কোহিনুর' পত্রিকার দুটি সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩০৫ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি। তাছাড়া উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তাও জানা যায়নি।

এক স্নেহান্ধ মুসলমান জমিদার মাতামহের (এখানে 'নানা' হিসেবে অভিহিত) চটুল দৌহিত্রের বিচিত্র খেয়াল খুশির চরিতার্থতা এবং সেই খেয়ালের আবদার মেটাতে জমিতদারের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণই "নিয়তি কি অবনতি"র উপজীব্য। প্রবীণ জমিদার 'নানা' শিক্ষিত, বিচক্ষণ এবং পরিপক্ক সংসারী। এরূপ বয়স্ক এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে তাঁর আদুরে নাতির বিচিত্র আবদার মেটাতে বয়স ও মর্যাদার পরিপন্থী কাজ করতে হয়। নাতির বায়নায় তিনি প্রতিদিন বিয়ের অভিনয় করেন, নদীতে স্নান করতে গিয়ে একশ একবার ডুব দেন। নাতির ইচ্ছায় রাত্রে নিত্যই গান বাজনার আসর বসে। নাতি প্রায় দিগম্বর বেশে থাকলেও গানের এক দল পরিবর্তন করে অন্যদল আনার হুকুমজারী করতে এবং বখশিশ ঘোষণা করতে দক্ষ।

এইভাবে নাতির আবদারের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এক সময় সেই আবদার অন্যায় আবদারে গিয়ে ঠেকে। একবার একদল ব্রাহ্মণ যখন মদনমোহন ঠাকুরকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন তখনই নাতি বায়না ধরে— "ঐ

পুতুলটা আমার চাই।" অবশ্য যদিও নানার জমিদারীতে "কত ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর" হিন্দুরা বিনা বিয়ে ভোগ করিতেছে" তবু তিনি নাতির আবদার রক্ষা করতে গিয়ে ব্রাহ্মণদের উপর বলপ্রয়োগ করে সেই বিগ্রহ নিয়ে তাকে দেন। এছাড়া বিগ্রহের গলা থেকে একদিন সোনার মালাটি চুরি হয়ে গেলে তা রক্ষার্থে ব্যর্থ হওয়ায় নানা ঠাকুরকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করেন। শিশুর ক্ষণস্থায়ী বায়নাক্কা মিটে গেলে ক'দিন বাদেই নাতির খেয়ালে "মদনমোহনকে কচুবনে যাইতে হইল"। পত্রিকায় কাহিনীর এই পর্যন্ত ছাপা হয়।

বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব ঘটনা ও চরিত্রের মিল থাকা সম্ভব। সে কারণে কাজী আবদুল মান্নান বলেছেন ঃ

> 'নিয়তি কি অবনতি'র নায়ক নানার নাম তিনি উল্লেখ করেননি, কাহিনীর মধ্যে কোন স্থানেরও নাম করেননি এবং এর কারণ সম্ভবত রচনার কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয়।[২৯৮]

"কোহিনূর" পত্রিকার সম্পাদক কাহিনীতে হিন্দু বিগ্রহের অবমাননা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন ঃ

> হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে 'কোহিনুরের' আবির্ভাব। কেহ কেহ বলিত পারেন, এইরূপ কথার প্রচার, উহার উদ্দেশ্যের বিপরীত; কিন্তু আমরা কি করিব, বাস্তবিক পক্ষেই এইরূপ ঘটনা এদেশে এককালে ঘটিয়াছিল। লেখক সেই চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন।[২৯৯]

'নিয়তি কি অবনতি'কে কেউ কেউ "গদ্যে রচিত নাটক" বলে অভিহিত করেছেন।[৩০০] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি উপন্যাসাকারেই প্রকাশিত হচ্ছিল এবং লেখক নিজেও একে 'উপন্যাস' বলেই চিহ্নিত করেছিলেন।

অসম্পূর্ণ কোন রচনার উপর কোনরূপ মূল্যায়ণ করা সম্ভব না হলেও এ কথা বলা যায় যে, এতে উপন্যাসের কাহিনী সৃজনের কোন আভাস মেলেনি। বিচক্ষণ, বিষয়ী ও শিক্ষিত জমিদার 'নানা' চরিত্রটির পক্ষে সর্বক্ষেত্রে বালখিল্য আচরণ বাস্তবতাকে ক্ষুন্ন করেছে। দেখা যায়, উপন্যাসোচিত কাহিনী ও চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস এখানে নেই। তবে জমিদার শ্রেণীর দাম্ভিকতা ও অত্যাচারের চিত্র স্বল্পকথায় উপস্থাপনে, হাস্যরসসৃষ্টিতে এবং ভাষার প্রাঞ্জলতায় মশাররফের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় মেলে।

হজরত ইউসোফ বা প্রেম পারিজাত

পবিত্র কোরান শরীফে বর্ণিত পয়গম্বর হজরত ইউসোফ ও জোলেখার শাশ্বত প্রণয়-কাহিনী নিয়ে এবং প্রচলিত লোককাহিনী অনুসরণে মীর মশাররফ "হজরত ইউসোফ" রচনা করেন। "হজরত ইউসোফ" গ্রন্থটি সম্পূর্ণ রচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলেও তা কোনো পত্রপত্রিকায় বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "আমার জীবনী"র ১ম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩১৫) এটি 'যন্ত্রস্থ' বলে যে বিজ্ঞাপন ছিল তা দেখে একে মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকাভুক্ত করেন।[৩০১] কাজী আবদুল মান্নান 'গদ্যে রচিত গল্প (?)' হিসেবে চিহ্নিত

করে এর প্রকাশকাল নির্ধারণ করেন আনুমানিক ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ।[৩০২] কিন্তু পরবর্তীকালে আশরাফ সিদ্দিকী জানান, "ইউসুফ জোলেখা এখন অপ্রকাশিত অবস্থায় তাঁর সন্তানদের নিকট রক্ষিত।"[৩০৩] অধ্যাপক আলী আহমদও জানিয়েছেন হজরত ইউসুফের (ইউসুফ-জোলেখা)প্রণয়োপাখ্যানের প্রকাশিত কোন কপি পাওয়া না গেলেও মীরের বংশধরদের কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন ষোলো পৃষ্ঠার ছাপা গ্যালি প্রুফসহ মোট ৩৭৩ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি।[৩০৪] এ থেকে অনুমান করা যায় এটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোন কারণে আর প্রকাশিত হয়নি।

এছাড়া মীরের 'প্রেম পারিজাত' নামে একাধিক স্থলে বিজ্ঞাপিত রচনাটি আর হজরত ইউসোফ বা 'ইউসুফ জোলেখা' অভিন্ন রচনা।[৩০৫] অনেকে[৩০৬] অনুমান করেছেন রচনাটির পূর্বনাম ছিল 'প্রেম পারিজাত'। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে মীর যখন ধর্মমূলক কাব্যকাহিনী রচনায় ব্যস্ত তখন হয়তো মুসলমান সমাজের চৌদ্দ আনা লোকের কথা ভেবে নবীর মতো মহাপুরুষের প্রেমমূলক কাহিনীকে 'প্রেম পারিজাত' নামে প্রকাশ করাকে সমীচীন বলে মনে করেননি বা করতে চাননি। তাই একে হজরত ইউসোফ বা 'ইউসুফ জোলেখা' হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।

'ইউসুফ জোলেখায়' পরিচ্ছেদ 'উদ্যান' হিসেবে এবং পরিচ্ছেদের উপবিভাগগুলি 'কোরক' হিসেবে চিহ্নিত।

'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'র পর মীরের প্রায় সব রচনাই ধর্মাশ্রিত। 'হজরত ইউসুফ' শীর্ষক রচনায়ও সেই ধর্মের আবরণ আছে, কিন্তু এখানে ধর্মকে ছাপিয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে চিরকালীন নরনারীর প্রেমকাহিনী। 'বিষাদসিন্ধু'তে যেমন লেখক ধর্মীয় কাহিনীকে মানবীয় রসের কাহিনীরূপে গড়ে তুলেত চেয়েছেন এখানেও তেমনি নবী বা রসুলকে অতিমানবীয় ভাবগম্ভীর পরিমণ্ডল থেকে সাধারণ রক্তমাংসের মানব-মানবী রূপেই অঙ্কিত করেছেন। 'বিষাদসিন্ধু'র এজিদের রূপজ-মোহের প্রতিধ্বনিই যেন শোনা যায় 'ইউসুফ জোলেখা'য়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এর অংশ বিশেষ উল্লেখ্য ঃ

> প্রেমিক কি প্রেমিকের রূপদর্শনে ক্ষণকাল বঞ্চিত থাকিতে পারে? অন্যমনস্কে কি প্রেমিকের চিত্তভ্রম জন্মাইতে পারে? (২য় উদ্যান, ১ম কোরক)।[৩০৭]

এবং

> প্রিয়তম ইউসোফ। তুমি আমার হৃদয়ের অমূল্য নিধি। জীবন যৌবনের অধিকারী। বহু বৎসর গত হইল তোমার পদে বিক্রীত হইয়াছি। . . . . জোলেখা আজীবন তোমারই। সেই স্বপ্ন আজ সফল হইল। তুমি আমার নিদ্দিষ্ট (নির্দিষ্ট), আমি তোমার নিদ্দষ্ট (নির্দিষ্ট)। (৩য় উদ্যান, ২য় কোরক)।[৩০৮]

সুতরাং কাহিনী-উৎস ধর্মীয় হলেও তার আবরণ ভেদ করে মুখ্য হয়ে উঠেছে পার্থিব নরনারীর জীবন-তৃষ্ণা। ধর্মপ্রাণ মীরের চেয়ে শিল্পী মীর এখানেই তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

নাটক
বসন্তকুমারী

১. ভূমিকা

কবিতা-পুস্তক 'গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু' লিখে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করলেও মনে হয় মীর মশাররফ এই রচনাটিকে তাঁর সাহিত্যিক প্রস্তুতির নিদর্শন হিসাবে রেখে দিতে চান। তাই তিনি ভূমিকায় 'বসন্তকুমারী নাটক'কে তাঁর 'অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম' বলে অভিহিত করেছেন।

'বসন্তকুমারী' কলকাতা থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৫ই মাঘ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ থেকে আইনউদ্দীন বিশ্বাস এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে চট্টগ্রাম থেকে ডঃ আবদুল আউয়াল গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের পুণর্মুদ্রণ প্রকাশ করেন। এরপর বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'মশাররফ রচনা সম্ভার'-এর প্রথম খণ্ডে কাজী আব্দুল মান্নান এর দ্বিতীয় সংস্কারণ পুণর্মুদ্রণ করেন।[১]

'বসন্তকুমারী' লেখকের প্রথম নাট্য-প্রচেষ্টা। এর আগেও তিনি 'রত্নবতী' নামক গদ্য আখ্যান রচনা করে গদ্যে গল্প বলার কৌশল আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু 'রত্নবতী'র আখ্যান ছিল রূপকথাধর্মী। মীর মশাররফ 'রত্নবতী' থেকে 'বিষাদসিন্ধু' পর্যন্ত গদ্য আখ্যানের ক্ষেত্রে রূপকথা বা প্রাচীন পুরাণের জগতে বিচরণ করেছেন। অন্যপক্ষে নাটকের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমাবধিই বাস্তব জীবনের সমস্যাকেই গ্রহণ করে নাট্যরস পরিবেশন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। গদ্য আখ্যানের কথক হিসেবে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র মধ্যে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু নাটকে তখন বাস্তব সমস্যাকে ছাড়িয়ে তিনি 'বেহুলা গীতাভিনয়' পর্বে কল্পনামূলক কাহিনীর আশ্রয় অবলম্বন করেছেন।

২. কাহিনী বিশ্লেষণ

যে রকম জ্বলন্ত সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে 'বসন্তকুমারী' বা 'এর উপায় কি ?' লিখেছিলেন কিংবা যেরকম সমাজ অর্থনীতিক প্রশ্ন তাঁর 'জমীদার দর্পণ' নাটকে উত্থাপিত হয়েছিল পরে কিন্তু তার চর্চা হয়নি। অর্থাৎ কিনা যে জটিল জীবন–বাস্তবতাকে মীর মশাররফ শিল্পীর অনুভূতি দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন, বাস্তববোধের যে সহজ অথচ তীক্ষ্ণ চেতনা তাঁর প্রথম পর্বের নাট্য-গ্রন্থাবলীতে পরিস্ফুট হয়েছিল তা পরের দিকে আর ব্যবহৃত হল না। শিল্পীর জীবনবোধে এর কোনো প্রাসঙ্গিক কারণ থাকা সম্ভব।

'বসন্তকুমারী নাটক' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রকাশিত হয় তার আগের বছরই সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং সেখানে 'নীলদর্পন' নাটকের অভিনয়ের মতো একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। 'বসন্তকুমারী' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হবার আগেই বৃদ্ধের তরুণী স্ত্রীর সমস্যা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নাটক লেখা হয়েছে। একেবারে প্রথম দিককার জি. সি. গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাসের' রূপকথাধর্মী নাট্য-কাহিনীর একরূপ উপস্থাপনা 'বসন্তকুমারী' নাটকে

দেখা যায়। ইন্দ্রপুরের বৃদ্ধ রাজা মন্ত্রী ও বিদূষকের প্ররোচনায় রেবতী নামক এক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি রাজকার্য ফেলে তরুণী স্ত্রীর বংশবদ হয়ে পড়লেন। রানী রেবতীর কিন্তু বৃদ্ধ রাজার উপরে মন নেই। তিনি যুবরাজ নরেন্দ্রর প্রতি অবৈধ প্রণয় নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হলে এতে তার ব্যর্থ প্রেম রোষের প্রকৃতিতে প্রকাশিত হল। এদিকে ভোজপুরের রাজকুমারী যুবরাজ নরেন্দ্রকে স্বপ্নে দেখে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। প্রকাশ্য স্বয়ংবর সভায় তাঁর গলায় মালা দেন। যুবরাজ যুবরানীকে নিয়ে দেশে ফেরার পরেই সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে। প্রতিহিংসাপরায়ণ রেবতী রাজার কাছে যুবরাজের নামে মিথ্যা নালিশ করেন। রাজা তরুণী ভার্যার কপটতা বুঝতে না পেরে অনুচিত ও অবৈধ প্রেম প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজপুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেন। রাজপুত্র দণ্ডাদেশ স্বীকার করে রাজার হাতে তাঁর উদ্দেশ্যে লিখিত রানীর প্রেমপত্র প্রত্যর্পণ করে জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দেন। যুবরানী বসন্তকুমারীও স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিলেন। অতঃপর রাজা যুবরাজের উদ্দেশে লিখিত রানীর প্রেমপত্র পাঠ করে রানীকে হত্যা করেন এবং নিজেও শোকে দুঃখে অনুশোচনায় আত্মাহুতি দেন। এইভাবে সমগ্র রাজ পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়।

মীর মশাররফ এই নাট্যকাহিনীর মূল প্রতিনায়িকা এবং ধ্বংসের বীজশক্তিরূপে রেবতীকে উপস্থাপিত করেছেন। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করা যায় মীর মশাররফের প্রায় রচনায় এই নারীর প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং অশুভ প্রকৃতি সংসারে একটা বড় সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' নামক গদ্য আখ্যানেও নারীর এই প্রলয়ংকরী ভূমিকা বেশ বড় জায়গা পেয়েছে। জয়নাবের রূপসৌন্দর্য একদিকে যেমন এজিদের চিত্তে দাবানল জ্বালিয়েছে তেমনি সেই অনলে হাসান–হোসেনের সংসার ধ্বংস হয়ে এক সর্বগ্রাসী ইতিহাসের দাবানলে সমগ্র দেশকেও দগ্ধ করেছে। যেমন জয়নাবের রূপরাশি উত্থিত সৌন্দর্য তেমনি হাসানের দ্বিতীয়া স্ত্রী জায়েদার ঈর্ষা, ছলনা এবং চক্রান্ত এই উপন্যাসটির ক্রিয়াগতিকে পরিচালিত করেছে। 'বসন্তকুমারী' নাটকে এই দুই নারীর ভূমিকাকে মীর মশাররফ একই চরিত্রে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে অবশ্য বলা যায় এই নারীর ভূমিকা তাঁকে উদ্ভাবন করতে হয়নি। তিনি হয়ত তা প্রচলিত ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন।[২] কারণ 'কীর্তিবিলাস' বা 'রূপকথা'য় এরকম ঐতিহ্য ছিল।[৩] 'বসন্তকুমারী' নাটকের সমস্যা দেশে তদানীন্তন ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত — সেটুকু তার বাস্তবতা। অন্যপক্ষে কাহিনীর রূপকথাধর্মী রূপ তাঁর লেখায় থেকে গেছে। এখানে উল্লেখ করা যায় 'রত্নবতী' বা 'বসন্তকুমারী' প্রথমপর্বের এই দুটি রচনাতেই মীর মশাররফ স্বকীয় কাহিনী উদ্ভাবনার চেয়ে রূপকথার ঐতিহ্যকে বেশী মূল্য দিয়েছেন। পরে 'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনীতেও তাই দেখতে পাব। যাই হোক এখানে একটি কথা মনে করা যায় — প্রথমপর্বে মীর মশাররফ নারীর মধ্যে একই সঙ্গে শুভঙ্করী এবং প্রলয়ঙ্করী দুই ধর্মকেই পাশাপাশি বিরাজ করতে দেখেছিলেন। আমরা 'রত্নবতী'র রাজকন্যার মধ্যেও এই দুই ধর্ম দেখি। সুতীব্র সৌন্দর্যের আধারেই থাকে মলিন কুমন্ত্রণা। রত্নবতী একদিকে সুন্দরী রাজকন্যা অন্যপক্ষে তিনি ছলনায় প্রবঞ্চনায় রাজপুত্রদের কারারুদ্ধ করে রাখেন। বসন্তকুমারী নাটকের রাণী রেবতী সুন্দরী কিন্তু তাঁর সৌন্দর্যের আধারেই নিমগ্ন আছে কুমন্ত্রনায় রাজাকে প্রবঞ্চিত করার ইচ্ছা। মীর মশাররফের সৌন্দর্যবোধে এখন যুগপৎ শুভঙ্করী ও প্রলয়ঙ্করী দুয়ের মিশ্রিত আকৃতি। তাঁর সৌন্দর্য বিমল নয়, নির্মল নয় – মিশ্রিত। উভয়বোধের একটা মিশ্র রূপ।

'বসন্তকুমারী' মোট তিন অঙ্কে এবং বারোটি দৃশ্যে গ্রথিত নাটক। প্রথম সংস্করণে নাটকটিতে মোট এগারোটি দৃশ্য ছিল; পরে তাতে অতিরিক্ত একটি দৃশ্য সংযোজিত হয়। নাটকটি সংস্কৃত নাট্যরীতিতে রচিত। প্রথমেই প্রস্তাবনায়

সভা-বর্ণন এবং নটীর প্রবেশ এবং নাট্যকার ও নাটক পরিচিতি। তারপর নটীর গীত। গীতান্তে মোহিত দর্শকসাধারণকে নাট্যবস্তুর অভ্যন্তরে নিয়ে উপস্থিত করা হয়েছে। এই রীতিটি সংস্কৃত নাটকের বিশেষতঃ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের রীতি। নটীর সঙ্গীত-মুগ্ধ নট বলছেন, তোমার সঙ্গীতে দুষ্মন্ত যেমন হরিণ কর্তৃক আশ্রমে নীত হন আমরা তেমনি মুগ্ধভাবে নাট্যবস্তুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হলাম। যাইহোক মীর মশাররফ অনুরূপভাবে রাজা বীরেন্দ্র সিংহের কাহিনীর মধ্যে পৌঁছেছেন। কাহিনীর এই ধরণের উপস্থাপনা রামনারায়ণ একাধিকবার করেছেন। অনান্য নাট্যকারেরাও এই রীতি ব্যবহার করে তখন পরিত্যাগ করছিলেন। কারণ সংস্কৃত নাটকে এই রীতির একটি বিশেষ উপযুক্ততা ছিল। সংস্কৃত নাটক রসনিষ্যন্দী। রসই সেখানকার মূলকথা। এ বিষয়ে সংস্কৃত রসশাস্ত্রে একটি কথা পাওয়া যায়। তাকে বলে 'সর্বসামাজিকানাম একরসঘনতা'। যখন সর্বশ্রেণীর দর্শক নাট্যক্ষেত্রে নাটক দেখবার মন নিয়ে প্রস্তুত হন তখন যে তাদের সামাজিক শ্রেণীবিভেদ রসগ্রহণে কোন অসুবিধার কারণ হয় না তা দেখানোর জন্যে নাটকে এই রীতির প্রস্তাবনা করা হয়। সেখানে নটীর সঙ্গীতের মোহনসুরে সর্বশ্রেণীর দর্শক সমান মন নিয়ে নাট্যরস আস্বাদনে প্রস্তুত হন। কিন্তু বাংলা নাটকে এই রীতি ব্যবহার যখন প্রথাবদ্ধভাবে শুরু হল তখন কিন্তু তার সেই প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য ছিল না। এর ফলে বাংলা নাটকে এই রীতি বিশেষ শক্তি প্রদর্শন করতে পারেনি। মীর মশাররফ যখন এই রীতি ব্যবহার করছেন তখন রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু এই রীতি পরিত্যাগ করেছেন। তবু বলা চলে কৌশল হিসেবে এটি মন্দ হয়নি। তার কারণ প্রথমতঃ বসন্তকুমারী একটি কল্পরাজ্যে আমাদের নিয়ে যায় যে রাজ্য দৈনন্দিন বাংলাদেশের বাস্তব নয়। তার ফলে এই সঙ্গীতের সধারসধারে এই কল্পরাজ্যে প্রবেশ সহজ হয়। অন্যপক্ষে মশাররফ এখানে প্রচলিত একটি নাট্যরীতিকে অবলম্বন করে নাট্যকাহিনী গ্রন্থনা কৌশল আয়ত্ত করছেন। এটি তাঁর প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা। সেদিক থেকে গতানুগতিক নাট্যকৌশল অবলম্বন করে তার প্রকৃতি আত্মস্থ করে রীতিটিকে ব্যবহার করবার দ্বারা তিনি আত্মশক্তির পরীক্ষা করেও নিচ্ছেন। মুনীর চৌধুরী অবশ্য এই প্রয়োগ কৌশলকে অতিশয় প্রশংসা করে লিখেছেন :

> প্রাণহীন রীতিও যে প্রাণবন্ত কল্পনার স্পর্শে, আবেদন ক্ষমতায় কত বিদ্যুদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে,
> 'বসন্তকুমারী নাটকে'র প্রস্তাবনা তার এক প্রকৃষ্ট নজির।[৪]

নাট্যকার অবশ্য রসৈক্য সৃষ্টির পথে নিজেই একটি সমকালীন সমস্যা উত্থাপন করে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমকালীন মুসলমান লেখকের প্রতি হিন্দু সমাজের অবজ্ঞার প্রসঙ্গ প্রস্তাবনা অংশে উত্থাপন করেছেন। "মুসলমান নাট্যকারের রচনা বিষয়ে নাট্যজগতে তৎকালে বিরাজমান সংশয় এবং তার ফলে সৃষ্ট মুসলিম নাট্যকারের আত্মবিশ্বাসের অভাব"[৫] ছিল। "মীর ঐ বৈরী স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছেন"।[৬] তিনি নট-নটীর সংলাপের মধ্যে লিখেছেন :

নটী।— বসন্তকুমারী !!! কার রচিত ?

নট। — কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশাররফ হোসেন রচিত।

নটী।— ছি, ছি !!! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কল্লেন।

নট। — কেন ? মুসলমান বলে কি একেবারেই অপদস্থ হলো ?

নটী।— তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয় ? হাজার হোক মুসলমান।

লেখক কিন্তু এই প্রসঙ্গে নবীন ধারণার প্রয়োগ করেছেন। পুরোনো পদ্ধতিটিকে তিনি ভারতের হিন্দু-মুসলমানের অভেদত্ব প্রতিপাদনের কাজে লাগাচ্ছেন। নটের মুখে তিনি বললেন, "অমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্ব্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্ব্বনাশ হচ্ছে।" এই উক্তিটির গুরুত্ব ঐতিহাসিক। কারণ মীর মশাররফ এর মধ্যে ভারতের সমাজ রাজনীতিক প্রসঙ্গ এনে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যরক্ষা ও সম্প্রীতি সাধনের বাণী তুলে ধরলেন। সন্দেহ নেই, এ প্রসঙ্গটি নাটকের কোন বিষয় নয়, নাট্যবস্তুর সঙ্গে তার দূরসম্পর্কও নেই। এমনকি এইরকম একটি বিষয় উপস্থাপন করে সোচ্চারে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বাণী প্রচারে হয়তো নাট্য বহির্গত কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ হওয়া সম্ভব কিন্তু যে রসৈক্যসৃষ্টির কাজ প্রাচীন সংস্কৃত নাচকের প্রস্তাবনা অংশে করা হয়ে থাকে এখানে তা হয়নি। নাট্যগত দর্শকের পক্ষে নাট্যরস আস্বাদনের যে ঐক্যময় প্রক্রিয়া প্রাচীন নাট্যরীতিতে ক্রিয়া করতো এখানে নাট্যকার তাকে সমকালীন ভারতের সাম্প্রদায়িক ঐক্য রচনার কাজে ব্যবহার করেছেন।

'বসন্তকুমারী' নাটকের কাহিনীতে ঘটনাগত বৈচিত্র্য কম। উপরন্তু কাহিনীর মধ্যে অন্তবর্তী প্রকৃত কোন দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয়নি। এই কারণে নাটক হিসাবে তার সার্থকতা সীমাবদ্ধ। বসন্তকুমারী নাটকের বিষয় বৃদ্ধের তরুণী ভার্যায় অত্যাসক্তি এবং সেই কারণে দৃষ্টিক্ষীণতা ও সংসারে বিপর্যয়।

এই ঘটনাটিকে ব্যক্ত করবার জন্য নাট্যকার তিনটি অঙ্কে বারোটি দৃশ্যকে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন দেখা যাক। প্রথম অঙ্কে মোট পাঁচটি দৃশ্য। নাট্যকার এগুলিকে 'রঙ্গভূমি' বলেছেন। প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে তিনি তাঁর লক্ষ্য অভিমুখে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে গেছেন। প্রথম দৃশ্যে রাজার মনে বিবাহের ইচ্ছা ঢুকিয়ে দিয়ে এবং পরের দৃশ্যে রাজার বিবাহে সম্মতি দেখিয়ে নাট্যকার কাহিনীর একটি আখ্যানকে অভিলষিত পথের দিকে নিয়ে চলেছেন। তৃতীয় দৃশ্যে দেওয়া হল রাজকুমারী বসন্তকুমারীর প্রণয় স্বপ্ন এবং স্বয়ংবর সভার সংবাদ। সম্ভবতঃ কেবল রাজা বীরেন্দ্রর কাহিনী বর্ণনা করলে একঘেঁয়েমি এসে যেতে পারে ভেবে নাট্যকার এই আখ্যান বর্ণনা করেছেন। এই অংশে বসন্তকুমারীর নরেন্দ্রকে স্বপ্নে দর্শন, তার জন্য ব্যাকুলতা মূল কাহিনীর অংশ হিসেবে বা তার সঙ্গে কোনরূপ দ্বন্দ্বের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয় নি। চতুর্থ দৃশ্যে আমরা দুই নারীর কথোপকথনে জানতে পারি রাজা গোপনে রেবতীকে বিবাহ করেছেন। নরেন্দ্র ও শরতের কথোপকথনে জানতে পারি, রাজ্যে প্রথম দৃশ্যে যে সুশৃঙ্খল অবস্থা ছিল তা বিঘ্নিত হয়েছে, "দুর্জনেরা নিরীহ প্রজাগণের প্রতি দৌরাত্ম কোরে তাদের সর্বসান্ত করেছে। কর্মচারীরা খোলা মহল পেয়ে দেদার লুট আরম্ভ করেছে।" (১/৪)। এবং রাজকার্যে রাজার মন নেই, তিনি "সর্বদাই অন্তঃপুরে নববিবাহিতা রাণীর মন্দিরে থাকেন।" (১/৪)। চতুর্থ দৃশ্যে প্রজাদের মুখ দিয়ে যা বলানো হল পঞ্চম দৃশ্যে তারই উপস্থাপনা। অতিরিক্ত যা পেলাম তাতে আছে রানী রেবতীর Evil Design. রাজাকে প্রেমের ভান দেখিয়ে যুবরাজকে প্রলুব্ধ করা। প্রথম অঙ্কের এই পাঁচটি দৃশ্য-বিন্যাস কাহিনীকে নিশ্চয় একটা লক্ষ্যে নিয়ে চলেছে। লেখক প্রথম দৃশ্যে রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি দেখিয়েছিলেন। চতুর্থ দৃশ্যে তা আর নেই। রাজ্য প্রায় অরাজক। এই কথা আরও বর্ণবন্ত করার জন্য পঞ্চম দৃশ্যের অবতারণা করা হল। দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যে শরত ও নরেন্দ্রের কথোপকথনের মাধ্যমে নরেন্দ্রের চিত্ত বর্ণনা। প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে রানী নিজেই নরেন্দ্রকে দেখতে চেয়েছিলেন। এবার দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে রানী অপলক চোখে রাজপুত্রকে দেখলেন। এর আগে দাসীর মাধ্যেমে তিনি নরেন্দ্রের কাছে প্রেমপ্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। এবার নরেন্দ্রকে নিজের রূপ দেখালেন। নরেন্দ্র কিন্তু মুখ তুলে দেখল না। এই দৃশ্যে

এল বসন্তকুমারীর স্বয়ংবর সভার সংবাদ। এই একটি দৃশ্যে দুটি কাজ করে নাট্যকার কাহিনীতে সংহতি এনেছেন। এই দৃশ্যে নরেন্দ্র বসন্তকুমারীর স্বয়ংবর সভায় যাবেন শুনে রানীর মনে হতাশা এবং প্রতিহিংসা দুই–ই দেখা দিয়েছেঃ

> আমি ধর্ম্মের দিকে ফিরেও চাইলেম না ? লজ্জার মাথা খেয়ে সতীত্বকে বিসর্জন দিয়ে, কলঙ্কভার মাথায় বহন করতে হবে, লোকের গঞ্জনা সৈতে হবে, অধর্ম্মে নরকে পুড়তে হবে। এসকল ভেবেও রাজকুমারের প্রতি মন সমর্পণ কল্লেম। কিন্তু তিনি তো আমার পানে একবারও চাইলেন না (২/২)।

আবার

> হা ! সকল আশায় নিরাশ হল। মালতী ! এর উপায় ? আমি তো আর বাঁচি না। (২/২)।

রানী কিন্তু মালতীর প্রস্তাবে ক্ষান্ত হলেন না। তিনি যুবরাজকে পত্র লিখে মনের কথা জানালেন। পত্র লেখা হল পদ্যে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রেমপ্রস্তাব হিসেবে পদ্য ভালো মাধ্যম কিন্তু নাটকের সংলাপ হিসেবে বা নাট্যক্রিয়ার পক্ষে তা উপযোগী নয়। এই দৃশ্যটি রেবতীর মনের গতিপ্রকৃতি বোঝানোর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু যে রেবতী রাজপুত্রের কাছে পদ্যচ্ছন্দে বেশ সুললিত পত্র প্রেরণ করেছে তা নয়, রাজাকে প্রবঞ্চনা করার পক্ষেও তার ভূমিকা লক্ষণীয়। কেবল রূপ ও যৌবন দ্বারা সে রাজাকে একেবারে বিমোহিত করে রেখেছে। এ দৃশ্যের প্রথমে নরেন্দ্রকে সে চক্ষু দ্বারা পান করেছে আর শেষে নরেন্দ্রকে পত্র দ্বারা সম্ভাষণ করেছে এবং রাজাকে তার মোহিনী ভঙ্গিতে প্রবঞ্চনা করেছে। সে মালতীকে বলছে ঃ "সেকেলে বুড়োরা কি একেলে মেয়েদের চাতুরী বুঝতে পারে ? দেখলি তো রাজাকে কেমন জব্দ করেছি।" (২/২)। এই দৃশ্যটিকেই রেবতীর মনের দিক থেকে এবং নাটকের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য বলা যেতে পারে। এই দৃশ্যেই নাটকের অন্তর দর্শন হলো। এখন কেবল পরিণতির অপেক্ষা।

নাট্যকার অতঃপর তৃতীয় দৃশ্যে বসন্তকুমারীর উচাটন, চতুর্থ দৃশ্যে বসন্তকুমারীর নরেন্দ্রকে পতিরূপে লাভ দেখিয়েছেন। এ দুটি দৃশ্য নিতান্ত অনাবশ্যক। এই নাটকের মূল যে ভাব তার উন্মোচনের পক্ষে এদের কোনো প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। তাই নাট্যকার অতিদ্রুত এই দুই দৃশ্য অঙ্কন করে আবার রেবতী–বীরেন্দ্র কাহিনীতে ফিরে গেছেন। এই বার তৃতীয় অঙ্কে কাহিনী পরিণতিতে পৌঁছল। প্রথম দৃশ্যে দেখানো হল রেবতীর প্রতিহিংসাপরায়ণতা বসন্তকুমারীকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে চায়। সে বসন্তকুমারীকে উদ্দেশ্য করে বলছে "তুই আমার সুখতরী ডুবালি। ..... তুই আমার শত্রু।" (৩/১)। অতঃপর প্রবঞ্চনাকুশল মালতী মোহিনীমুগ্ধ রাজাকে জানালো নরেন্দ্র তাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছে। রাজা অমনি নরেন্দ্রকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেবতীর design অনুসারে বসন্তকুমারীর সুখতরী ডুবাতে বদ্ধপরিকর। বিস্ময়ের কথা নাট্যকার এর পরদৃশ্যেই বসন্তকুমারী ও নরেন্দ্রের প্রণয়দৃশ্য অঙ্কন করলেন। নাট্যগত দৃশ্য যোজনার নিয়ম হিসাবে তিনি ভেবেছিলেন যুবরাজের প্রণয়দৃশ্যের মধ্যে নগরপালের আকস্মিক কঠোর আচরণ নিশ্চয় অতিরিক্ত করুণা জাগ্রত করবে। তিনি নাট্যদৃশ্যের কাল সংস্থানের রীতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হলে এমন করতেন না। কারণ আগের দৃশ্যেই নরেন্দ্রের প্রতি উদ্যত কঠোর রাজদণ্ডের ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। এখন আর একটি দৃশ্য জুড়ে তারই প্রণয় সম্ভাষণ দৃশ্য সেই পূর্ববর্ত্তী দৃশ্যের প্রত্যক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করে নাট্যঘটনা বিন্যাসকে লঘু করে দেয়। ফলে কাহিনীর বিন্যাসে ত্রুটি হয়। নাট্যকার যদি আর একটি দৃশ্যের অবতারণা না করে এই দৃশ্যেই তৃতীয় দৃশ্য যোজনা করে দিতেন তাহলে প্রত্যক্ষতা থাকতো। তবে নাট্যকার এই দৃশ্যে পত্রের প্রসঙ্গ অবতারণা করে

বসন্তকুমারীকে রেবতীর প্রকৃতি বুঝিয়ে দিয়েছেন এইমাত্র। তবে তার কোনো প্রয়োজন ছিলনা কেননা নাট্যগত ঘটনা দর্শকদের জানানোর জন্যই নাটকে অবতারণা করা হয়, নাট্যগত পাত্রপাত্রীর জন্য নয়। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাজপুত্রের প্রতি রাজার আচরণ কতখানি সঙ্গত এবং পূর্বাপর সঙ্গতিসম্পন্ন সে প্রশ্ন তোলা যাবে না। কারণ রাজা বুদ্ধিভ্রষ্ট এবং রানী-নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বসন্তকুমারী বা অন্য কেউ এ কথা নিশ্চয় উত্থাপন করতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। নরেন্দ্র সম্ভবতঃ অভিমানে আত্মবির্সজন দিয়েছেন। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের সামান্যতম চেষ্টা (পত্রপাঠ করবার অনুরোধ) পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। এবং এরই ফলে একের পর এক মৃত্যু দেখিয়ে তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যকার করুণ পরিণতি সৃষ্টি করবার বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা ট্রাজিক এফেক্ট তো দূরের কথা কোনো কারুণ্যই সৃষ্টি করতে পারেনি। মৃত্যুর ঘটনাগুলি একান্তভাবেই আকস্মিক ও ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে অনিবার্যসূত্রে গ্রথিত নয় বলেই মনে হয়। সে কারণে সমকালীন পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' যথার্থ মন্তব্য করে লেখে ঃ

> গ্রন্থখানি করুণরসপ্রধান, কিন্তু যেরূপে গ্রন্থের উপসংহার করা হইয়াছে,তাহাতে 'ফুললো আর মলো' এই যে প্রবাদ বাক্যটি আছে তাহাই আমাদিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। গ্রন্থকার তত ব্যস্ত না হইলে উপসংহারটি অধিকতর মনোহর হইত সন্দেহ নাই।[৭]

'বসন্তকুমারী' নাটক যে এই করুণরসও সৃষ্টি করতে পারল না কেবল মেলোড্রামা হয়ে রইল তার মূলে আছে যথার্থ নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টির অক্ষমতা। নাটকটির কাহিনীর বৈচিত্র্য অত্যন্ত কম। প্রায় সরল একমুখী কাহিনী নিয়ে নাটকটি একটি সহজ সরল নৈতিকতা প্রতিপাদনের লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে। কাহিনীর বৈচিত্র্য কিছু না থাকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টির অভাব। কাহিনীগুলি অধিকাংশই কোন অবস্থার বর্ণনা মাত্র। নাটকের পক্ষে ঘটনাগুলি যেভাবে দৃশ্য পরম্পরায় তীব্রতর হয়ে একটা Crisis Point অভিমুখে ধাবিত হয় এবং একটি চূড়ান্ত সংঘাতে অভিব্যক্ত হয় তা এ নাটকে কিছুই হতে পারেনি। এমন কি এ নাটকে যেভাবে একটা সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে তারও উপস্থাপনা আকস্মিক। এমন কি রেবতী যে এ রকম একটি তীব্র ছলনাময় ভূমিকা অবলম্বন করে নরেন্দ্রকে শাস্তি দিতে চাইছে তারও কোনো পটভূমিকা নেই। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই মন্তব্য করেছেন ঃ

> তরল আবেগ, সরল করুণরস, মৃত্যু ও আত্মহত্যার বাড়াবাড়ির ফলে এ নাটকের ট্রাজিক গাম্ভীর্য আদৌ রক্ষিত হয়নি।[৮]

এছাড়া ট্রাজিক নাটকে সমস্ত ঘটনার আবেদন যেভাবে কোনো নাট্যচরিত্রকে আলোড়িত করে তার দুঃখ ও দুর্ভাগ্য আমাদের বিচলিত করে তা এ নাটকে কিন্তু হয়নি। বীরেন্দ্র এ নাটকে নৈতিক দিক থেকে দুর্বল চরিত্র। সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে ঠিক কাজ করেনি। তার তরুণী স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ এবং তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া এ নাটকের বিষয়। ফলে বীরেন্দ্র নৈতিক দিক থেকে দুর্বল চরিত্র। তারই বিবাহের ফলে নাটকের ক্রিয়া সম্ভব হয়েছে। অন্যপক্ষে নরেন্দ্র সর্বগুণসম্পন্ন চরিত্র। কিন্তু তার কোনো ক্রিয়া এ নাটকে নেই। সে কেবল পরিবেশের ফলভোগকারী চরিত্র। অবশ্য এ নাটকের কোন চরিত্রই স্বাতন্ত্র্য পায়নি। সবাই একেবারে সরল ফ্লাট টাইপ চরিত্র। ভালো এবং মন্দে তারা বিভাজিত। কেবল রেবতীর মধ্যে লেখক কিঞ্চিৎ কামনা বাসনার স্পন্দন দেখাতে চেয়েছিলেন। তারই ফলে এ নাটকে সামাজিক একটি সমস্যা সম্বন্ধে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লেখকের লক্ষ্য চরিত্রসৃষ্টি বা কাহিনী নৈপুণ্য

প্রদর্শন অপেক্ষা এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। এই সমস্যাটির দুটি রূপ। প্রথমতঃ বৃদ্ধের তরুণী ভার্যাজনিত সাংসারিক সমস্যা। যার প্রকাশ ঘটেছে সংসারে ও রাজ্যে বিশৃঙ্খলায়। অন্যপক্ষে আর একটি প্রশ্ন এ নাটকে উঠেছে বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণী নারীর বিবাহজনিত নারীর জীবন ও যৌবন ভোগের প্রশ্ন। এই দ্বিতীয় প্রশ্ন লেখক উত্থাপন করতে পেরেছেন—রেবতীর দিক থেকে ঃ

১. তার যৌবন অবস্থা মধ্যম অবস্থা গিয়ে এখন শেষ অবস্থারও শেষে ঠেকেছে, আমার অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ। এতে মনের মিল হবে কেন ? আমিই বা তাকে ভালবাসবো কেন ? (১/৫)।

২. মা বাপে জোর কোরে ধোরে রাজ-রানী কোরে দিয়েছেন, . . . মালতী আমি যে যাতনা ভোগ করছি, তা সেই ভগবানই জানেন। (১/৫)।

লেখক সে সচেতনভাবেই এ প্রশ্ন তুলেছেন এই উক্তিতে তার প্রমাণ আছে। অন্যপক্ষে বৃদ্ধ রাজা বীরেন্দ্র সিংহের বিবাহ যে সংসারের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে তা গোটা নাটকেই পরিস্ফুট হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, মীর মশাররফের ব্যক্তিজীবনের ঘটনার কথা। যুবা মশাররফের সঙ্গে লতিফনের প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং বিবাহের কথা স্থির হয়। কিন্তু অভিভাবকদের চাপে শেষ পর্যন্ত এ বিবাহ হয়নি। লতিফনের অমতে যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল তিনি ছিলেন জনৈক বৃদ্ধ জমিদার। এ বিবাহের পরিণাম শুভ হয়নি।

আসলে নাট্যকার একটি রূপকথার কাহিনী নির্ভর করে এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করা এবং তার ফল দেখানো — এই দুই কাজেই নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। ফলে কাহিনীতে যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টির অবকাশ তৈরি হয়নি তেমনি পাত্রপাত্রীর চরিত্র, নাট্য কাহিনীর লক্ষ সবই হয়েছে সরল, একমুখী এবং নির্দ্বন্দ্ব। কেবল একটা নৈতিক বৈপরীত্য সৃষ্টি করে তিনি একটিকে ভালো আর একটিকে মন্দ এই চিহ্নে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। বীরেন্দ্র সিংহের বিবাহ যে খারাপ, নৈতিকভাবে সমাজ ও সংসারের পক্ষে দূষনীয় এবং কুফলদায়ী আর নরেন্দ্র-বসন্তকুমারীর বিবাহ যে কল্যাণপ্রদ এবং সুফলদায়ী—এই সরলীকৃত উপাখ্যানে নাটকটি ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

৩. চরিত্র চিত্রণ

'বসন্তকুমারী নাটকে' সংক্ষিপ্ত পরিসরে কাহিনী-সংঘটনে ও দ্রুত পরিসমাপ্তির কারণে চরিত্রগুলি পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি। চরিত্রসৃষ্টি যথাযথ হয়নি। তবু এরই মধ্যে কোন কোন চরিত্র বেশ সজীব ও প্রাণবন্ত।

রাজা বীরেন্দ্র সিংহকে নাটকে শক্তিশালী ও সাহসী নৃপতি বলে বর্ণনা করা হলেও সে রকম কোন শৌর্য--বীর্যের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়নি। বরং বিবাহোপযোগী পুত্রের বিবাহের পূর্বেই রাজার দ্বিতীয় স্ত্রী–গ্রহণ, রাজকার্য তুচ্ছ করে নব–পরিণীতা যুবতী–মহিষীর মন রক্ষায় সদাব্যস্ততা, সত্যাসত্য বিচার না করেই রানী রেবতীর কথায় নরেন্দ্রের প্রাণদণ্ড দান — প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজা বীরেন্দ্রের অবিমৃষ্যকারিতা, স্ত্রৈণতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয়ই ফুটে ওঠে। তাঁর মোহান্ধ মন কতটা অপরিণামদর্শী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিরপরাধ পুত্র ও পুত্রবধূকে শাস্তিদানের মধ্যে। অবশ্য শেষদৃশ্যে রেবতীর ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হলে তার আত্মসম্বিৎ ফিরে আসে।

এরপর তিনি দুর্বৃত্তা রেবতীকে প্রাণসংহার করে সমগ্র ঘটনার আকস্মিকতায় অনুশোচনা–দগ্ধ হৃদয়ে আত্মহত্যা করেন। কেবল এই অংশেই রাজকীয় মর্যাদাপূর্ণ আচরণেরও সামান্য হলেও মানবিক গুণের নিদর্শন পাওয়া যায়।

রেবতী এই নাটকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। "নাটকের নাম 'বসন্তকুমারী' হলেও এই নাটকের প্রাণ রেবতী।"[৯] এবং "নাম-চরিত্র বসন্তকুমারীকে নায়িকা বলে অনুমান করা স্বাভাবিক হলেও নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছেন রেবতী।"[১০] — সমালোচকদের এই মন্তব্যদ্বয় যথার্থ। তার স্বভাবপ্রকৃতি ও সক্রিয়তা নাটকের কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং শোকাবহ পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছে। সমগ্র নাটকে সে তার কার্যকলাপের সক্রিয়তা দ্বারা দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। এই চরিত্রের চাতুরী, কামনা ও জটিলতাকে কেন্দ্র করেই নাটকের কাহিনী অগ্রগতি লাভ করেছে বলেই লেখক নাটকের দ্বিতীয় নামকরণ করেছেন — 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'। চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকেই রেবতী চরিত্র সার্থক, জোর দিয়ে বলা না গেলেও এ কথা সত্য যে মশাররফের পরবর্তী নারী চরিত্র যেমন জায়েদা, জয়নাব ইত্যাদি সৃষ্টির সার্থক শিক্ষানবিশী বটে।[১১]

রেবতী চরিত্রের মধ্যেই 'নাট্যকার খুঁজে পেয়েছেন জীবনের স্মরগরল, মানুষের দেহ নেশার ভীষণ মধুর রূপটি'।[১২] সে বৃদ্ধ রাজা বীরেন্দ্রসিংহের মহিষী। কিন্তু হৃদয় ধর্মের টানে যাবতীয় নৈতিকতা ও যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে সপত্নী–পুত্র সুদর্শন নরেন্দ্রকে প্রেম নিবেদন করেছে। কিন্তু নরেন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখাত হলে তার স্বরূপ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে তার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা চরিতার্থ করতে যাবতীয় কূটকৌশল ও অমানবিক হিংস্রতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেনি। অর্থাৎ সে একাধারে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, কপটতা, মিথ্যাবাদিতা ও হিংস্রতার প্রতিমূর্তি।

নরেন্দ্র তাকে প্রত্যাখ্যান করে রাজকন্যা বসন্তকুমারীকে বিয়ে করলে রেবতী নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে তার সতীত্ব হানির মিথ্যা অভিযোগ আনে এবং তাকে চরম শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণা রেবতী তাই বলে ঃ

> আমার প্রাণে আর সয় না। নরেন্দ্র বিবাহ কোরে এসে মনের আনন্দে নবযুবতীর সঙ্গে সুখভোগ কোরবেন, আর আমি তাই দেখবো, আমার প্রাণে তাই সহ্য হবে ? আমি মনে মনে পুড়ে মরব ? এ কখনই হবে না। (৩/১)।

তারই ষড়যন্ত্রে নিরপরাধ নরেন্দ্র–বসন্তকুমারীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। পরিণতিতে তাকেও শাস্তি পেতে হয়েছে।

> যুবরাজ আমিই তোমার জীবননাশের মূল। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে। (৩/৩)।

এই শেষ স্বীকারোক্তিতে তার চরিত্রে মানবীয়তা আরোপিত হয়েছে। পাপিষ্ঠা রমণীর মধ্যে অন্ততঃ এই অন্তিম মুহূর্তেও একবার হলেও বিবেকবোধ জাগ্রত হয়েছে। রেবতী তাই রক্ত-মাংসের মানবী চরিত্র। উনিশ শতকের শেষদিকে রেবতীর মত চরিত্রসৃষ্টি খুব বেশি একটা পরিলক্ষিত হয় না।

রাজপুত্র নরেন্দ্র পিতৃভক্ত, সরল, আদর্শ যুবক ও পত্নীপ্রেমিক। সে বড্ড একপেশে চরিত্র। সে তার সৎমার ষড়যন্ত্র জেনেও পিতার সামনে কোন প্রতিবাদ না করেই সস্ত্রীক মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নিয়েছে। এই বিনয়সুলভ আচরণ

বাস্তবজীবনে প্রত্যাশিত হলেও নাটকে তা কার্যকারণ সূত্রে পস্ফুটিত হয়নি। সে কারণে তাকে রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না।

বসন্তকুমারীর নামানুসারেই এই নাটকের নাম। তবে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়িকাসুলভ গুণ তার মধ্যে পরিস্ফুটিত হতে পারেনি। সে কারণে মুনীর চৌধুরী তাকে 'জটিলতাহীন নমনীয় সরল আবেগের'[১৩] মূর্ত প্রতীক বলেই মনে করেছেন। সে ভোজপুর-রাজ বিজয় সিংহের কন্যা। বিবাহের পূর্বে স্বপ্ন-দৃষ্ট নরেন্দ্রের ছবি দর্শন করে ব্যাকুল হয়েছে। স্বয়ম্বর-সভায় যথারীতি সমাগত নরেন্দ্রের গলায় মালা দিয়ে প্রত্যাশা পূরণ করেছে। স্বামী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আত্মাহুতি দিলে সেও সহমরণকে বরণ করে নিয়েছে খুব সহজেই। তার চরিত্রে তাই অকপট প্রেম, সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের আদর্শ লক্ষিত হলেও আবেগ তাড়িত। তাকে বাস্তবজগতের রক্তমাংসের মানবী মনে হয় না। নরেন্দ্র এবং বসন্তকুমারী—দুই চরিত্রেই মানবিক কোন দোষত্রুটি নেই। রেবতীর তুলনায় বসন্তকুমারী অনেকটা অনুজ্জ্বল ও প্রাণহীন।

অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে মন্ত্রী বৈশম্পায়ন ও যুবরাজের সঙ্গী শরৎকুমার বৈশিষ্ট্যহীন ও অবিকশিত চরিত্র। তবে সামান্য হলেও নাটকে তাদের ভূমিকা আছে। দ্বিতীয় বিবাহে রাজাকে প্ররোচিত করার পেছনে তার ভূমিকা ছিল। সেক্ষেত্রে প্রথা-মাফিক মন্ত্রীদের মতোই সেও আপন স্বার্থসিদ্ধির অর্থাৎ কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধ রাজা আরো কিছুদিন ক্ষমতায় থাকলে তার লাভ—এ উদ্দেশ্য তার ছিল। শরৎকুমার বলতে গেলে নরেন্দ্র চরিত্রের স্বরূপকে আরো একটু পরিস্ফুট করে তোলার উদ্দেশ্যেই চিত্রিত। তুলনায় বিদূষক প্রিয়ম্বদ কিছুটা আকর্ষণীয় চরিত্র। রঙ্গ-ব্যঙ্গ, হাস্য-পরিহাস তার চরিত্রে বেশ ভালই ফুটেছে। মূলত তারই যুক্তিজাল-নির্ভর প্ররোচনাতেই রাজা বীরেন্দ্র দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহী হন। খুব স্বল্প পরিসরে হলেও সুরমা, বিমলা এবং দুই নামহীন প্রজার মতো অনভিজাত সাধারণ চরিত্রগুলি তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

৪. সীমাবদ্ধতা

'বসন্তকুমারী নাটকে'র কাহিনীর অবতারণা যেন 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' — এই আপ্তবাক্যের সারবত্তাকে প্রতিপন্ন করবার জন্যেই। তাই পূর্ব থেকেই এর পরিণতি যেন অনেকটা নির্দিষ্ট। কাহিনীর বিস্তৃতি, নাটকীয় সংঘাত কিংবা চরিত্রের বিকাশ এখানে যথাযথভাবে পরিচর্যা লাভে সমর্থ হয়নি। অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘ সংলাপ 'বসন্তকুমারীর' নাট্যিক গুণ ক্ষুন্ন করেছে। এই নাটকে সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী রেবতীর রূপযৌবনের বর্ণনা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় তার বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[১৪] কেননা প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ রঙ্গভূমিতে বিমলা বলছে, রেবতী 'এখনও ১৪ পেরোয়নি।'[১৫] এছাড়া নাটকে কোন বিশেষ চরিত্র কর্তৃক অন্য বিশেষ চরিত্রকে কখনো 'আপনি' কখনো 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়।[১৬] এই বিভ্রান্তিকে অবশ্য কাজী আব্দুল মান্নান বলেছেন, 'ছাপার ভুলেও এ বিভ্রাট ঘটতে পারে।'[১৭] কিন্তু ছাপার ভুলের চাইতেও যেটি দর্শক পাঠকদের বেশি করে মনে হয় তাহল নাট্যকারের অমনোযোগিতার কারণেই এই বিভ্রাট হওয়া সম্ভব।

৫. সাদৃশ্য

বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রথম মৌলিক বিয়োগান্ত নাটক বলে অভিহিত জি.সি. গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস' (১৮৫২)-এর সঙ্গে 'বসন্তকুমারী নাটকে'র কাহিনী ও ভাবের মিল লক্ষ করা যায়। অনেকে 'বসন্তকুমারী'তে 'কীর্ত্তিবিলাসে'র ছাপ আছে বলে মনে করেন।[১৮] বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা নিয়ে বিড়ম্বনার কাহিনী 'কীর্ত্তিবিলাসে' বর্ণিত। হেমপুর অধিপতি মহারাজ চন্দ্রকান্তের দুই পুত্র – জ্যেষ্ঠ যুবরাজ কীর্ত্তিবিলাস এবং কনিষ্ঠ মুরারি। বিপত্নীক, বৃদ্ধরাজা তরুণী নলিনীকে বিয়ে করেন। সপত্নীপুত্র যুবরাজ কীত্তিবিলাসকে শাস্তি দিতে রানী রাজার কাছে তার বিরুদ্ধে কামাতুরতার অভিযোগ আনেন। স্ত্রৈণ রাজা প্রথমে পুত্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেন এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে তা রদ করেন। আর তখনই অকস্মাৎ পীড়িত হয়ে রাজা মৃত্যু বরণ করেন। কীর্ত্তিবিলাসের প্রাণদণ্ড হয়েছে ভেবে তার স্ত্রী সৌদামিনী আত্মহত্যা করেন। কীর্ত্তিবিলাসও ফিরে এসে তা দেখে আত্মঘাতী হয়। এই কাহিনীর প্রভাব 'বসন্তকুমারী'তে থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, 'কীর্ত্তিবিলাস' "নাটকটি অভিনীত তো হয়ই নাই, পাঠ্যবই রূপেও চলে নাই।"[১৯] সে কারণে মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মনে করেন ঃ

> সমকালীন সাহিত্যিকদের উপর এ নাটকের কোন প্রভাব পড়েনি বলেই মনে হয়, কারণ কীর্ত্তিবিলাস অভিনীত হয় নি এবং পাঠ্য হিসাবে গৃহীত হয় নি।[২০]

যাইহোক, উভয় নাটকের মধ্যে কাহিনীগত সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিক প্রকরণ ও সংলাপ রচনার দিক থেকে 'বসন্তকুমারী' উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রচনা। কীর্ত্তিবিলাস ঈশ্বরগুপ্তীয় ঢং-এর প্রাচীন গদ্য-পদ্যে রচিত কিন্তু বসন্তকুমারী সাবলীল গদ্যে লেখা। 'বসন্তকুমারী নাটকে'র কাহিনী সু-সংবদ্ধ, সংলাপ সাবলীল ও প্রবহমান। মুনীর চৌধুরীর মন্তব্যও তাই প্রণিধানযোগ্য ঃ

> কিন্তু যা জি.সি. গুপ্তে নেই, তা হল বসন্তকুমারীর কাহিনী গ্রন্থনে সুসংবদ্ধতা, সংলাপের বিচিত্র চাতুরী এবং এক সর্বাঙ্গীণ প্রাণবন্ত ভাবপরিমণ্ডল।[২১]

এছাড়া মূলভাবের ক্ষেত্রে 'কীর্ত্তিবিলাসে' সপত্নীপুত্রের প্রতি সপত্নীর তীব্র ঈর্ষা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতাই ছিল মূল। কিন্তু 'বসন্তকুমারী'তে নারীর কামনা বাসনা অধিক প্রাধান্য লাভ করেছে।

তবে মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' দ্বারা তিনি অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। মশাররফ যে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' ভালভাবেই পড়েছিলেন তাঁর বিভিন্ন রচনায় তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'র ত্রয়োদশ নথিতে বিভিন্ন লেখকের অন্য কয়েকটি রচনার সঙ্গে মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'ও উল্লিখিত হয়েছে।[২২] 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে গদাধরের স্বগতোক্তি প্রায় হুবহু মিল লক্ষ করা যায় 'বসন্তকুমারী নাটকে'র প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বর্ণিত বিদূষক প্রিয়ম্বদের স্বগত-ভাষণে। অনুরূপ আরও একাধিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ছোটখাট মিল লক্ষ করা যায়। তবে মধুসূদনের প্রহসনটির সঙ্গে মশাররফের এই নাটকের মূলভাবের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

নাট্যশিল্প বিচারে 'বসন্তকুমারী নাটকে' কিছু দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু তবু নাট্য কৌশলের দিক থেকে সে যুগের দৃষ্টিতে 'বসন্তকুমারী' বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি। বিশেষত এতে মানব চরিত্রের বিচিত্র রহস্য, বাস্তব সংসারের জটিলতা ও সমাজ জীবনের প্রতি নাট্যকারের গভীর ঔৎসুক্য বিদ্যমান। "মানুষের দেহাশ্রিত কামনা বাসনার যে বিচিত্র অভিব্যক্তি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তার প্রথম রূপকার মীর মশাররফ হোসেন এবং এ ধারায় তাঁর প্রথম রচনা বসন্তকুমারী নাটক।"[২৩] আর মুনীর চৌধুরীর ভাষায় বলা যায়, "এজিদ-জায়েদার সার্থক স্রষ্টার শিক্ষা-নবিশিকালের এই রচনা ভবিষ্যৎ পরিণতির বীজ বহন করে।"[২৪]

জমীদার দর্পণ

১. ভূমিকা

'জমীদার দর্পণ'[২৫] (১৮৭৩) মশাররফ্ হোসেনের সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং পরিণত নাটক। মশারফের সাহিত্যিক খ্যাতি যে গ্রন্থদুটির উপর অধিক নির্ভরশীল সেই 'বিষাদসিন্ধু' ও 'জমীদার দর্পণে'র মধ্যে দ্বিতীয়টিই আধুনিক পাঠকের কাছে অধিক গুরুত্বের। আজ থেকে ১২৭ বছর আগে রচিত হয়েও আজও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। এর কারণ 'জমীদার দর্পণে'র বিষয়বস্তু এবং তার treatment। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, রচনার গুণেই লেখক টিকে থাকেন। সে কথা সত্যি। শুধু তাই নয় লেখার গুণে আমরা বহু সময় পুরোনো রচনাকে নূতন করে আবিষ্কার করি। মশারফের 'জমীদার দর্পণ' প্রসঙ্গে সে কথা বলা যায়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হবার পর তা দীর্ঘদিন লোক চক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিল। এমনকি নাটকটি আদৌ কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল কিনা তাও বলা যায় না।[২৬] অথচ জাতীয় রঙ্গমঞ্চে তার অভিনীত না হবার বিশেষ কারণ ছিল না। নাটকটিকে নূতন করে আবিষ্কার করলেন ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে নাটকটিকে পুনরায় লোকচক্ষুর সমক্ষে নিয়ে এলেন। আব্দুল হাই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখলেন। এই ভাবে নাটকটি আবার পুনঃপরিচিত হলো।

আধুনিককালে এই নাটকটির বহু পরিচিতির কারণ তার বিষয়বস্তু এবং তার ব্যবহার। এই নাটকেই মশাররফ প্রথম সমকালীন প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ব্যবহার করলেন। রূপকথার রাজ্য থেকে, কল্পনার ভাব-জগৎ থেকে সরে এসে প্রত্যক্ষ বাস্তব পরিপার্শ্বের দিকে চোখ মেলে তাকালেন। আগের গ্রন্থগুলিতে মীর সাহেব দুটি কাজ করেছেন। প্রথমত শিক্ষানবিশি করে গল্প গ্রন্থন আর ভাষায় তা প্রকাশের শক্তি আয়ত্ত করেছেন। কতোটা পেরেছেন সে প্রশ্ন নয় কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল এই ভাষার উপরে দক্ষতা বাড়ানো এবং গল্প বলবার কৌশল শেখা। সেই সঙ্গে তিনি যে গল্প বলেছেন সেই গল্পে কল্পনাশক্তিকে কিছুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে নিজের মতো কল্পজগতের একটি রূপালেখ্য রচনা করতে চেয়েছেন। এও এক অর্থে শিক্ষানবিশি ; এ কল্পনার উপরে শিক্ষার অধিকার খাটানো। বলা দরকার

ভাষাশিক্ষায় মশাররফ দক্ষতা অর্জন করেছেন। গল্প বলায়ও যৎকিঞ্চিৎ সিদ্ধি আয়ত্ত করেছেন ; কিন্তু কল্পনাশক্তির সীমানা বিস্তার কিংবা কল্পনায় এবং সুপরিকল্পিত জগৎ রচনা করবার শক্তিতে ঘাটতি থেকে গিয়েছে। এই কারণে বারবার আমরা যে কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছি তা হল কল্পনার জগৎ নির্মাণের ক্ষমতার চেয়ে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক ও সমাজপটে মানুষের অবস্থান বিচারে মীর সাহেবের হাত ভালো খোলে। সেখানে তিনি সহজ স্বাচ্ছন্দ্য পান। এই কারণে তাঁর "জমীদার দর্পণ" তাঁর শিল্পিমনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিষয়বিন্যাসের সঙ্গতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছিল। এই শ্রেণীর রচনা 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী' বা 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' তাঁর শোনা কাহিনী, চোখে দেখা কাহিনী নয়। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। দীনবন্ধু মিত্র সামাজিক বৃক্ষে আরূঢ় বাঁদরকে হয়তো লাঙ্গুল শুদ্ধ আঁকতে পারতেন[২৭] মশাররফেরও সেই শক্তি ছিল, কিন্তু তিনি সেই সামাজিক ঘটনাকে কিঞ্চিৎ রূপকায়িত এবং প্রত্যক্ষতার দায়মুক্ত করে তুলতে গিয়ে সব সময় ঠিক সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেন নি। 'জমীদার দর্পণ' কিন্তু সে দিক থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যক্ষতার দায় থেকে মুক্ত করতে 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে তাঁকে আড়াল আশ্রয় করে গল্প বলতে হয়েছে। এই আড়াল দেওয়ার কাজটি প্রত্যক্ষ ঘটনার সাহিত্যিক abstraction, ঠিক মতো না হলে তা রচনা হিসেবে স্বাদু হয়ে ওঠে না। 'জমীদার দর্পণে' তিনি প্রত্যক্ষকে সাধারণীকৃত করেছেন কিন্তু ঘটনাকে আড়াল করবার প্রয়োজন হয়নি। অন্যপক্ষে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে প্রত্যক্ষকে আড়াল করতে হয়েছে কিন্তু সাধারণীকরণ হয়নি। এই কারণে সব সমালোচকের চোখেই 'জমীদার দর্পণে'র অনন্যতা ফুটে উঠেছে। 'জমীদার দর্পণে'র আর একটি লক্ষনীয় দিক লেখকের দৃষ্টি ভঙ্গিগত অবস্থান। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যও সাহিত্যিক রচনাকে গুণ-গুরুত্বে বিশিষ্টতা দেয়। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনটিকে অনেকেই আত্মসমীক্ষণ বলে মনে করেন। কবি নিজেই এখানে নিজের বিশেষ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী চরিত্র উদ্ঘাটন করে নিজের অবস্থানকেই যেন সমালোচনা করেছেন। মীর মশাররফ–এর পক্ষেও অনেকটা সেই রকম আত্মবিখণ্ডন এই 'জমীদার দর্পণ'। তিনি এই গ্রন্থটির 'নিবেদন' অংশে বলেছেন ঃ

> নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় 'জমীদার দর্পণ' সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভালমন্দ বিচার করিবেন।[২৮]

এ হল সেই শিল্পীর আত্মনিরীক্ষা। তবে নিরাসক্ত নিরীক্ষা কিনা তা বলা যায় না।

এইখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। এই নাটক লেখক কেন লিখলেন ? যিনি রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যা নিয়ে 'রত্নবতী' ও 'বসন্তকুমারী'র মিলন বিরহ বর্ণনার আত্মনিরূপিত জগতে স্বচ্ছন্দ বিহার করছিলেন কেন সেখান থেকে তিনি নেমে এলেন ?

এমন নয় যে নিরাসক্ত নিরীক্ষা না হলে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। হয়তো ব্যক্তিক আবেগই মৌল অনুভূতি হিসেবে সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু করে। এমন কোনো তাৎক্ষনিক আবেগ এই নাট্যসৃষ্টির মূলে কার্যকরী ছিল কিনা আজ আর

জানবার উপায় নেই। তবে নাট্যকার 'প্রস্তাবনা' অংশে নটের সঙ্গে সূত্রধারের কথোপকথনে যে ভাবে জমিদার শ্রেণীকে আক্রমণ করলেন তাতে মনে হয় কোনো তাৎক্ষনিক উত্তজনায় তাঁর শিল্পীমন আলোড়িত হয়েছিল। সম্ভবত কোনো প্রত্যক্ষ ঘটনার উত্তেজক প্রেরণা এর ভূমিকা স্বরূপ কাজ করেছে। নাট্যকার জমিদার শ্রেণীকে 'জানোয়ার' বলে সম্বোধন করছেন, তাদের শেয়াল কুকুরের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছেন এবং বলছেন, "জানোয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।" (প্রস্তাবনা)। তাদের মোসাহেবদের লেজনাড়া কুকুর বলছেন। এইভাবে প্রত্যক্ষ আক্রমণ অন্তত সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে রীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু এ থেকে একটা জিনিস বোঝা যায়। এ সব উক্তির মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত Emotion প্রকাশ হয়ে পড়ে। সাহিত্যিক নিরপেক্ষতার তুলনায় প্রত্যক্ষ কোন সাময়িক ঘটনার উত্তেজক ভূমিকাই বড়ো হয়। মীর মশাররফ নাটকটির ভূমিকায় লিখেছেন, এই নাটকের 'কিছুই সাজানো নয়' সব 'অবিকল ছবি।' (প্রস্তাবনা)। অবিকল ছবি বলবার দ্বারা লেখক সম্ভবত বাস্তবচিত্র অনুসারে নাট্যচিত্র অঙ্কনের কথাই বুঝিয়ে থাকবেন। সমকালীন 'সোমপ্রকাশ' (৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮০/১৯ মে ১৮৯৩) 'জমীদার দর্পণে'র কাহিনীর বাস্তব ঘটনা সাপেক্ষতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছিল।[২৯] মশাররফ নিজে তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরীতে লিখেছেন—

> 'জমীদার দর্পণ' হাতে লিখিয়া আমার বাটীতে কুমারখালিতে কয়েকবার অভিনয় করা হয়। শেষ অভিনয় দিনে আনারমোল্লাকে ['এই মোল্লার স্ত্রীই জমিদারের অত্যাচারে প্রাণ হারাইয়াছিল' পাদটিকা] উপস্থিত করিয়া দর্শকগণকে দেখান হইয়াছিল। সত্যঘটনা মূলক নাটক অভিনয় সময় নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই জীবিত।[৩০]

লেখক স্পষ্টই বলেছেন এ নাটক 'সত্য ঘটনা মূলক'। সুতরাং এর চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর কিছুই হতে পারে না। এর সঙ্গে 'উপহার' অংশে লেখকের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যায়। তিনি পূজ্যপাদ মীর মহম্মদ আলী সাহেবকে গ্রন্থটি উপহার দিয়ে লিখেছেন–

> সামান্য উপহার স্বরূপ, আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় 'জমীদার দর্পণ' সম্মুখে ধারণ করিতেছি। একবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। অনেক শত্রু দর্পণখানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।[৩১]

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় 'জমীদার দর্পণ' অনেকের মনে রোষের উদ্রেক করেছিল। কিন্তু লেখক নিজেই সে কাজ করতে কলম ধরেছিলেন। তিনি জমিদারদের মুখ এই দর্পণে তুলে ধরবার কাজই করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, " 'জমীদার দর্পণ' সম্মুখে ধারণ করিতেছে, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন।" (পাঠকগণ সমীপে নিবেদন)। অর্থাৎ এই নাটকটিকে তিনি নক্‌শা শ্রেণীর বাস্তব ঘটনার অনুকৃতিমূলক চিত্ররূপে উপস্থাপিত করেছেন। যা দেখে জমিদার শ্রেণী নিজের প্রতিকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবেন।

২. পটভূমি

জমিদার শ্রেণীর এই চিত্র অঙ্কন করবার পিছনের পটভূমিটি কীরকম ছিল ? একথা ঠিক যে জমিদার শ্রেণীর জীবনে অনেক রকম কদাচারের দৃষ্টান্ত ছিল, তার কিছু কিছু সাহিত্যকারদের লেখায় প্রকাশিত হয়েও ছিল। কিন্তু এ

নিতান্ত ব্যক্তিমনের আকস্মিক উদ্বেগজনিত রচনা নয়। বাঙলাদেশের সমাজ ইতিহাসের একটি ঘনিষ্ট সংযোগে এর রচনার মানসপ্রক্রিয়া কার্যকরী হয়েছিল। 'নীলদর্পণ' নাটক যেমন নীলবিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত হয় তেমনি 'জমীদার দর্পণ' নাটকের পিছনে ছিল সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহের (১৮৭১-৭৬) পটভূমি। ১৮৭১ সালে পাবনার সিরাজগঞ্জের জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক সাধারণের এক অভূতপূর্ব বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। ক্রমে তা সিরাজগঞ্জ থেকে সমগ্র পাবনা ও বগুড়া জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। জমিদারী খাজনাবৃদ্ধি এবং প্রজা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহে হিন্দু মুসলমান মিলিত ভাবে অংশ গ্রহণ করে। পরিণতির বিচার করলে বলতে হয় নীল বিদ্রোহের মতোই এ বিদ্রোহ গুরুত্ব পেয়েছিল। কারণ এ কেবল জমিদারের শোষণ পীড়নের কাহিনীকেই জন সমক্ষে প্রকাশ করে থেমে যায় নি বরং জমির উপর প্রজার দখলীস্বত্বের বিধান জারী করে ইংরেজ সরকারকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' প্রণয়ন করতে বাধ্য করে।[৩২]

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়ে এই আন্দোলন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। আর এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মীর মশাররফ 'জমীদার দর্পণ' লিখে প্রকাশ করেছিলেন। এই নাটকের মধ্যে হয়তো জমিদারদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহকে রূপায়িত করা হয় নি—সামগ্রিকভাবে কৃষক বিদ্রোহের প্রকৃতি যদি নাটকে উপস্থাপিত হতো তা আমাদের সামাজিক পটভূমির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে পারতো। কিন্তু নাটকটি পটভূমির পরিবেশগত সাহায্য লাভ করতে পেরেছিল বলেই মনে হয়। কেননা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো একজন সমালোচক এই গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন–

> আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রোয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য।[৩৩]

এ থেকেই বোঝা যায় কৃষক আন্দোলনের পটভূমি নাটকটির পক্ষে কীরকম উপযোগী হয়েছিলো এবং নাটকটি কৃষক আন্দোলনের পক্ষেই বা কতোটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো।

৩. শিল্প ও শিল্পী

মশাররফ্ নাটকটির 'নিবেদন' অংশে লিখেছেন "জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয় স্বজন সকলেই জমীদার।" অথচ তাঁর জীবনী থেকে জানতে পারি তিনি জীবনের অধিকাংশ দিন অন্যের এস্টেটে চাকরি করে কাটিয়েছেন। অর্থাৎ জন্মগতভাবে জমিদার হলেও কার্যত মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী শ্রেণীর মানুষ ছিলেন মীর মশাররফ। অবশ্য একথা বলা ঠিক হবে না যে তাঁর শ্রেণীগত রূপান্তর ঘটেছিল। তবু 'জমীদার দর্পণে' তাঁর অবস্থান আপাত দৃষ্টিতে জমিদার শ্রেণীর বিপক্ষেই ছিল। আর এই কারণে তিনি স্ব শ্রেণীর বিরাগভাজনও হয়েছিলেন। তবু একে নিশ্চয় শ্রেণীগত রূপান্তর মনে করা ভুল হবে। যদিও মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের সূচনা হয়েছে তবু তার পরিমাণ অতি নগন্য। মশাররফ রাজনীতি ক্ষেত্রে সেই ভূস্বামী শ্রেণীরই মানুষ। প্রজাদের প্রতি তাঁর যে সহানুভূতি তাকে শ্রেণীগত পরিচয় না দিয়ে বিশেষ ঘটনাগত বলা যায়। আবদুল আউয়াল[৩৪] লিখেছেন মীর সাহেবের মনে একটা

"দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল"। তিনি দ্বন্দ্বে পড়েছিলেন কথাটা সহজভাবে গ্রহণ করবার মতো প্রমাণের অভাব। অবশ্য 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়ও প্রজার প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রমাণ সাহিত্যিক রচনাগুলিতে নেই। মীর সাহেব কি কোনো অত্যাচার বিশেষের দ্বারা অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে জমিদার শ্রেণীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করে এ নাটকটি লেখেন ? এবং এই সমালোচনার মূলে কি শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষার কোনো অন্তরীণ তাগিদ ছিলো ? নাট্যকার জমিদার শ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণের কোনো চিত্র আঁকেন নি। তাঁর অনেক আগে অনেক জোরালো ভাবে অক্ষয়কুমার দত্ত জমিদারের প্রজাশোষণের কাহিনী 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন', নামক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছিলেন ঃ

> 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক' — এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গালার ভূস্বামীদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি কখন কি উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলেবলে কৌশলে তাহারদিগের যথাসর্বস্ব হরণে একাগ্রচিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন।[৩৫]

অক্ষয়কুমার দত্ত বলে দিয়েছিলেন জমিদারেরা প্রজাদিগের যথাসর্বস্ব হরণে প্রতিজ্ঞারূঢ়। এরপর বঙ্কিমচন্দ্রও 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে লিখেছিলেন জমিদারেরা 'বাঙালী কৃষকের শত্রু'।[৩৬] মশাররফ কিন্তু এই অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র রচনা করলেন না। (সেইখানেই শ্রেণীগত স্বার্থ উদ্ঘাটন হতে পারত)। তিনি 'জমীদার দর্পণ' রচনা করে তাদের যে মুখ দেখালেন তা কামকলঙ্কিত বহুভোগ কালিমা জর্জর মুখচিত্র। এই নব্য জমিদার শ্রেণীর নীতিবিহীন বিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, লাম্পট্য নিয়ে অনেক লেখাই হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্র (আলালের ঘরের দুলাল, ১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচার নক্সা, ১৮৫৯), মধুসূদন দত্ত (বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, ১৮৬০) অনেকেই এসব লিখেছেন। মীর মশাররফ উনিশ শতকে রচিত দর্পণ শ্রেণীর নাটকের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। এই দর্পণ শ্রেণীর নাটক এক সময় বাংলা সাহিত্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) থেকেই এর সূচনা। 'নীলদর্পণ' প্রকাশের তের বছর পরে 'জমীদার দর্পণ' লেখা হয়। 'জমীদার দর্পণে'র আগে আর মাত্র দুটি দর্পণ নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। একটি বাঙালী সমাজের শিষ্টাচারের অভাব নিয়ে লেখা অজ্ঞাতনামার 'সাক্ষাৎ দর্পণ' (১৮৭১) আর অন্যটি প্রিয়লাল দত্ত ও ললিতমোহন শীলের 'ভারত দর্পণ' (১৮৭২)। এরপর আরও অনেকগুলি দর্পণ নাটক প্রকাশিত হয়।[৩৭] 'নীলদর্পণ' যে রকম সার্বিকভাবে নীলকরদের অত্যাচারকে উদ্ঘাটিত করেছে লেখকেরও অনুরূপ ইচ্ছা ছিল। বঙ্কিম এই উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন তাঁর সমালোচনায়, "নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্যে।"[৩৮] মীর মশাররফ সাহিত্যে প্রচলিত যে ধারা সেই ধারা অনুসরণ করেই কেবল জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের একটি নবচিত্র উদ্ঘাটিত করলেন। আমরা ভক্তপ্রসাদের যে চরিত্র দেখেছি এও তারই অনুরূপ চিত্র, কেবল নাট্যপরিণতিতে মধ্যুসূদন যেখানে সংহত এবং একমুখী মীর মশাররফ সেখানে বিস্তৃত এবং প্রজার সামাজিক অবস্থানও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। জমিদার শ্রেণীর দর্পণবিশেষ হয়েও মীর কেবল এই লাম্পট্য এবং ভোগচিত্রের বাইরের কোনো চরিত্র আঁকতে পারেন নি। সে সুযোগ তাঁর ছিল কিন্তু তা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মীর মশাররফ এই নাটকে হায়ওয়ান আলীর মুখে বার

বার তাঁর পূর্ববর্তী জমিদারদের অত্যাচার পীড়নের কথা বলে নিজের অক্ষমতার জন্য শোচনা করেছেন ঃ

> এখন কি আর সেদিন আছে ? এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কর্ম্ম করেছি, সাবেককাল হলে আর এত ভাবতে হোতো না। (২/৩)।

এই উক্তি দ্বারা নাট্যকার হায়ওয়ানের আরও অনেক অনুরূপ কীর্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং এই চিত্রে এবং হায়ওয়ানের উক্তিতে কথিত 'কতকাণ্ড' মূলত যে তাদের লাম্পট্য বিষয়ক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীর দোষ বা তাদের প্রকৃতি বলতে নাট্যকার তাদের লাম্পট্যকেই প্রধানত বুঝিয়েছেন, তাদের অন্যতর অর্থনৈতিক শোষণের চিত্ররচনাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। অবশ্য আবু মোল্লা স্ত্রীর হত্যাজনিত ঘটনার পর বিচারের প্রহসন পর্যন্ত সম্পত্তির অধিকার থেকে বিচ্যুত না হলেও বিচার সমাপ্ত হবার পর সে সম্পত্তি থেকে উচ্ছিন্ন হয়েছে এবং গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এর দ্বারা অর্থনৈতিক পীড়নের চিত্রও পাওয়া যায়। কিন্তু একে অর্থনৈতিক শোষণ বলা যায় না। যাই হোক, এই লাম্পট্য-দোষে সেকালের বহু জমিদার যে দুষ্ট ছিলেন তা সত্য। আর মশাররফ তাকেই জমিদার শ্রেণীর চরিত্র বা তাঁর নির্মিত দর্পণে সেই মুখকেই দেখাতে চান। সুতরাং প্রজার প্রতি তাঁর সহানুভূতি কোনো গভীর অর্থনীতিক চেতনা থেকে উৎসারিত হয়নি। তা কোনো সচেতন মনের প্রজা সংরক্ষণী চিন্তাভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তবে পূর্ববর্তী রচনাগুলির সঙ্গে 'জমীদার দর্পণে'র একটি স্বাতন্ত্র্য হল এই যে আগের লেখাগুলিতে মুসলমান সমাজের চিত্র বা চরিত্র আমরা পাইনি। মুসলমান লেখকেরাও তা উদ্ঘাটিত করেন নি। 'জমীদার দর্পণ' মুখ্যত মুসলমান সমাজের চিত্র তুলে আনল। এই কারণে ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন, "এ লেখার শিল্পমূল্য যত, তাথ্যিক মূল্যও তার চেয়ে কম নয়"।[৩৯]

যেমন জমিদার শ্রেণীর চেতনা থেকে মীর মশাররফ মুক্ত নন তেমনি সেকালের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মতো ইংরেজদের শুভশক্তির উপরেও তাঁর আস্থা কখনো বিচলিত হয়নি। সেকালের বহু বুদ্ধিজীবী মানুষের ধারণা ছিল ইংরেজ-রাজ মঙ্গলজনক। কেবল মধ্যবর্তী কিছু অক্ষম প্রশাসকই প্রজাদের 'দুঃখের কারণ'। এই কারণেই দেখতে পাওয়া যায় ভারতেশ্বরীর কাছে প্রজাদের পক্ষে কাতর আবেদন জানানো তখনকার সাহিত্যে একটা প্রথায় পরিণত হয়েছিলো। তখন পর্যন্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহলে এ রকম একটি বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজ শাসনের দ্বারাই প্রজাদের জীবনের সর্বাঙ্গীল কল্যাণসাধন সম্ভব। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে হানিফ জমিদারের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার পথ না দেখে ইংরেজ রাজত্বের সুবিচারের উপর ভরসা করেছিল 'দেখি এ কুম্পানির মুলুকে এনছাপ আছে কি না।' 'এনছাপ' যে সে পায়নি তার প্রমাণ জমিদারদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কৃষক বিদ্রোহ। অথচ এই সুবিচারের উপর বাঙালীবুদ্ধিজীবীর বিশ্বাস টলেনি। মীর মশাররফ তাঁর প্রায় সব লেখায় ইংরেজ-রাজত্বের জয়গান করেন। এও সেই জমিদার শ্রেণীর চরিত্রগত ইংরেজ তোষণ। মশাররফ এখানে ইংরেজ রাজত্বের প্রশাসা করেছেন দুভাবে। প্রথমত হায়ওয়ান আলির মুখে তিনি বলিয়েছেন ইংরেজ রাজত্বে আগের মতো অত্যাচার করবার সুযোগ নেই। আর অন্যদিকে প্রজাদের মুখে ভারতেশ্বরীর কাছে কাতর আবেদন জানিয়ে এই দুঃখ মোচনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন।

কাতরে ডাকি মা তোরে শুন মা ভারতেশ্বরী . . .

রক্ষ মা প্রজা কিঙ্করে, বিনয়ে মিনতি করি।

কিন্তু এই আহ্বান যে ব্যর্থ হয়েছে তা নাটকের শেষে ঈশ্বরনির্ভরতার কথায় স্পষ্ট হয়। এক সময় বাঙালী বুদ্ধিজীবী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ধারণা ছিল বৃটিশরাজ সুবিচার করবে, কেবল কোম্পানীর আইনেই ভারতবাসীর দুঃখ বাড়ছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর কোম্পানীর হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের হাতে যায়। কিন্তু তাতে আবুমোল্লার অবস্থার কোনো হেরফের হয় না। নাট্যকার এই নাটকের শেষে বিচার ব্যবস্থার যে চিত্র সংযুক্ত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাকে "অতি পরিপাটি" বলে প্রশংসা করেছিলেন। এই বিচার ব্যবস্থাই বলে দেয় ইংরেজদের বিচারপদ্ধতি কতো শূণ্যগর্ভ, বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ইংরেজ-নির্ভরতা কতো নিষ্ফল। লেখক তার ফলে নটের মুখে 'বিপদতারণ' ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবার কথা বলেছেন এবং প্রার্থনা জানিয়েছেন "তুমি দেব সর্বময়, কাতরে করুনাময় নাশ কর দীনভয় শ্রীপদ কমলধরি।" এইভাবে 'জমীদার দর্পণ' জমিদারের এবং ইংরেজ বিচারব্যবস্থার সার্বিক পীড়নের ও প্রহসনের চিত্র তুলে ধরে প্রজা সাধারণের জীবনের সম্মুখে নিঃসীম অন্ধকার এবং নিরন্তর শঙ্কাকে উপস্থিত করে। এই খানেই নাটকটির সাফল্য।

৪. নাট্যকাহিনী বিশ্লেষণ

জমিদার হায়ওয়ান আলীর বহুতম লম্পট্যের একটি চিত্র নিয়ে এই নাটকের কাহিনী রচিত হয়েছে। গ্রামের গরীব কৃষক আবুমোল্লার স্ত্রী সুন্দরী নুরুন্নেহারকে কীভাবে তার সম্ভোগের জন্য নিয়ে আসা যায় এই নিয়ে নাটকটির সূচনা। ইতিপূর্বে তার কাছে একাধিক সংকেত পাঠানো হলেও নুরুন্নেহার তা স্বীকার করেনি। তাই এবার ষড়যন্ত্র করে জমিদারের পেয়াদারা বিনাদোষে তার স্বামী আবুকে জমিদারী কয়েদে আটকে রাখে। এই সুযোগে অরক্ষিত নুরুন্নেহারকে জোর করে ধরে আনা হয়। হায়ওয়ানের বলাৎকারে গর্ভবতী নুরুন্নেহারের মৃত্যু হয়। তারপর বিচারের প্রহসন এবং বিচারে হায়ওয়ান বেকসুর খালাস পায়। এবং আবুকে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেশছাড়া করে।

'জমীদার দর্পণে'র এই গল্পটি জটিল নয়, তা সরল একমুখী কাহিনী। প্রজাপীড়নের নানাবিধ উপায় নিয়ে লেখক প্রজাদের জীবনের অসহায়তা এবং জমিদারের পীড়নের তীব্রতা দেখাতে চাননি। তিনি কেবল হায়ওয়ানের পরস্ত্রী লিপ্সা এবং তার ফলে প্রজার জীবনেরই অসহায়তা কী পর্যায়ে যেতে পারে তাই এ নাটকে দেখিয়েছেন। হায়ওয়ানের চরিত্রের যে দিকটি এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে তাকে লেখক জমিদার শ্রেণীর চারিত্র্য বলে দেখাতে চান। হায়ওয়ানের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি তুলে ধরবার জন্য তিনি একটি গল্প কাহিনী রচনা করেছেন। বিশেষ একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে কাহিনী গড়ে তোলার ফলে প্রসঙ্গটি হায়ওয়ানের বহুসংখ্যক লাম্পট্যের অন্যতম হয়ে উঠেছে। বিশেষ ঘটনার উপর আলো ফেলে নাট্যকার ঘটনাকে গল্পে রূপান্তরিত করেছেন। এইভাবে ঘটনাকে কাহিনীতে রূপান্তরিত করবার দ্বারা লেখক সৃজনী-শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন।

কাহিনীটি প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে অত্যন্ত সহজভাবে শুরু হচ্ছে। প্রথম দৃশ্যে হায়ওয়ানের সঙ্গে মোসাহেবদের

কথোপকথনের নাটকীয়তা প্রশংসনীয়।

হায়।—দেখেছো ?

প্র. মো।— হুজুর দেখেছি।

এই দেখার অর্থ পরে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল আবুমোল্লার স্ত্রী নুরুন্নেহারকে সম্ভোগ করবার উদ্দেশ্যে। নাট্যকার অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে এবং নাটকীয় উপস্থাপন দক্ষতায় এই প্রসঙ্গটিকে গভীরে নিয়ে গেছেন। ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে তিনি তাকে হাত করবার বহু চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। এবং শেষ চেষ্টা হিসেবে আবু মোল্লাকে বিনা অপরাধে ধরে আনিয়ে কৃষ্ণমণিকে পাঠিয়ে পুনরায় নুরুন্নেহারের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর ষড়যন্ত্র স্থির হয়। সেই অনুসারে পরের দৃশ্যেই পেয়াদারা আবুমোল্লাকে ধরে আনে। এখানে পেয়াদাদের চিত্রও অত্যন্ত সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে আবুমোল্লার উপর জমিদারের অন্যায় অত্যাচার ও পীড়নের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নুরন্নেহারকে কৃষ্ণমণি জমিদারের বৈঠকখানায় যাবার প্রস্তাব দেয় কিন্তু নুরুন্নেহার সে কথা অগ্রাহ্য করায় কৃষ্ণমণি ক্রুদ্ধ হয়। এই দৃশ্যে আমিরনের মুখে নাট্যকার বলিয়েছেন "ওদের মেয়ে মানুষ দেখলেই চখ টাটায়" এবং "বাজারের মেয়ে গুলো এসে কত লাঞ্ছনা দিয়ে যায় তবু নজ্জা নেই।" এর সঙ্গে আছে মেয়ে মানুষ নিয়ে তান্ত্রিক আচারের নিন্দা। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে জমিদারের আরেকটি দিক মদ ও গুলির নেশা দেখানো হল। এই অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যেই নুরন্নেহারের উপর বলাৎকার এবং তার মৃত্যু। নুরন্নেহার প্রজার জীবন-রক্ষার তিনটি শক্তি জমিদার, মহারানী এবং খোদার কাছে নিষ্ফল প্রার্থনা জানিয়ে প্রাণত্যাগ করে। এইভাবে প্রথম দৃশ্যের জমিদারের সম্ভোগ-তৃষ্ণা একটি নিরপরাধ নারীর জীবনের পরিণতি এবং এক প্রজার সর্বস্ব-নাশের কাহিনী হয়ে দাঁড়ায়।

নাট্যকার প্রথম দুই অঙ্কের কাহিনীতে unity of time, place এবং action তিনটিই বজায় রেখেছেন। দুটি অঙ্কের ঘটনা ঘটেছে কোশলপুরে এবং দৃশ্যগুলির অধিকাংশেরই স্থান জমিদারের বহির্বাটী। কাহিনীর ক্রিয়া নুরন্নেহারের প্রতি জমিদারের কামনার প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু হয় এবং তাতেই শেষ হয়। সুতরাং ক্রিয়াগত ঐক্যও নাট্যকার বজায় রেখেছেন। আর কালের দিক থেকে কাহিনীর প্রথম দুটি অঙ্কের ঘটনা একদিনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় প্রথম দুটি অঙ্কের কাহিনীর মধ্যেই নাট্যকারের নাট্যক্রিয়া রচনার শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের কাহিনী পৃথকভাবে নাট্য রূপায়িত করে দেখাবার প্রয়োজনই ছিল না। যেমন প্রথম দুটি অঙ্কের কাহিনী আরও সংহত করার উপায় ছিল। নাট্যকার সেই সংহতির নাট্যিক-শক্তি আয়ত্ত করতে পারেননি। নাটকে সব ঘটনার উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই, কোন ক্রিয়ার পরিস্ফুটনের জন্য যা দরকার তাকেই দেখাতে হয়। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে হায়ওয়ান যেখানে ডাকলেন 'ওরে জামাল' সেখানেই দৃশ্যের সমাপ্তি হতে পারতো। আবুমোল্লার জন্যে অতিরিক্ত দুটি দৃশ্য লেখক জমিদারের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ চিত্রণের জন্যই ব্যয় করেছেন। তেমনি আমিরণ নুরন্নেহারের কথোপকথন থেকে জমিদারের নারীলিপ্সার প্রসঙ্গ বুঝিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণমণিরা যেমন নারী হয়েও নারীর শত্রু, সে কথা বোঝা যায় সেই দৃশ্যে, তার ক্রুদ্ধ ভাষণ (খাঁ সাহেবের কাছে এই সতীপনার যা শোনাতে হয়

তা হবে অখন! শেষে জান্তে পারবে আমি কেমন কৃষ্ণমণি) অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু গুলির আড্ডার দৃশ্যটির পৃথকভাবে দেখানোর কোনো প্রয়োজন ছিলনা। তাছাড়া তৃতীয় অঙ্কে বিচারের দুটি পৃথক দৃশ্যের উপস্থাপনের দরকার ছিলনা বলেই মনে করি। সেই কারণে মনে হয় নাট্যকার দৃশ্য-যোজনা ও কাহিনীগত সংহতির গুণটি ঠিক আয়ত্ত করতে পারেননি। সমগ্র তৃতীয় অঙ্কটি কাহিনীর পরিণাম বটে—আবুমোল্লার অবস্থান বোঝানোর জন্যও প্রয়োজন—কিন্তু কাহিনীর সঙ্গে তার কালগত ঐক্য নেই, যাকে ঠিক ক্রিয়াগত ঐক্য বলে তাও এ নয়। অজিতকুমার ঘোষ তাই মন্তব্য করেন ঃ

> প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় অঙ্কেই নাটকের ঘটনা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং দর্শকদের কৌতূহলেরও সমাপ্তি ঐ অঙ্কে। . . . তৃতীয় অঙ্কে উপস্থাপিত দৃশ্যগুলি বাস্তব ও চমকপ্রদ বটে কিন্তু নাট্যরসের দিক দিয়া প্রয়োজনহীন।[৪০]

তবু বলা যায় নুরুন্নেহারের উপর বলাৎকার এ কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হলেও তার মূল লক্ষ্য প্রজার জীবনের নিরাপত্তাহীনতা। কীভাবে সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি জমিদারের লোভের ফলে আবু মোল্লা উচ্ছিন্ন ও দেশান্তরী হতে বাধ্য হল তাই দেখানো এ নাটকের লক্ষ্য। সেদিক থেকে দৃশ্য যোজনার সার্থকতা স্বীকার করতে হবে। আর এই কথাটি ভেবেই হয়তো ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, "নাট্যরূপের বাঁধুনি মোটামুটি সংহত"।[৪১]

৫. চরিত্র চিত্রণ

'জমীদার দর্পণ' নাটকের চরিত্রগুলি টাইপশ্রেণীর, কেউ ব্যক্তিচিহ্নিত মানুষ নয়। তারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে কিন্তু ব্যক্তিবোধের দ্বারা কেউ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। কেবল নাট্যকারের অভীষ্ট পূরণের জন্যই তাদের এই শ্রেণীর চরিত্রাভিনয় করতে হয়েছে।

'জমীদার দর্পণে'র কেন্দ্রীয় চরিত্র হায়ওয়ান আলী। নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র হায়ওয়ান আলীই নাটকীয় চরিত্র[৪২] হয়ে উঠেছে। 'হায়ওয়ান' শব্দের অর্থ জানোয়ার। তার এই নাম-পরিচয়ের মধ্যেই তার স্বরূপ প্রকাশিত। সেকালের অকর্মন্য লম্পট জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি সে। কোশলপুরের এই জমিদার একদিকে মোসাহেব বেষ্টিত অলস অকর্মন্য জীবনধারায় অভ্যস্ত ব্যক্তি, অন্যদিকে প্রজা নিপীড়নকারী, কুচক্রী ও পরস্ত্রীলোলুপ। এই দুর্দান্ত চরিত্রটির পাপ কাজ করতে যেমন দ্বিধা নেই, তেমনি পাপকাজ করবার পরেও তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। বহু নিরীহ রমনীর মতো নুরুন্নেহারও তার লালসার শিকার। সে তাকে অন্তঃসত্বা জেনেও তার সতীত্ব হানি করতে দ্বিধা করেনি। তার বলাৎকারের ফলে নুরুন্নেহারের প্রাণ যায়। একই সঙ্গে হায়ওয়ান আলী ভণ্ড ও কপট ধর্মাচারীও। নুরুন্নেহারকে করায়ত্ত করবার কৌশল হিসাবে তার স্বামী আবু মোল্লাকে আটক করার নির্দেশ দিয়ে তার অপকর্মের সহচরদের সে জানায় ঃ

> নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি। ততক্ষণ হারামজাদাকে ধরে আনুক। (১/১)।

সে কূটকৌশলী। আইন বা বিচারের প্রতি তার শ্রদ্ধা নেই, নিজের অর্থ এবং শক্তিই তার অস্ত্র। কৌশলে অর্থের

বিনিময়ে সে বলাৎকার বা হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তিও লাভ করে সহজে। তার অত্যাচারের পরবর্তী রূপ দেখা যায় আবুমোল্লার সর্ব্বস্ব হরণ করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে।

আবুমোল্লা নিরীহ দরিদ্র প্রজা। জমিদারের অত্যাচারের শিকার সে। কিন্তু সে নির্বিবাদী, প্রতিরোধহীন চরিত্র। সর্ব্বস্ব খুইয়ে জমিদারের লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে সে। স্ত্রীর শ্লীলতা হানি ও মৃত্যুর পরে অসহায় ক্রন্দন ও মহারানীর কাছে বিচার প্রার্থনা করা ছাড়া সে নিষ্ক্রিয়ই থেকে যায়। তার দুরবস্থা সহানুভূতি ও করুণা উদ্রেক করে।

জিতু মোল্লা ও হরিদাস বৈরাগী ধড়িবাজ, বকধার্মিক। জিতু মোল্লা চার বার হজ করেছে, সারারাত জেগে নামাজ পড়ে আর আল্লাহর নাম সর্বক্ষণ স্মরণ করে। হরিদাস বৈরাগীও গায়ে নামাবলি, কপালে তিলক, হাতে তুলসীর মালা নিয়ে অহরহ হরিনাম জপ করত। এই উভয় ধর্মপ্রাণ চরিত্রই আবার হায়ওয়ান আলীর পক্ষ নিয়ে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে তাদের প্রকৃত স্বরূপ চিনিয়ে দেয়। এ দুটি চরিত্র এ নাটকের মূল্যকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। এসব চরিত্র-সৃষ্টিতে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর চেয়ে তিনি কম দক্ষতার পরিচয় দেননি।

হায়ওয়ান আলীর অগ্রজ সিরাজ। সে হায়ওয়ান আলীর দুষ্কর্মের জন্যে তাকে ভর্ৎসনা করে ও ধিক্কার দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই নুরুন্নেহারের মৃত্যুতে সহোদরের বিপদাশঙ্কায় তাকে রক্ষা করবার জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ হেন চরিত্রের প্রতি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধাবোধ থাকে না।

জামাল জমিদার হায়ওয়ান আলীর চাকর। সে লোভী, অসৎ এবং হুকুম তালিমকারী নির্যাতক। আবু মোল্লাকে আটক করতে গিয়ে সে 'কোমর খোলাই' গ্রহণ করে আবার পরে আবুকে পীড়নও করে। তবে হায়ওয়ান আলীর একনিষ্ঠ চাকর হওয়া সত্ত্বেও সে তার সব কাজ অসঙ্কোচে মেনে নেয় নি। নুরুন্নেহারকে অপহরণ করার পর তার চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং সে এর ঔদিত্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এ নাটকে একমাত্র এই জামাল চরিত্রেই তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও বিবেক-দংশন আছে।

ডাক্তার কানিংহাম প্রাহসনিক ও নীতিবর্জিত চরিত্র। সেও পেশাগত নিষ্ঠা ও সততা প্রদর্শনে ব্যর্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারকের দোসর।

'জমীদার দর্পণে' নারীচরিত্র তিনটি – নুরুন্নেহার, আমিরন ও কৃষ্ণমণি। স্বল্পায়তন কাহিনীতে চরিত্রগুলি পূর্ণ বিকশিত নয়। একমাত্র নুরুন্নেহার চরিত্রেই স্বকীয়তা প্রকাশিত।

'জমীদার দর্পণ' নাটকের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু নুরুন্নেহার চরিত্র। তাকে অবলম্বন করেই কাহিনীর সূচনা ও সমাপ্তি। অধিকাংশ গ্রাম্য নারীচরিত্রের মতোই সেও পবিত্রতা, ধর্মশীলতার প্রতীক। অত্যাচারের প্রতিরোধে সে অক্ষম। তবু সে সতীত্ব রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প, স্বামীপ্রেমে একনিষ্ঠ ও জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষীণ কণ্ঠে হলেও প্রতিবাদকারী। সে জমিদারের যাবতীয় প্রলোভনকে উপেক্ষা করছে। জমিদার দূতী কৃষ্ণমণির মাধ্যমে কুপ্রস্তাব দিলে সে বলে–

> সে কাজ আমি পার্ব্বো না, জান থাকতে তো নয়। আগে আমায় খুন করুন, তারপর যা ইচ্ছে তাই কর্ব্বেন। (২/১)।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত হায়ওয়ান আলীর লালসা-লিপ্ত হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। অন্তিমকালে সে গভীর বেদনা ও আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়ে প্রথমে মহারানী ও পরে খোদার কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেছে। উনিশ শতকীয় স্খলিত চরিত্র জমিদারদের কামনা-বাসনার শিকার বঙ্গ-রমনীর এক প্রতীক চরিত্র নুরুন্নেহার। চরিত্রটি স্বাভাবিক ও গতিশীল।

আবু মোল্লার ভগ্নী অমিরণ এক বাস্তববুদ্ধিসম্পন্না, সহানুভূতিশীলা গ্রাম্য মহিলা। তবে চরিত্রটি স্বল্প সময়ের জন্যে আবির্ভাবের পরই মিলিয়ে গেছে—ফলে বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি।

কৃষ্ণমণি হরিদাস বৈরাগীর বৈষ্ণবী। সেও বৈরাগীর মতো নীতিবিবর্জিতা, অর্থলোলুপ ও কপটিনী। 'কূটনী' চরিত্রের আদর্শ ও আদলে সে চিত্রিত। সে হায়ওয়ান আলীর কু-কর্মের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। সে তাই নানাভাবে নুরুন্নেহারকে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করার চেষ্টা করে ও মিথ্যা বলে। আবার আবুমোল্লার বন্দিদশা ও পীড়নের কথা শুনে সে নুরুন্নেহারের সামনে কপট সহানুভূতি প্রকাশ করে বলে ঃ 'আহা-হা, এত করেছে? হা কৃষ্ণ !' স্বল্প উপস্থিতির মধ্যেও চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

৬. সমাজ-চেতনা

'জমীদার-দর্পণ' উনিশ শতকের সমাজের একটি নিখুঁত দর্পণ। বস্তুত সেকালের সমাজচিত্র অঙ্কনে ও সামাজিক আবেদন সৃষ্টিতে এর মূল্য অপরিসীম। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নবসৃষ্ট জমিদার শ্রেনীর উচ্ছৃঙ্খলতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রজাদের প্রতি পৈশাচিক অত্যাচারের দিকগুলি মশাররফ ব্যক্তিজীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জমিদার বংশের সন্তান হওয়ায় এবং জমিদারী সেরেস্তায় দীর্ঘদিন কাজ করায় তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ফলে "প্রত্যক্ষ সেই অভিজ্ঞতার ছবি জীবন্ত প্রাণোত্তাপে রসঘনিষ্ট হয়ে রয়েছে নাটকটি জুড়ে।"[৪৩]

মশাররফ হোসেন একদিকে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ অন্যদিকে আবার মহারানী ভিক্টোরিয়ার উপরও অনেকটা আস্থাশীল। ইংরেজ শাসনব্যবস্থার বিশেষত তার বিচারবিভাগের অপরিসীম ক্ষমতার প্রতি যে সশ্রদ্ধ অভিবাদন নাট্যকার এখানে করেছেন তা উনিশ শতকীয় পরিবেশেরই ফল। বিপন্ন নুরুন্নেহারের সকরুণ আবেদন মহারানী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে ঃ

> শুনেছি যে মহারানী সকলের বড় সাএবের উপরেও বড়, আমরা যেমন তোমার প্রজা তুমিও তেমনি তাঁর প্রজা। তিনি কি এর বিচার কর্ব্বেন না। (২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)।

অবশ্য মীরের এই মহারানী-প্রশস্তি সত্ত্বেও স্মরনীয় যে, এই নাটকে ইংরেজ জজ ম্যাজিস্ট্রেট চরিত্রগুলি বিচারদৃশ্যে তেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্কিত নয়।

আসলে সেকালের অনেক বাঙালী লেখক ও সমাজ কর্মীর মতো মশাররফও অন্যায় অত্যাচার দেখে ক্ষুব্ধ

হয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু এই সব অন্যায় অত্যাচারকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করেছেন। এটি যে একটা বিশেষ সামাজিক বা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল—এ উপলব্ধি তাঁর মধ্যে আসেনি[৪৪] বা এলেও হয়তো কৌশলগত কারণে তা ব্যক্ত করতে চাননি।

মশাররফ এই নাটকে এই প্রথম স্বসমাজকে স্পর্শ করেছেন এবং সমকালীন সমস্যার কথা ব্যক্ত করেছেন। শিল্পীর সহজাত সহমর্মিতার বশবর্তী হয়ে তিনি স্বসমাজের সমশ্রেণীর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে দ্বিধান্বিত হননি। এটি সেকালের প্রেক্ষাপটে তাঁর দুঃসাহসিকতারই পরিচয় দেয়। কেননা তাঁর আত্মীয় পরিজন ছাড়াও বহু জমিদার ছিলেন তাঁর স্বসমাজ-ভুক্ত।

এরই পাশাপাশি মুসলিম সমাজের অধঃপতনের আর একটি বিষয়ের প্রতি মশাররফ এই নাটকে (২/২) ইঙ্গিত করেছেন। অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত কিছু কিছু মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রসঙ্গ মশাররফ উল্লেখ করেছেন। এই ধর্মান্তর উনিশ শতকের নিম্নবঙ্গে কিছু কিছু সংঘটিত হওয়ার সংবাদ সেকালের পত্র পত্রিকায় পাওয়া যায়।[৪৫]

সেকালের সমাজের নানা প্ররোচনা সত্ত্বেও তিনি এখানে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ নির্ভীক মানসিকতারও পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে নানা কারণে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। মশাররফ সেদিকে না গিয়ে অর্থনীতিক শ্রেণী চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। এক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই সমানধর্মী। তাই 'জমীদার দর্পণে' দেখা যায় মুসলমান প্রজার উপর কেবল মুসলমান জমিদার অত্যাচার করেছে তা নয়। আদালতে অত্যাচারী জমিদারের পক্ষ সমর্থন করে সাক্ষ্য দিয়েছে হরিদাস বৈরাগী আর জিতু মোল্লা নামে দুই সম্প্রদায়ের দুই বকধার্মিক লোক। জীবনের অভিজ্ঞতায় মীর দেখেছিলেন যে, এই ধরনের চরিত্র ধর্মের নামে কিভাবে লোককে ঠকায় ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে; সেই অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে এই নাটকে।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচক নাটককে বলেছেন, "...a copy of life, mirror of custom, a reflection of truth."[৪৬] এই সত্যের আলোকে বিচার করলে 'জমীদার দর্পণে'র চিরন্তনতাকে অস্বীকার করা বড় সহজ নয়। নীলকরের অত্যাচার আর নেই, জমিদারের অত্যাচার এখন অতীতের বিষয়। কিন্তু সমকালের অবিকল ছবি পেতে 'নীলদর্পণ' এবং 'জমীদার দর্পণ' অবশ্য স্মরণীয়। নীলকর অত্যাচারের পক্ষে 'নীলদর্পণে'র ভূমিকা যতখানি 'জমীদার দর্পণ'কে ততখানি গুরুত্ব না দিলেও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য প্রজাদের মানসিকতা গঠনের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে এ গ্রন্থ সে যুগে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। সেদিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমান বাংলাদেশে আরিফুল হকের পরিচালনায় 'থিয়েটার' সম্প্রদায় যখন ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই 'অবহেলিত' বাংলা নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেন, তখন "দৈনিক বাংলা" পত্রিকার (৭.৭.৮৩) আলোচক নির্মল সেন বলেন ঃ

> মনে হবে মীর মশাররফ তীব্র ঘৃণা আর ভর্ৎসনা চোখে বলছেন, ১৮৭২ সাল নয়, ১৯৮৩ সাল।[৪৭]

সমালোচকের এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, বর্তমান সামাজিক অত্যাচার, নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে 'জমীদার

দপণ' নাটকটি আজও প্রাসঙ্গিক। তাই বলা যায়, নাটকটি মীরের তীক্ষ্ম সমাজচেতনার স্বাক্ষর।

৭. সমকালীন বাংলা নাটক ও জমীদার দর্পণ

'জমীদার দর্পণ' দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের প্রভাব-জাত বলে অনেকে মনে করেন।[৪৮] জনৈক সমালোচক এমনও মন্তব্য করেছেন, " 'জমীদার দর্পণে'র ওপর 'নীলদর্পণে'র প্রভাব বেশী যে স্থল বিশেষে সরাসরি অনুকরণ বলে ভ্রম হয়।"[৪৯] আসলে উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এই দুটি নাটকের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রথম করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন– "নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত 'নীলদর্পণে'র যে উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।"[৫০] এরপর অনেক সমালোচক এই দুটি নাটকের তুলনামূলক আলোচনা করেন।

বস্তুত 'জমীদার দর্পণ'-এর উপর 'নীলদর্পণে'র যে কিছু প্রভাব ছিল তা অনস্বীকার্য। তবে একে পুরোপুরি 'অনুকরণ' বলা চলে না। একথা সত্য যে নামকরণের মধ্যেই এই প্রভাব স্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকায় যেমন নীলকর সাহেবদের সামনে দর্পণ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন 'জমীদার দর্পণে'ও লেখক জমিদারদের সম্মুখে 'আপন মুখ আপনি' দেখতে দর্পণ তুলে ধরেছেন। তৃতীয়তঃ উভয় নাটকেই অত্যাচারের প্রতিকারের জন্যে ভারতেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে শরণ নেওয়ার কথা রয়েছে। চতুর্থতঃ চরিত্রগত দিক থেকে রোগ সাহেবের সঙ্গে হায়ওয়ান আলীর, সাধুচরণ ও রাইচরণের সঙ্গে আবুমোল্লার, ক্ষেত্রমণির সঙ্গে নুরুন্নেহারের এবং পদীময়রানীর সঙ্গে কৃষ্ণমণির সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষনীয়। এছাড়া পঞ্চমতঃ উভয় নাটকের প্রহসনাত্মক বিচারদৃশ্যের মধ্যেও সাদৃশ্য যথেষ্ট।

এতৎসত্ত্বেও উভয় নাটকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। "দুটি নাটকের বিষয়বস্তু, ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্রসৃষ্টি ভিন্ন ধরনের।"[৫১] প্রথমতঃ 'নীলদর্পণ' শেকসপীয়ারীয় রীতিতে লেখা পঞ্চাঙ্ক নাটক কিন্তু 'জমীদার দর্পণ' তিন অঙ্কে লেখা ক্ষুদ্রাকার নাটক। দ্বিতীয়তঃ 'নীলদর্পণে' সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসৃত হয়নি যদিও নাটকের সংলাপে সংস্কৃত প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু 'জমীদার দর্পণে' সংস্কৃত প্রস্তাবনা দৃশ্যের অনুরূপ প্রস্তাবনা দৃশ্য রয়েছে। তবে সংলাপ সংস্কৃত-প্রভাব মুক্ত।[৫২] তৃতীয়তঃ 'নীলদর্পণে' রয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাদের প্রতিনিধি বিদেশী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রজাদের বিদ্রোহের কথা। কিন্তু 'জমীদার দর্পণে' এদেশের শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি জমিদারের বিরুদ্ধে এদেশেরই কৃষিজীবী নিম্নবর্গের মানুষের ক্ষোভ, ঘৃণা ও বিদ্রোহ ঠাঁই পেয়েছে। চতুর্থতঃ 'নীলদর্পণে' ক্ষেত্রমণির উপর বলাৎকারের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সেই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু 'জমীদার দর্পণে' নুরুন্নেহারের উপর পাশবিক অত্যাচার এবং সেই অত্যাচারের ফলে মৃত্যু দেখানো হয়েছে যা পৈশাচিক বীভৎসতার রূপলাভ করেছে। পঞ্চমতঃ 'নীলদর্পণে' শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী শক্তিই জয়লাভ করেছে বটে, কিন্তু সেই শক্তির বিরুদ্ধে নবীনমাধব, তোরাপ এবং অদৃশ্য প্রজাদের প্রতিরোধও দেখান হয়েছে। কিন্তু 'জমীদার দর্পণে' পাশবিক শক্তিরই জয়জয়কার—অত্যাচারিতের ক্রন্দন ও হাহাকার তেমন সুতীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ষষ্ঠতঃ উভয় নাটকেই বাস্তব প্রয়োজনে চরিত্রগুলি (রোগসাহেব-সাধুচরণ-রাইচরণ ক্ষেত্রমনি পদীময়রাণী এবং হায়ওয়ান-

নুরুন্নেহার-আবুমোল্লা কৃষ্ণমণি) এসেছে, এদের স্বরূপ যদিও কিছুটা এক তথাপি একের প্রভাব ও অনুকরণে অন্যটি সৃষ্ট হয়েছে এমন কথা বলা যায় না।[১১] বরং 'জমীদার দর্পণ'কে 'নীলদর্পণে'র পরিপূরক গ্রন্থ বলা যায়। উভয়গ্রন্থই একই বেদীমূলে দাঁড়িয়ে আসুরিক শক্তি বিনাশে বেগ সঞ্চার করেছে।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র পাশাপাশি মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের প্রভাবও 'জমীদার দর্পণে' কিছু পড়েছে। সুকুমার সেনও মন্তব্য করেছেন "ইহাতে বুড়-সালিকের ঘাড়ে রোঁ-র অনুসরণ আছে।"[৫৩] 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র সঙ্গে 'জমীদার দর্পণে'র কিছু প্রত্যক্ষ প্রভাবের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ভক্তপ্রসাদ বলছে, "আহা! এমন খোস-চেহারা কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? রাজরানী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়। 'ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়। হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়'।"[৫৪] 'জমীদার দর্পণে'র প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে হায়ওয়ান আলী বলেছে ঃ

> আবুমোল্লা নব কার্ত্তিক। বিধির নির্বন্ধ দেখ; 'চাষার হাতে গোলাপ ফুল, একি প্রাণে সয় ? হায় বিধি ! পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।'

'বুড় সালিকে' হান্‌ফের মাগকে ভজাবার জন্যে কুড়ি টাকা 'কি তার চেয়ে জেয়াদা' খরচ হবে শুনে ভক্তপ্রসাদ যেমন বিস্মিত হয় তেমনি 'জমীদার দর্পণে'র হায়ওয়ান আলীও আবু মোল্লার স্ত্রী নুরুন্নেহারের 'আস্পর্ধা'র কথা শুনে অবাক হয়—'মেয়েমানুষের এত হেম্মত'। 'বুড় সালিকে' হান্‌ফের মাগ ফাতেমাকে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা যখন হচ্ছে এবং যখন সেখানে যাওয়ার জন্যে ভক্তপ্রসাদের প্রস্তুতি চলেছে তখনই লোকদেখানো ধর্ম অনুরাগ প্রমাণের জন্য সন্ধ্যার শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি হওয়ার পর পুত্র-বন্ধু আনন্দকে সে বলছে, "এসো বাপু। ঠাকুরদর্শন করিগে"।[৫৫] অনুরূপভাবে 'জমীদার-দর্পণে'ও হায়ওয়ান যখন নুরুন্নেহারকে অপহরণ ও তাকে বলাৎকারের পরিকল্পনা করছে তখনই মাগরেবের আজানের সময় ঐ একই উদ্দেশ্যে সে মোসাহেবকে বলে— "নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি" (১/১)।

তবে 'বুড়সালিকে' ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্য ও ধর্মের ভণ্ডামির স্বরূপ উদ্ঘাটনই ছিল লেখকের মূল লক্ষ্য। কিন্তু 'জমীদার দর্পণে'র হায়ওয়ান আলী কেবল লম্পট ও ধর্মের বেশধারী শয়তানই নয়—সে অত্যাচারী, প্রতিহিংসাপরায়ণও। ভক্তপ্রসাদ আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়েছে— বলপ্রয়োগের পথে সে যায়নি। কিন্তু হায়ওয়ান নুরুন্নেহারকে শুধু ধর্ষণই করেনি—তাকে হত্যা করেছে এবং তার স্বামী আবুমোল্লাকে সর্বস্বান্ত করে দেশছাড়া করেছে। এখানেই উভয় রচনার চরিত্র দুটির স্বাতন্ত্র্য।

তবে 'নীলদর্পণ' ও 'বুড়সালিকের ঘাড়ে রো' —এই দুটি নাটকের সমাজচেতনা, মানবতাবোধ ও শিল্পীর সুতীব্র অনুভূতি 'জমীদার দর্পণে' রয়েছে।

৮. মূল্য নিরূপণ

'জমীদার দর্পণ' উদ্দেশ্যমূলক রচনা কিনা—এ প্রশ্নও আসে। বস্তুত এই নাটকের কাহিনী পরিকল্পনাটিতে

নাট্যকারের মৌলিকত্ব আছে। বাংলায় জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রজাদের মধ্যে মাঝেমধ্যে আন্দোলন হয়েছে, তবে তা সফল হয়নি। প্রজা-স্বত্ব ও ধান-শালিসী-বোর্ড ও জমিদারী উচ্ছেদ আন্দোলন যদি মঙ্গলের সূচনা করে থাকে তবে মশাররফের চিন্তা-চেতনা সুদুর প্রসারী ছিল বলা যায়। তবে 'জমীদার দর্পণ' উদ্দেশ্যমূলক রচনা – একথা মনে করবারও কোন কারণ নেই। কেননা নির্যাতিত মানুষের প্রতি যে মমত্ববোধ এখানে ফুটেছে কালের কষ্টিপাথরে তার শাশ্বত মূল্য অনস্বীকার্য। অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে কথা বলতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও সাহসী ছিলেন। সুতরাং এই কাহিনী পরিকল্পনায় লেখকের মৌলিক চেতনা যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল।[৫৬]

নাট্যকাহিনীতে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট ছিল। নাট্যকার তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে না পারলেও নাটকীয় রসসৃষ্টিতে তিনি সফলও হয়েছেন। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার এবং পরিণামে অধর্মের জয় ও ধর্মের পরাজয় এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। গতানুগতিক ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় এখানে চিত্রিত হয়নি। এ নাটকের যে দ্বন্দ্ব তা একান্তভাবেই বাহ্যিক—চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব তেমন নেই। বাইরের দুটো পক্ষের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত সীমাবদ্ধ। তবে দুপক্ষের শক্তির ফারাক আশমান-জমিন। ফলে এগুলি নাটকের ত্রুটি বটে, তবে নাট্য-ক্রিয়ার অভাব তাতে নেই। ডাক্তারের রিপোর্ট, বিচার দৃশ্যের অবতারণা—এগুলি যথার্থই আকর্ষনীয় দিক। অবশ্য জমিদার পক্ষের বিপরীত শক্তি প্রজাপক্ষ নিতান্ত দুর্বল বলে কোন প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি—বরং রাজদ্বারে বা ঈশ্বরের কাছে দীর্ঘ প্রতিকার কামনার মধ্যেও তা পর্যবসিত হয়েছে। এটি অস্বীকার করা যায় না। তবে জমিদারের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আসন্তোষ বা প্রতিবাদের ইঙ্গিত একেবারে অনুপস্থিত নয়।

প্রথমেই বলা যায়, নাটকটি অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদও বটে।[৫৭] গীতা মুখোপাধ্যায় বলেন—"এই গ্রন্থের পূর্বে সামন্ততন্ত্রের উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত অন্য কোনও লেখক হানতে পারেন নি।"[৫৮] তবে এই প্রতিবাদ হয়তো যথেষ্ট তীব্রতা লাভ করেনি। কিন্তু নাটকে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে বহুবার। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে হায়ওয়ান আলীর কুকর্মের অন্যতম সহায়ক জামালের উক্তিতে প্রতিবাদের সুর ঃ

> দেখুন আমরা চাকর হুকুম করলে আর অদুল কর্ত্তে পারিনে। এ কাজটা বড়ই অন্যায় হচ্ছে! মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জবরান। কাজটা বড় অন্যায় হচ্ছে ! কি করি ? এঁর অধীনে থেকে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে (২/৩)।

ক্ষীণ হলেও নুরুন্নেহারের ক্ষোভও চাপা থাকেনি। সে হায়ওয়ান আলীর অত্যাচারকে 'দিনে ডাকাতী' বলে অভিহিত করে জানিয়েছে ঃ

> তাঁর কি এমন কর্ম্ম করা উচিত ? অধীনে আছি বলেই কি এমন অধর্ম্মের কাজ কর্ব্বেন ? এই কি তাঁর ধর্ম্ম ? . . . তিনি যা করুণ তা করুণ প্রাণ থাকতে . . . আমি বৈঠক খানায় কখন যেতে পার্ব্বো না। (২/১)।

এর চেয়ে স্পষ্ট প্রতিবাদ শোনা যায় দক্ষিণপাড়ার এক প্রজার কণ্ঠে। লম্পট জমিদার তার কন্যার প্রতি নজর করলে সে সরাসরি জানায়— "দিনে মুনিব বলে মানবো, নাত্তিরে অজায়গায় দেখলি আর হাকিম বলে ন্যাত কর্ব্বো না।"

(৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)। আবার নাটকের অন্তিম দৃশ্যে নট ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করে— "চখের উপর এমন অন্যায় হলো ? . . . তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না।" (৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)। সুতরাং মৃদুকণ্ঠে হলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে এই নাটকে।

প্রজার প্রতি জমিদারের নির্মম অত্যাচারের যে মর্মঘাতী বর্ণনা এবং যে বস্তুগত উপাদান এতে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে নাটক্টির ট্রাজেডি হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অসমান দুই প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব তীব্র আকার লাভ না করায় এবং চরিত্রের অভ্যন্তর থেকে এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হওয়ায় নাটকটি ট্রাজিক মহিমা লাভ করতে পারেনি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য এখানে তাই যথার্থই ঃ

> কিন্তু নাটকের ফলশ্রুতিতে ট্রাজেডীর গভীরতা ফুটে উঠতে পারেনি। ট্রাজেডির বিষাদ, নির্বেদ-বৈরাগ্য ও নৈরাশ্য যা মনকে স্তব্ধ বেদনায় অকম্পিত করে রাখে, বাংলা নাটকে তার বিশেষ কোন ত্রুটিহীন দৃষ্টান্ত নেই। মীর সাহেবের 'জমীদার দর্পণ'ও সেদিক থেকে ট্রাজেডী হয়নি, যেমন হয়নি দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'।[৫৯]

এর উপায় কি ?

১. ভূমিকা

'এর উপায় কি ?' মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম প্রহসন। কালানুক্রম অনুসারে এটি তার পঞ্চম গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।[৬০] এর প্রথম সংস্করণের কোন কপি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ১৮৯২ খ্রষ্টাব্দে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (১লা কার্তিক ১২৯৯) প্রকাশিত হয়।[৬১] প্রথম প্রকাশের পর মশাররফ গ্রন্থটি তাঁর জনৈক 'প্রিয়তম বন্ধু ভ্রাতা'কে উৎসর্গ করেন। কিন্তু 'পুস্তক ভাল নহে'—এই বিরূপ সমালোচনা ও ধারণা সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় 'বন্ধুবর বড়ই লজ্জিত হন।' তাই দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক উৎসর্গ পত্রটি প্রত্যাহার করে নেন। এই গ্রন্থেও লেখক বাস্তব জগতে বিচরণ করেছেন।

২. উদ্দেশ্য

'এর উপায় কি ?' সমসাময়িক কালের নাগরিক জীবনের একটি সমস্যার চিত্রণ। সেকালের মদ্যপ ও পতিতাসক্ত স্বামীদের নিষ্ঠুর অবহেলা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য স্ত্রীদের গৃহীত পন্থার একটি কল্পিত চিত্র এই প্রহসনে অঙ্কিত হয়েছে। লেখক এই প্রহসন রচনার উদ্দেশ্য ও কাহিনীর বাস্তবতা সম্পর্কে 'লিখকের কয়েকটি কথা' অংশে বলেছেন—

> বিষয়টি ভাল নয়—কিন্তু রাধাকান্ত বাবুর মত স্বামী, মুক্তকেশীর ন্যায় স্ত্রী, মদনের মত এয়ার খুঁজিলে যে, না পাওয়া যায় তাহা নহে। এ যাতনা অনেকেরই ভোগ করিতে হইতেছে। কত

> পরিবারের চক্ষের জল অবিরত ঝরিতেছে। সম্পূর্ণ নহে,—কোনও সত্য ঘটনার কতক সময়ের চিত্রই 'এর উপায় কি ?'। বিষয়টি যতই কেন কদর্য হউক না ঘরের কথা যে পরের কানে গিয়াছে,—আর কেন ? বাবুদিগের মনে এই কথাটা উদয় হইলেও আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করি।[৬২]

শুধু তাই নয়, তিনি সমাজের এই কদাকার চিত্র রূপায়ণে যে, যে কোন ঝুঁকির সম্মুখীন হতেও প্রস্তুত তা 'বিজ্ঞাপন' অংশেও জানিয়েছেন—

> . . . সাধারণের উপকারের জন্য সত্য তত্ত্ব প্রকাশ করিতে, কখনি সঙ্কোচিত হইব না।[৬৩]

লেখকের উদ্দেশ্য যে সমাজ-সংস্কার, এখানে তা স্পষ্ট এবং তাঁর এই উদ্দেশ্য-সাধনে তিনি নিঃসঙ্কোচ। ভয়ে ভীত বা নিন্দায় সঙ্কুচিত না হয়ে মানুষের উপকার সাধনের মহৎ বাসনা মশাররফ হোসেনের সাহিত্য-সাধনার মধ্যে জাগ্রত ছিল। 'জমীদার দর্পণে'ও তিনি সমকালের জমিদার শ্রেণীর রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে তাদের পাশবিক অত্যাচার ও কুৎসিৎ লম্পট্যের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। 'এর উপায় কি?' তাঁর সে চেতনারই সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন সামাজিক পটভূমি ও সেই সমাজের কদাচার রূপায়ণে সাহিত্য-ধারার কিঞ্চিৎ পরিচয় নেয়া যেতে পারে।

৩. পটভূমি

উনিশ শতকে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বিশেষত কলকাতার সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে একশ্রেণীর মানুষ ইংরেজের অধীনে চাকুরী করে অথবা ব্যবসা করে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হন এবং সামাজিক কৌলীন্য লাভ করেন। এঁদের বাবু নামে অভিহিত করা হত। এঁদের নানা অনাচার বা নৈতিক স্খলনের কথা তৎকালীন বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন—

> এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা . . . রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত . . .।[৬৪]

তিনি আরো জানিয়েছেন—

> পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে--'ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ী করিয়া দিয়াছেন।'—এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল। . . . দেশের সর্বত্রই এই সম্বন্ধে নীতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল।[৬৫]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাবু' প্রবন্ধে বাবুদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

> যিনি নিজগৃহে জলখান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু।[৬৬]

রাজনারায়ণ বসু লেখেন ঃ

> এক্ষনকার লোক পানাসক্ত ও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত।[৬৭]

বাংলার শহুরে এই বাবুগোত্রীয় লোকেদের নানা অনাচারের মধ্যে অন্যতম ছিল এই মদ্যপান এবং বিবাহিত পুরুষের বেশ্যাসক্তি।

উনিশ শতকীয় এই সামাজিক অনাচারকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে সেকালে অনেক নকশা এবং নাটক প্রহসন রচিত হয়েছিল। নকশা ও ব্যঙ্গপ্রধান রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'বাবুর উপাখ্যান' (সমাচার দর্পণ, ১৮২১), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস'(১৮২৫), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) এবং 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬১) প্রভৃতি।

তবে সে সময়ে সমাজ-সমালোচনার মাধ্যম হিসেবে নাটক ও প্রহসনে এ জাতীয় বিষয় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল বলা যায়। পানাসক্তি ও লাম্পট্য দোষ নিয়ে লেখা এ প্রসঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয় সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' (১৮৬০) ও দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত নাটক প্রহসন মশাররফ হোসেনের সামনে 'মডেল' বা আদর্শ হিসেবে ছিল। নাটক ও প্রহসনের এই ধারায় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'এর উপায় কি ?' নামক গ্রন্থটি। প্রসঙ্গত মীরের ব্যক্তিগত জীবনেতিহাসও স্মরণে রাখা যায়। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' যদি হয় তাঁর আত্মবীক্ষণ তাহলে 'জমীদার দর্পণে'র পর 'এর উপায় কি ?'ও যেন অনেকটা মীরেরই আত্মদর্শন। অবশ্য এই রচনায় পুরুষের মদ্যাসক্তি ও গণিকাসক্তির পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে স্বামীর সম্বিৎ ফেরানোর জন্য বঞ্চিতা স্ত্রীর অভিনব কৌশল, সেকালের আদালতের বিচারকদের গোপন কার্যকলাপ, কলেজের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি।

৪. গঠন-রীতি

'এর উপায় কি ?' রচনাটি একটি অঙ্কে এবং চারটি দৃশ্যে বিভক্ত ক্ষুদ্রায়তনের প্রহসন। লেখক 'দৃশ্য' শব্দের পরিবর্তে 'রঙ্গভূমি' ব্যবহার করেছেন। 'বসন্তকুমারী'তেও 'রঙ্গভূমি' ব্যবহার করেছিলেন। ইতিপূর্বে 'বসন্তকুমারী' ও 'জমীদার দর্পণ' দুটি নাটকে সংস্কৃত-রীতির অনুযায়ী নান্দী, প্রস্তাবনা এবং সূত্রধার ও নট-নটীর আমদানী করেছিলেন, কিন্তু 'এর উপায় কি ?' সেই প্রভাব-মুক্ত। গঠনরীতির দিক থেকে একে চার দৃশ্য-সম্বলিত একাঙ্কিকা বলা যেতে পারে। এতে পাঁচটি গান ও কয়েকটি পদ্য-সংলাপ রয়েছে। চরিত্রের স্বরূপ বোঝাতে এবং কাহিনীর সরসতা ও গতিময়তা বজায় রাখবার জন্যে গানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এই গানগুলির অধিকাংশই তাঁর 'সঙ্গীত লহরী' (১৮৮৭) নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৫. কাহিনী

রাধাকান্ত বিত্তবান শিক্ষিত শহুরে বাবু। তার স্ত্রী মুক্তকেশী সুন্দরী ও অত্যন্ত সহ্যশীলা নারী। এতৎসত্ত্বেও রাধাকান্তবাবু মদ খায় এবং গণিকালয়ে নয়নতারা নামে জনৈক বারাঙ্গনার সঙ্গে নিত্য মেলামেশা করে এবং প্রেমে পড়ে। পক্ষান্তরে নয়নতারা পতিতার প্রকৃতি অনুসারে রাধাকান্তের আড়ালে বহু পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয় আর রাধাকান্তের মন জয় করে রাখে। রাধাকান্ত ইয়ারদের নিয়ে যায় নয়নতারার ঘরে, জমায় মদের আসর আর বলে—-'রাণ্ডির বাড়ী ব্রাণ্ডি না খেলে কোন কালে মজা হয় না।' (১/১)।

বারাঙ্গনার প্রেমে রাধাকান্ত মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এটা মুক্তকেশী ভাল করেই জানে। স্বামীকে সে পথ থেকে ফেরাবার জন্যে নানা অনুনয় বিনয় করে। কিন্তু রাধাকান্ত তাতে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, বরং নানাভাবে মুক্তকেশীকে নির্যাতন করে। মুক্তকেশীর এই অসহনীয় দুর্গতির কথা তার সখী রাইমনী জানে। অভিজ্ঞা ও নিপুণা সখী রাইমণী স্বামীকে বশ করবার কৌশল পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে শিখেছে। সে গ্রাম্য মহিলা মনমোহিনীর দৃষ্টান্ত তুলে স্বামীকে জব্দ করবার জন্যে মুক্তকেশীকে প্ররোচিত করে। মুক্তকেশী ক্রমে কঠিন হয়ে ওঠে। অধশেষে সে সখী রাইমনীর পরামর্শে এক ফন্দী আঁটে। একরাতে মুক্তকেশী তার ঘরে ছদ্মবেশী রাইমনীকে উপপতি সাজিয়ে বসিয়ে রাখে। অন্যদিকে নয়নতারার পথে কাঁটাস্বরূপ মুক্তকেশীকে হত্যা করবার জন্যে নয়নতারার প্ররোচনায় রাধাকান্ত সেই রাতে বাড়ী যায়। মুক্তকেশীর ঘরে প্রবেশ করে রাধাকান্ত দেখে যে সে উপপতি নিয়ে রাত্রি যাপন করছে। এ দৃশ্য দেখে উত্তেজিত রাধাকান্ত উভয়কে খুন করতে উদ্যত হয়। ছদ্মবেশী উপপতি প্রতিরোধ করে বলে— "সাবধান! . . . যা তোর নয়নতারার ঘরে যা। এ ঘরে কেন ? আমি ইচ্ছে করে আসি নাই, টাকা দিয়ে নিয়ে এয়েছে।"। (১/১)। রাধাকান্তের উত্তেজনা চরমে ওঠে এবং সে স্ত্রীকে মারতে ওঠে। মুক্তকেশী তখন সাহসভরে বলে ঃ—

> এত কেন ? তুমি টাকা দিয়ে বেশ্যা এনে আমার ঘরে ?—আমি পারিনে ? এক রাত্রে দেখেই সহ্য হচ্ছে না। . . . আমি যে চিরকাল দেখেছি, আমার মনে কিছুই হয় না ? কিছুই বেদনা লাগে না ? . . . ধিক তোমার জীবনে! ধিক তোমার মুখে! তুমি আগে করেছ, আমি না হয় পাছে করেছি . . . এখন তুমি তোমার মত থাক, আমি আমার মত থাকি। (১/১)।

এ কথা শুনে রাধাকান্ত লজ্জিত হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। তৎক্ষণাৎ মুক্তকেশীর উপপতি রাইমনী ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে প্রমাণ করল যে মুক্তকেশী অসতী হয়। রাধাকান্ত আত্মগ্লানি আর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে তার ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। অতঃপর রাধাকান্ত ও মুক্তকেশীর বিড়ম্বিত দাম্পত্য-জীবন মধুর মিলনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

৬. কোন শ্রেণীর রচনা

'এর উপায় কি?' রচনাটিকে লেখক 'প্রহসন' বলে অভিহিত করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[৬৮] প্রমুখ প্রায় সব সমালোচক একে 'প্রহসন' বলেই গণ্য করেছেন। প্রহসন আকারে ছোট, কারণ মূল অন্য একটি নাটকের

আগে বা পরে এটি অভিনীত হত।

> Generally, the term was applied to an after piece, or else to a piece inserted within an evening's performance, generally it tended to be associated with short plays, not more than three acts in leagth.[৬৯]

এর মধ্যদিয়ে সমাজের কোন বাস্তবচিত্র উদ্‌ঘাটিত হত। মাঝে মধ্যে শ্লেষ বিদ্রূপের ব্যবহার থাকলেও তা পীড়াদায়ক ছিল না। সমাজের কোনো সমস্যাকে অবলম্বন করে হাস্যরস সৃষ্টি এবং সমাজ-সমালোচনা ও সমাজ-সংশোধন এর লক্ষ্য। তাই হাস্যরসের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বাস্তব চিত্র একটি কাহিনীর মাধ্যমে পরিবেশিত হত। Oxford companion to the theatre-এ প্রহসনের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

> An extreme form of comedy in which laughter is raised at the expense of probality, particularly by Horse play and bodily assault.[৭০]

'এর উপায় কি ?' আকারে ছোট—চারটি দৃশ্য মিলিয়ে একাঙ্কের রচনা। হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে সমাজের একটি বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। উনিশ শতকের সুদখোর আর বেশ্যাসক্ত পুরুষদের আচরণ তুলে ধরে তাদের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ ও তাদের সুপথে আনার কথা এতে ব্যক্ত হয়েছে। লম্পট স্বামীর নিষ্ঠুর অবহেলা আর নির্মম লাঞ্ছনার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একালের স্ত্রী কি উপায় গ্রহণ করতে পারে, তারও একটি পন্থা এতে চিত্রিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এইভাবে লেখক একটি ছোট্ট কাহিনীও গড়ে তুলেছেন। এবং এর মধ্য দিয়ে লেখকের সমাজ-সংশোধনের অভিপ্রায়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই এটি যে প্রহসন জাতীয় রচনা তা বলাই বাহুল্য।

৭. সমকালীন সমালোচনা

'এর উপায় কি ?' প্রহসনে পরিবেশিত উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার এই আধুনিক সমাধান বা কৌশল সমকালের অনেক সমালোচককে খুশি করতে পারেনি। সেকালের 'বান্ধব' এবং 'সুলভ'– দুটি পত্রিকায় এর বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ঢাকার 'বান্ধব' (আশ্বিন, ১২৮৩) পত্রিকা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু বা গুণাগুণ সম্পর্কে তেমন কিছু বিচার বিশ্লেষণ করেনি। তবে এই পত্রিকায় প্রহসনটির সমালোচনা করে লেখা হয়, এ দেশের মুসলমান লেখকদের রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁরা প্রশংসা করতে উদ্যমী কিন্তু তাঁদের লেখায় অশ্লীলতা ও রুচি বিকৃতির জন্য তাঁরা বিরক্ত।

> যদি তাঁহারা . . . কল্পনায় ও ভাষায় যারপরনাই জঘন্য রুচির পরিচয় দেন, অশ্লীল পদাবলীর ছড়াছড়িকেই কাব্যরসে রসিকতা মনে করেন, তখন এই গ্রন্থকারের ন্যায় আমরাও বিপন্ন হইয়া ইহাই জিজ্ঞাসা করি— 'এর উপায় কি ?'[৭১]

সমকালীন এইসব সমালোচনায় প্রহসনটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ও রুচিবিকারের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই অভিযোগ ছিল মূলত বর্ণনার ভাষা ও শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে। যেমন—বারাঙ্গনা নয়নতারার আপন জন্ম-রহস্যের পরিচয়

জ্ঞাপন রুচি-হীনতার ইঙ্গিত দেয় ঃ

> মার বিয়ে হয়েছিল কিনা শুনি নাই। বাবা কেমন চিনি না, কখন দেখি নাই; সেই বাবার ঘোড়া চড়া সাধ হয়েছিল বলে তাতে বেশ দশ টাকা লাভ করেছি। (১/১)।

এ ছাড়া এতে কতকগুলি অশিষ্ট শব্দ, যেমন—রাণ্ডী, মাগ, মাগী, দুশ-ভাতারী, বাঞ্চৎ গরুখেক নেড়ে, হারামজাদি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল, 'এর উপায় কি ?' প্রহসনধর্মী রচনা। এর মধ্যে বেশ্যাসক্ত পুরুষের আচরণ শোধনের উপায় হিসাবে স্ত্রীরও অন্যাসক্তির কল্পকাহিনী উপস্থাপন করা হয়েছে। এ দেখে যাঁরা নীতি ও রুচি বিকারের প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে বলতে হয় প্রহসনে কাহিনী উপস্থাপনায় চমক সৃষ্টি করা হয়। এই অপ্রত্যাশিত চমকেই প্রহসনের আত্মা পরিপুষ্ট হয়। ঘটনার বাস্তবতা অপেক্ষা ঘটনার আতিশয্যেই প্রহসন যুগপৎ বিদ্রূপ ও বিদ্রূপমিশ্র হাস্যরস সৃষ্টি করে। সুতরাং এ সমস্ত অভিযোগকে আমল দিলে আর যাই হোক অন্তত প্রহসন সৃষ্টি করা দুষ্কর। বিশেষত প্রহসনের বিরুদ্ধে নৈতিক বিকারের অভিযোগ ওঠাই একটা বিস্ময়কর বিষয়। এছাড়া পরিবেশের আবহ বজায় রাখতে বিশেষত নিষিদ্ধ পল্লীর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের কথোপকথনে এই শব্দপ্রয়োগ বাস্তবতাবোধেরই পরিচয় দেয়। বিষয় এবং পরিবেশকে আরো স্পষ্ট করে তুলতে অনুরূপ শব্দপ্রয়োগ উনিশ শতকের অন্যান্য লেখকের নাটক প্রহসনেও ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। সুতরাং মীর মশাররফ কোথাও অকারণে শিল্পের অমর্যাদা করেন নি।

৮. চরিত্র

'এর উপায় কি ?' প্রহসনে চরিত্রের বাহুল্য নেই। এখানে পুরুষ চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — রাধাকান্ত বাবু ও মদনবাবু। এছাড়া রয়েছে সন্ন্যাসীদাস, জগা ও হাকিম নগেন্দ্রবাবু। নারী চরিত্র হল তিনটি নয়নতারা, মুক্তকেশী ও রাইমনী।

রাধাকান্ত এই প্রহসনের প্রধান চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র কাহিনীটি আবর্তিত হয়েছে। উনিশ শতকের ভোগবিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মদ্যপ 'বাবু' চরিত্রের প্রতীক সে। তবে তার চরিত্র–স্খলনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ লেখক উপস্থাপিত করেননি। মশাররফ হোসেনের রাধাকান্ত নিমচাঁদ নয়, অটল নয়, নববাবুর মতোও নয়। নিমচাঁদের মতো জীবনের ব্যর্থতাবোধ থেকে সে সুরাপান করে না, অটলের মতো সামাজিক সম্ভ্রমের প্রত্যাশায় রক্ষিতা সংসর্গ করে না কিংবা নববাবুর মতো সাহেব হবার ইচ্ছে থেকেও মতিভ্রান্ত হয় না। সে কেবলই মদ্যপ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত। তবে নাটকে চরিত্রটির পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। স্খলিত চরিত্র রাধাকান্তবাবু পত্নীর কাছে চরম শিক্ষা লাভ করে অবশেষে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। চরিত্রটি একেবারে সরলরৈখিক না থেকে কিছুটা বিকশিত হতে পেরেছে।

মদনবাবুও উনিশ শতকীয় বাবুদের মতোই সুরাসক্ত, বারাঙ্গনাপ্রিয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীতপ্রিয়। তবে মদনবাবু পত্নীকে অবহেলা করে সেই বিলাসভোগের পক্ষপাতী নয়। উভয় দিকেই তার মন। অবশ্য নাট্যকাহিনীতে

সন্ন্যাসীদাস ও হাকিম নগেন্দ্রবাবুর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট নয়। এরাও মদ্যপ এবং লম্পট। পতিতার চাকর জগা লোভী ও সুবিধাভোগী। এই চরিত্রগুলি নাটকে অস্পষ্ট।

নারীচরিত্রের মধ্যে প্রহসনে নয়তারা প্রধান চরিত্র। সে দেহপসারিনী। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কৌশল – ইত্যাদি নানা অনৈতিক গুণের সমাহার এই চরিত্রটি। সে বহু পুরুষের মনোহরণের সঙ্গে সঙ্গে রাধাকান্তবাবুর সংসারেও অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে। মুক্তকেশী রাধাকান্তবাবুর স্ত্রী। সে সরল, সহ্যশীলা, পতিপরায়ণা। লম্পট স্বামীর সোহাগ বঞ্চিতা এই নারীর দাম্পত্যজীবন তাই দুঃখ ও যন্ত্রণাপূর্ণ। ক্রমাগত স্বামীর লাঞ্ছনা সহ্য করার পরে তার সখী রাইমনীর পরামর্শে ও সহায়তায় সে কৌশলে স্বামীর চেতনা সঞ্চার করতে সমর্থ হয়। পূর্বের অসহায়া নারী মুক্তকেশী ক্রমে দৃঢ় ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তার চরিত্রেও তাই রূপান্তর লক্ষ করা যায়। 'মাঝে মাঝে মুক্তকেশীর কণ্ঠে যেন ভাবীকালের নারীমুক্তির ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে।'[৭২] রাইমনী পার্শ্বচরিত্র হলেও এই প্রহসনে তার ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত তারই পরামর্শে, কৌশলে ও বাস্তবতাবোধের ফলে মুক্তকেশী ও রাধাকান্তের দাম্পত্যজীবন একটি বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তাছাড়া সখী মুক্তকেশীর মধ্যে প্রতিবাদী মনোভাব তৈরিতে ও দৃঢ় মানস-গঠনে তার ভূমিকাই ছিল প্রধান।

৯. মূল্যায়ন

শৈল্পিক বিচারে মশাররফের 'এর উপায় কি ?' রচনাটি হয়তো খুব উঁচুমানের নয়। কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালী সমাজের নৈতিক স্খলনের চিত্রাঙ্কণে এবং সেকালের সৃষ্ট সাহিত্যের গুণ-মানের নিরিখে এই প্রহসনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

বেহুলা গীতাভিনয়

১. ভূমিকা

'বেহুলা গীতাভিনয়' (১৮৮৯) গদ্যে-পদ্যে রচিত মশারফের চতুর্থ নাটক। ছয় অঙ্কে বিভক্ত 'বেহুলা গীতাভিনয়ে'র মোট দৃশ্য-সংখ্যা কুড়ি। লেখক এই দৃশ্যগুলিকে 'গর্ভাঙ্ক' বলে অভিহিত করেছেন।

'বেহুলা গীতাভিনয়'-এর উপাদান ও আঙ্গিক সম্পর্কে 'অগ্রে পাঠ্য' শীর্ষক ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেনঃ

> বেহুলা লখিন্দরের কথা নূতন নহে। বঙ্গের স্ত্রীমহলে বেহুলার কাহিনী—বড়ই আদরের। কথাটা যে একেবারেই উপকথা—এরূপ বোধ হয় না। ভাগলপুর অঞ্চলে চাম্পাই নগর, সাতালী পর্ব্বতের চিহ্ন—এবং ত্রিবেণীর নিকট নেতা ধোপানীর পাট (এইক্ষণে পাথরে পরিণত) আজ পর্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ঘটনা লইয়াই যশোহর অঞ্চলে প্রথম ভাসান যাত্রার সৃষ্টি হয়। ভাসানের ভাগ্যদোষে, রচয়িতার অযথা বর্ণনায় এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতুতেই শিক্ষিত সমাজে ভাসান যাত্রার

আদর নাই। কিন্তু শুক্তিতেই মুক্তা, স্বর্ণকারের নিক্ষিপ্ত অঙ্গারভস্মেই সুবর্ণকণা, সামান্য প্রস্তরেই কোহিনুর এবং দারইয়াই নুরের জন্ম। এই পরিসিদ্ধ বাক্যের অনুকরণে — দৃষ্টান্তস্থলে বলিতে পারি, মনসার ভাসানই 'বেহুলা গীতাভিনয়'। এই গীতাভিনয়ে শিক্ষিত সমাজের কথঞ্চিৎ পরিমাণ চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিলেই, আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

আর একটি কথা। অনেক অভিনয়াভিজ্ঞ মহোদয় বলিতে পারেন, যে গীতাভিনয়ে, পদ্যের এত ছড়াছড়ি কেন ? উত্তর – যে সকলপদ, পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে — তাহা খাঁটি পদ্য নহে। উর্দ্দু — ইন্দ্রসভার অনুকরণে এ সকল পদ রচিত হইয়াছে। নাট্যপ্রিয় মহামতিগণ ইন্দ্রসভার সুরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পদ্য পদগুলি আবৃত্তি করিবেন। সহজেই ভাব উপলব্ধি ও সুশ্রাব্য হইবে।[৭৩]

বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী বা মনসার ভাসান বাংলার লোক-সমাজে একটি জনপ্রিয় বিষয়। সম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে সমগ্র বাঙালী সমাজেই এই কাহিনীর পরিচিতি। মশাররফ হোসেন এই জনপ্রিয় ও পরিচিত কাহিনীকে অবলম্বন করে তাঁর 'বেহুলা-গীতাভিনয়' নাটকটি রচনা করেন।

২. পটভূমি

'বেহুলা গীতাভিনয়' দেশী যাত্রা ও অপেরার ঢঙে রচিত নাটক বিশেষ।[৭৪] লোক-কথা আশ্রিত গ্রাম্যযাত্রাকে শিক্ষিত শ্রেণীর উপভোগ্য করে তোলাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। মশাররফ দীর্ঘকাল ধরে গল্প-উপন্যাস-নাটকের কাহিনী অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর 'রত্নবতী' ও 'বসন্তকুমারী'র কাহিনী রূপকথা আশ্রিত। 'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনীও আরবদেশের পুরাণ-ইতিহাস–নির্ভর। অতঃপর লেখক 'বেহুলা গীতাভিনয়' রচনা করলেন দেশীয় লোককাহিনীর উপর ভিত্তি করে। এখানে কাহিনীগত বিষয়ে মৌলিকত্ব নেই, তবে উপস্থাপন কৌশলে ও কাহিনীর রূপায়ণে লেখকের নিজস্ব শিল্প-চিন্তার স্বাক্ষর রয়েছে।

'বেহুলা গীতাভিনয়ে'র ভূমিকা থেকে দেখা যায়, লেখক একই সঙ্গে ঐতিহ্যকে অনুসরণ ও তাকে পরিশ্রুত করার প্রয়োজন বোধ করেছেন। সেইসঙ্গে ঐতিহ্যের পেছনে যে বাস্তব ভিত্তি রয়েছে তাকেও তিনি সনাক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী'তে মশাররফ রাজপরিবারের প্রেম ও প্রবৃত্তির এক কাল্পনিক আলেখ্য রচনা করেছেন, অথচ ঐ একই বছরে মাস দুয়েকের মধ্যে রচিত 'জমীদার দর্পণে' তিনি সম্পূর্ণ বস্তুভিত্তিতে নেমে এসেছেন। আবার পরবর্তী প্রহসন 'এর উপায় কি ?' গ্রন্থে তিনি তদানীন্তন বাবু সমাজের বেশ্যাসক্তির নগ্নসত্য ঈষৎ হাস্য মিশ্রভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এ থেকে দেখা যায়, নাট্যরচনার ক্ষেত্রে মশাররফের দৃষ্টি কোন বাঁধাধরা পথ অবলম্বন করে চলেনি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে নাট্যরচনা করেছেন। শিল্প চর্চাই তাঁর কাছে প্রধান গুরুত্ব লাভ করেছিল, বিষয় নয়।

৩. কাহিনী

'বেহুলা গীতাভিনয়ে'র প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, চম্পক নগরের পরম শিবভক্ত চাঁদ সওদাগর দেবী মনসার

বিদ্বেষী। চাঁদের বাণিজ্য-যাত্রার শুভকামনা করে পত্নী সনকাদেবী মনসার পূজার আয়োজন করলে ক্রুদ্ধ চাঁদ সওদাগর পত্নীকে ভর্ৎসনা করে মঙ্গলঘট ভেঙে দেয় এবং মনসার অনিষ্টকারী শক্তিকে অগ্রাহ্য করে বাণিজ্য-যাত্রা করেন। এদিকে দেবী মনসা এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে সখি ত্রিগুণার পরামর্শে চাঁদের বাণিজ্যবহর সপ্তডিঙ্গা ডুবিয়ে দেন। এই বিপর্যয়ের পেছনে মনসার হাত রয়েছে জেনেও চাঁদ অবিচল থাকেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে, সপ্তডিঙ্গা খোয়ানো নিঃস্ব চাঁদ সওদাগর বন্ধু চন্দ্রকেতুর গৃহে গেলে বন্ধু কর্তৃক তিনি সাদরে গৃহীত হন। চন্দ্রকেতু চৌদ্দ ডিঙ্গা ভর্তি বহু মালপত্র সাহায্য করে বন্ধুকে বিদায় দিতে যান। কিন্তু বিদায় মুহূর্তে নাটকীয়তা জমে ওঠে। চন্দ্রকেতু দেবী মনসার ভক্ত — এ কথা ঠিক সেই সময়ে জানতে পারলে চাঁদ সওদাগর তাঁর যাবতীয় সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন। কপর্দকহীন অবস্থায় তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করেন। দুর্গম বনে একাকী নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তাঁর মন অটুট থাকে।

তৃতীয় অঙ্কে, দীর্ঘদিন স্বামীর কোন সংবাদ না পেয়ে সনকা চিন্তিত। এমন সময় বটু নামে বুড় সারেঙ্গ বাড়ীতে জানাল যে, প্রবল ঝড়ে সপ্তডিঙ্গা ডুবে গেছে এবং 'কে কোথা গিয়াছে চলে, কার সনে দেখা নাই।' একথা শুনে সনকা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। অন্যদিকে চাঁদবেনে এক ভট্টাচার্যের গৃহে অসম্মানজনক গৃহভৃত্যের কাজ গ্রহণ করেন। বহুকাল পরে চাঁদ তাঁর নিজের বাড়ী ফিরে আসেন।

চতুর্থ অঙ্কে, সনকা তাঁর স্বামী চাঁদকে নির্বিঘ্ন বেঁচে ফিরে আসার জন্য পুনরায় মনসার পূজা করার কথা বলেন। কিন্তু চাঁদ ক্ষিপ্ত হয়ে 'বেঙ্গখাকি কানীর' পূজাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং আবার গৃহ-ত্যাগ করতে উদ্যত হন। কিন্তু পুত্র নখিন্দরের (লখিন্দর) কাতর অনুরোধে নিরস্ত হন। এরপর সপ্তপুত্রের মধ্যে একমাত্র জীবিত পুত্র নখিন্দরের (লখিন্দর) বিবাহের আয়োজন করেন। নিছনি নগরের সায়া বণিকের কন্যা বেহুলার সঙ্গে নখিন্দরের বিবাহ স্থির হয়।

পঞ্চম অঙ্কে, উদ্ধত এবং অনমনীয় চাঁদবেনের দুর্বলতম স্থানে আঘাত করার জন্যে তাঁর একমাত্র জীবিত প্রিয়পুত্র নখিন্দরকে মেরে ফেলার জন্য মনসা ষড়যন্ত্র শুরু করেন। কিন্তু এখানে তাঁর মনে দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়। চাঁদকে শাস্তি দিতে গেলে সনকাকেও দুঃখ দিতে হয়। বেহুলাও অকারণে শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাঁদ বেনের প্রতি তাঁর ক্রোধই জয়ী হয়। এদিকে বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থার তদারকি করছেন স্বয়ং চাঁদবেনে। সবাই আনন্দ কলরবমুখর। বাসরঘরে মেয়েরা বর কনেকে নিয়ে কৌতুক করছে। গভীর রাতে সবাই বিদায় নিলে 'ঘরের মেজে ফাটিয়া মনসা দেবীর আবির্ভাব' ঘটেছে। সে সময় ঘুমন্ত নখিন্দরকে দেখে পুনরায় মনসার অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। কিন্তু এমন সময় বাইরে চাঁদের হুঙ্কার শুনে তিনি নির্দ্বিধ হয়ে যান এবং তাঁর শরীর থেকে কালী নামের সাপ নখিন্দরকে দংশন করলে নখিন্দরের মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় সকালে চাঁদ পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। এমনকি চাঁদও পুত্র-বিয়োগ শোকে কাতর হয়ে পড়েন।

ষষ্ঠ অঙ্কে, বেহুলা মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে তার জীবনলাভের আশায় অনির্দিষ্ট গন্তব্যে ভেসে চলে। পথে নানা দুষ্ট জনের প্রলোভনকে এড়িয়ে চলে। নানা স্থানের পর ক্রমে বেহুলা উপস্থিত হয় 'নেত ধোপানীর ঘাটে'। নেত

ধোপানীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে বেহুলা আশান্বিত হয়। 'সেখানে দেখে, নেত ধোপানী নিজের ছেলেকে মেরে রেখে কাপড় কাচছে। কাজ সারা হলে মৃত ছেলেকে জীবন্ত করে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে।' তাই সে নেত ধোপানীকে সঙ্গে নিয়ে দেবসভায় গিয়ে উপস্থিত হয়। এদিকে দেবসভায় ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ নানা আলোচনায় রত ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টজীব মানুষের প্রতি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করবার জন্যে অন্যান্য দেবতাদের সমালোচনা করছেন। সেই সভায় মহাদেব-কন্যা মনসা নিন্দিত হন। এমন সময় বেহুলা উপস্থিত হয়ে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইলে মনসা তার ত্যাগ ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে স্বামী নখিন্দরসহ চাঁদ বেনের সাতপুত্রকে পুনর্জীবিত করেন এবং নিমজ্জিত সপ্তডিঙা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর বেহুলা দেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে 'চাম্পাই নগরে' প্রত্যাবর্তন করে। এখানেই বেহুলা 'গীতাভিনয়ে'র কাহিনী শেষ হয়েছে।

৪. পূরাণ কাহিনীর নব রূপায়ণ

'বেহুলা গীতাভিনয়' ভাসান-যাত্রার অনুকরণে লেখা এবং এর কেন্দ্রে রয়েছে দৈবী বিষয়। প্রচলিত কাহিনীতে সেই দেব-মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়েছে। যেনতেনপ্রকারেণ যেন মনসার পূজা প্রচারই মুখ্য বিষয়। কিন্তু এখানে মশাররফ বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে মানবিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এবং তার মধ্য দিয়ে মানুষের জয়ী হওয়ার কাহিনীকে চিত্রিত করেছেন। 'বেহুলা গীতাভিনয়ে' ভঙ্গুর মানুষ চাঁদ সওদাগর দৈব মনসাকে অস্বীকার করেন। এজন্যে বাসরঘরে ইতিমধ্যেই তিনি ছয় ছেলেকে হারিয়েছেন। তাঁর ব্যবসা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছে এবং সে কারণে তাঁকে প্রচণ্ড কঠোর জীবন-যাপন করতে হয়েছে। তবু তিনি 'বেঙ্গ-খাকী কানী' মনসার পূজো করতে রাজী নন। তাঁর সপ্তডিঙ্গা ডুবে যাওয়ার পর বন্ধু চন্দ্রকেতু তাকে চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে নূতনভাবে ব্যবসা করে দিলেও যখন চাঁদ জানতে পারে বন্ধুর বাড়িতে মনসার পূজো হয় তখন তিনি তার ঐ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন। পরে পুত্র লখিন্দরকেও বাসরঘরে সর্পাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

আবার বেহুলাও ভাগ্যের কাছে হার মানতে রাজি নন। সে মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যে ভেলায় করে তার সঙ্গে ভেসে চলে। পথে নেত ধোপানীর ঘাটে উপস্থিত হয়ে বেহুলা তার অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে জীবনকে গ্রহণ করার এই সহজ সাহস অদম্য জীবন-বীক্ষারই প্রকাশ। নেত ধোপানীর মত একজন প্রাকৃত মানুষের মধ্যে তার সন্ধান লাভ নাট্যকারের প্রবণতাকেই চিহ্নিত করে। যদিও প্রথাগত ভাবে পতিধর্মের জয়লাভের মধ্যে নাটকটি সমাপ্ত হয় তবু দেব-সভায় ক্ষমতাগর্ব ও অত্যাচারের অন্যায় প্রবণতাকে নিন্দা করার মধ্যে এর প্রতিবিধানকারী ও তার সাহসের প্রতিই লেখকের সমর্থন ব্যক্ত হয়।[৭৫] দেবসভায় ব্রহ্মা অভিযোগ করছেন— "আমার সৃষ্ট জীবের উপর যার যা ইচ্ছে সে তাই কর্চ্ছে। দেবতারাই যখন নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করেছেন, তখন আর মানুষকে কি বলি।"[৭৬] মনসার প্রতি মহাদেবের উক্তিও উল্লেখ্য ঃ "ক্ষমতা আছে কি পেয়েছ বলেই কি দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশ কর্ত্তে হয়।— না ক্ষমতা দেখিয়ে তাকে জব্দ কর্ত্তে হয় ?"[৭৭] এই দুর্বলের প্রতি ক্ষমতাবানদের অত্যাচারের চিত্র আমরা লক্ষ্য করেছি 'জমীদার-দর্পণ' নাটকে। মশাররফ এই বাস্তব জীবনভাবনার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর এই 'বেহুলা গীতাভিনয়ে'। নাট্যকার দৈবী-কাহিনীকে উনিশ-শতকীয় মানবতাবোধের চেতনায় সামান্যতম হলেও উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

৫. চরিত্র

ছকে বাঁধা কাহিনীর চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি নির্ধারিত। তাই সেখানে পূর্ণ বিকশিত চরিত্র নির্মাণের সুযোগ লেখকের অপেক্ষাকৃত কম থাকে। তবু এরই মধ্যে লেখক মশাররফ কয়েকটি চরিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রধান-অপ্রধান মিলিয়ে অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে 'বেহুলা–গীতাভিনয়ে'। চাঁদ সওদাগর ও বেহুলা এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র। এ ছাড়া লখিন্দর, চন্দ্রকেতু, সায়া বণিক, সনকা, নেত ধোপানী প্রভৃতি। আর দেব চরিত্রের মধ্যে মনসা, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

চাঁদ সওদাগর ও মনসার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। চাঁদ সওদাগর এই কাহিনীর প্রাণকেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় চরিত্র। পুরুষকারের প্রতীক তিনি। তাঁর চরিত্রে সাহসিকতা, বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা, অসহনীয়তা যেমন আছে তেমনি রয়েছে স্নেহবাৎসল্য ও মানবিকবোধও। তিনি ধ্বংস হতে পারেন, নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারেন, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতে জানেন না। মনসার নানা লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পূজা প্রচারে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হননি। এই প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দৃঢ়চেতা চরিত্র আবার একমাত্র জীবিত পুত্র লখিন্দরের অকাল মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তাঁর করুণ হাহাকার মর্মস্পর্শী। এখানেই চরিত্রটির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব যা পাঠক বা দর্শককে মুগ্ধ করে।

নারী চরিত্রের মধ্যে প্রধান হল বেহুলা। তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্য, পতিভক্তি, যাবতীয় প্রলোভনকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা তাঁকে একটি ব্যতিক্রমী নারীচরিত্রে উন্নীত করেছে। তাঁর উপস্থিতি প্রধানতঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে সীমিত থাকলেও ঐ স্বল্প ভূমিকায় তিনি কাহিনীর গতি সঞ্চার করেছেন। একমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টায় স্বামী লখিন্দর ও চাঁদ সদাগরের ছয়পুত্র সহ সপ্তডিঙ্গা পুনরুদ্ধার হয়। সনকা বাংলার শাশ্বত কল্যাণী গৃহলক্ষীর প্রতীক। ধৈর্য–ত্যাগে তিনিও অনন্যা।

দেব-চরিত্রের মধ্যে মনসা অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। প্রধানতঃ তাঁর পূজা প্রচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই কাহিনীর জন্ম। তিনি ক্রূর, নিষ্ঠুর। আপন পূজা প্রচারের স্বার্থে চাঁদ সওদাগরের বিরুদ্ধে যাবতীয় হীন উদ্যোগ নিতে তিনি পিছপা হননি। তবে এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে মনসার অন্তর্দ্বন্দ্বেরও পরিচয় পাওয়া যায় – বিশেষতঃ লখিন্দরকে সর্পাঘাতে মেরে ফেলার সময়। শেষ দৃশ্যে, বেহুলার কাতর অনুনয়ের সময় অবশ্য মনসা চরিত্রের দয়া ও ক্ষমারও পরিচয় মেলে। মনসা চরিত্রে এই সব মানবীয় গুণাবলী আরোগের কারণে যেন তাঁকে দেবচরিত্র বলে মনে হয় না। মনসাও দোষেগুণে আধুনিক মানব-চরিত্রে রূপান্তরিত হয় ও জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে।

৬. মূল্যায়ন

'বেহুলা গীতাভিনয়' মীর মশাররফ হোসেনের লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। তেমন উচ্চমানের নাটক না হলেও প্রচলিত লোক-কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়ে তাঁর শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা নাটকের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

টালা অভিনয়

১. ভূমিকা

'টালা অভিনয়' মশাররফ হোসেনের পরবর্তী প্রহসন জাতীয় রচনা। এটি প্রকাশিত হয় শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত মাসিক 'হাফেজ' পত্রিকার ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল এবং মে-জুন দুটি যুক্ত সংখ্যায়। গ্রন্থাকারে 'টালা অভিনয়' প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় নি। এ সম্পর্কে প্রায় সব সমালোচকই একই মত পোষণ করেছেন।[৭৮]

২. গঠনরীতি

'টালা অভিনয়' প্রহসনটির গঠনরীতি কোনো প্রচলিত নিয়ম মেনে চলেনি। অঙ্ক ও দৃশ্যভাগও সংজ্ঞা-সূত্র বহির্ভূত। এর প্রথমে আছে তিনটি দৃশ্য। তারপর আছে প্রথম অঙ্ক। তাতে একটি মাত্র গর্ভাঙ্ক (দৃশ্য)। অর্থাৎ মোট চারটি দৃশ্যে এই প্রহসনটি বিভক্ত। দৃশ্যবিভাগ ও অঙ্কবিভাগ দেখে গ্রন্থটিকে অসম্পূর্ণ রচনা বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণে অনেকে[৭৯] একে অসম্পূর্ন রচনা, কেউ বা[৮০] সম্পূর্ণ রচনা বলেই উল্লেখ করেছেন।

৩. পটভূমি

মশাররফ হোসেনের অন্যান্য অনেক রচনার মতোই 'টালা অভিনয়' সমকালীন বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত। 'হাফেজ' পত্রিকায় প্রহসনের শেষ কিস্তিতে 'লেখকের বিদায়' শীর্ষক শিরোনামের 'বিজ্ঞাপনে' মশাররফ বলেছেন ঃ—

> যে বৎসর পড়িয়াছে, তাহাতে আমার ন্যায় বহু পারিবারিক লোকের একস্থানে টেকসই হইয়া ঠিকভাবে থাকা সহজ নহে। বাধ্য হইয়া কলিকাতা যাওয়া আবশ্যক হইল। যে সকল কথা শুনা যাইতেছে, প্রতিদিন খবর আসিতেছে, তাহাতে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া আর যাইতে ইচ্ছা হইল না। . . . প্রিয় সুহৃদ এন. বি. এস. রেলওয়ের কোন মুসলমান স্টেশন মাষ্টার উপদেশ দিলেন—এ সময় যাওয়া উচিত নহে। . . . মনে যাহাই থাকুক, আর অগ্রসর হইলাম না। সাহসেও কুলাইল না। ঐখানে থাকিয়া কল্পনাচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই কলম সহায় কালীতে আঁকিয়া সাধারণের সমুখে ধরেছি। লিখক স্বচক্ষে কিছুই দেখে নাই। পরস্পর শুনা, শক্তির চালনা আর মনের কল্পনা—এই তিন যোগে যাহা জমিয়াছে, তাহাই আঁকিয়া মনের ভাব তুলিতে লিখিয়া ও তুলিয়া সাধারণের গোচর করিতেছি। যাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কল্পনার অভিনয়ের সহিত প্রত্যক্ষ অভিনয় একবার মিল করিয়া সুবিচার করিবেন। ইহাই প্রার্থনা।[৮১]

কলকাতার টালা অঞ্চলে এক খণ্ড জমির দখল কে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গাই হল 'টালা-

অভিনয়ে'র কাহিনীর মূল উপজীব্য। এই বাস্তব ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ সমসাময়িক পত্রিকা 'Calcutta Review' সহ Bengal under the lieutenant governors, Muslim community in Bengal, বাংলাদেশের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।[৮২]

কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার জমিদার মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের (১৮৩১-১৯০৮) টালা অঞ্চলের এক টুকরো জমির উপর স্থানীয় মুসলমানেরা একটি চালাঘর নির্মাণ করে মসজিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু আদালতের রায়ে মুসলমানদের এই দাবী নাকচ হয়ে যায়। অতঃপর জমির দখল নিয়ে মহারাজার লোকজনদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন। এর জের পরদিন অর্থাৎ ১লা জুলাই পর্যন্ত চলে। এতে সরকারী হিসেব মতে, হাঙ্গামাকারীদের এগার জন নিহত ও প্রায় কুড়ি জন আহত হয়। অবশ্য নিহত ও আহতের প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে বেশী ছিল বলেই অনেকের অনুমান। পুলিশ পক্ষের কেউ নিহত না হলেও ৩৪ জন আহত হয়। এই হাঙ্গামা কলকাতায় জনমনে বেশ আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সূচনা হয়। দাঙ্গাকারীদের মধ্যে ৮৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে ৮১ জনের শাস্তি হয়। দাঙ্গা প্রথমে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘটিত হলেও সরকারপক্ষ হিন্দুদের পক্ষ নেওয়ায় ক্রমে তা ইংরেজ বনাম মুসলমানের লড়াই-এর রূপ নেয়।

এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই সময় কলকাতার কিছু প্রভাবশালী মুসলমান ধর্মীয় নেতা ফতোয়া দেন যে, বিতর্কিত চালাঘরটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মসজিদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। কারণ, বিতর্কিত জমিটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ অন্যের জমির উপর কেউ মসজিদ তৈরী করতে পারে না, যে সম্পত্তি ওয়াকফ নয় তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা যায় না এবং কোনো জমির মালিক অনুমতি না দিলে তার উপরে জুম্মার নামাজ আদায় জায়েজ (সিদ্ধ) নয়। একই সঙ্গে তাঁরা এর তীব্র নিন্দা করেন। নেতৃবৃন্দের এই প্রচারপত্রে সম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমিত হয়। তবে এর পেছনে সম্ভবতঃ বৃটিশ সরকারের ভূমিকাও ছিল।[৮৩] যাই হোক, টালা হাঙ্গামায় মুসলমানদের দায়িত্বই ছিল বেশী। ঘটনাপ্রবাহ এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচারপত্রও এই ধারণা সমর্থন করে।

টালা-ঘটনায় মীর মশাররফের সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই ঘটনায় স্বসমাজের কতিপয় লোকের অন্যায় আচরণকে অন্ধ আবেগবশত সমর্থন জানান নি। বরং এর পশ্চাৎপটের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গূঢ় সত্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।

লেখকের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট না হলেও 'পরস্পর শুনা' কথাকে তিনি আপন 'কল্পনা' শক্তির দ্বারা এর একটি কাহিনী রূপ গড়ে তুলেছেন। তৎকালীন হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের পেছনে তিনি 'শয়তানের চক্রান্ত'কে দায়ী করেছেন। দায়ী যেই হোক, সংঘর্ষের ক্ষেত্র হিসেবে মীর প্রেতাত্মার সভা কল্পনা করেছেন যেখানে হিন্দু ও মুসলমান ভূতেরা হাঙ্গামা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। পুরোহিত বেশধারী ভূতরা মুসলমানদের মধ্যে এবং মোল্লা বেশধারী ভূতরা হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে এই ধরণের কাহিনী কল্পনার ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৪. কাহিনী

প্রথম দৃশ্যের ঘটনাস্থল কল্পনা-রাজ্য। কলকাতার মৌলা-আলীর দরগার পেছনে বড় রাস্তার ধারে জনৈক হিন্দুস্থানী মৌলবী হিন্দু মুসলমানের ঐক্য কামনা করে এলাহির (ঈশ্বরের) কাছে প্রার্থনা করছেন। অদূরে শয়তানের দুটি চেলা মৌলবীর প্রার্থনাকে ব্যঙ্গ করছে। ভূতবেশী অশরীরী এই দুই চেলাকে দেখে মৌলবী সাহেব ভয়ে ভীত হয়ে সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যান।

দ্বিতীয় দৃশ্যে, কালীঘাটের মন্দিরের পাশে বিদ্যারত্ন মহাশয় কালীদেবীর স্তব করতে করতে ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান দুই সন্তানের মিলন কামনা করছেন। সেখানেও শয়তানদ্বয় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রার্থনাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে বিকট চিৎকার করলে তিনিও ভয়ে পলায়ন করেন।

তৃতীয় দৃশ্যে, ভারত শ্মশানের অন্তর্ভূক্ত হরিণবাড়ী জেলখানার সম্মুখে রাস্তার ধারে ভূতপ্রেত শয়তানদের সভা। এই সভায় হিন্দু এবং মুসলমান বেশধারী ভূতেরা কৌশলে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে হাঙ্গামা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়। সভাপতি ছিলেন খুড়ো নারদ ঠাকুর। সেখানে মৌলবীর বেশে শয়তান ইবলিসও রয়েছে। সবার কণ্ঠে বৃটিশ রাজশক্তির প্রশংসা। ইবলিস জানায়, "আমি মসজিদ বলেই ধুয়া ধরি। আর তুমি যদি নওয়াতে পার, তবে হয় তোমার, নয় আমার নাম করে 'নয়' 'নয়' মসজিদ নয় বলে টান দিও। যাবে কোথা ?" (৩য় দৃশ্য)। নারদও সম্মতি জানিয়ে বলে, "শুধু বসে থাকা ভাল নয়, স্বভাবের বিপরীত কাজ।" (৩য় দৃশ্য)। শুধু তাই নয় মুসলমান ভূত ইবলিস হিন্দুভূত নারদ ঠাকুরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে— "মেয়া ভাই ! মালা কুড়জালি নিতে ভূলো না। আমিও তসবিহ নিতে ভুলিব না। লোকের মনে ধাঁদা (ধাঁধাঁ) লাগানো চাই। চক্ষে ধুলা দেওয়া চাই।" (৩য় দৃশ্য)।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে দেখা যায়, ঘটনাস্থান কল্পনারাজ্য। হত দরিদ্র মুসলমান নজু, ফজু, কালু প্রভৃতি চরিত্রগুলি বড় রাস্তার ধারে একটি ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের সংসারের অভাব অনটনের কথা বলছে। শিক্ষাদীক্ষায় এবং আর্থিক দিক দিয়ে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুগণ যে অনেক এগিয়ে সে কথাও তারা জানায়। অবশ্য দারিদ্র্যের কারণে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের যে একই অবস্থা তা তারা জানাতে ভোলেনা। এমন সময় খাঁ সাহেব দলবল নিয়ে এসে তাদের জানায় যে, রাজা বাহাদুরের লোকজন নাজীরসহ আদালতের হুকুমনামা নিয়ে এখনই ঘর ভাঙ্গতে আসছে। এতে খাঁ সাহেবের সঙ্গে ফজু, নজু সবাই গর্জে উঠে একসুরে জানাল— 'এ জান থাকতে মসজিদ ভাঙ্গিতে দিব না।'

এমতাবস্থায় আদালতের ও রাজা বাহাদুরের লোকজন নিয়ে নাজীরবাবু সেখানে উপস্থিত হয়ে আদালতের হুকুম জানিয়ে দিলেন এবং সেই ঘর ভেঙ্গে দিতে বললেন। তিনি এও জানালেন যে, ঐ ঘরটি আদালতের রায়ে মসজিদ বলে সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু মুসলমান পক্ষের সাধারণ লোকজন তা না মেনে রাজা বাহাদুর এবং সরকার পক্ষের লোকজনের প্রতি আক্রমণ করে। দখলকারীগণ বেগতিক দেখে সভয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করে। এখানেই রচনাটির সমাপ্তি হয়েছে।

৫. রচনা-বৈশিষ্ট্য

'টালা অভিনয়ে'র কাহিনীর বর্ণনা দেখে মনে হয় রচনাটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল। তবে পরিণতিতে দাঙ্গাকারীদের পরাজয় বা শাস্তির বিষয়টি এখানে নেই। শিল্পী মশাররফ তাঁর প্রহসনের শেষাংশে হয়তো তার প্রয়োজন মনে করেন নি। বরং তিনি সুস্থ সমাজ-জীবনে দুটি সম্প্রদায় কিভাবে শয়তানরূপী কিছু দুষ্কৃতকারী মানুষদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তারই শিল্পিত রূপায়ণ ঘটিয়েছেন এই 'টালা অভিনয়ে'।

প্রহসনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল, সমাজের কোনো অসঙ্গতিকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা। এর পেছনে সমাজ-সংশোধনের উদ্দেশ্যও নিহিত থাকে। ইতিপূর্বে মশাররফ হোসেন উনিশ শতকের বাবু সমাজের মদ্যপান ও বারাঙ্গনা-গমনকে কেন্দ্র করে 'এর উপায় কি?' (১৮৭৫) প্রহসন রচনা করেন। 'টালা অভিনয়ে'ও তিনি ধর্মের মুখোশধারী হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ভণ্ডলোকেদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। তবে 'এর উপায় কি'-এর তুলনায় 'টালা অভিনয়' শিল্পের বিচারে বিশিষ্ট রচনা হয়নি।

এতৎসত্ত্বেও এই রচনায় বেশ কিছু স্থানে সমাজের বিভিন্ন মানুষদের নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও হাসি মস্করার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—কেবল মাত্র অর্থলোভে অজ্ঞ ও ভণ্ড লোকেরা ধর্মশাস্ত্র পাঠকে পণ্যে পরিণত করেন। সমাজে প্রচলিত এই ধর্ম ব্যবসাকে লেখকের কটূক্তি ঃ

> দোয়া দরূদ কিছুই নহে, সেই প্রকার কথার উচ্চারণ মাত্র। অর্থ সংযোগ কিছুই নাই। তিনি যে প্রকারে শিক্ষা করিয়াছিলেন, বিশ্বাসের সহিত তাহাই পড়িতে লাগিলেন। (১ম দৃশ্য)।

আবার নজু, ফজুদের মতো সমাজের অশিক্ষিত সাধারণ অজ্ঞ মানুষগুলি তাদের ধর্মীয় গুরুদের পরামর্শ ও উপদেশকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস বা ধারণাকে লেখকের ব্যাঙ্গোক্তি ঃ

> মৌলবী বেল্লীক আর ইবলিস মুন্সী বলে গেছে—দুই সেজদা যেখানে পড়ে— সেই খোদার ঘর – কার সাধ্য সে ঘর ভাঙ্গে। যারা ভাঙ্গতে আসবে, তার খোদার হুকুমে, হাত পা অবশ হয়ে পড়ে যাবে। আর যে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছে, তাতে আমাদের এক একজনের গায়ে এক এক হাতীর বল হবে। আর তারা আমাদিগকে বাঘের মত দেখবে। এক খোরা ধুলা পড়ে দিয়ে গেছে।... মুখে মাখলেই বাঘের মত দেখাবে। (১/১)।

তাছাড়া এই রচনার মামদো, লেললু, ঘোঁঘোঁ এই নামগুলিও বেশ কৌতুককর। সুতরাং প্রহসনের অনেকগুণই এতে রয়েছে।

৬. সমাজ চেতনা

সমাজ সম্পর্কে মশাররফ হোসেনের গভীর চিন্তাচেতনার ছাপ রয়েছে 'টালা অভিনয়ে'। বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের সহাবস্থান তিনি আন্তরিকভাবে কামনা করেছেন তাঁর একাধিক রচনায়। 'টালা অভিনয়'ও

হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি-ইচ্ছা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাক্ষর। হিন্দু মুসলমানের মিলনে মৌলবী ও পুরোহিতদের প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা যে আন্তরিক ছিল না, শুধু তাই নয়, তাদের চক্রান্ত ও উস্কানিই যে এই দাঙ্গার মূল কারণ, প্রহসনে এই সত্যই প্রতিফলিত হয়েছে।[৮৪] এখানে হিন্দু মুসলিম মিলনের কৃত্রিম ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচেষ্টাকে মশাররফ বিদ্রূপ করেছেন।

তাঁর অন্যান্য রচনার মতো 'টালা অভিনয়'-এও মশাররফ তাঁর অকৃত্রিম রাজভক্তির পরিচয় গোপন করেননি। এখানে তিনি তাঁর যুগ ও শ্রেণীর প্রতিনিধি-স্বরূপ। ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়েছে মৌলবীর প্রার্থনায় ঃ

> এলাহি ! ভারতেশ্বরীর রাজ্য চিরস্থায়ী হউক। স্ব স্ব ধর্ম্মে স্বাধীনতা এরূপ সামঞ্জস্যভাবে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া প্রজাপালন করিয়া আসিতেছেন, এলাহি! তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিও।[৮৫]

এই বৃটিশ-শাসনের প্রতি আনুগত্যের পাশাপাশি ভারতবাসীর স্বাধীনতা আকাঙ্খা বা স্বায়ত্ত শাসনের দাবীকে ১ম চেলার মুখদিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে – 'জঙ্গ ফতে করবেন। রাজ্য শাসন কর্ব্বেন, স্বায়ত্ত শাসন দণ্ড হাতে নিবেন। ঘৃণা ! ঘৃণা !'[৮৬]

এছাড়া স্বায়ত্ত-শাসন ও অন্যান্য দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজ-বিরোধিতার প্রশ্নে মশাররফের সমাজ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তাঁর গভীর চিন্তা-চেতনার ছাপ ধরা পড়ে ঃ—

> শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, বনেদী ঘরণা, ধনী বিদ্বান ভদ্রলোক, কি হিন্দু কি মুসলমান—উভয় দলই রাজভক্ত। অশিক্ষিত দলেই যত গোলযোগ। যদি তাহারা শিক্ষা পায়, তবে নিশ্চয়ই শিক্ষিত সমাজে মিশিতে পারিবে। রাজ্যে দিন দিন শান্তিস্থাপন হইবে। আমারই যদি শিক্ষিত হইতাম, তাহা হইলে কি রাজদণ্ডে প্রাণদণ্ড হয়। শিক্ষাই শান্তির আকর, উন্নতির সোপান।[৮৭]

জাতীয় উন্নতির জন্যে শিক্ষার কথা তিনি অন্যান্য রচনায়ও বহুবার বলেছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল। তবে এখানে তিনি এই শিক্ষার্জনকে 'রাজভক্ত' হয়ে ওঠার প্রকরণ হিসেবে গণ্য করেছেন।

'টালা অভিনয়ে' নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি গভীর দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। উচ্চবিত্তের মানুষেরা এদের কিভাবে বঞ্চনা করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে তারও করুণ ও মর্মস্পর্শী চিত্র এতে আছে। এক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানে কোন তফাৎ নেই। ইবলিস নারদকে তার বাহন কোথায় জিজ্ঞেস করলে নারদ আফসোস করে জানিয়েছে ঃ—

> আর ভায়া বাহন। এবারকার আকালে আবার বাহন আছে ? জরাজীর্ণ হয়েছে। টাঠা পোকা মাঝে মাঝে ঘূন ধরে একেবারে জ্বরজ্বর করে ফেলেছিল, দুইদিন উপবাস থেকে দশ পয়সায় আমার চিরপ্রিয় বাহনটি বিক্রয় করে একসের চাল কিনেছিলাম।[৮৮]

বাঙালী মুসলমানদের অবস্থা যে এর চেয়েও করুণ মশাররফের সংবেদনশীল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ইবলিসের খেদোক্তিতে,

> বাঙ্গালার মুসলমানের কি কিছু আছে। বিশেষ নিম্ন শ্রেণীর লোকের পেটে অন্ন নাই, পরণে কাপড় নাই। হাভাত, হাভাত করে লুটপুটী খাচ্ছে।[৮৯]

মুসলমান সমাজের এই দুর্দশার জন্যে তিনি তাদের আলস্য, বড় মানুষীভাব, অবিমৃষ্যকারিতা, শ্রমবিখুতা ও পারলৌকিক চিন্তাকেই দায়ী বলে মনে করেছেন।

সাধারণ খেটে খাওয়া এই হত দরিদ্র মানুষদের দুঃখ-দুর্দশার পাশাপাশি ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যও লেখককে পীড়া দেয়। 'কারা খাটে কারা খাটে শোয়।'[৯০]— এই চিরন্তন প্রশ্নের মীমাংসা অসাধ্য হলেও তা এখানে উত্থাপিত হয়েছে। এই সমস্ত ইতর শ্রমজীবী মানুষেরাই 'সভ্যতার পিলসুজ'। নজুর মতো দরিদ্র শ্রমজীবী চরিত্রের মুখ দিয়ে এই বক্তব্যই তীব্রভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ—

> ভদ্রলোক নিয়েই আমার মরণ। আমরা খাটী, আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবাদ করি, ধান জন্মাই। সুযোগ সুবিধা করে দেই। সাহেবরা বাড়ীতে বসে থেকেই, ছায়ায় বিছানা পেতেই ভদ্রলোক। আমরা জোগায়ে না দিলে, আমরা ছোটলোক বলে রাজী না হলে, তারা ভদ্রলোক হতেন কোথা হতে ? তাঁদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তো কে ?[৯১]

মীরের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই প্রহসনের দুয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি যে সহানুভূতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার মূল্য নেহাৎ কম নয়।

৭. চরিত্র

'টালা অভিনয়ে'র স্বল্প পরিসরে চরিত্রগুলি পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। তারা বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধ করতেই এখানে আবির্ভূত। মোটামুটি তিন শ্রেণীর চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ঃ (ক) মৌলবী, বিদ্যারত্ন, শয়তান-সভার ভূতপ্রেত চেলা চামুণ্ডা, (খ) নজু, ফজু, কালুর মতো কায়িক পরিশ্রমী নিম্নশ্রেমীর মানুষ, (গ) খাঁ সাহেবের মতো কৌশলী মানুষ, আদালতের নাজীর বাবু ইত্যাদি। এখানে কোন নারী চরিত্র নেই। স্বল্পায়তন এই প্রহসনে অধিকাংশ চরিত্রই অস্পষ্ট, তবে এদের অনেককেই কোন শ্রেণী বিশেষের প্রতিনিধি হিসেবে চিনে নিতে অসুবিধে হয়না। ছদ্মবেশী ইবলিস ও নারদ ঠাকুর কপটাচরণে 'জমীদার দর্পণে'র জিতুমোল্লা ও হরিদাস বৈরাগীর প্রায় কাছাকাছি। তবে এই স্বল্প পরিসরেও নজু, ফজু ও কালুর মতো নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলি সামান্য রেখার আঁচড়েও বেশ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

৮. মূল্যায়ন

মশাররফ হোসেনের 'টালা অভিনয়' প্রহসনটি শিল্প-গৌরবে নয়, সমকালের একটি স্পর্শকাতর ঘটনার বিশ্বস্ত রূপায়ণের জন্যেই উল্লেখ্য। তবু বলা যায় বাংলা সাহিত্যের প্রহসনের ধারায় এটি অন্যতম সংযোজন।

প্রবন্ধ–ইতিহাস

মীর মশাররফ হোসেন বাংলা প্রবন্ধ রচনায়ও হাত দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষী ও সাহিত্যিকগণ। উনিশ শতকে 'আধুনিক বাংলা গদ্যের অন্যতম মুখ্য সাহিত্যরূপ প্রবন্ধ'[১], সাহিত্যের অন্যতম বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্য দিয়ে সমকালের বাঙালীর জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় প্রকাশ পায়।

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়েই লক্ষ করেছি যে উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমান লেখকদের মধ্যে রসসাহিত্য রচনায় অনীহা বা বিরূপ মনোভাব থাকলেও প্রবন্ধ-রচনায় তাঁদের আগ্রহ কম ছিল না। কিন্তু মীর মশাররফ একাধারে রসসাহিত্য রচনার পাশাপাশি প্রবন্ধ-রচনায়ও দক্ষতা দেখিয়েছেন। তবে তাঁর প্রবন্ধ রচনার সংখ্যা বেশি নয়। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ-গ্রন্থ হল — 'গো-জীবন'। বাকী সবই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত স্বতন্ত্র প্রবন্ধসমূহ। আর ছিল একটি ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থ। এই শ্রেণীর রচনাগুলি হল এরূপ ঃ ১. গো জীবন এবং ২. এসলামের জয়। এই দুটিই প্রবন্ধ-গ্রন্থ। আর যে সমস্ত প্রবন্ধ পৃথকভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল ঃ

১. 'মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি' (সংবাদ প্রভাকর, মে ১৮৬৫)
২. 'সুসমাচার' (নবরত্ন, ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬)
৩. 'আমাদের শিক্ষা' (হিতকরী, ১, ১৫ পৌষ ১২৯৭)
৪. 'সৎপ্রসঙ্গ' (কোহিনুর, ভাদ্র ১৩০৫)

এগুলির মধ্যে অধিকাংশই আজ প্রায় দুষ্প্রাপ্য। আমাদের আলোচনা প্রধানতঃ নিবদ্ধ থাকবে গোজীবন, এসলামের জয় এবং প্রাপ্ত দু-একটি প্রবন্ধের উপর।

গো-জীবন

১. ভূমিকা

'গো-জীবন' মীর মশাররফ হোসেনের বিতর্কিত একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ। এতে তাঁর তিনটি প্রবন্ধ, জনৈক নইমুদ্দিনের তিনটি প্রতিবাদপত্র এবং লেখকের একটি প্রতিবেদন সংকলিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধগুলি 'প্রস্তাব' শিরোনামে 'আহমদী' পত্রিকায় (১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৫ শ্রাবণ, ১৫ পৌষ ১২৯৫) বেনামীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি হল ঃ— প্রথম প্রস্তাব — 'গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা', দ্বিতীয় প্রস্তাব — 'গো-ধন কি সামান্য ধন ?' এবং তৃতীয় প্রস্তাব — 'গো-মাংস'। পরে একত্রে সংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে 'গো-জীবন' নামে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হয় ১২৯৫ সালের ২৫শে ফাল্গুন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এই সন তারিখ অনুসারে ইংরেজি ৮মার্চ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

মীর মশাররফ "পঞ্চবিংশতি কোটী ভারত-সন্তান করে"[৩] গ্রন্থটি উৎসর্গ করে বাংলাদেশ তথা সমগ্র

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যসাধনকল্পে এবং গোজাতি রক্ষায় গো-হত্যার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন ঃ

> আশা ছিল, ভারতের প্রতি হস্তে গো-জীবন অর্পণ করি। অবস্থার গতিকে তাহা পারিলাম না। করুণাময় ভগবান কৃপায় মাত্র দুই হাজার গো-জীবন আপনাদের পবিত্র হস্তে অর্পণ করিতেছি; গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।
>
> গো-জীবনের চির-অরি, প্রতিবাদকারী মহাত্মগণ, গো-জীবনে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা সম লিখনি আঘাতে যে প্রকার ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া স্ব স্ব মত প্রকাশ করিলে পরম প্রীতিলাভ করিব।[৪]

এ ছাড়া তিনি এই গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে মক্কা, বাগদাদ, ঢাকা, দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ বিদেশের শহরে পাঠিয়ে ধর্মীয় পণ্ডিতদের মতামত সংগ্রহ করে পুনঃপ্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লেখকের এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

২. পটভূমি

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের নানা কারণের মধ্যে গো-হত্যা অন্যতম প্রধান কারণ। হিন্দুদের কাছে গরু দেবতা-জ্ঞানে পূজিত হয় এবং সেই সূত্রে গো-হত্যা মহাপাপ। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ খাদ্য হিসেবে গো-মাংস ভক্ষণ করে এবং ধর্মপালনের অঙ্গ হিসেবে 'ঈদ-উল-আজহা' বা কোরবানী উৎসবে গো-বধ করে থাকে। দুই সম্প্রদায়ের এই ভিন্নধর্মী ধর্মনীতির কারণে গো-হত্যা ও গো-রক্ষাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল ধরে বিবাদ চলে আসছিল। এই সময় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ১২ জানুয়ারী আর্যসমাজপতি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী "গো-রক্ষিনী সভা" স্থাপন করে গো-হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে দ্বন্দ্ব আরো তীব্র আকার ধারণ করে। এ নিয়ে কেবল সমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামাই হয়নি—বিতর্কমূলক অনেক পুস্তক-পুস্তিকাও রচিত হয়েছে।[৫] এই পটভূমিকায় মীর মশাররফ স্বসমাজের মানসিকতার ঊর্দ্ধে উঠে গো-হত্যার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে রচনা করেন 'গো-জীবন'। 'গো-রক্ষিনীসভা'র পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগতও জানান হয়।[৬]

৩. 'গো-জীবন'-এর সারকথা

প্রথম প্রস্তাব ঃ গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা

ভারতবর্ষব্যাপী সমাজ-জীবনে ও পত্র-পত্রিকায় গো-হত্যা ও গো-রক্ষা নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ চলেছে। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে। এই সময় লেখক মশাররফ 'আর নীরব থাকা উচিত নয়' মনে করে লেখনী ধারণ করেছেন।

মশাররফ নিজেকে একজন মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে 'মোসলমান ভ্রাতা'দের উদ্দেশ্যে জানালেন, 'ন্যায়চক্ষে' এবং যুক্তিসংগত কারণে গো-হত্যা করা অনুচিত।

তিনি ইসলামী শরীয়তের হালাল-হারাম (বৈধ এবং নিষিদ্ধ) — এই দুটি বিধানের কথা উল্লেখ করে বলেন,

গো-মাংস ভক্ষণ হালাল। তবে কোরান শরীফে যেমন শূকর মাংসকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, সেভাবে গো-মাংসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়নি, বরং তা ইচ্ছাধীন।

তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে বলেছেন, জগতে ফড়িং, গো-সাপ, পাঁঠা প্রভৃতি বহু প্রাণী আছে যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি কিন্তু সেগুলি বৈধ নয় বলে আমরা খাই না। বৈধ প্রাণীর মধ্যে ঘোড়া, মহীষ, বনগরু, মেষ, ছাগল, মৃগ, খরগোস প্রভৃতি এত রকম প্রাণী থাকতে গো-বংশ নষ্ট করে হত্যা করা কেন ?

গো-দুগ্ধ আমাদের বহু উপকারী জিনিস। শিশুর খাদ্যে ও নানা মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত করতে তার প্রয়োজন। ভূমি কর্ষণের জন্যে বলদের দরকার। গো-বিষ্ঠা মুসলমানের কাছে অপবিত্র মনে হলেও হিন্দুদের কাছে তা আদরের। তাছাড়া শুষ্ক গো-বিষ্ঠা তো হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার কাছেই প্রিয়। গো-মূত্রে উৎকট ব্যাধি আরোগ্য হয়। গরুর উপকারের অন্ত নেই। মৃত গরুর চামড়া দিয়ে জুতো তৈরী হয়। অতএব তাঁর কাতর আবেদন, এই উপকারী প্রাণীকে যেন নিধন করা না হয়।

তাছাড়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্যে গো-হত্যা বর্জন করা জরুরী। দেশের রাজা ইংরেজ। তাদের কাছে গরু ও শূকর — উভয় প্রাণীই খাদ্য বলে এ বিষয়ে তারা উদাসীন থাকতে পারে। আমরা রাজাকে একসময় ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে পরিত্যাগ করতে পারি না।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব 'কোরবানী'র উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালের পয়গম্বর হজরত ইব্রাহিমের কোরবানীর ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেছেন — গরু কোরবানী না দিয়েও ধর্মরক্ষা হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ গোধন কি সামান্য ধন ?

গো-ধন সামান্য ধন নয়। শাস্ত্রে গো-জাতির গুণাগুণের তেমন কোন বর্ণনা নেই। তাকে কেবল হালাল প্রাণীর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে মাত্র। শাস্ত্রে ও আরবদেশে উট আর দোম্বার কথাই গুরুত্বসহকারে বেশি উল্লেখিত হয়েছে।

প্রয়োজনানুসারে আমরা অনেক সময় শাস্ত্র-বহির্ভূত অথবা শাস্ত্রে অনুল্লেখিত কোন কাজ করে থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লেখক উল্লেখ করেছেন — ধুতি চাদর পরিধান, গুড়গুড়ি বা তামাকের ধুমপান, নাগরাই জুতো ব্যবহার, বাষ্প -শকট, টেলিফোন, বিলেতি-দেশলাই প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি। অবশ্য তিনি শাস্ত্র-বহির্ভূত কোন কাজ করতে প্ররোচিত করতে চান না। তিনি কেবল শাস্ত্র রক্ষা করে উপকারীজনের প্রত্যুপকার করতেই অনুরোধ করেছেন। এক্ষেত্রে যারা প্রত্যুপকার করতে অনিচ্ছুক লেখক তাদের পশুদের চাইতেও অধম বলে মনে করেছেন।

কসাইগণ শাস্ত্র-বিধি মেনে গো-হত্যা করলেও তারা কসাই ('কাচ্ছাব' শব্দ থেকে কসাই, যার ভাবার্থ ব্যবসায়ী) নামেই অভিহিত। মুসলমান পারসী কবিগণ কসাইকে নিষ্ঠুর-হৃদয় বলে বর্ণনা করে গেছেন। সেই কসাইগণ নিজের জন্য নয় — ব্যবসার কারণে খাদকদের জন্য গরু জবাই করে থাকেন।

তবু মুসলমানগণ যে ধর্মের দোহাই দিয়ে গো-হত্যা করেন তা বন্ধ করতে লেখক প্রাণপণ চেষ্টা করে যাবেন। এ সুলতানী রাজত্ব নয় — ইংরেজ আমল। তাই তিনি নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায় গো-হত্যার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করে

যেতে পারবেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁর এই উদ্যোগে সামিল হতে হিন্দুভ্রাতাগণকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। কেন না, হিন্দু মুসলমান একযোগে কোন কাজ না করলে তা সিদ্ধ হবে না।

তৃতীয় প্রস্তাব ঃ গো-মাংস

'গো-মাংস' প্রবন্ধে লেখক খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে বিন্যাস করেছেন — খাদ্য, অখাদ্য এবং সুখাদ্য। এরপর দেশ-কাল ভেদে খাদ্য-ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেছেন যে, জলবায়ু, তাপ এবং মৃত্তিকার বিচারে বঙ্গদেশে ইউরোপীয় বা আরবদেশীয়দের মতো গরুকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে না। আবার এমন কাল উপস্থিত হয়নি যাতে বঙ্গবাসী মুসলমানগণকে গো-মাংস খেতেই হবে। কোমল আর্দ্র জলমাটির এই বাংলাদেশে বাঙালীদের হজম-শক্তিও সুপরিপক্ক নয়। তাই যেহেতু গো-মাংস সহজ-পাচ্য নয় এবং নানা অসুখের সম্ভাবনা — তাই এদেশবাসীর গো-মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। এমনকি হাকিমি মতে (আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্র) গো-মাংস ভক্ষণে পেটে কৃমি, বাত, দন্তব্যাধি প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকে।

'আবার আমার কয়েকটি কথা' অংশে লেখক প্রতিবাদকারীদের হিংসার আভাসের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে বৃটিশ রাজত্বে ন্যায়দণ্ড বিরাজমান বলে তিনি এ বিষয়ে নীরব থাকবেন না।

এই প্রবন্ধেরই 'গো-দুগ্ধ' অংশে লেখক পুনরায় দুগ্ধের নানা গুণাবলীর উল্লেখ করে বলেছেন যে দুগ্ধ মানুষের জীবনের জীবন। ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, হিন্দু-মুসলমান — সবার প্রিয় বস্তু। কোন সম্প্রদায়ের কাছেই তা পরিত্যাজ্য নয়। এমন কি স্বর্গ-মর্ত্যেও এর সমান আদর। প্রতিদিন গো-মাংস খাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু প্রত্যহ দুগ্ধপান অরুচি বা অসুবিধের কারণ হয় না। এমনকি মানব-জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও রোগীর কাছে দুগ্ধ প্রয়োজনীয় বস্তু। তাই লেখকের বক্তব্য, মূলে কুঠারাঘাত করলে কি আর ফললাভের আশা থাকে ?

৪. প্রবন্ধ বিষয়ের পর্যালোচনা

'গো-জীবন'-এর প্রস্তাবসমূহে মশাররফ গো-রক্ষার জন্য স্ব-সমাজের উদ্দেশ্যে অনুনয় ও আবেদনের পাশাপাশি গো-সম্পদের উপকারিতা ও গো-মাংসের অপকারিতা সম্পর্কে যুগপৎ যৌক্তিক ও আবেগী বক্তব্য পেশ করেছেন। স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে লেখক ধর্মগ্রন্থ এবং প্রাত্যহিক বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে নানা যুক্তি ও তথ্য পরিবেশন করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

> আমি মোসলমান — গো-জাতির পরম শত্রু। আমি গো-মাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পারি, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গো-বৎস্যের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায়চক্ষে যাহা দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব ? . . . শাস্ত্রে এ কথা লিখা নাই যে গো-হাড় কামড়াতেই হইবে, গোমাংস গলাধ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে।[৭]

লেখকের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মূল অভিপ্রায়ই ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা। গো-হত্যাকে কেন্দ্র করে যাতে

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ বিরোধের সূত্রপাত না হয় তাই তিনি বারবার ব্যক্ত করেছেন ঃ

> এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক .... এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গি যাহারা তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ? .... কালে আমরা রাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। রাজাও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু-মোসলমানে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।[৮]

তাছাড়া মশাররফের অন্যান্য রচনার মতো এই গ্রন্থেও ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার প্রতি লেখকের অকুণ্ঠ বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে ঃ

> এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশসিংহ ইহার শাসনকর্ত্তা, ন্যায্য কথা বলিতে কোন বাধা নাই – ভয়েরও কোন কারণ নাই। সুতরাং লিখনি ক্ষান্ত হইবার নহে।[৯]

এই বিশ্বাস, এই আস্থা মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত নয় – বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উদীয়মান মধ্যবিত্ত মাত্রই এই ধরনের বিশ্বাস সযত্নে লালন করেছেন।[১০]

৫. সমকালীন প্রতিক্রিয়া

'গোজীবনে'র প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। হিন্দু পরিচালিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মীরের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্প্রদায়-সম্প্রীতি প্রয়াস প্রশংসিত হয়। 'ভারতী ও বালক' (চৈত্র, ১২৯৫) পত্রিকা লেখকের উদারতার প্রশংসা করে জানায় ঃ

> ... কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যাহাতে গো-জীবন রক্ষায় সচেষ্ট হন এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানি লিখিত। ... লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষয়ে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, যে-রূপ অপক্ষপাতীভাবে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে আমাদের আশ্চর্য্যও জন্মিল। ভরসা করি অন্য মুসলমানগণ তাঁহার অনুসরণ করিবেন।[১১]

'অনুসন্ধান' (১৫ বৈশাখ, ১২৯৬) পত্রিকা মন্তব্য করে, লেখক 'সাহসী' এবং 'প্রকৃতই হৃদয়বান'।[১২] 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (বৈশাখ, ১৮১১ শক, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) লেখে ঃ

> তিনি মুসলমান হইয়া স্বীয় ভ্রাতা মুসলমানদিগকে গোমাংস সেবনে বিরত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। ... দয়াধর্মের মূল এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।[১৩]

কিন্তু অন্যদিকে মুসলিম পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলিতে এই রচনার জন্যে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করা হয় ও মশাররফের নিন্দা করা হয়। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন 'আখবারে এসলামীয়া' পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ নইমুদ্দীন (১৮৩২ – ১৯০৮)। প্রথম প্রবন্ধ 'গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা' 'আহমদী' পত্রিকায় (১৫ শ্রাবণ ১২৯৫) প্রকাশের পরেই 'আখবারে এসলামীয়া'য় তার প্রতিবাদ বের হয়। প্রতিবাদকারী নইমুদ্দীন সাহেবের মতে, মূল প্রবন্ধ-লেখক 'মুসলমান নহেন'।[১৪] এই উক্তির সমর্থনে 'আখবারে এসলামীয়া'য় বহু চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। ক্রমে বৃহত্তর মুসলিম সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ সময় 'আহমদী' পত্রিকার সম্পাদক আবদুল হামিদ

খান ইউসফজয়ী মশাররফের সমর্থনে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়া এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, ২ ভাদ্র, ১২৯৫ তারিখে টাঙ্গাইলের সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী সফীউদ্দিন সাহেবের বাসগৃহে ধর্মসভা অনুষ্ঠান করে সেখানে টাঙ্গাইলের অবৈতনিক কাজী ও নইমুদ্দীনের সহযোগী মৌলবী সুলতান আহমদের ফতোয়ায় "মোসলমান ধর্ম্মসভার সভ্যগণ সম্মুখে গোকুল নির্ম্মূল প্রস্তাব বিষয়ে উল্লেখ করিয়া লিখককে 'কাফের' এবং 'স্ত্রী হারাম' হওয়া"[১৫] সাব্যস্ত করা হয়। অতঃপর মোহাম্মদ নইমুদ্দীন 'ভারতে গো-বধ' শিরোনামে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে মশাররফ ও আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর সমালোচনা করেন। তিনি ধর্মসভার প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন, "এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি (মশাররফ) খোদাতালার সত্য-ধর্ম্ম প্রচারকের আদেশ অমান্য করতঃ নিশ্চয়ই কাফের হইয়াছেন।"[১৬] শুধু তাই নয়, প্রাণনাশের হুমকিও তাঁর বক্তব্যে প্রকাশ পায়, – ". . . যদি মুসলমানের রাজ্য হইত তাহা হইলে আহমদী সম্পাদকের ও আপনার জীবন তিন দিবসের ছিল।"[১৭] নইমুদ্দীনের এই সমস্ত প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ মশাররফ 'গো-জীবনে' সংকলিত করেন। তবে তাঁর অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি মশাররফ বাদ দেন, এরূপ অভিযোগ এনে নইমুদ্দীন 'গো-কাণ্ড' (সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯) নামে একটি প্রতিবাদ পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[১৮]

অতঃপর মশাররফ হোসেন 'কাফের' ও 'স্ত্রী হারাম' — ফতোয়ার কারণে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ 'আখবারে এসলামীয়া'র সম্পাদক মৌলবী নইমুদ্দীনের বিরুদ্ধে টাঙ্গাইলের আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করেন। এই মামলা লড়তে গিয়ে নইমুদ্দীন মুসলমান সমাজের ব্যাপক নৈতিক সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য লাভ করেন। 'আখবারে এসলামীয়া'য় প্রকাশিত নানা চিঠিপত্রে এই সমর্থন প্রকাশ পায়। সে সময়ের মুসলিম সমাজের মানস প্রবণতার পরিচয় জানতে একটি চিঠির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হল ঃ ". . . মৌলবী নইমুদ্দিনের যাচিত সাহায্যের প্রার্থনা পত্র প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। মনুষ্য নির্লজ্জ আর ধর্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইলে তাহার জীবনের গতি এরূপই হইয়া থাকে।"[১৯]

গো-জীবন বিষয়ক মামলা ও বাদ প্রতিবাদে 'আহমদী'র সঙ্গে যুক্ত হয় 'নবরত্ন' নামে নতুন এক পত্রিকা। 'নবরত্নে'র ১লা জ্যৈষ্ঠ (১২৯৬) সংখ্যায় মশাররফ হোসেনের 'সুসমাচার' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[২০] অন্যদিকে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহম্মদ (১৮৬২ – ১৯৩৩) পরিচালিত 'সুধাকর' পত্রিকা[২১] নইমুদ্দিনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। 'সুধাকরে' 'গো-জীবন' প্রসঙ্গে মশাররফের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক বিষোদ্‌গার প্রকাশ করা হয়। 'সুধাকরে' (২৬ মাঘ ১২৯৬) মন্তব্য করা হয় ঃ

> মুসলমানদিগের সমাজ বন্ধনের শৈথিল্য প্রযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ কত শত মুসলমান যে দিন দিন বিপথগামী হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।[২২]

'হিন্দু-মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থ-রচয়িতা শেখ আবদোস সোবহান 'আর নীরব থাকা গেল না' শীর্ষক এক নিবন্ধে ('আখবারে এসলামিয়া', পৌষ, ১২৯৬) কটূক্তি প্রকাশ করে বলেন ঃ

> . . . কয়েকদিন হইল বটতলার গোজীবনের কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়াছিলাম। বেশী পড়িতে রুচি না হওয়ায় ফেলিয়া দি। গোজীবন মুসলমান ধর্ম্মকে ও মুসলমানদিগকে যত ঠাট্টা চাতুরী বিদ্রূপ করিয়াছে, তাহা ত আছেই, কিন্তু স্থানে স্থানে . . . ছন্দপতন, কর্কশ ইত্যাদি দোষে পূর্ণ রহিয়াছে।[২৩]

গো-কোরবানীর সমর্থনে পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ আলমাশহাদী (১৮৫৯ – ১৯১৮) প্রকাশ করেন 'অগ্নি-কুক্কুট' (১২৯৬ বঙ্গাব্দ/১৮৮৯ খ্রীঃ)। এতে তিনি পরোক্ষভাবে মশাররফ হোসেনকে কটাক্ষপাত করে বলেন ঃ

> হিন্দুদিগের প্ররোচনায় দুই একজন আত্মতত্ত্ববিহীন ধর্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ অদূরদর্শী মোসলমানও আজকাল গরু কোরবানি ও গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন।[২৪]

অবশেষে উভয়পক্ষ থেকে মামলা তুলে নেওয়া হয় এবং লেখক মীর আর 'গো-জীবন' প্রকাশ করবেন না বলে অঙ্গীকার করলে এ বিবাদের নিষ্পত্তি হয়।

৬. গোজীবন ও মীর-মানস

শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালী মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল অংশের এই অনুদারতা নিঃসঙ্গ ও বিপন্ন মীর মশাররফের শিল্পীসত্তার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। পারিপার্শ্বিক চাপে 'মুসলমান ধর্মে' দীক্ষিত হয়ে সাহিত্যিক মশাররফ পরবর্তীকালে তাঁর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে লেখনী চালনা করেন। এ কারণে –

> রচনার সংখ্যাধিক্যে উর্বরতম এই অন্তিমপর্বে মীর-মানস শিল্পবিচারে অবসন্ন ও উদাসীন। মানব-জীবনের রহস্য আর তাঁকে শিল্পানুপ্রেরণা যোগায়নি, ধর্ম-জীবনের গভীরতম উপলব্ধি তাঁকে উৎকণ্ঠিত করেনি। বেশীর ভাগ রচনাই অলৌকিকতা মণ্ডিত, কিংবদন্তীপূর্ণ, অসংস্কৃত পুঁথিসাহিত্যের ইসলামের পুনর্নির্মাণ।[২৫]

গো-জীবনে মীর স্ব-সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও যে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করেছিলেন তাতে তাঁর সৎসাহস ও আপন বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া শুধু স্বীয় মত প্রকাশ নয়, বিরুদ্ধ মতকে আপন গ্রন্থে স্থান করে দেওয়ার মধ্যে তাঁর মানসিক ঔদার্যেরই পরিচায়ক।

'গো-জীবন' 'বিষাদসিন্ধুর' প্রায় সমকালে রচিত হলেও এখানে সেই ভাষার প্রবাহ অনুপস্থিত। গুরু-গম্ভীর বিষয়ের কারণে তাঁর গদ্য ভিন্ন। যুক্তি-তর্ক ও আবেগ এই গদ্যকে আশ্রয় করেছে। তাই কখনো নীরস — কখনো সরস বাগভঙ্গী লক্ষণীয়। তবে যুক্তি পরম্পরাময় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যে বৈশিষ্ট্য প্রবন্ধে থাকে তা "গো-জীবনে" মশাররফ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

৭. মূল্যায়ন

'গো-জীবন'-এ মশাররফ সমকালকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের ছোঁয়া যে তাঁর প্রাণ মনকে স্পর্শ করেছিল এ রচনাটিতে তার কিছু ছাপ রয়েছে। রামমোহন রায় বা বিদ্যাসাগরের প্রতিভার সঙ্গে মশাররফের তুলনা না করেও একটি বিষয়ে ঐ দুই মনীষীর সঙ্গে মীরের সাধর্ম্য লক্ষণীয়। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর – উভয়েই নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মের যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা দিয়ে স্ব-সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও নতুন যুগের আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন। মীর মশাররফও আপন ধর্মীয় সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠে গো-মাংস ভক্ষণ না করার বিষয়ে যুক্তির অবতারণা করেন। কেবল অন্ধবিশ্বাসে নয় – যুক্তির ধারা গ্রহণ বর্জনের কথা বলেছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি তো একালের — নবজাগরণেরই ধর্ম। অবশ্য যদিও তিনি কার্যক্ষেত্রে পরাস্ত হয়েছেন – কিন্তু তাঁর মানস-প্রবণতা

ছিল আধুনিকতার দিকে। এ কারণেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৮৯ খ্রীঃ) মন্তব্য করে ঃ

> লোকে প্রায় গতানুগতিকই হইয়া থাকে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আচার ব্যবহার পরম্পরা প্রচলিত হইয়া আইসে, সেই সম্প্রদায়ের অন্তবর্তী অধিকাংশ লোকেই ঐ আচার প্রভৃতিকে নিয়তির নিগড় স্বরূপ জানিয়া অকুণ্ঠভাবে তাহাতে বিচরণ করিতে থাকে। কিন্তু যাঁহারা সেই সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানবান ও প্রতিভাসম্পন্ন তাঁহারা ধারাবাহিক আচার সমূহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তর্ক করেন, যেটি অন্যায় তাহার প্রতিবাদ করেন ও তৎপরিত্যাগে যত্নবান হন। আমরা গো-জীবন লেখক শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেনকে শেষোক্ত দলের অগ্রণীদিগের মধ্যে স্থান দিতে চাই।[২৬]

'তত্ত্ববোধিনী'র সমালোচকের মতো গো-মাংস ভক্ষণকে আমরা 'অন্যায়' পর্যায়ভুক্ত করতে চাই না। কিন্তু যে বিষয়টি স্পর্শকাতর – তাকে কেবল অন্ধ সংস্কার বশেই নয়, যুক্তি বিচার বিবেচনার মধ্যে গ্রহণ বর্জনের যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নটিকে আপন সমাজ-মানসের ঊর্দ্ধে উঠে যে চেতনা বা বোধের সৃষ্টি সেই অর্থেই তিনি আধুনিক।

এই যুক্তিবাদী, মুক্তমনা, সমাজ-মনস্ক শিল্পীর অন্তর আধুনিক মানবতাবাদেও উদ্বুদ্ধ ছিল। এই মানবিক বোধেও তিনি ছিলেন নবজাগরণের শরিক। তাই মীর-মানস বিশ্লেষণে ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

> ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রেখেও যুক্তি, মানবিক মূল্যবোধ ও বিচার-সাম্যের এক দুর্লভ পরিচয় সরল সাবলীল ভাষায় ধৃত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বাগভঙ্গী যেমন বলিষ্ঠ, স্থানে স্থানে তেমনি কটাক্ষ-তীক্ষ্ণ। নব বাঙালি জাতীয়তার জাগরণ-চেতনা তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিকশিত ঃ 'এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক – সংসার কার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না।' – ধর্মনিরপেক্ষ এই মানবিক প্রীতির সচেতনাবশেই মশাররফ উনিশ শতকের মুসলমান বাঙালীর নবজাগরণের অগ্রপথিক।[২৭]

এসলামের জয়

১. ভূমিকা

'এসলামের জয়' মীর মশাররফ হোসেনের ইসলাম ধর্মবিষয়ক ঐতিহাসিক গদ্যরচনা। মীর মশাররফ তাঁর সাহিত্য-জীবনের শেষ পর্যায়ে যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন তার অধিকাংশই ইসলামী গ্রন্থ এবং পদ্যে লেখা। এই ধারার একমাত্র এই গ্রন্থটিই গদ্যে রচিত। গ্রন্থটি ৪ঠা আগষ্ট ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর এটি মুসলমান পাঠক সমাজে বেশ সমাদৃত হয় বলে এর একাধিক সংস্করণও বের হয়।[২৮]

'এসলামের জয়' গ্রন্থটি দুই ভাগে বিভক্ত। লেখক প্রত্যেক ভাগকে 'শাখা' এবং প্রত্যেক ভাগের অন্তর্গত পরিচ্ছেদগুলিকে 'মুকুল' নামে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম শাখায় দশটি এবং দ্বিতীয় শাখায় তেরটি 'মুকুল' আছে।

২. মূল বিষয়বস্তু

এই গ্রন্থে বর্ণিত মূল বিষয়বস্তু হল মদিনায় অবস্থানকালে হজরত মোহাম্মদের (সঃ) জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং মক্কাবিজয়। মদিনায় মোহাম্মদের বিজয় পতাকা উড়ছে। তাই দেখে মক্কার অধিবাসী পৌত্তলিক কোরেশরা ঈর্ষান্বিত। অন্যদিকে মোহাম্মদ পারস্য, কনস্ট্যান্টিনোপল, মিশর, বসরা প্রভৃতি দেশের খ্রীষ্টান শাসকদের কাছে ইসলাম গ্রহণের বার্তা পাঠিয়ে দূত পাঠান। কিন্তু অধিকাংশ দেশই তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি বসরার শাসক প্রেরিত দূতকে অপমানিতও করে।

এদিকে দেশত্যাগী মদিনার মুসলমানরা জন্মভূমি মক্কায় যাবার জন্য উতলা হয়ে ওঠেন। কোরেশদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী মুসলমানেরা বছরে কেবল তিনদিন মক্কায় থাকতে পারেন। সেই অনুসারে মোহাম্মদ তাঁর ভক্তদের নিয়ে মক্কায় যান। সেখানে থাকাকালে মোহাম্মদের মধুর ব্যবহারে এবং ইসলামের উদার বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে বহু কোরেশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তা দেখে মক্কাবাসীরা তাঁকে তিনদিনের আগেই মক্কা ত্যাগ করে চলে যেতে বলে, যা ছিল চুক্তির খেলাপ। এতে মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হন। তবু বিতর্ক এড়াতে বাধ্য হয়ে মোহাম্মদ মদিনায় ফিরে যান।

অন্যদিকে তুরস্কের অধীন রাজ্য বসরার খ্রীষ্টান-শাসক দূতের প্রতি আশালীন আচরণ করার কারণে মুসলমানরা তুরস্ক ও বসরার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। সিরিয়ার 'মাতায়া' নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হন এবং মদিনায় খুব আনন্দ উৎসব হয়। 'মাতায়া'য় মুসলমান বিজয়ের খবরে ক্রমে দিকে দিকে বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করে।

এই সময় নারীঘটিত বিষয় নিয়ে মক্কার কোরেশরা মুসলমানদের অনুগত 'বনি খোজায়া' বংশের লোকেদের অন্যায়ভাবে মারধর করে। কিন্তু কোরেশদের সঙ্গে মুসলমানদের শান্তি-চুক্তির শর্ত ছিল মুসলমানদের অনুগত কাউকে আক্রমণ করলে সমুদয় চুক্তি ভঙ্গ হবে। ফলে মুসলমানরা মক্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভীত মক্কাবাসীরা হজরতের আত্মীয় ও শ্বশুর আবু সুফিয়ানকে মধ্যস্থতা করবার জন্য পাঠায়। কিন্তু মুসলমানদের সাধারণসভায় দাম্ভিক সুফিয়ানের আর্জি নাকচ হয়ে যায়। তবে তিনি হজরতের স্বার্থত্যাগ, সমাজ-হিতৈষণা ও গণতান্ত্রিক মনোভাবে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান। মুসলমানরা জেহাদের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করলে পথিমধ্যে মক্কাবাসীরা তাদের আক্রমণ করে এবং তুমুল যুদ্ধ হয়। এখানেও আবু সুফিয়ান মধ্যস্থতা করলে যুদ্ধ স্থগিত হয়। এই সময় মক্কাবাসীরা লক্ষ করে যে, বিপদের মুহূর্তেও দেবমূর্তিগুলি অসহায়, নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়। ফলে তাদের অনেকেই মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিনা বাধায় ও বিনা রক্তপাতে মুসলমানরা মক্কা ও কাবা শরীফ দখল করেন। মহাম্মদ ভক্তদেরকে বিজিতদের প্রতি সদাচরণ করবার নির্দেশ দেন। কাবাগৃহের সব দেবমূর্তিগুলি ফেলে দিয়ে ইসলামের বিজয়পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়। আর সকলে সমস্বরে বলে ওঠেন 'জয় এসলামের জয়'।

৩. রচনা বৈশিষ্ট্য

'এসলামের জয়' কেবল খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের উপর সামরিক জয় বা মক্কার উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কাহিনীই নয়—সেইসঙ্গে ইসলামের শান্তির বাণী, মহৎ আদর্শ ও উদার নীতি প্রচার করাই যেন লেখকের মূল

উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে লেখক এখানে ইসলামী জগতের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে আবেগমথিত করে কাহিনীর আকারে পরিবেশন করেছেন এবং অনেকক্ষেত্রে আপন মতাদর্শ ও চিন্তা-চেতনাকে ব্যক্ত করেছেন। ফলে এটির শ্রেণীনির্ণয় কঠিন হয়ে পড়ে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যসাধক চরিতমালায়'[২৯] মশাররফের অন্যান্য রচনার সঙ্গে 'এসলামের জয়'-এর উল্লেখ করলেও এটি কোন শ্রেণীর রচনা তা বলেন নি। তবে 'বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ'-এ এর শ্রেণী-পরিচয় দিয়ে বলা হয় ঃ—

> It contains brief account of the victories which the Muhammedans obtained during the life-time of the prophet after the battle of Badar, Ohod and Khaibar. [৩০]

সম্ভবত সেইসূত্রেই আলী আহমদ[৩১] এই গ্রন্থকে 'ইতিহাস' বলেই উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু 'এসলামের জয়' ইসলামের ইতিহাসের ঘটনাবলী নিয়ে লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ইতিহাস নয়। এতে কল্পনার স্থান অনেকখানি। আরবদেশের পটভূমিতে মুসলমান ভক্তদের নিয়ে মোহাম্মদের (সঃ) যুদ্ধ ও বিজয় — বিশেষ করে মক্কা নগরী জয়ের ঘটনাকে আকর্ষণীয় কাহিনীর রূপ দেওয়া হয়েছে। ফলে, লেখকের আবেগ ও কল্পনার স্ফূর্তি ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেনি। অবশ্য মশাররফ সে চেষ্টা বা দাবীও করেননি।[৩২] ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠার চাইতে এখানে অনেক বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে লেখকের মননশীলতা, ভাবময়তা ও আবেগপ্রবণতা। ইতিহাসের কাহিনী লেখকের বর্ণনাগুণে উপন্যাসের কাহিনীর কাছাকাছি বলেই মনে হয়। সে কারণে জনৈক সমালোচক একে 'প্রবন্ধোপন্যাস' বলে অভিহিত করে জানিয়েছেন ঃ

> 'এসলামের জয়' ইতিহাসও নয়, উপন্যাসও নয়—ইসলামের শৈশবেতিহাসের কতকগুলো ধারাবাহিক এবং বিচ্ছিন্ন কাহিনী নিয়ে রচিত আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগময় সন্দর্ভ।[৩৩]

এই গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

> ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হলেও 'এসলামের জয়' (১৯০৮) গ্রন্থে কল্পনার স্থান অনেকখানি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঢঙে বর্ণাঢ্য বর্ণনা, কাল্পনিক সংলাপ ও চরিত্র-চিত্রণের প্রচেষ্টা এতে দেখা যায়—প্রসঙ্গত জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এবং বর্ণনাধীন বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থকার তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ উচ্ছ্বাসময় আত্মগত উক্তি সংকলন করেছেন।[৩৪]

সুতরাং 'এসলামের জয়'কে ইতিহাস আশ্রিত রসধর্মী রচনা বলাই শ্রেয়।

৪. মোহাম্মদের (সঃ) আদর্শ প্রচার

'এসলামের জয়' গ্রন্থের সমগ্র কাহিনী, ঘটনাবলী ও নানা আত্মগত বর্ণনার কেন্দ্রভূমিতে রয়েছেন হজরত মোহাম্মদ। মহাম্মদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও কর্মপ্রণালী সম্পর্কে লেখকের বর্ণনা আন্তরিক এবং হৃদয়স্পর্শী। এতে তাঁর মহত্ত্ব, উদারতা, অকপটতা, সহিষ্ণুতা ও বিবেচনা-বোধের পরিচয় দিয়ে লেখক ইসলাম ধর্মের সুমহান আদর্শের কথা

তুলে ধরতে চেয়েছেন। নানা অসুবিধে এবং মুসলমানদের প্ররোচনা সত্ত্বেও কোরেশদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করার মধ্যে যেমন তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি মক্কা-বিজয়কালে বিপক্ষদের প্রতি শান্ত নম্র হওয়ার উপদেশ দানের মধ্যেও তাঁর বিবেচনা বোধ ও মহত্ত্বের ছাপ নিহিত। এছাড়া তাঁর কৃতিত্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সেই দাস-প্রথার যুগেও তিনি আজকের সাধারণতন্ত্রের একটি প্রাকরূপ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কোনো ব্যক্তিবিশেষের হাতে এক বা একাধিক দায়িত্ব অর্পণ না করে একটি সাধারণ-সভার হাতে সমস্ত কার্যভার থাকলে জনগণের মঙ্গল হয় — এই বোধ থেকে তিনি রাজ্যের সমস্ত কাজ সাধারণ-সভার হস্তে ন্যস্ত করেছিলেন। এই সমস্ত বিবরণই লেখক এখানে আবেগময় ভঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন।

৫. দৃষ্টিভঙ্গি

'এসলামের জয়' গ্রন্থের ঘটনা বর্ণনার ফাঁকে লেখক কখনো কখনো আপন দৃষ্টিভঙ্গি ও উনিশ শতকীয় চিন্তা-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। উনিশ শতকের নবজাগ্রত চেতনায় স্বদেশপ্রেম ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দেশপ্রেমের কথাই বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন ঃ

> জন্মভূমি কাহার না আদরের ? . . . হায়রে জন্মভূমি! জন্মভূমির দৃশ্য নয়নমন প্রীতিকর। বসবাসে আনন্দে সুখচ্ছাসে হৃদয়ের শান্তি যাহার প্রীতিপ্রদ স্থান, মহাপবিত্র পুণ্যক্ষেত্র, ধূলি মলা, আবর্জ্জনা — প্রকৃত সুসন্তান পক্ষে স্বর্ণ রজত অপেক্ষাও মূল্যবান। . . . মাতৃদ্রোহী সন্তানের পক্ষে নহে, স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গারের পক্ষে নহে। জন্মভূমি-বৈরী নিষ্ঠুর পামরের পক্ষে নহে। এ দৃশ্য জন্মভূমির যথার্থ সন্তান প্রকৃত পুত্রগণের আর অতিপ্রিয় বংশধরগণের পক্ষেই শোভা পায়। (১ম শাখা/৩য় মুকুল)[৩৫]

এই দেশপ্রেমের পাশাপাশি তিনি স্বাধীনতাবোধের কথা, স্বরাজ্য রক্ষার কথা বলেছেন এবং পরাধীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেছেন ঃ

> স্বরাজ্যে স্বরাজ অপেক্ষা গৌরবের কথা—অস্থায়ী জগতে আর আছে কি ভাই ? স্বরাজই যদি পররাজ হইল, তবে গোলামি করিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা জীবনপাত করাই শ্রেয়! . . . পবিত্র জন্মভূমি অপরের পাদুকাতলে দলিত হইবে, স্বাধীন জীবন পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িবে, গলায় রজ্জু দিয়া বাঁদর নাচান নাচাইয়া লইয়া বেড়াইবে, ইহা কোন্ প্রাণে সহ্য হইবে ? (১ম শাখা/ ৮ম মুকুল)।[৩৬]

এই স্বাধীনতা-ধনকে রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি দূর করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে উদার আহ্বান জানিয়েছেন তা তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তারই পরিচায়ক। তিনি বলেছেন ঃ

> স্বদেশ রক্ষা করিতে, স্বাধীনতা-ধন অক্ষুন্ন রাখিতে, লক্ষপতি হইতে ভিখারীকে, আর ইহার মধ্যে যতপ্রকার শ্রেণীভেদে বিভেদ আছে; সকলপ্রভেদ ভূলিয়া — জন্মভূমির প্রতি ভক্তি সহকারে অকপট মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আনন্দ-হৃদয়ে খোলামনে স্বদেশী হইতে হইবে। . . . একা একদলে এক মাথায় এক শ্রেণীর লোকের যত্ন চেষ্টায় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা হয় না, উদ্ধারের আশাও করা যায় না।[৩৭]

এখানে লেখক স্বাধীনতা-রক্ষায় দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর জোর দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে, এই গ্রন্থ রচনাকালে (১৯০৮ খ্রীঃ) ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলন চলছিল। কলকাতা ছিল এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। কলকাতায় বসে এই গ্রন্থ রচনা করলেও বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কোন ছাপ এতে নেই। তবু এই আন্দোলন সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। আবার এই সময়েরই আরেকটি রচনা 'বিবি কুলসুমে' (১৯১০) এই স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর পত্নী কুলসুম বিবি বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন যা লেখকের মানসিকতারই প্রতিফলন।[৩৮] সুতরাং বোঝা, যায় স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে লেখক সমকালীন মুসলমান সমাজের একাংশের মধ্যে যে দোলাচলতা ছিল সেই মনোভাবই পোষণ করতেন।

এতৎসত্ত্বেও লেখক এই গ্রন্থে গণতান্ত্রিক চেতনার একটি পূর্বাভাস দিতে পেরেছিলেন। তিনি জানাচ্ছেন ঃ

> সভার হস্তে কার্যভার থাকিলে সর্ব্বাংশেই মঙ্গলের সম্ভাবনা। একা একজনের মস্তক হইতে নির্দোষ নির্ভুল কার্য্যের আশা করা দুরাশামাত্র--ক্ষতির আশঙ্কাই অত্যধিক।[৩৯]

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে উনিশ শতকীয় বাঙালীর গণতান্ত্রিক চেতনাবোধেরই প্রকাশ। উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক নগর সভ্যতার কেন্দ্রস্থল কলকাতা থেকে বহু দূরে তাঁর অধিকাংশ সাহিত্য-জীবন অতিবাহিত হলেও এবং প্রধানত গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে তাঁর মানসিক জগৎ আবর্তিত হলেও তিনি কতক ক্ষেত্রে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ রেখে যেতে পেরেছিলেন।

'আমাদের শিক্ষা' (প্রবন্ধ)

মশারফের অন্যান্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'আমাদের শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। এ প্রবন্ধে মশাররফ গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সেকালের মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও মাতৃভাষা বিতর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'হিতকরী' (পৌষ,১২৯৭) পত্রিকায়।[৪০]

আমরা 'দ্বিতীয় অধ্যায়ে' লক্ষ করেছি যে উনিশ শতকে মুসলমান সমাজ নানা কারণে আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে পড়েছিল। অথচ শিক্ষাই হলো একটি জাতির উন্নতি--অবনতির মাপকাঠি। এই সময় নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে আন্দোলন করেছিলেন। আবদুল লতিফ ও আমীর আলী উভয়েই ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আবদুল লতিফ সেই সঙ্গে আরবী-ফারসী-উর্দু ভাষাসহ ধর্মশিক্ষাও অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে মশাররফ হোসেন তাঁর 'আমাদের শিক্ষা প্রবন্ধে বললেনঃ

> সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। . . . জাতীয় বিদ্যায় আলাপ, জাতীয় রীতি-নীতি পদ্ধতি রক্ষা করিতে না পারিলে, না জানিলে, এক প্রকার বিপদ, অপ্রস্তুতের একশেষ। কাজেই উর্দু, ফারসী-শিক্ষার নিতান্তই প্রয়োজন। শুধু ইংরাজী শিখিলে আমাদের কোন লাভ নাই। ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ আদৃত, সমাজ প্রচলিত উর্দু ফারসী শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়;

> উর্দু ফারসী শিক্ষা অবহেলা করিয়া, শুধু ইংরাজী, কি কেবলই বাঙ্গালা শিক্ষা করিলে সমাজে মুখ পাইবার উপায় নাই। বাধ্য হইয়া প্রথম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উর্দু ফারসী শিক্ষা করা সর্বতোভাবে আবশ্যক।[৪১]

মশারফের এই উক্তিতে আবদুল লতিফের মনোভাবের প্রতিফলন আছে। সেই সঙ্গে সমকালীন মুসলিম সমাজের মধ্যপন্থী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানস-প্রবণতাকেই তিনি রূপায়িত করেছিলেন।

তবে বাঙালী মুসলিম সমাজের মাতৃভাষা কী হবে সে বিষয়ে তখন সমাজে ও সাহিত্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'হাণ্টার কমিশনে'র কাছে পরামর্শ-পত্রে নবাব আবদুল লতিফ ঘোষণা করেন, মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মাতৃভাষা বা শিক্ষার মাধ্যম হল উর্দু। পক্ষান্তরে গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানের শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। এছাড়া তাঁর অভিমত, বাঙালী মুসলমানের বাংলা সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত ও আরবী-ফারসী শব্দযুক্ত হবে। ফলে মাতৃভাষার প্রশ্নে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এতে সমকালের বিভিন্ন মুসলিম লেখকগণ পক্ষে বিপক্ষে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করে নানা প্রবন্ধ রচনা করেন।[৪২] এই সময় মশাররফ তাঁর এই প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে জানালেন ঃ

> বিশেষ সাংসারিক কাজকর্ম্মে মাতৃভাষারই সম্পূর্ণ অধিকার। মাতৃভাষায় অবহেলা করিয়া অন্য অন্য ভাষায় বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও তাহার প্রতিপত্তি নাই। পরিবার, আত্মীয়স্বজন, এমনকি প্রাণের প্রাণ যে স্ত্রী, তাহার নিকটেও আদর নাই। অসুবিধাও বিস্তর। ইস্তক ঘরকন্নার কার্য্য নাগাএদ রাজসংশ্রবী যাবতীয় কার্য্যে বঙ্গবাসী মুসলমানদের বাংলা ভাষার প্রয়োজন।[৪৩]

এক্ষেত্রে তিনি আবদুল লতিফ প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে গিয়ে অপেক্ষাকৃত পৃথক ও অগ্রসর চিন্তাচেতনার ছাপ রেখেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

> বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশভাষা বা মাতৃভাষা 'বাংলা'। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে।[৪৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধে মশাররফ হোসেন যুক্তিশীলতা, বলিষ্ঠতা, স্বচ্ছতা ও অগ্রগামী দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন।

সৎপ্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)

১. ভূমিকা

'সৎপ্রসঙ্গ' 'কোহিনুর' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩০৫, কলিকাতা) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধবিশেষ, পৃথক কোন গ্রন্থ নয়। মশাররফের কোন গ্রন্থে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পরবর্তীকালে ডঃ কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত 'মশাররফ রচনা সম্ভার'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এটি সংকলিত হয়েছে।

'গো-জীবন'-কেন্দ্রিক বিতর্কে মশাররফ স্ব-সমাজের কাছ থেকে নানান ভাবে নানা আঘাত পেয়ে শেষ পর্যন্ত তার প্রকাশ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি কামনা বা বিরোধ-দূরীকরণ

ভাবনা যে পরবর্তীকালেও জাগরূক ছিল এই প্রবন্ধটি তার প্রমাণ। 'সৎপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধে মশাররফ হিন্দু মুসলমান বিবাদ সমস্যাটি কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব সেযুগে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'কোহিনুর', 'হাফেজ' প্রভৃতি মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের একান্তিক কামনা ব্যক্ত করে নানা প্রবন্ধ কবিতা প্রকাশিত হত। 'কোহিনুর' পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করা হয়েছে 'হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি'। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা 'কোহিনুর'কে অবলম্বন করে মিলিত হয়েছেন। তাঁদের বিভিন্ন লেখায় সম্প্রীতির ভাব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। গোপালচন্দ্রের 'সংস্কার ও সংস্কারক', যদুনাথের 'হিন্দু মুসলমান', সতীশচন্দ্রের 'হিন্দু ও মুসলমান', দক্ষিনারঞ্জনের 'হিন্দু মুসলমান', কিশোরীমোহনের 'সম্প্রীতি', ওসমান আলীর 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়', ডাক্তার মহম্মদ মীর আলীর 'এখন কর্তব্য কি ?' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও কবিতায় এই মিলন-মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে। মীর মশাররফের 'সৎপ্রসঙ্গ' সেই শ্রেণীরই রচনা। এই সমস্ত লেখক এ বিরোধের বাস্তব কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, এ বিরোধ সম্পর্কে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক রূরম ছিলনা।

২. মূল বক্তব্য

মশাররফ হোসেন তাঁর 'সৎপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধে হিন্দুমুসলমান বিরোধকে কিভাবে দেখেছেন তা অনুধাবন করতে এর মূল বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হল ঃ

লেখক মশাররফ হোসেন প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলেছেন, 'হিন্দু মুসলমানে বিবাদ' নিয়ে সংবাদপত্রে, সাহিত্যে, নানান সভাসমিতিতে প্রবল আলোচনা চলেছে। কিন্তু 'বিবাদের মূল কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য।' হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন অন্তরের বিরোধ নেই—যা আছে তা দৈনন্দিন সংসার জীবনের বিপদের মতোই তুচ্ছ।

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পরাধীন, আত্মমর্যাদাহীন এবং বিদেশী ইংরেজ শাসকের পদদলিত। এত দুরবস্থা সত্ত্বেও তাদের কারোরই প্রতিবাদ করবার শক্তি নেই। এমনকি ইংরেজের সামান্য পুলিশের কাছে এরা হীনবল। বিবাদের এক কারণ বলতে গেলে সে গো-কাণ্ড। কিন্তু সে সম্পর্কে লেখক কিছু বলতে চান না। সাহিত্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানগণ হিন্দুদের চাইতে বহু যোজন পেছনে। বাহুবল উভয়ের একই – ব্রিটিশের পদানত। জাতিগত মনান্তর ? ধরতে গেলে কিছুই নয়।

তাঁর মতে, এ বিবাদ অনেকটা 'ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ, আত্মীয়স্বজনে কলহ, পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে মেয়েলী ঝগড়া', স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমানের ঝগড়ার মতো। অতএব তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ধর্মের আচার বিচার (যেমন, আজান-ধ্বনি, হরিবোল ধ্বনি প্রভৃতি) নিয়ে বিবাদও ক্ষণিকের। প্রকৃত ধার্মিকের হৃদয়ে এ নিয়ে বিবাদ হয় না।

এরপর লেখক প্রধানতঃ মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যেই তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। স্বল্প সংখ্যক মুসলিম চাকুরীজীবীদের আক্ষেপ, হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত অগ্রসর, সরকারী দফতরে তাদেরই দাপট। আরেকদল মুসলিম আছেন

যাঁদের উদ্দেশ্য ভিক্ষা করা, কিন্তু সাজ-সরঞ্জাম ভদ্রতার পরিচায়ক, তাঁরা ভাবেন না এটি মুসলমান-শাসিত দেশ নয়।

লেখকের বক্তব্য, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাহায্য না নিলে তো মুসলমানদের চলে না। কেননা মুসলমানদের বেশির ভাগই অশিক্ষিত। তাছাড়া পত্রলেখক, মুদ্রাযন্ত্রওয়ালা, কেরানী এবং মুসলমান জমিদারদের কার্যকারকগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। মুসলমানগণ অলস, অকর্মন্য, কর্তব্যজ্ঞানহীন। আদালতে মুসলমানদের হিন্দু উকিল মোক্তারের সাহায্য নিতে হয়। এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে রজক, নরসুন্দর, ধীবর প্রভৃতির জন্যও হিন্দুদের মুখাপেক্ষী হতে হয়। যাঁদের সঙ্গে সর্বক্ষণের কাজ কারবার বা প্রয়োজনের সম্পর্ক তাঁদের সঙ্গে বিবাদ কেন ?

তাছাড়া হিন্দুরা একটু অগ্রগামী হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে একযোগে মহরমের তাজিয়াদারী, মর্সিয়াখানির মজলিসে যোগ দিয়ে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার প্রভৃতি হিন্দু মনীষীগণ মারা গেলে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানগণও ব্যথিত হন। পক্ষান্তরে নবাব আবদুল লতিফ, নবাব খাজা আবদুল গনি, স্যার সৈয়দ আহমদ প্রভৃতি মুসলিম নেতাগণ পরলোকগমন করলে হিন্দুগণও দুঃখিত হন। তাহলে উভয় সম্প্রদায়ের কিসের বিবাদ ?

আবার হিন্দুলেখক অক্ষয়কুমারবাবু নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকদের কলঙ্কময় লেখার প্রতিবাদ করে তাঁকে 'বিষোর কলঙ্গ হইতে বিমুক্ত করিয়াছেন'। একজন মুসলমান শাসকের প্রতি অন্যায় দোষারোপের জন্যে হিন্দু-অন্তর বিগলিত।

পরিশেষে লেখক কতকগুলি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেছেন, বহু ধনী হিন্দু মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণ করতে বা সংস্কার করতে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাই লেখকের মতে, হিন্দু মুসলমানে বিবাদ প্রকৃতপক্ষে মনের ঝগড়া নয়।

৩. উদ্দেশ্য ও সীমাবদ্ধতা

মশাররফ হোসেন এই প্রবন্ধে বিস্ময়কর মুক্তদৃষ্টি ও বাস্তব-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, হিন্দু মুসলমানের বিরোধ রাজনৈতিক নয়, প্রধানতঃ অর্থনৈতিক এবং অংশত সামাজিক। একই সঙ্গে তিনি এও দেখিয়েছেন যে, হিন্দু কর্মচারী ছাড়া মুসলমান জমিদার বা সংবাদ পরিচালকদের চলে না। দৈনন্দিন সাংসারিক ক্ষেত্রেও মুসলমান সমাজ হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল। উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের দুঃখে কাতর। সুতরাং এভাবে পরস্পর সমর্থিত দুই সম্প্রদায়ের মৌলিক বিরোধের সুযোগ নেই। তাই লেখক আত্যন্তিক কামনা করেছেন যে, এই কল্পিত বিরোধ যেন আমরা ভুলে যাই।

এই প্রবন্ধে মশাররফের উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সত্ত্বেও বক্তব্য যে অনেকটা একপেশে হয়ে গিয়েছে সে অভিযোগ তুলে ধরে প্রবন্ধটির শেষে 'কোহিনুর' পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেন ঃ

> লেখক একপক্ষের কথাই বলিয়াছেন। অন্যপক্ষের কথা আমরাও কিছু বলিব না। লেখকের মতের সহিত আমরা কয়েকস্থলে একমতাবলম্বী হইতে পারি নাই।[৪৫]

আবার হিন্দু-মুসলমানের এই বিরোধকে তাঁর মত উচ্ছাসের দৃষ্টিতে অনেকেই দেখেননি। সমকালে 'কোহিনুর' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) ডাঃ মহম্মদ মীর আলী 'এখন কত্তব্য কি ?' নামে এক প্রবন্ধে এই বিরোধের কয়েকটি মৌলিক সমস্যার কথা (লেখকের দৃষ্টিত) উল্লেখ করে লেখেন ঃ

> অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, প্রধানতঃ চারটি অন্তরায়বশতঃ উভয় জাতিতে সদ্ভাব স্থাপিত হইতেছে না। (১) ধর্ম্মের বিভিন্নতা, (২) বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের একদেশতা, (৩) বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানদের চর্চাহীনতা, (৪) মুসলমানদের দুরবস্থা।[৪৬]

লেখক সহানুভূতির সঙ্গে প্রত্যেকটি কারণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেগুলি দূর করার পন্থা নির্দেশ করেছেন। অবশ্য মশাররফ এত গভীরে যান নি।

৪. মীরের চিন্তা-চেতনা ও সমাজ-ভাবনা

'সৎপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধে মশাররফের কিছু নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও সমাজ-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। পরাধীনতার গ্লানি যে তাঁর হৃদয়কেও বেদনার্ত করে তুলেছিল তা তিনি প্রবন্ধের শুরুতেই জানিয়েছেন ঃ

> পরাধীন দাসত্ব-জীবনে কি আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে ? পরমুখাপেক্ষী পরঅন্নে পালিতদিগের অন্তরে কি উৎসাহ ভঙ্গে আক্ষেপ আছে ? পরপদদলিত পরপদপোষিত লাঞ্ছিত, জঘন্ন 'নেটিভ' শব্দে সম্বোধিতদিগের মজ্জায় কি জাতিগত ধর্ম্মগত বাদ প্রতিবাদে, বিবেকের প্রাধান্য দেখাইবার শক্তি আছে ?[৪৭]

কিন্তু পরাধীনতার এই আত্মাবমাননা সত্ত্বেও লেখকের ব্রিটিশ-প্রশস্তি এখানেও উপস্থিত ঃ

> হিন্দু মুসলমান উভয়ে ব্রিটিশ সিংহের পদপ্রসাদে ভিখারী। উভয়েই নতশিরে-ভক্তি সহকারে চির আজ্ঞাকারী। উভয়েই সমপ্রকারে সুখ সম্ভোগের অধিকারী।[৪৮]

মশাররফ হোসেন যে সমকালের মুসলিম সভা-সমিতি বা সংগঠন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহলী ছিলেন তার পরিচয়ও এই প্রবন্ধে আছে। মুসলিম সমাজের উন্নতি বিধানের মৌলিক উদ্দেশ্য এক হওয়া সত্ত্বেও আবদুল লতিফের 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' ও সৈয়দ আমীর আলীর 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন'-এর মধ্যে মতৈক্য অপেক্ষা মতবিরোধই বেশি ছিল। এই প্রবন্ধে মশাররফ হিন্দু মুসলমানের বিরোধের প্রসঙ্গে সোসাইটি ও এসোসিয়েশনের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য—

> সাহিত্যসমিতি ও জাতীয় সমিতির মধ্যে—মর্ম্মগত, আত্মগত, ব্যক্তিগত; অব্যক্ত মনোমালিন্য ছিল।[৪৯]

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের কারণ সন্ধান করতে গিয়ে মশাররফ এখানে সেকালের বাঙালী মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক দুর্দশার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন—

> বর্তমান সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, পদার্থ, তর্ক, রসায়ন ইত্যাদি শাস্ত্রে হিন্দু হইতে মুসলমান বহুযোজন পথ ব্যবধানে; শতবর্ষে সমান হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ।[৫০]

শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয়, আর্থিক ক্ষেত্রেও বিশেষত চাকুরীতে মুসলমানদের পশ্চাদপদতার বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। ইতিমধ্যে মশাররফ তাঁর অনেক রচনায় জমিদারদের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। 'সৎপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধেও সেই জমিদারদের বিশেষত মুসলমান জমিদারদের সম্বন্ধে স্বল্প বর্ণনায় একটি নিখুঁত ছবি তুলে ধরেছেন। হিন্দু আমলানির্ভর মুসলমান জমিদাররা অধিকাংশই অলস, অকর্মণ্য, কর্তব্যজ্ঞানহীন ও অপটু ছিলেন — এই বিশ্লেষণ যে মশাররফের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তিরই পরিচায়ক তা আর একবার এই প্রবন্ধের মাধ্যমের জানা যায়।

৫. মূল্যায়ন

'সৎপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লেখক আপন বক্তব্য উপস্থাপনে যুগপৎ যুক্তি ও আবেগের আশ্রয় নিয়েছেন। ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ, তবে 'বিষাদসিন্ধু'র মতো পরিণত নয়। তবু মীর-মানস বিশ্লেষণে প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনী – আত্মজীবনী

আমার জীবনী

১. পটভূমি

মীর মশাররফ হোসেনের রচনাবলীর একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে তাঁর আত্মজীবনীর উপাদান। আধুনিককালের লেখকেরা অবশ্য কোনভাবেই ব্যক্তিজীবনের ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারেন না। এক হিসেবে তাঁরা আত্মজীবনীই রচনা করেন। তবে আত্মজীবনীর সঙ্গে এইসব আত্মজীবন-কাহিনী-নির্ভর রচনাবলীর পার্থক্য এই যে এইসব লেখায় লেখক উপদানকে যতটা সম্ভব নৈর্ব্যক্তিকভাবে ব্যবহার করেন। নিজেকে সেখানে তিনি প্রচ্ছন্ন রাখেন। আর আত্মজীবনীতে বক্তা এবং বর্ণিত বস্তু আসলে একই। ব্যক্তি থেকে বর্ণকের দূরত্ব রক্ষা করতে সেখানে তাই লেখককে যথাসম্ভব নিজত্ব সরিয়ে রাখতে হয়। নিজেকে নায়ক করে উপন্যাস লেখার সময় লেখক যে কল্পনার বিস্তার ঘটাতে পারেন, যেভাবে সত্তার বিস্তার ঘটিয়ে কল্পনায় আত্মসম্ভোগ করতে পারেন আত্মজীবনীতে তার অবকাশ থাকে না। যাকে বলা যায় Scrutining Self সেই আত্মনিরীক্ষণ, আত্মবিশ্লেষণ তাই আত্মজীবনীর বিষয়। তাই আত্মজীবনী রচনা করতে গিয়ে লেখককে যথাসম্ভব আত্মবর্ণনার Objectivity রক্ষা করতে হয়। আর এরই মধ্য দিয়ে লেখককে দেখাতে হয় জীবনের উন্মোচন ও উত্তরণ।

স্পষ্টই বোঝা যায়, আধুনিককালের আগে এরকম রচনা হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ ব্যক্তির যে আত্মসচেতনতা, আধুনিক যুগের আগে তার উন্মোচন হয়নি। সেই আত্মবোধ একেবারে সম্পূর্ণতই আধুনিক যুগের জিনিস। তাই মধ্যযুগের সাহিত্যে কবির আত্মপরিচয় বা কোনো কোনো জীবনী-রচনার চেষ্টার মধ্যে সত্যিকারের একালের আত্মজীবনী রচনার বীজানুসন্ধান ব্যর্থই হবে।

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর ধারা বেশ বিস্তৃত। মুনীর চৌধুরী উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের যে আত্মজীবনী সাহিত্যের পরিচয় দিয়েছেন[১] মীর মশাররফ তার মধ্যে কালানুক্রমিক বিচারে সপ্তম স্থানে থাকবার যোগ্য। নীচে সেই তালিকা দিলাম ঃ

১. রাসসুন্দরী দাসী রচিত, 'আমার জীবন' (বাং ১২৭৫/ ইং ১৮৬৮)
২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বিদ্যাসাগর চরিত' (১৮৯১)
৩. দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, 'আত্মজীবন চরিত' (১৩০৩)
৪. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী' (১৮৯৮)
৫. রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত' (১৯০৮)
৬. নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন' ৫ খণ্ড (১৯০৮-১৯১৩)
৭. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী' (১৯০৮-১৯১০)
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবন স্মৃতি' (১৯১১-১৯১২)
৯. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' (সচিত্র/১৯১৫)
১০. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত' (১৯১৮)

এই তালিকার মধ্যে স্থান পাননি এমন কয়েকজনের কথা অন্য লেখকরা তুলে ধরেছেন। যেমন মীর

মশাররফের আগে আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী 'জীবনচরিত' (১৮৮৯) রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়েছে। এটি মুসলমান লেখকের প্রথম আত্মজীবনী।[২] শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' (১৮৯৮) বইটিও একটি আত্মজীবনী গ্রন্থ।[৩] সেই হিসেবে মীর মশাররফের রচনাকে মুসলমান লেখকগণের মধ্যে তৃতীয় আত্মজীবনী বলতে হয়।

মীর মশাররফের অনেকগুলি লেখায় (উদাসীন পথিকের মনের কথা, গাজীমিঁয়ার বস্তানী, আমার জীবনী, বিবি কুলসুম) আত্মজীবনীর উপাদান থাকলেও প্রথম রচনা দুটি প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসই। এখানে আত্মজীবনীর উপাদান উপন্যাসের রসকল্পনাকেই আস্বাদ্য করেছে। ব্যক্তি মশাররফ এসব লেখায় প্রায় প্রচ্ছন্ন। 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে ভেড়াকান্তের মধ্যে তাঁর ভূমিকা অনতিপ্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও ভেড়াকান্তকে একটি চরিত্ররূপেই দেখা ঠিক হবে। তার ভিতরে আছে লেখকের জীবন থেকে আহরিত উপাদান; কিন্তু তা লেখকের জীবনী নয়। তাছাড়া তিনি নিজেও সেটিকে আত্মজীবনী বলেননি। সচেতনভাবে তিনি 'আমার জীবনী' ও 'বিবি কুলসম' — এই রচনা দুটির মধ্যেই আত্মজীবনী রচনা করে গেছেন। অন্যান্য লেখায় তাঁর জীবনের উপাদান আছে কিন্তু এ দুটি ক্ষেত্রে আছে আত্মজীবনী রচনার প্রয়াস।

২. রচনা বিশ্লেষণ

আত্মজীবনীরূপে 'আমার জীবনী' রচনার পরিকল্পনা মশাররফের দীর্ঘদিনের। তিনি নিজে বলেছেন, "এ সংকল্প বহুদিনের। .... প্রায় ১৯ বৎসর পূর্ব্বের সংকল্প"।[৪] 'আমার জীবনী'র প্রথম খণ্ড ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তারপর পৃথক পৃথক ১২টি খণ্ডে ১৯১০ সাল পর্যন্ত এই গ্রন্থের প্রকাশ হয়। ১৯০৮ থেকে উনিশ বছর পিছিয়ে গেলে বলতে হয় ১৮৮৯ সালের কোনো সময় থেকেই তিনি আত্মজীবনী লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। আর এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে বলেছিলেন — "জীবনের আদি অন্ত ঘটনা শুনাইব।"[৫] লেখক তাঁর জীবনের ৬৫ বছরের ঘটনা শোনাবেন বলেছিলেন। জীবনের শেষ অঙ্ক পর্যন্ত কাহিনী বলবার ইচ্ছে তাঁর ছিল। কিন্তু তা হয়নি। নিজের জীবন-বর্ণনার মাঝেই বিরত হয়ে স্ত্রী কুলসুমের জীবনী রচনা শুরু করেছিলেন। 'আমার জীবনী'র একাদশ-দ্বাদশ খণ্ডের 'বিদায়' শিরোনামে তিনি লেখেন ঃ

> জীবনের প্রথম হইতে যৌবনকাল পর্যন্ত (বিবাহ ঘটনা) প্রকাশ হইয়া রহিল। জীবনের চারিভাগের এক ভাগ প্রকাশ হইল।[৬]

তখনো অবশিষ্ট ৪৩ বছরের ঘটনা প্রকাশ করা বাকি ছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ

> যদি জীবনে কুলায়, দয়াময় এলাহির কৃপা হয় তবে ঐ অংশ অবশ্যই প্রকাশ করিব।[৭]

কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। পরের বছরই তাঁর মৃত্যু হয়। তাই 'আমার জীবনী'তে কেবল তাঁর জীবনের ১৭/১৮ বছর বয়সের ঘটনা মাত্র বিবৃত হয়েছে। যদি লেখক অবশিষ্ট জীবনকাহিনী বর্ণনা করতে পারতেন তাহলে আমরা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ক্রিয়াশীল যে শিল্পীমন তার অন্তরধর্মের পরিচয় পেতে পারতাম। কোন বিশিষ্ট জীবনধর্মে তাঁর সাহিত্যিক রচনাবলীর সৃষ্টি তার মধ্যে উন্মেচিত হয়েছে, তাঁর কোন্ কবিসত্তা লেখকের এই রচনাবলীর পিছনে ক্রিয়াশীল সেই সত্তার স্বরূপসন্ধান — আমরা লেখকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর থেকেই লাভ করতে পারতাম। কিন্তু লেখক তা বলবার সুযোগ পাননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা বাংলায় আত্মজীবনী রচনা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট মানুষ। মীর মশাররফও হয়তো তাই ছিলেন। একমাত্র রাসসুন্দরী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি গৃহবধূ হিসেবে সেকালের নারীজীবনের যে চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন তার বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু প্রধানত নবজাগ্রত বাংলাদেশ ও বাঙালীজীবনের ভাবান্দোলনের বিশিষ্ট ভূমিকা যাঁদের, তাঁরাই আত্মজীবনী রচনা করেছেন। আর এই মানুষগুলির জীবনের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়েছে কলকাতা শহর — যে শহর নূতন বাংলার রাজধানী — বাংলাদেশের নবযুগের কর্মক্ষেত্র। ফলে নূতন জীবনের নানা ভাবদ্বন্দ্ব তাঁদের জীবনে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে — সমাজ ও ব্যক্তির যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় জীবনের নবজাগ্রত ভাবচেতনার ফসল ফলেছে — তাই বাংলার মানুষের কাছে নূতন জীবনবোধের স্বরূপ সন্ধান রূপে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু মীর মশাররফ এই নবচেতনার কেন্দ্রভূমি থেকে ছিলেন বহুদূরে। এমনকি নূতন যুগের প্রধান কেন্দ্র যে নগর কলকাতা সেই কেন্দ্র থেকে দূরে ঢাকা শহরকে অবলম্বন করেও তাঁর জীবনের আবর্তন ঘটেনি। ফলে বলা যায় মীর সাহেবের জীবন গ্রামীণ নিস্তরঙ্গতার মধ্যে — অন্তত নূতন ভাবাবর্তের বাইরে — অতিবাহিত হয়েছে। জীবনের যে পর্বে নগরকেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করবার আগেই তাঁর জীবন-কাহিনী স্তব্ধ হয়ে রইল। তাই বলা যায়, মীর মশাররফের 'আমার জীবনীতে' আধুনিক জীবনের প্রকাশভূমিকে স্পর্শ করা সম্ভব হল না। আধুনিক চেতনার এই কেন্দ্র থেকে তিনি এবং তাঁর জীবন অনেক দূরেই থেকে গেল। আর তাছাড়া মীর সাহেব যাই রচনা করুন না কেন তার সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে সচেতন থেকেও বলা যায় যে আধুনিকতা নবযুগের প্রাণকেন্দ্রকে অধিকার করে নবস্ফূট পদ্মের মতো মাথা তুলে থাকে - সেই নবচেতনার ভাবাবর্তে তাঁর জড়িয়ে পড়বার কোনো অবকাশই হয়নি। বাংলাদেশ ও বাঙালীর ভাবচেতনার বৃত্তে তাঁর কোনো স্থান ছিল না। ফলে যাকে বলা যায় তাঁর আত্মজীবনীর পশ্চাৎপট তা ছিলো নিতান্ত সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। আত্মজীবনী নিশ্চয় ব্যক্তির আত্মবোধের জগৎকে প্রকাশ করে — আত্মসত্তার উন্মোচন তাঁর অভিপ্রেত কিন্তু তার সমাজভূমির বিস্তার যত ব্যাপকতা পায় ব্যক্তির আন্তরসত্তার উন্মোচনও তত গভীরতা পায়।

মীর মশাররফ 'আমার জীবনী' গ্রন্থটিকে নিম্নোক্ত অধ্যায়ে ভাগ করে প্রকাশ করেন ঃ

১. আমার আত্মকথা ঃ প্রার্থনা
২. উপক্রমণিকা ঃ আমি কে ?
৩. জন্ম বিরবণ
৪. বিদ্যাশিক্ষা
৫. যৌবন জোয়ারারম্ভ
৬. বংশ পুরাণ

পরবর্তী অধ্যায়গুলির কোন নামকরণ করেননি।

লেখক এই রচনায় সহজভাবে তাঁর পারিবারিক ইতিবৃত্ত, পিতামাতার পরিচয়, পূর্বপুরুষদের কাহিনী এবং পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। তৎকালীন মুসলমান সমাজের অবস্থা, নিজের জ্ঞাতিবর্গের কাহিনী, নিজের শিক্ষাদীক্ষার কথা, সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত, প্রণয় ও বিবাহের ঘটনা — এই অংশে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

রচনা হিসেবে দেখলে বলা যায়, এই অংশ থেকে যেমন তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথা আমরা পাই তেমনি সেকালের মুসলমান সমাজ ও তাদের জীবনের নানা চিত্রও এর মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এইভাবে ব্যক্তিজীবনের

বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক সমগ্র পরিবেশও বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত করে তুলেছেন। আত্মজীবনীর বর্ণকের একটি চোখ থাকে নিজের দিকে আর একটি থাকে সমাজের দিকে। কোন্ পারিবারিক বা সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের এই প্রকাশ সম্ভব হল, কীভাবে ব্যক্তির সত্তার বিশেষ রূপের উন্মোচন সার্থকতা লাভ করল আত্মচরিতকারের বর্ণনায় তার আভাস থাকা চাই। মীর মশাররফের রচনায় এই পরিবেশ-পট বর্ণিত হয়েছে – তাঁর পরিবারের জীবনচিত্র, পিতার চরিত্র, মাতার পবিত্র চিত্তের পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন। মীর মশাররফ সেকালের অভিজাত মুসলমান সমাজের মানুষদের মতো অল্পবয়সেই লেখাপড়ায় ছেদ টেনে দিয়েছিলেন। সেই বয়সেই নানা ভোগমত্ততার টানে ভেসে পড়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "দাসী বান্দী কর্তৃকই আমার চরিত্র প্রথম কলঙ্করেখায় কলঙ্কিত হয়।"[৮] অতঃপর মশাররফ কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আবার এক নারীর টানে সেই চেষ্টাও ফলবতী হয়নি। তারপর সেই প্রণয়কেন্দ্রিক বিবাহ তাঁর জীবনের করুণ পর্বরূপে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। মশাররফ এইসব কাহিনী বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই বর্ণনা করেছেন। আত্মজীবনীকারের আত্মবর্ণনায় সত্যকথনের যে দায়বদ্ধতা থাকে মশাররফ মোটের উপর তাকে রক্ষা করেছেন। যেমন নিজের চরিত্রের কলঙ্করেখার কথা তিনি বলেছেন তেমনি বলেছেন তাঁর পিতার স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তির কথাও।[৯] অবশ্য সেকালের অভিজাত সমাজে বারযোষিতের প্রতি আসক্তি এমন কিছু দোষাবহ ছিল না। তাদের অভিজাত ধর্মেরই একটি প্রকাশ এইভাবে ঘটত। সে যাই হোক মীর মশাররফ এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। নিজের নারী আসক্তির এই চিত্র তিনি বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ

> ঘরের মধ্য হইয়া আসিতেই দেখি সম্মুখে মোহিনী মূর্তি। সেই একপ্রকার স্নেহে আমার হাত ধরিয়া বুকে বুক স্পর্শ করিয়া মুখের উপর সেই অতি মোলায়েম সৌগন্ধিযুক্ত গণ্ডস্থল রাখিয়া আমায় কয়েকটি কথা চুপিচুপি বলিলেন . . . ।[১০]

এইভাবে নিজের জীবনের নারী রূপতৃষ্ণার কথা বলাটা মীর আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই আসক্তির বর্ণনা আত্মজীবনীকারের কাছে একমাত্র কাম্য নয়। নিজের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করবার দ্বারা লেখকের আত্মমনের বিবর্তনের ধারাটিকে ফুটিয়ে তোলা তার কাজ।[১১] একজন লেখকের জীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যে বোধের বিবর্তন ঘটে – আত্মজীবনীতে তারই প্রকাশ ঘটা চাই। মানুষের জীবনের বাইরের ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে যে অন্তর্সত্তা তার পরিস্ফুটনেই তার সার্থকতা। আত্মজীবনী ব্যক্তির প্রকাশিত হয়ে ওঠবার কাহিনী। সেদিক থেকে এই রচনার সার্থকতা সীমাবদ্ধ।

আসলে সত্যকথনের মধ্যেও থাকে এক রকমের নৈর্ব্যক্তিকতা। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় তাঁকে সত্যকথনের জন্য চরিত্রের উপর কোনো উজ্জ্বল আলো ফেলতে হচ্ছে না। সত্য তাঁর কাছে জীবনের মধ্যে প্রকাশিত। অন্যপক্ষে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী পড়ে মুনীর চৌধুরীর মনে হয়েছে সে তার কাম দমনের ইতিবৃত্ত।[১২] মীর মশাররফ সম্বন্ধে সে কথা না বলা গেলেও এমন মনে করা যায় যে, এসব ঘটনার বর্ণনায় জীবনকে তিনি কিছুটা দীপ্তিমান করে তুলেছেন।

সে কথা আরও স্পষ্ট হয় তাঁর আত্মজীবনীর রচনারীতির দিকে নজর দিলে। প্রথম থেকেই তিনি একটি নাটকীয় বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করে আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছেন। মুনীর চৌধুরী একেই বলেছেন 'উপন্যাসের কলারীতি'।[১৩] মীরের লেখায় যে রীতি দেখি তা এই পর্বের আরও কারো কারো লেখায় ফুটে উঠেছে। 'আমার

জীবনী'র প্রারম্ভেই মীর লিখেছেন ঃ

> চিনি না। চিনিতে পারিলাম না। কতদিন ভাবিলাম কত চিন্তা করিলাম, মাথার মগজ ক্ষয় করিলাম, কিছুই হইল না — আভাস ইঙ্গিতেও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতদিন জনমানববিহীন বিজন বনে, কতদিন সুপ্রশস্ত প্রান্তরে, কত নিশীথ সময়ে নির্জ্জন গৃহে শয়ন শয্যায়, দার্জিলিং পাহাড়ের উচ্চশিখরে — নির্জ্জন উপবনে, ঘোর নিশীথ সময়ে গৌরী নদীতটে বসিয়া কত চিন্তাই করিয়াছি, জানিতে পারিলাম না — আমি কে ? যুগ যুগান্তর কাটাইলাম, — কিছুই নির্ণয় হইল না। পরিচয় পাইলাম না। আমি কে ?[১৪]

স্পষ্টত এ ভঙ্গি ঔপন্যাসিকের। যে জীবন ঔপন্যাসিকের কল্পনায় প্রকাশিত হয় সে জীবন রচিত এবং কল্পনাবিদ্ধ। কিন্তু ব্যক্তির জীবন এই কল্পনাপটে বিধৃত নয়। মীর তাঁর জীবনীগ্রন্থে এই ভঙ্গি অনুসরণ করে আত্মজীবনীকে কিছুটা কুণ্ঠিত করে তুলেছেন। মাঝে মাঝেই তাঁর এই বর্ণনারীতির দেখা মেলে। আসলে যে নিরপেক্ষ আত্মবিশ্লেষণ আত্মজীবনীর ধর্ম — এ সব তাকে কুণ্ঠিত করে। মীর বলেছেন বটে — "সত্যই আমার জীবনীর মূল উদ্দেশ্য। সত্য প্রকাশেই আমার স্থির সংকল্প।"[১৫] তবু গ্রন্থের নানা জায়গায় রোমান্সের রস সম্পাদনের মোহে তা সফল হয়নি। "লেখক ঘটনা যেভাবে ঘটেছে সেভাবে বর্ণনা করার পরিবর্তে তিনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই তা বর্ণনা করে পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনে প্রয়াসী হয়েছেন।"[১৬] বিশেষত মক্তারপুরে লতিফন প্রসঙ্গে 'রোমান্সরস প্রক্ষেপের ঝোঁকই প্রাধান্য পেয়েছে'।[১৭] মুনীর চৌধুরী তাই বলেছেন, মীর মশাররফ আত্মজীবনীতে যে নাটকীয়তা ও রোমান্সরস সঞ্চার করেছেন তা সর্বত্র পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করে না।[১৮]

৩. সামাজিক মূল্য

'আমার জীবনী'র একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর সামাজিক মূল্য। লেখকের আত্মকথা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এতে উঠে এসেছে সমকালের সমাজ-সংস্কৃতির বহু উপকরণের চিত্র। বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমান সমাজের চিত্রাঙ্কণের পাশাপাশি সমগ্র বাংলাদেশের একটি ছবি তিনি বর্ণনা করেছেন। তাই সেকালের দলিল হিসেবে এর মূল্য যথেষ্ট। সেকালের মুসলমান সমাজের একটি বর্ণনা ঃ

> ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে মুসলমানের কিরূপ শোচনীয় দশা ছিল তাহা ভাবিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আমি সেই দুর্ঘটনা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহাই জীবনীতে সন্নিবেশিত করিব। সে সময়ে বঙ্গে মুসলমান সমাজের দুর্দশার কারণই, ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থপাঠে অনিচ্ছা। জাতীয় বিদ্যাশিক্ষায় শৈথিল্য। জাতীয় ভাব রক্ষার অমনোযোগী এ সকল ঘটিবার কারণ ? বিধর্ম্মীদিগের প্রবল পরাক্রম, ধন গৌরব শাসন, বিচার রাজ্যবিভাগ সমগ্র বিভাগেই মুসলমানশূন্য।[১৯]

সে সময়ে বাংলার সাধারণ মানুষ কিরূপ 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' ছিল এবং ইংরেজের নামে ভয়ে শিউরে উঠত তার পরিচয়ও লেখক দিয়েছেন ঃ

> আমাদের দেশের লোকে, সে সময় সাহেবের নাম শুনিলেই কাঁপিয়া উঠিত, সাহেবের পোষাকপরা অন্যজাতীয় লোক দেখিলেও তাহাকে সাহেব বলিয়া বিশ্বাস করিত। পাটনা, ভাগলপুর কোথায় তাহা ত কেহই জানিত না।[২০]

বাঙালী হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে প্রচলিত সেকালের জাত-ঘরের বর্ণনাও বেশ স্পষ্ট ধারণা দেয়।[২১]

সেকালের পূর্ববঙ্গে দাস-দাসী কেনা-বেচার প্রথা চালু ছিল। তিনি বাল্যকালে নিজ পরিবারে ৩০/৩২ জন দাসী-বান্দী দেখেছেন। মশাররফ লিখেছেন যে,

> মাতামহ রঙ্গপুর অঞ্চল হইতে টাকা দিয়া দাসী খরিদ করিয়া পাঠাইতেন। রঙ্গপুর অঞ্চলে সে সময় পিতা কন্যাকে, স্বামী স্ত্রীকে যথেষ্ট টাকা পাইলে, অথবা দীনদুঃখী লোক কন্যা ভগ্নী স্ত্রী বিক্রয় করিত।[২২]

তাঁর 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'তেও দাসী বাঁদীর ক্রয় বিক্রয়ের উল্লেখ আছে। অনেক সময় বাঁদীরা গৃহস্বামীর উপপত্নীরূপে ব্যবহৃত হতো। বাঁদীপুত্র গৃহভৃত্যের কাজ করত।

তাছাড়া সেকালের বাঙালী মুসলমান জমিদারদের যে বিলাস-ব্যসন, বাইজী পরিবৃত জীবন যাপন ও অধঃপাতের চিত্র অঙ্কন করেছেন তাও বাস্তবসম্মত। মশাররফের আত্মীয় মীর মহাম্মদ আলী এবং পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন বাইজী-প্রিয়। অন্যায় ও অসৎ উপায়ে বিপুল বিত্তের অধিকারী হন মীর মহম্মদ আলী ও মশাররফের আরেক দূর-আত্মীয় বামনার জমিদার। মীরের জেঠতুতো দিদির স্বামী সা-গোলামও 'নিমকহারাম', 'চক্ষু লজ্জাহীন'। শিক্ষাদীক্ষায় এদের তেমন রুচি ছিল না।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমগ্র মুসলমান সমাজই পিছিয়ে ছিল। এরই মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার যে-ব্যবস্থা চালু ছিল এবং মুসলমানদের মনোভাব কি ছিল তাও বেশ চমকপ্রদভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। মশাররফ নিজের শিক্ষাজীবন শুরুতে 'হাতে তাক্তি' (হাতে খড়ি), আরবী ফারসী শিক্ষা, দুর্গাচরণ রায়ের কাছে বাংলা লিখতে শেখা বা নন্দীর পাঠশালায় সরস্বতী বন্দনা আওড়ানোর কাহিনী যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য।[২৩] মুন্সী সাহেবরা 'বাঙ্গালার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না'। এমনকি আরবী শিক্ষক মুন্সী সাহেবরা কোরান শরীফ পড়েই যেতেন, 'আরবী কোরাণ শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না'।[২৪]

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মনোভাব কিরূপ ছিল তার বর্ণনা ঃ

> ইংরেজী পড়িতে পাপ ত আছেই, আর মরিবার সময় গিডীমিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ রসুলের নাম মুখে আসিবে না। তাহার পরেও আত্মীয়স্বজন গুরুজনগণের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংরেজী পড়িলেই, একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়।[২৫]

মশাররফের পিতাও প্রথমে ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীকালে আরো অনেকের মতো তাঁরও এই মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে ঃ

> বামনা ঢাকা মোসলমান সমাজে, সায়েস্তাবাদের মীর সাহেবদিগের মুখে ইংরেজী শুনিয়া ইংরেজী ভাষার প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ঘৃণা ছিল তাহা অনেক পরিমাণ ছুটিয়া গিয়াছে।[২৬]

তখনকার মুসলমান সমাজে প্রচলিত পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সংক্রান্ত একটি বিষয়ে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে ঃ

> আমাদের বিবাহ! ভাগ্যলিপির উপর নির্ভর। অদেখা অবস্থাতেই বিবাহ করিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে পর্দানশীন পরিবার মধ্যে পাত্রী দেখার নিয়ম নাই। কেহ কাহাকে দেখায় না, পুরুষ ত দূরের কথা, স্ত্রীলোকেরাও দেখিতে পায় না।
>
> বর্তমান সময়ে দেখিতেছি, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর দেখিতেছি, গ্রামে নহে কলিকাতায় দেখিতেছি, বিবাহের পূর্বে পাত্রপক্ষের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের পরিবারেরা এবং মাতা ভগ্নী পিসি

> মাসি ইহারা, পাত্রীকে পাত্রীর বাড়ী যাইয়া দেখিতে পারেন। সম্বন্ধহীন অপরের বাড়ীতে যাইতে অপমান বা দোষ মনে করেন না। কিন্তু পল্লীগ্রামে বিবাহের পূর্বে কোন ভদ্র ঘরের পরিবার পাত্রীর বাড়ীতে যাওয়া দূরে থাক সে কথা কেহ মুখেও আনিতে পারেন না।[২৭]

এ ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজের মতো মুসলমান সমাজেও যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ (আশরফ-আতরাফ) প্রচলিত ছিল তারও এক কৌতুকপ্রদ বর্ণনা আছে 'আমার জীবনী'তে ঃ—

> বড়লোক, সকলেই খুব খাতির করিলেন। কিন্তু মজলিশ করিয়া কেহই তাঁহার সহিত খাদ্য খাওয়া করিলেন না। এক সঙ্গে এক দস্তরখানায় খাইলেন না — চৌধুরী রহিমউদ্দিন সকলি বুঝিতে পারিলেন। ইহারা জাত্যংশে আমা হইতে খুব বড়, তাহাতেই আমার সঙ্গে খানাপিনা করিলেন না।[২৮]

কোম্পানী আমলের বাংলাদেশের সাধারণ প্রজাদের অবস্থা ও নীলকরদের দৌরাত্ম্য বিষয়েও 'আমার জীবনী'তে উল্লেখ আছে।[২৯] তবে বিশেষত্ব এই যে প্রজাদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের চেয়ে লাম্পট্য জীবন ও নারী অপহরণের মতো দিকগুলিই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র ঐতিহাসিক নীলকর মে.টি.আই. কেনীও 'আমার জীবনী'তে বর্ণিত হয়েছেন। তবে তিনি এখানে শালঘর মধুয়ার কেনী নন, বরং মীরপুর কুঠির কুঠিয়াল সাহেব। তিনিই মশাররফকে ছেলেবেলায় বিলেতে নিয়ে গিয়ে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। আবার অন্যদিকে কি করে নীলকরের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে প্রজারা জোটবদ্ধ হলো এবং সমস্ত নীলকুঠি দেউলিয়া হয়ে গেল, তার ইঙ্গিত আছে।

সুতরাং উনিশ শতকের বাঙালী সমাজের বিশেষত মুসলমান সমাজের সামগ্রিক অবস্থার অবিকল ছবি এতে বিধৃত হয়েছে। সেদিক থেকে এর সামাজিক মূল্যও অপরিসীম।

৪. দৃষ্টিভঙ্গি

মীর মশাররফ জন্মেছিলেন সেকালের গ্রামীণ অভিজাত মুসলমান পরিবারে। ফলে সেই পরিবারের চিন্তা-চেতনায় তার মন গড়ে উঠেছিল। নিরন্তর অনুশীলন আর নূতন চেতনার অভিঘাতে মনের বিস্তার ঘটবার সুযোগ তাঁর তেমন ছিল না। অবশ্য তারই মধ্যে তিনি অনেকক্ষেত্রে নূতন চিন্তার কথা বলতে পেরেছিলেন। লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে তিনি সেকালের মত মেনে নিতে পারেননি।

শিক্ষাদীক্ষা এবং সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন মুসলমান সমাজের সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলেন। তখন মুসলমান নবাব ও জমিদারদের গৃহে সঙ্গীতের কদর ও রেওয়াজ থাকলেও মুসলমান সমাজের সর্বস্তরেই গান-বাজনার প্রতি বিরূপতা লক্ষিত হত। মশাররফ হোসেন এ জাতীয় অসংস্কৃত মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করে লিখেছেন ঃ

> আমাদের সমাজে গানের নামেই চটা, — গানের নামেই ছি ছি!! শত শত ঘৃণা। উচ্চদরের মুসলমান, শিক্ষিত মুসলমান সমাজে সঙ্গীত ঘৃণার্হ, কাটমোল্লার দলেই বেশী নিন্দনীয়। এই স্থানে কয়েকটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠকগণ! মার্জনা করিবেন, এই গান আরবদেশে, মক্কা শরীফে হইতেছে, মদীনা শরীফে হইতেছে। তুরস্ক সুলতান, যিনি জগতের মুসলমানের ধর্মগুরু, তাঁহার রাজ্যেও গান বাজনার আদর আছে, এমন কি ভদ্রঘরের মেয়েরা গান এবং বীণা-বেহালা

> বাজাইতে না জানিলে মেয়েদের বিবাহ হওয়াই কঠিন। বোগদাদ, মেসের, পারস্য, তাহার পর বাড়ীর নিকটে আফগান রাজ্যে গানের চর্চা আছে। কাবুলীদিগের গানবাজনা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। স্বয়ং আমির বাহাদুর আমাদের মাননীয় বঙ্গাধিপ লাট ফ্রেজারের বাড়ীতে তাল-মান-লয় বাজনার সহিত গান গাহিয়াছিলেন। যত দোষ বঙ্গে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের কতকাংশে।[৩০]

সমাজে নারী-স্বাধীনতা ছিল না বলে মশাররফকে দারুনভাবে বিচলিত করেছিল। বিশেষতঃ বিবাহ বিষয়ে নারীর মতামতের কোনো মূল্যই ছিল না। সমাজ-প্রচলিত এই প্রথার বিরুদ্ধে সংবেদনশীল লেখকের বক্তব্য ঃ

> আমাদের সমাজের গতি চমৎকার, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। যে সম্বন্ধ উপস্থিত, ইহাতে স্ত্রী লোকের প্রতি বহু পরিমাণ নির্ভর করা কর্তব্য। তাহা সমাজে কই, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে কে ? পিতামাতা ভ্রাতাই সম্বন্ধ গড়াইয়া থাকেন। তাঁহারাই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন, যার বিবাহ তার অভিমতের দিকে কেহই লক্ষ্য করেন না, এই যে এক ভয়ানক প্রথা, ইহারই জন্য আমার প্রাণ সর্বদা কান্দে।[৩১]

নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে তাঁর এই অভিমত বা আবেগময় প্রকাশ — ক্ষীণস্বরে হলেও তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনাকেই ব্যক্ত করে।

এ ছাড়া এই গ্রন্থেরই ভিন্ন প্রসঙ্গে মীরের প্রগতিশীল অগ্রগামী চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষরও পাওয়া যায়। যেমন—

> ভদ্রলোক জোট বান্দিলে কি হয় ? জনসাধারণ কৃষক শ্রেণী পণ্ডিত মুর্খে এক জোট না হইলে কিছুই হয় না।[৩২]

কিন্তু তা সত্ত্বেও রক্ষণশীলতার প্রতি মশাররফের একটা টান ছিলই। ডারউইনের তত্ত্বের প্রতি শ্লেষোক্তি,[৩৩] পর্দাপ্রথার প্রতি সমর্থন তাঁর রক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচায়ক। অলৌকিকতার প্রতি মশাররফের স্বাভাবিক দুর্বলতার পরিচয় 'আমার জীবনী'তেও পাওয়া যায়। কবর সম্পর্কে তাঁর পূর্বপুরুষ সৈয়দ সাদুল্লাহর উপদেশের বর্ণনায়,[৩৪] গৌরীনদীর উৎপত্তির বিবরণ[৩৫] এবং লতিফনের রোগ-আরোগ্যের উপায়স্বরূপ তন্ত্রমন্ত্র ঝাড়ফুঁকের আশ্রয়গ্রহণ[৩৬] প্রভৃতি ক্ষেত্রে অলৌকিকতার ছাপ আছে। সেক্ষেত্রে লেখকের অন্ধবিশ্বাসও রয়েছে যা আধুনিক যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। সেদিক থেকে তিনি সমকালের সাধারণ মানুষের চিন্তাচেতনারই সমধর্মী। সুতরাং এই গ্রন্থে লেখকের যুগপৎ প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ রয়ে গেছে।

৫. মূল্যায়ন

সে যাই হোক, জীবন-কাহিনী বর্ণনায় অসম্পূর্ণতা এবং কোথাও কোথাও শৈল্পিক ও দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মীর মশাররফের 'আমার জীবনী' বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

———

আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী বা বিবি কুলসুম

১. পটভূমি

মীর মশাররফ হোসেনের সর্বশেষ গ্রন্থ এবং জীবনীমূলক রচনা হল 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী'। এই গ্রন্থটিকে লেখক 'বিবি কুলসুম' নামেও অভিহিত করেছেন।[৩৭] মশাররফ যখন খণ্ডে খণ্ডে 'আমার জীবনী' প্রকাশ করছিলেন তারই মধ্যে নিজের জীবনী রচনা বন্ধ রেখে তিনি এই গ্রন্থ লেখেন। এটি কলকাতা থেকে ১৩১৭ সালে (ইং ১৯১০) প্রকাশিত হয়।

মশাররফের প্রিয়তমা পত্নী কুলসুমের মৃত্যুর পরে রচিত এটি একটি পত্নীপ্রেমের স্মারক গ্রন্থ। বিবি কুলসুম প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে এতে লেখক নিজের কথাও বলেছেন। স্ত্রীর কথা বলতে বলতে নিজের কথা স্বাভাবতই এসে গেছে। এখানে মশাররফের জীবনের অনেক কথাও বর্ণিত হয়েছে। এদিক থেকে 'বিবি কুলসুম'কে 'আমার জীবনী' গ্রন্থের পরিপূরক বলা চলে। এ কারণে আত্মজীবনী না হয়েও গ্রন্থটিকে মশাররফের আত্মজীবনী-নির্ভর জীবন-চরিত বলা যায়। তাঁর অনান্য গ্রন্থের চেয়ে এখানে মশাররফকে আরও একান্ত ভাবে পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে পত্নীবিয়োগ জনিত বেদনা প্রকাশ করে অনেক কাব্যকবিতা ও গদ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্মরণ' (১৯০৩), মোহাম্মদ দাদ আলীর 'ভাঙ্গাপ্রাণ' (১৯০৫), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আলেখ্য' (১৯০৭), অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' (১৯১২) প্রভৃতি এই পর্যায়ভূক্ত বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। পত্নী-শোকাতুর চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬) বিচ্ছেদ বিষাদের 'গদ্যকাব্য'। এই সমস্ত গ্রন্থগুলি পত্নীর স্মৃতিতে রচিত সাহিত্যিক রচনা। কিন্তু মশাররফের পত্নী বিয়োগের পর তাঁর শোকোচ্ছাসে 'বিবি কুলসুম' রচিত হলেও এটি মূলতঃ জীবন-কথা।

২. রচনা বিশ্লেষণ

সমগ্র গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি 'কথা' নামে চিহ্নিত। প্রথম অধ্যায় ছাড়া বাকী চারটি অধ্যায় আবার শিরোনামযুক্ত। এগুলি হল —

১. প্রথম কথা

২. দ্বিতীয় কথা — বাল্যজীবন

৩. তৃতীয় কথা — ভয়ানক ষড়যন্ত্র মুক্তি ও উন্নতি

৪. চতুর্থ কথা — আমার কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার কথা ও কার্য্যবিবরণ এবং

৫. 'পঞ্চমকথা'র দুটি অংশ ঃ ক) শেষকথা প্রথমাভাষ ও খ) কথা নাই — শেষ বিবরণ।

এছাড়া রয়েছে 'লেখকের কথা', 'প্রিয় পাঠক এবং পরম প্রিয়তমা পাঠিকাগণের নিকট লেখকের মনের কথা -- প্রেম' এবং 'সূচনা' শীর্ষক উপক্রমণিকা আর উপসংহারে 'সমাধি' নামে কুলসুম-স্মরণে রচিত একটি চতুর্দশপদী কবিতা।

মশাররফ তার প্রিয়তমা পত্নীর উদ্দেশে পদ্যে একটি আবেগময় 'উৎসর্গ-পত্র' রচনা করে জানিয়েছেন -

যেদিন গিয়াছ চলি অমরা পুরীতে,
কান্দিয়াছি কত কান্না নির্জন নিশিতে।
জান তুমি যিনি মোর আশ্রয়-সম্বল,
তাঁর ধ্যান করি মনে পাইলাম বল।
আর শুনিলাম কানে জীবনী 'তোমার',
প্রকাশ করিলে শান্তি হইবে আমার।
.....
সেই দৈব্বাণী প্রতি স্থির করি মন,
তোমারই জীবনকথা বাল্য বিবরণ –
তোমারই পবিত্র নামে রাখিলাম নাম,
সকলি দিয়াছি তোমা ইহাও দিলাম।[৩৮]

অর্থাৎ তার প্রিয়তমা স্ত্রীর অকাল প্রয়াণে শোকার্ত লেখক ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ পত্নীর 'পবিত্র' 'জীবনকথা' রচনা করে মনে দু-দন্ড শান্তিলাভের প্রয়াস করেছেন।

এরপর পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখকের 'মনের কথা'য় মশাররফ 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

> অনেকেই স্ত্রীবিয়োগে, নানাবিধ রঙ্গবিরঙ্গের পদ্য, পয়ার ত্রিপদী চতুস্পদী অমিত্রাক্ষর লিখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। আমার সে সকল শক্তি এক্ষণে নাই। ... কান্দিতে কান্দিতে মনের আবেগে যাহা ধারণা হইয়াছিল, কানেও শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই করিলাম। 'কুলসুম জীবনী' লিখিলাম। এতকাল যে সকল কথা গুপ্ত ছিল তাহা প্রকাশ হইল। বার বৎসর পূর্ব্বে গাজিমিয়াঁ আপন বস্তানিতে কুলসুম বিবির অনেক কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন– 'বউ' আখ্যা দিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথাও ইহাতে সংযোগ করিলাম।[৩৯]

'বিবি কুলসুম' মশাররফের সুখী দাম্পত্য জীবনের স্মৃতিচিত্র। লেখকের প্রথমা স্ত্রী অজিজননেসার সঙ্গে প্রথমাবধিই তাঁর দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি। এই অশান্ত, অতৃপ্ত জীবনে দ্বিতীয়া পত্নী কুলসুম আসার পর সব কিছু পাল্টে যায়। উচ্ছৃঙ্খল মশাররফ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন এবং সেই সঙ্গে সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে ওঠে। কুলসুমের কল্যাণেই তিনি জীবনে সুখ অনুভব করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই কুলসুমের অকাল-প্রয়াণের ফলে তিনি হৃদয়-মনে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন এবং গভীর বেদনা বোধ করেন। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে তিনি রচনা করলেন গদ্যগ্রন্থ 'বিবি কুলসুম'।

বিবি কুলসুমের জীবনী রচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর মনে কুলসুম যে আবেগময় প্রভাব মুদ্রিত করে

গেছেন প্রধানত সেই চিত্ত প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। বিবি কুলসুম ছিলেন মশাররফের সহধর্মিনী। মশাররফের জীবন ও সাহিত্যকর্মে উদ্দীপনা হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা বা শিল্পীর সাহিত্যকর্মের ইন্ধন হিসেবে তিনি যে প্রেরণা দিয়েছেন সেই দিক থেকে আমাদের কাছে তাঁর গুরুত্ব। যে কোন মানুষের জীবনকাহিনী পাঠকের মনে আগ্রহের সঞ্চার করে না। জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত যে মানুষ তার জীবন আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। কিংবা জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাতময় পথে ব্যক্তির যে আত্মসন্ধান তাও আমাদের আগ্রহ জাগায়। বিবি কুলসুমের জীবনকাহিনী সে রকম নয়। তাঁর ব্যক্তিপরিচয় অপেক্ষা লেখকের জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে তাঁর ভূমিকা– লেখকের জীবনকে নানা দিক থেকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে তাঁর যে গুরুত্ব লেখক তাকেই এখানে দেখিয়েছেন। এজন্য তাঁকে লেখক "জীবনীর জীবনী, নয়ন মন-রঞ্জিনী, চিত্তহারিণী, চিত্তাকর্ষিনী"[৪০] ইত্যাদি অভিধায় বিশেষিত করেছেন।

বিবি কুলসুম নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার (বর্তমানে বাংলাদেশে) এক অখ্যাত গ্রামে ১২৬৮ সালের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ সদরদ্দী ওরফে সদু সেখ আর মাতার নাম লালন। তাঁর পিতা মাতা ছিল অতি সাধারণ দরিদ্র পরিবারভুক্ত। ছেলেবেলায় কুলসুমের নাম ছিল কালী। সে সময় নদীয়া জেলায় অনেক মুসলমানেরই এ রকম হিন্দু নাম রাখা হত। সপত্নীর জ্বালায় অতীষ্ঠ হয়ে কুলসুমের মা পুত্র-কন্যা নিয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে লাহিনীপাড়ার দক্ষিণে সাঁওতা গ্রামে হিন্দুপাড়ায় বসবাস করতেন।

কুলসুমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও প্রণয়ের বিষয়টি লেখক তাঁর নিজস্ব নাটকীয় ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। মায়ের মৃত্যুর কিছুকাল পর সম্পত্তি দেখাশুনার কাজে নবীন যুবক মীর মশাররফ প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে শালঘর মধুয়ার কুঠিতে যেতেন। পথিমধ্যে ছিল 'কালী'দের বাড়ী। সে সময় বালিকা 'কালী'কে প্রায়ই দেখতে পেতেন। কালীও দেখত। এর পর প্রায় তিনচার বছর তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। অতঃপর একদিন ফাল্গুন মাসের দুপুর বেলায় লেখকের গ্রামের দক্ষিণে মাঝিদের পাড়ায় ভয়ানক আগুন লাগে। মীর মাঠের মধ্যে পৌঁছতেই দেখতে পান, একদিকে আগুনের তাড়না এবং অন্যদিকে দুটি ঘোড়ার তাড়ায় ভীত সন্ত্রস্ত 'কালী' দৌড়তে দৌড়তে এসে তাঁর বুকের ভেতর আশ্রয় নেয়। মীর তাকে নিয়ে বাড়ী এলেন। তখন মীরদের বাড়ীতে আগত মুর্শিদাবাদের বিনোদিয়ার পীরসাহেব তার 'কালী' নাম পাল্টে রাখেন কুলসুম। উভয়ের মনোভাব বুঝে পীরসাহেব মীরকে বিবাহের আজ্ঞা দেন। মীর কুলসুমকে বিবাহ করেন। কিন্তু মীরের এই দ্বিতীয় বিবাহ আত্মীয়স্বজন এবং বিশেষতঃ প্রথমা পত্নী আজীজান বিবি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। পারিবারিক অশান্তি এড়াতে মীর কিছুকাল কুলসুমকে নিয়ে নৌকোয় যমুনা-বক্ষে কাটান। কিন্তু মীর ব্যক্তি জীবনে এই দ্বিতীয় স্ত্রীর গুণে ও সাহচর্যে শান্তি, সুখ ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। যা'হোক কিছুদিন বাদে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে মশাররফের সংসারে সপত্নীর দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। প্রথমা স্ত্রী আজীজান বিবি কুলসুমকে হত্যা করতে পর্যন্ত চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে মীরের আর্থিক অনটন দেখা দিলে তিনি ১২৯১ সালে দেলদুয়ারে শ্রীমতি করিমননেসার জমিদারী এষ্টেটে ম্যানেজারী পদ গ্রহণ করেন। এবং কুলসুমকেও সেখানে নিয়ে যান। কুলসুম আপন চরিত্রগুণে সবার প্রিয়পাত্রে পরিণত হন।

'চতুর্থকথা'র প্রথম অংশে লেখক বিবি কুলসুমের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে লেখক এখানে 'গাজীমিয়ার বস্তানী'র 'ভেড়াকান্ত' এবং 'বউ' চরিত্র দুটি যে যথাক্রমে মীর নিজে এবং

বিবি কুলসুম তা স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন। দেলদুয়ারের জমিদারদের শরিকী-দ্বন্দ্বের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে মশাররফকে হাজত বাস করতে হয়। ফলে তখন কুলসুম বিবিকে নানা ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতাশক্তি, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়। প্রধানতঃ বিবি কুলসুমের প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তায় অবশেষে মীর মুক্তি পান। এমন কি এই সময় মীরের উচ্ছৃংখল জীবনযাপন ও অধঃপাতের হাত থেকে বিবি কুলসুম তাকে মুক্ত করেন। বিবি কুলসুম যে অত্যন্ত স্বামী-অনুরাগিনী ছিলেন– স্বামীর গুণকীর্তনকারী ছিলেন তা তিনি এই রচনায় বহুভাবে বলেছেন।

কিন্তু এই স্বামী অনুরাগিনী পত্নীর সঙ্গে সুখে থাকার সময়ও যে মীর অন্য রমনীর প্রতি আসক্ত ছিলেন তা তিনি নিজে জানিয়েছেন। কুলসুম তা মেনেও নিয়েছিলেন। কারণ সে যুগে এসব নারীদের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা। এতে কুলসুমের স্ত্রী-মহিমার যাই প্রকাশ ঘটুক মীর মশাররফের চরিত্রের এবং বিশেষত তিনি যে কুলসুমের প্রতি এত উচ্চ প্রণয় বর্ণনা করছেন তা খাটো হয়ে পড়ে। কুলসুম যে একবার সন্দিগ্ধ হয়ে এক দাসীকে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন বলে মশাররফ জানিয়েছেন তার মূলের সন্দেহও কি এই দাম্পত্য-প্রেমের পক্ষে কুণ্ঠাকর নয়? মৃতা স্ত্রীর কথা মনে রেখে প্রণয়াসক্তির যে বর্ণনা তিনি করেন এতে তা যেন কিছুটা শূন্যগর্ভ হয়ে যায়। তবু তাঁর পত্নীপ্রেম ফাঁপা মাত্র নয়।

'পঞ্চম কথা'য় লেখক কুলসুমের অসুস্থতা, তাঁর পত্নী-সেবা এবং কুলসুমের মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছেন। ১৩১৬ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ তাঁর মৃত্যু ঘটে। কুলসুমের সমাধিগাত্রে লেখক যে এপিটাফটি মুদ্রিত করেছিলেন তাতে তাঁর এই প্রেমের গভীর বেদনা স্তব্ধ হয়ে আছে ঃ

> . . . স্বামী সোহাগিনী বিবি কুলসুম হেথায়,
> সমাধি শয্যায় রয় অনন্ত নিদ্রায়।
> . . . . . .
> পতিগতপ্রাণা ধনী পতিসহ আসি,
> পদমদীর মৃত্তিকায় রহিলেন মিশি।
> ভাই ভগ্নি যেই হও ক্ষণেক দাঁড়াও,
> আত্মার কল্যাণে তারে আশিষিয়ে যাও। [৪১]

৩. বিবি কুলসুমের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য

কুলসুমের যে প্রকৃতি-পরিচয় মশাররফ দিয়েছেন তাতে দেখি তিনি যথাসম্ভব কুলসুমের ব্যক্তিত্বটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। কুলসুম সুন্দরী ছিলেন না, তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ও সুশ্রী। কিন্তু তিনি তেজস্বী ছিলেন। নিতান্ত দরিদ্র ঘরের মহিলা হলেও তাঁর আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল।

মীর-পরিবারের পারিবারিক মর্যাদার তুলনায় কুলসুমের তেমন কোন কৌলিন্য ছিলনা। সে কারণেই মীরের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তিনি ছিলেন অবহেলিত। তবু তিনি নিজেকে স্বামীর যোগ্য করে তুলেছিলেন। নিরক্ষর কুলসুম স্বামীর প্রেরণায় বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লেখা, গ্রন্থ-পাঠ প্রভৃতি বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা করেন। সাহিত্যিক

রুচি তৈরী হওয়ায় সাহিত্য-শিল্প ও সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ জন্মে। তিনি মশাররফের অনেক লেখার প্রেরণা স্বরূপ 'সর্ব্বদা মহাভারত পড়িতেন'। মীরের বহু লেখার প্রথম শ্রোত্রীও তিনি এবং অনেক সময় সেই রচনা সম্পর্কে মতামতও দান করতেন।

বিবি কুলসুম স্বাধীনচেতা নারী ছিলেন। তিনি 'কাহারও কর্তৃত্বাধীনে' থাকতে পছন্দ করতেন না এবং প্রায়ই 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' পংক্তিগুলি আউড়াতেন। তবে স্বাধীনতা তাঁর প্রিয় জিনিস হলেও 'স্বদেশী আন্দোলনে' তিনি বিরক্ত হতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ

> ঘরে তণ্ডুল নাস্তি, ওদিকে ধনকুবের অদ্বিতীয় রাজশক্তিসম্পন্ন ব্রিটিশ জাতি, বিদ্যাবুদ্ধিতে জগৎ শ্রেষ্ঠ। সভ্যতায় জগতে সর্ব্বজাতির আদর্শ এবং অগ্রণী, বিচারক্ষেত্রে স্থির ধীর। এমন নিরপেক্ষ রাজার অসন্তোষের কারণ- বিরক্তির কারণ করিয়া লাভ কি হইবে? [৪২]

অবশ্য আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে এই মনোভাবে যুক্ত ছিল কিছুটা তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভও। এছাড়া ইংরেজদের সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি মীরের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন বলা যায়।

বিবি কুলসুমের সঙ্গে মীরের দাম্পত্যজীবনও বেশ মধুর ছিল। মশাররফ বলেছেন- "আমি আমার জীবনে সাংসারিক সুখ বিবি কুলসুম জন্য বিশেষরূপে ভোগ করিয়াছি।"[৪৩] পঁয়ত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে কুলসুম পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যার জন্ম দেন। বহু সন্তানবতী হলেও কুলসুম পুত্র কন্যাদের প্রতি যত্নবতী ছিলেন। সেই সঙ্গে ক্রমশঃ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা অটুট ছিল। শেষ জীবন পর্যন্ত কুলসুম প্রকৃত অর্থেই মশাররফের প্রিয়সঙ্গিনী ও অর্ধাঙ্গিনী ছিলেন।

মশাররফ অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে কুলসুমের কিছু দোষত্রুটির কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। মশাররফ নিজেই বলেছেন- "কুলসুম বিবির যে কোন দোষ ছিল না তাহা নহে।"[৪৪] যেমন ছিলেন তেজস্বিনী তেমনী ছিলেন রাগী। তাছাড়া তিনি সন্দেহপরায়ণ ছিলেন বলেও লেখক জানিয়েছেন। একবার সন্দেহবশত এক দাসীকে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন।

দোষে-গুণে ভরা এই কুলসুমই লেখকের সহধর্মিনীর ভূমিকা পালনের পাশাপাশি তাঁর লেখার প্রেরণাস্বরূপও ছিলেন। এমনকি কখনো কখনো মীরের "লেখনীশক্তিকে তাঁহার স্ত্রী চেষ্টা করিয়া পরিমার্জিত করিয়াছেন।"[৪৫] (ভেড়াকান্তের স্ত্রীর ভূমিকায়) বিবি কুলসুম মীরের বিভিন্ন লেখালেখির বিষয়েও খুব আগ্রহী ছিলেন। সে কারণে প্রায়ই তিনি মীরকে রচনার বিষয়ে সজাগ করে দিয়ে বলতেন—

> 'ঐ বিষয়টা লিখিতে চাহিয়াছিলে, কৈ লিখিলে না'। 'ঐ প্রবন্ধটার এক পাত লিখিয়া ফেলিয়া রাখিলে কেন'। 'নাম রাখিলে, বিজ্ঞাপন দিলে, পুস্তকের খোঁজ নাই' 'পদ্যটার আধাআধি লিখে আর লিখিলে না?'[৪৬]

শুধু বলেই ক্ষান্ত হতেন না — লেখার যাবতীয় সামগ্রী স্বামী মশাররফের হাতের কাছে এনে মজুদ করে দিতেন। এতে কুলসুম বিবির সাহিত্যপ্রীতির পরিচয়ও আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

৪. মূল্যায়ন

'বিবি কুলসুম' গ্রন্থটি মৃতা স্ত্রীর স্মৃতিচিত্র – পূর্ণাঙ্গ জীবনীরচনা নয়। স্ত্রীর প্রতি তাঁর প্রেম এবং তাঁর প্রতি স্ত্রীর যে ভালবাসা – এই দাম্পত্যানুভূতি থেকেই এ গ্রন্থের রচনা। বলা যায় মীর-মানসে স্ত্রীর প্রতি যে প্রেম উদ্গত হয়েছিল– এটি তারই ফসল। বিশুদ্ধ জীবনীগ্রন্থে জীবন-বর্ণনার যে বস্তুনিষ্ঠা ও নৈপুণ্য তার চেয়ে মীর ও কুলসুম সম্পর্কের আত্যন্তিকতা– প্রণয় কলহ– স্বামীকে বিভিন্ন দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা– স্বামীর কাজে সাহায্য করা– এই দিক থেকেই কুলসুমকে তিনি চিত্রিত করেছেন।

এমন গ্রন্থে যে কুলসুমকে পাই তিনি মীরের স্মৃতিতে যেভাবে ধরা দিয়েছেন সেই মানসময়ী নারী। তবে তার সবটাই কল্পনা নয়। বাস্তব নারীকে দৈনন্দিনতা থেকে মুক্ত করে ভাবের পরিমার্জনা দিলে যেমন হয়– অনেকটা তাই। এ গ্রন্থে পত্নীর প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে মীর নিজের চরিত্রের দুর্বল দিকগুলিকেও অকুণ্ঠভাবে বলে গেছেন। এটা একটা লক্ষণীয় দিক। এর দ্বারা তাঁর সত্যনিষ্ঠা যতোটা প্রকাশ পায় তার পাশাপাশি তেমনি লক্ষণীয় এই যে দাম্পত্য-প্রেমের সুখের বন্ধনে থেকেও মীরের মন অন্যাসক্তি থেকে মুক্ত ছিল না।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে মুনীর চৌধুরীর মন্তব্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন ঃ–

> এই বইয়ের অনেক গুণ। রচনা আন্তরিকতাপূর্ণ, তথ্যের উল্লেখ সত্যাশ্রয়ী। চরিত্রসৃষ্টির কৌশল লেখকের আয়ত্তাধীন ছিল বলে তিনি মৃত ব্যক্তিকে নবজন্ম দান করতে পেরেছিলেন। একটি বিশেষ কালের একজন কৃতী পুরুষের দাম্পত্য-জীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী রচনা করতে বসে মীর সাহেব একটা মৃত যুগকে চিরকালের জন্য জীবন্তরূপে তুলে ধরেছেন। এই বইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ প্রৌঢ়া পত্নীর বিয়োগ ব্যথায় কাতর এক প্রাচীন পতিহৃদয়ের দুর্বার শোকোচ্ছ্বাস।[৪৭]

মুনীর চৌধুরীর শেষ কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি একে পতি 'হৃদয়ের দুর্বার শোকোচ্ছ্বাস' বলে অভিহিত করেছেন। মহম্মদ আবদুল হাইও একে বলেছিলেন 'অপূর্ব শোকগাথা'।[৪৮] শোকোচ্ছ্বাসেও গাথা রচনা করবার কালে লেখক এতটাই আবেগাচ্ছন্ন থাকেন যে তা তখন চরিত্রের বাস্তবভিত্তিকে অতিক্রম করে যায়। সেদিক থেকে বলা যায় 'বিবি কুলসুম' শোকগাথা হিসেবে ভালো লেখা – তবে তা শোকাচ্ছন্ন মীরের চোখে মৃতা পত্নীর জীবন-চিত্র – সেই অর্থে অপূর্ব শোকগাথা।

কাব্য কবিতা

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা কাব্য-কবিতায় পুরাতন ধারার কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। তখনও 'শুধু ভারত-চন্দ্রীয় আদিরসের ফেনিল উচ্ছ্বাস, আর কবিওয়ালাদের উচ্চকিত উল্লাস'[১] বাংলা কাব্যজগতে বিরাজ করছিল। তিরিশের দশক থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত নূতন ও পুরাতন ধারার 'যুগসন্ধিক্ষণের কবি'[২] ঈশ্বরগুপ্ত বাস্তব জীবন ও দেশপ্রেমমূলক লঘুচাপল পদ্য লিখে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও আধুনিক মার্জিত রুচির পাঠককে তা আর তৃপ্ত করতে পারেনি। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যুর পর কাব্যক্ষেত্রে নূতনত্ব আনলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বস্তুতঃ "এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলা কাব্যে যথার্থ যুগান্তর শুরু হয়।"[৩] তখন থেকেই নূতন রীতিতে আধুনিক জীবন-ভাবনার স্ফূরণ ঘটল। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিদের মধ্যে কেউ লিখলেন ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য, কেউ লিখলেন পুরোদস্তুর মহাকাব্য। আবার অনেকে লিখলেন রোমাণ্টিক আখ্যানকাব্য। তবে ক্রমে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্যের ধারা অপ্রচলিত হয়ে গীতিকাব্যই সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করল।

বাংলাদেশে যথার্থ গীতিকবিতার শুরু হল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে—এই যুগটি ১৮৬২ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত।[৪] মধুসূদন থেকে এই যাত্রা শুরু হয় বটে কিন্তু কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ এলেন গীতিকবিতার অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে। সুতরাং উনিশ শতকের শেষদিকে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

এই অবস্থায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী মুসলমান কবিরা স্বল্প পরিমাণে হলেও যে কাব্য-চর্চা করেছিলেন তার পরিচয় 'দ্বিতীয় অধ্যায়ে' বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কায়কোবাদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, হামিদ আলী প্রভৃতি মহাকাব্য-রচয়িতাগণ উনিশ শতকের শেষে দুয়েকটি ছোট ছোট আখ্যানকাব্য লেখেন তবে তাঁদের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য কাব্যই বিশ শতকের প্রথম দিককার রচনা। এছাড়া এই সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন কবি মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলুল করিম, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমেদ, শেখ ওসমান আলী প্রভৃতি কবিগণ। এই সময়েই কাব্য-কবিতা রচয়িতা হিসেবে মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাব।

মীর মশাররফ হোসেন মূলতঃ গদ্যশিল্পী। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কাব্য-কবিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সংশ্রব ছিল। কিশোর বয়সের 'বয়েত বাহাসে'র অভিজ্ঞতা, পুঁথির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, হেঁয়ালি রচনা—এইসব স্মৃতি কবিতার প্রতি তাঁকে অনুরক্ত করে তোলে এবং তাঁর কাব্যচর্চার সহায়ক হয়। এমন কি তাঁর যুবা বয়সের 'গোলাপ' (সংবাদ প্রভাকর, ২৮ চৈত্র ১২৭২) কবিতাটিও এককালে লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন বলে 'সংবাদ প্রভাকরে'র ২য় সংস্করণ বের করতে হয়।[৫] শুধু তাই নয় এই কবিতা রচনার পাশাপাশি সঙ্গীত-রচনাও তিনি করেছিলেন—যার বেশির ভাগই বাউলাঙ্গের পদ। তবে জীবনের শেষদিকে রচিত এইসব কাব্য-কবিতার মধ্যে তাঁর অধিকাংশ রচনাই ছিল ধর্মাশ্রিত। ধর্মীয় তত্ত্বকথা, কাহিনী, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্ব এইসব কবিতা বা পদ্য-রচনার মূল উপজীব্য। এগুলির প্রায় সব রচনাই আখ্যায়িকা কাব্যের ঢঙে রচিত।

কখনও কখনও কবিতার আবেশ বা সম্মোহন তাঁর অনেক গদ্যরচনাকেও পদ্যরচনার নিকটবর্তী করেছে

(যেমন— 'বিষাদসিন্ধু'র গদ্য)। কিন্তু পদ্যের যে নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন, তা ভারতচন্দ্রের কালের। তবে ভারতচন্দ্রের চাতুর্য, শব্দ-ব্যবহারে দক্ষতা, কৌতূহল, বিশেষণ-উপমা-রূপকের প্রয়োগ মশাররফ হোসেনের পদ্যে নেই। যিনি গদ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে শব্দ-ব্যবহারে অত্যন্ত বেশি সচেতন ছিলেন পদ্যের ক্ষেত্রে তারই শব্দ-ব্যবহার তাৎপর্যহীন এবং বটতলার পুঁথির মতো গতানুগতিক।[৬] অবশ্য মুসলমান পাঠক সমাজের 'চৌদ্দ আনা লোকে'র রুচি এবং গ্রন্থ বিক্রি-নির্ভর জীবিকার তাগিদ — এই শ্রেণীর ধর্মাশ্রিত রচনার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে বিষয় বা ভাবের দিক থেকে তাঁর কাব্যকবিতাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ—

(ক) **পার্থিব বিষয়ক কাব্য-কবিতা ঃ** গোরাই ব্রিজ বা গৌরীসেতু (১৮৭৩), সঙ্গীতলহরী (১৮৮৭) এবং বাজীমাত (১৯০৮) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(খ) **ধর্মমূলক কাব্য-কবিতা ঃ** এই শ্রেণীর হল — মৌলুদ শরীফ (১৯০৩), বিবি খোদেজার বিবাহ (১৯০৫), হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভ (১৯০৫), হজরত বেলালের জীবনী (১৯০৫), হজরত আমীর হামজার ধর্ম্মজীবন লাভ (১৯০৫), মদিনার গৌরব (১৯০৬) এবং মোশ্লেমবীরত্ব (১৯০৭)।

(ক) পার্থিব বিষয়ক কাব্য-কবিতা

গোরাইব্রিজ অথবা গৌরীসেতু

'গোরাইব্রিজ অথবা গৌরীসেতু' মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ এবং প্রকাশকালের দিক থেকে এটি দ্বিতীয় রচনা।[৭] ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারী কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

মীর মশাররফের জন্মস্থান লাহিনীপাড়ার নিকটবর্তী গৌরীনদী তাঁর মনের উপর ছোটবেলা থেকেই গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর আত্মজীবনীতেও তিনি এর কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[৮] এই মাতৃসমা গৌরীনদীর উপর ইংরেজ শাসক কর্তৃক লৌহসেতু নির্মাণ এবং তার উপর দিয়ে গাড়ী চালনার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনাই এই ক্ষুদ্র কাব্যটির মূল বিষয়। সমসাময়িক বাস্তব ঘটনা যে মশাররফের বহু রচনার উৎস 'গৌরীসেতু' সে রকমই বস্তুধর্মী রচনার পরিচায়ক।

ভাব ও কলাকৌশলের দিক দিয়ে 'গৌরীসেতু' তেমন উল্লেখযোগ্য রচনা নয়। বিষয় অতি সাধারণ এবং প্রকরণগত দিকও দুর্বল ও আটপৌরে। পয়ার ছন্দের পুরাতন রীতিতে কাব্যটি রচিত এবং সর্বত্র অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি। এতে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাবও আছে।[৯] বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের অনুসরণ লক্ষ করা যায়। যেমন—ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' আছে

লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হইল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥

'গৌরীসেতু'তে পাওয়া যায় ঃ

ঢাকায় চলিয়া গেল ঢাকাই বাঙ্গাল।
শিলটে শিলটী যায় বাঁধিয়া জাঙ্গাল॥

আবার ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাবও যথেষ্ট। যেমন—'ইংরেজী নববর্ষ' কবিতায় বিলাতি রমনী প্রসঙ্গে গুপ্তকবি বলেছেন ঃ

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে॥

'গৌরীসেতু'তে শ্বেতাঙ্গিনীর বর্ণনায় দেখা যায় ঃ

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী" কটা কটা কেশ।
মুখে গন্ধ, সব মন্দ, সুধু ভাল বেশ।

অকিঞ্চিৎকর বিষয় অবলম্বনে রচিত পদ্যের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মশাররফ সচেতনও ছিলেন। এ কারণেই প্রকাশক-বন্ধু 'আজিজদ্দীন মহম্মদ পারনন্দ আলী'র অনুরোধে একদিনের মধ্যে অতি দ্রুততার সঙ্গে রচিত বইটির প্রকাশে লেখক কুণ্ঠিত ছিলেন। 'বিশেষ কোন সম্পাদক মহাশয়ের উপদেশে' বইটি প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ অনুমান করেছেন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপদেশেই এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১০]

তবে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা হওয়া সত্ত্বেও সে যুগের শিক্ষিত সমাজ একে উপেক্ষার চোখে দেখেননি। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (পৌষ-১২৮০) অক্ষয়চন্দ্র সরকার[১১] এর পদ্যরূপের এবং লেখকের ভাষা-নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন।[১২]

রচনা হিসেবে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এর ভাষা যেমন সমকালীন সমালোচকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে, তেমনি কতকক্ষেত্রে 'গৌরীসেতু'তে লেখকের পর্যবেক্ষণশক্তি ও বর্ণনা নৈপুণ্যও উল্লেখযোগ্য। যেমন ঃ

কোন বিবি সুরা ঢালি গেলাসেতে করি,
দিতেছে সাহেব মুখে আ মরি আ মরি।
বিড়ালাক্ষী সাদামুখী ধবল বসন।
বাতির আলোতে আরো উজ্জ্বল বরণ।
বুক উচ্চ কুচগিরি অর্দ্ধ আবরণ।
কে বলিবে আছে তার উপরে বসন ?
শান্তিপুরে ডুরে পরা আমাদের মেয়ে।
শতগুণে ভাল তারা বিবিদের চেয়ে।

মশাররফ হোসেন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার চেয়ে বাঙালী মেয়ের রূপকে শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে স্বদেশের

প্রতি মশাররফের নাড়ীর টান লক্ষণীয় যা উনিশ শতকীয় দেশাত্মবোধেরই লক্ষণ।

'গৌরীসেতু'র মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

> রচনা মধ্যম শ্রেণীর, বক্তব্যও সর্বজনীন নয়। তবে চাক্ষুষ বর্ণনাটি মন্দ হয়নি। বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে তাঁর মতামত বেশ আধুনিক ও কৌতূহলোদ্দীপক, কোথাও কোথাও ঝালমসলাদার মুখরোচক।[১৩]

মীর মশাররফের 'গৌরীসেতু' কাব্য হিসেবে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু কাব্য রচনা প্রচেষ্টা হিসেবে এটি মূল্যবান। মীর মশাররফ তাঁর সাহিত্য-শক্তির উন্মেষ পর্বে গদ্য এবং পদ্য রচনার মাধ্যমে নিজের শক্তি আবিষ্কার এবং তা বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। গদ্য এবং পদ্য—দুই মাধ্যমকেই অবলম্বন করে নিজে সাহিত্য-রচনা শক্তি পরীক্ষা করছেন। মনের দিক থেকে তখনও তিনি তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্য মাধ্যম খুঁজে পাননি। এইভাবে 'রত্নবতী', 'গোরাইব্রিজ' প্রভৃতি রচনাগুলি তাঁর সেই আত্মশক্তি নির্বাচনের ধাপমাত্র। দ্বিতীয়তঃ 'গৌরীসেতু' বা 'রত্নবতী'র মতো রচনাগুলির ক্ষেত্রে তৎকালীন বাঙালী জীবনের ভাবকেন্দ্রটিকে অনুধাবন করবার এবং আত্মীকরণ করবার কাজ করছেন। মনে রাখা দরকার মীর মশাররফ তৎকালীন নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে বহুদূরে প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করছেন এবং তাঁর সাহিত্য-চর্চা করে যাচ্ছেন। এই গ্রামাঞ্চলে কলকাতার নব্যসংস্কৃতির আঁচ বিশেষ পৌঁছায়নি, তবু যেটুকু পত্রপত্রিকা বা অন্য কোন মাধ্যমে তাঁর কাছে এসে পৌঁছচ্ছে তাঁকে অবলম্বন করেই তিনি তদানীন্তন বাঙালী জীবনের ভাবরসটুকুকে আত্মসাৎ করে সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। এই দিক থেকে দেখলে বলা যায়, এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থটি তার ফল। একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে তিনি ভাষা, ছন্দ এবং কাব্যের ভাবক্ষেত্র পর্যন্ত আত্মবিস্তার করতে চাইছেন। এই জন্য বলা যায়, কাব্য হিসেবে 'গোরাইব্রিজ বা গৌরীসেতু' মূল্যহীন হলেও ভাষা এবং সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

সঙ্গীত লহরী (১ম খণ্ড)

'সঙ্গীত লহরী' (১ম খণ্ড, ১৮৮৭/বাং ১২৯৪) মীর মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় পদ্যরচনা। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে এটি গানের সংকলন গ্রন্থ যাতে বিভিন্ন ভাবের মোট ৯১টি[১৪] গান সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থের শুরু থেকেই ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে একটির পর একটি গান ছাপা হয়েছে। গানগুলির কোন নামকরণ করা হয়নি। কোন্ সুর ও তালে গীত হবে অধিকাংশ গানের শীর্ষে তার উল্লেখ আছে। গীতিকবিতা হিসাবেও এগুলির আবেদন আছে। এই গ্রন্থে সংকলিত বেশ কিছু গান মশাররফের অন্যান্য গ্রন্থে, বিশেষতঃ নাটক ও প্রহসনেও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, তাঁর সঙ্গীত রচনার প্রাথমিক প্রয়োজন নাট্যরচনার জন্যই অনুভূত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি স্বতন্ত্রভাবে কিছু বাউল গান রচনা করেন। 'সঙ্গীতলহরী' ১ম খণ্ড হিসেবে প্রকাশিত হলেও এর দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য আর কোন গান রচিত হয়েছিল কিনা বা রচিত হয়ে থাকলে তা আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

মীর মশাররফের কাব্যচর্চার সূত্রপাত 'গৌরীসেতু' থেকে হলেও সেটি ছিল নিছক পদ্যরচনা, প্রকৃতপক্ষে 'সঙ্গীতলহরী' গ্রন্থেই কবির কবিতা বা গান রচনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। পারিপার্শ্বিকতা ও উত্তরাধিকার

সূত্রেই তাঁর মধ্যে সঙ্গীতানুরাগ জন্ম নেয়। মীর পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা ছিল। পিতার সঙ্গীতচর্চার স্মৃতি এবং তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা নবাব মীর মহম্মদ আলীর সান্নিধ্য মীরকে এ বিষয়ে অনুরাগী ও অভিজ্ঞ করে তোলে। তিনি সঙ্গীত রচনায় হাত দেন। এমনকি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি কুলসুমও সঙ্গীতের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং 'সঙ্গীতলহরী'র গান তার প্রিয় ছিল।[১৫] এ ছাড়া বিভিন্ন সুর ও তাল ইত্যাদির প্রয়োগ দেখে বোঝা যায় যে, সঙ্গীতের উপর মীরের যথেষ্ট দখলও ছিল। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর এই দুর্বলতা ও আগ্রহ সঙ্গীত-রচনার সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে সম্ভবতঃ কাঙাল হরিনাথের 'ফিকির চাঁদের দল'। এই দলের সংশ্রবে থেকেই তিনি বাউলগান রচনার প্রেরণা পান।

প্রেমই 'সঙ্গীত লহরী'র মুখ্য বিষয়। তবে কোন কোন গানে সমাজের চিত্র আছে—আবার অধ্যাত্ম-ভাবনাও আছে। এই সব দিক বিবেচনা করে 'সঙ্গীতলহরী'র গানগুলিকে বিষয়-বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিম্নলিখিত ভাবে বিন্যস্ত করা যায়[১৬] ঃ

ক. প্রেম-বিরহমূলক গীতিগুচ্ছ

খ. হাস্যরসাত্মক, রঙ্গব্যঙ্গমূলক গীতিগুচ্ছ

গ. স্বাদেশিকতায় প্রোজ্জ্বল জাতীয় উদ্দীপনামূলক সঙ্গীত

ঘ. রাজপ্রীতিজাত প্রশস্তি-গীতি

ঙ. মিশ্রভাবের গান

চ. অধ্যাত্মভাবসমৃদ্ধ বাউলগান

'সঙ্গীত লহরী'তে প্রেমবিরহমূলক গীতিগুচ্ছের সংখ্যাই বেশি। গ্রন্থের সূচনাই হয়েছে এই প্রেমবিরহমূলক গান দিয়ে এবং প্রায় ৬৪টি গানই এই জাতীয়। বিচ্ছেদজনিত হাহাকারে পূর্ণ এই ধরনের কিছু গানে মশাররফের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ঃ

ফুটিল বসন্ত ফুল, মোহন কাননে। (সই)
দহিছে বিরহীর প্রাণ, বিচ্ছেদ দহনে॥
পিকবঁধু শাখী পরে,
কুহরে পঞ্চম স্বরে,
শুনে প্রাণ হু হু করে,
বিয়োগী মরে জীবনে॥ (১নং গান)

মীরের এই গানের সঙ্গে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর নিম্নোদ্ধৃত কাব্যাংশের বর্ণনার মিল লক্ষণীয় ঃ

সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন;
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন। (বঙ্গসুন্দরী, ১ম সর্গ)

'সঙ্গীতলহরী'র কোন কোন গানে রঙ্গব্যঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩, ৫৩, ৬০, ৬২ ও ৬৪ সংখ্যক গান এই শ্রেণীভুক্ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে 'গাজীমিঁয়ার বস্তানী', 'বাজীমাত' – প্রভৃতি রচনাতে এই ব্যঙ্গরসের পরিচয় আছে। একটি গানে হাস্যরসের বেশ খোরাক আছে। নায়িকার প্রেমাস্পদ হাকিম হওয়ায় তার মধ্যে গর্ববোধ জেগেছে। এই নিরেট গর্বে স্ফীত হয়ে নায়িকা জানায় ঃ

আর আমি ভয় করি কারে, এখন আমার ক্ষমতা অপার।
কাজী সাহেব ভালবাসে, ভাবনা কিরে আছে আর॥

অবশ্য মশাররফের হাস্যরস সবসময় যে নির্মল ও সূক্ষ্ম তা নয়। কোন কোন গানে স্থূলতা ও রুচিবিকারের পরিচয়ও আছে।

যেমন—— বুকে বুকে মুখে মুখে,
কতজনে আছে সুখে,
(কেবল) কান্দি আমি মনোদুঃখে, এবারকার শীত একা গেল॥ (৫৩ নং)

জাতীয় উদ্দীপনামূলক সঙ্গীতসমূহে মীরের স্বদেশ-চিন্তার পরিচয় প্রতিফলিত। ১১, ৯১ প্রভৃতি সংখ্যক গানে এই সুর ধ্বনিত। কবি দেশবাসীর উদ্দেশে আহবান জানিয়ে বলেছেন ঃ

ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল।
ঘুমের ঘোরে থেকে তোমার সর্ব্বনাশ হইল॥ (৯১ নং)

এর মধ্যে দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা হয়তো আছে। তবে তার চেয়ে বেশি আছে তাঁর আন্তরিক কামনাকে বাস্তবে রূপায়িত দেখবার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের বাসনাই এতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

নাই ভেদাভেদ কোন প্রভেদ হিন্দু মুসলমান।
ক্রমে ক্রমে হইতেছে এক দেহ এক প্রাণ রে॥ (৯১ নং)

স্বাধীনতার স্পৃহাও বিবৃত হয়েছে একটি গানে ঃ

সুখী বলে কোন জন
অধীনতাপাশে বাঁধা যাদেরি চরণ॥ (১১নং)

প্রসঙ্গত স্মরণীয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত পঙক্তিগুলি ঃ

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?

রঙ্গলালের এই পঙক্তিগুলি মীর 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গেই উদ্ধৃত করেছেন।[১৭] এবং বিবি কুলসুমেরও খুব প্রিয় ছিল এই গান।

অবশ্য জাতীয় উদ্দীপনামূলক এই সঙ্গীতগুলির পাশাপাশি রাজপ্রশস্তির প্রবণতাও লক্ষ করার মতো। ১২, ১৫, ৫০ প্রভৃতি সংখ্যক গানে এই রাজভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—

কাতরে ডাকি মা তোরে, শুন মা ভারতেশ্বরী।
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে, মরি মরি॥ (১৫নং)

অথবা,

গাওরে ভারতীগণ, হয়ে একতান মন,
ভিক্টোরিয়া গুণগান মনপ্রাণ হ'তেরে॥ (৫০নং)

ঈশ্বরগুপ্তের 'নীলকর', 'দুর্ভিক্ষ' প্রভৃতি কবিতায়ও অনুরূপ ভাব ও সুর আছে। মীরের রাজপ্রশস্তিমূলক গানের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, সমগ্র রাজনৈতিক সমস্যা বা আন্তর্জাতিক সমস্যা নয়—আঞ্চলিক সমস্যাই তাঁকে বেশী পীড়িত, ভাবিত ও আলোড়িত করে তুলেছিল। এর মধ্যে জমিদার ও নীলকরদের অমানবিক অত্যাচারই প্রধান। সে কারণে এদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে মহারানীর অনুগ্রহ-লাভের প্রার্থনা জানিয়েছেন। অবশ্য তাঁরা যে একই শাসন-যন্ত্রের অংশমাত্র—এই উপলব্ধি হয়তো কবির ছিল না। তবু এর মধ্যে দিয়ে কবির সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে।

'সঙ্গীতলহরী'তে আরো বিভিন্ন বিষয় ও ভাবকে কেন্দ্র করে অনেক গান রচিত হয়েছে সেগুলিকে মিশ্রভাবের গান পর্যায়ভুক্ত করা যায়। ৩৩ সংখ্যক গানে 'তুইরে কাঞ্চন ভবে আদরের ধন' বলে অর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। এই অর্থের গুণকীর্তন মীরের 'আমার জীবনী', 'বিষাদসিন্ধু', 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' প্রভৃতি রচনাতেও বার বার করা হয়েছে। অন্যদিকে ৪০ সংখ্যক গানটি মশাররফের জ্ঞাতিভ্রাতা মীর মহম্মদ আলীর 'নবাব' উপাধি লাভ উপলক্ষে রচিত একটি প্রশস্তি-গীতি। আবার কিছু কিছু গানে (৩, ১৮, ২৫, ৩০ ও ৮৬ নং) তিনি নারীর নানা রূপ ও রহস্যের কথা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এ রকমই একটি গানে রমনীর মাহাত্ম্য এরূপ ঃ

রমনী রতনে বিধি সযতনে
নিরজনে গড়িয়াছে।
তাই যত ধনী, হয়ে অভিমানী
মানের গুমানে এত বাড়িয়াছে।
মুনিঋষি রত, যে শিব সাধনে,
তিনিও আশ্রিত, রমনী চরণে। (৩ নং)

আপাত সরলতার আড়ালে নারীর ছলনাময়ী রূপটিও তাঁর চোখে ধরা পড়েছে ঃ

অবলা সরলা বলে যে করেছে বর্ণন
তার মত বোকা আর নাহি দেখি ত্রিভূবন।
তবে যা আছে মুখেতে কিন্তু
অন্তরে গরল॥ (৩০ নং)

অন্যদিকে তিনি ৭, ৩১ ও ৪২ সংখ্যক গানে নারীর দৃষ্টিতে পুরুষ চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

পুরুষ ভ্রমরা জাতি, কেবা নাহি জানে,
কত ছলে অবলারে মজাইছে প্রাণে,
পাষাণে গঠিত দেহ, লোহার গড়া মন। (৩১ নং)

আবার ৪ সংখ্যক গানে নারী পুরুষের অসম-বিবাহের চিত্র ঃ

নবীনা যুবতী আমি
অন্তদন্ত হারা স্বামী
অন্ত জানেন অন্তর্যামী,
মধুপ্রেম বিষময়॥
মন যারে নাহি চায়,
বিধি মিলাইল তায় . . . .।

সেকালে প্রচলিত বাল্যবিবাহ ও তার ভয়াবহ সমস্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এছাড়া ১০ ও ৯০ সংখ্যক গানে তিনি ভণ্ড পীর ও লম্পট ধর্মধ্বজীদের প্রকৃত চিত্র উদঘাটিত করেছেনঃ

যেমন— কু-বাসনা যার মনে, তার উপাসনা কি ?
মনে এক, মুখে শুধু, হরি বলে ফল কি ?
. . . . . .
সতীর সতীত্বধন, হরিবারে করে পণ,
মুখে বিভু পদে মন, এদের অন্তকালে হবে কি ? (১০ নং)

অথবা, দুই এক গণ্ডা পয়সা পেলে,
এর ধর্ম্ম কর্ম্ম শিকেয় তুলে,
সকলি করিতে পারে,
কিছু আটকে না॥ (৯০ নং)

তবে মশাররফের বাউলাঙ্গের পদগুলিই এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। 'মশা' ভণিতা যুক্ত তেরোটি (৭৮ থেকে ৯০ সংখ্যক) বাউলাঙ্গের পদ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে সাধক শ্রেণীর বাউল সম্প্রদায় ছাড়াও 'শখের বাউল' গান রচয়িতাদের আবির্ভাব ঘটে। 'শখের বাউল' শ্রেণীর রচয়িতারাও ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি, জীবাত্মা-পরমাত্মার স্বরূপ, সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করেও গান রচনা করতেন। এঁদের গানে সমকালের সমাজচিত্রও ফুটে উঠত। এই শ্রেণীর সখের বাউল গান রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। মশাররফ বাউলগান রচনার প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করেন তাঁর সাহিত্য গুরু কাঙাল হরিনাথের কাছ থেকে, যিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'ফিকির চাঁদ ফকিরের দল' নামে একটি বাউল গানের দল গড়েছিলেন। এই দলের জন্য

মীরকে বাউল গান রচনায় হাত পাকাতে হয়েছে। তাছাড়া বাউল-সম্রাট লালন সাঁই-এর ছেঁউড়িয়া গ্রামের আখড়া ছিল মীরের জন্মগ্রাম লাহিনীপাড়ার কাছেই। তার প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। কেননা লালনের সঙ্গে মীরের পরিচয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮] সে যাই হোক, মীর প্রকৃত বাউলসাধক না হয়েও শখ করে বাউল গান রচনা করেছিলেন।

মীরের বাউল গানে উল্লেখযোগ্যভাবে কোন গুহ্যতত্ত্বের কথা প্রকাশ পায়নি। সেটা সম্ভব ছিল না—কেননা তিনি বাউল সাধক ছিলেন না। সে কারণে তাঁর গানে সাধনতত্ত্বের ক্রিয়াকর্মের ইঙ্গিত খুঁজতে যাওয়া বৃথা। তবে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর দর্শনগুলি গানের মধ্যে চমৎকারভাবে ফুটেছে। কখনো বিমর্ষতা, কখনো বিরহ-বিচ্ছেদ, কখনো এই অনিত্য সংসার বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আবার কখনো ষড়রিপুর প্ররোচনায় বিপথে যাওয়ার প্রবণতা যা শেষ পর্যন্ত মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়, কোন কিছুই দিতে পারে না — এই সব বিষয়ই তাঁর গানে প্রধান হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই বাউল গানগুলির মধ্যেই তাঁর সৃজনক্ষমতা অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

জীবন-সায়াহ্নে পারাপারের ব্যাকুলতাই মীরের বাউল গানগুলির মূল সুর। এই অনিত্য সংসার থেকে কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন কিছুই সঙ্গে যাবার নয়। তাই মানুষের যাবতীয় হাসি-কান্না, টাকাকড়ি, অহঙ্কার সবই মিথ্যা হয়ে যায়। কেননা মৃত্যু এসে তাকে এসবের বন্ধন থেকে অচিরে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তখন আর কোন কিছুরই মূল্য থাকে না।

কেবা কার তুমি বা কার, কেবা তোমার,
চিনলে না মন মনের ফেরে॥ (৮০ নং)

এই গানটির সঙ্গে লালনের নিম্নোদ্ধৃত গানের যথেষ্ট মিল লক্ষ করা যায় ঃ

তুমি কার বা কে তোমার এই সংসারে
মিছে মায়ায় মজে কেন এমন কর রে।

এই অনিত্যতার সংসার থেকে খালি হাতে চলে যাবার জন্য 'মশা' বাউল ভয় পেয়ে বলছেন ঃ

ঐ ছয় চোরের ফেরে এবার পড়ে
ঘরে কিছু রহিল না।
এখন খালি হাতে ঘরে যেতে,
ভয়ের মশার পা উঠে না। (৭৯ নং)

এই গানটির সঙ্গে লালনের একটি গানের মিল লক্ষ করার মতো ঃ

মন-তরী তার ছ'জন মাল্লায়
সদাই তারা কুকাণ্ড বাধায়
ডুবালো ঘাটায়
আজ আমাদের॥

অধ্যাত্ম্য-চিন্তার গভীরতায় ও সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিমায় একটি গান বেশ চিত্তাকর্ষক ও উঁচু মানের। এখানে নশ্বর জগৎ-সংসারের অন্তিম পরিণতি নির্দেশ করে বলা হয়েছে ঃ

রবে না দিন চিরদিন,
সুদিন কুদিন একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
আমার আমার সব ফক্কিকার,
কেবল তোমার নামটি রবে।
হবে সব লীলা সাঙ্গ
সোনার অঙ্গ ধূলায় গড়াগড়ি যাবে॥

. . . . . .

তোমার আত্মস্বজন, ভাই পরিজন,
হায় হায় করে কাঁদবে সবে।
তারা পেয়ে ব্যথা ভাঙ্গবে মাথা,
তুমি কথা না কহিবে॥ (৮১ নং)

রাজা রামমোহন রায়ও তাঁর ব্রহ্ম-সঙ্গীতে অনুরূপ অধ্যাত্ম্য-ভাবনার কথাই বলেছিলেন ঃ

মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর,
অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

এই ভাবমগ্ন লেখককে বাউলদের মতোই জাত-বিচারের তুচ্ছতা স্পর্শ করতে পারেনি। তিনিও জাত-ধর্ম সম্পর্কে উদার মতেরই পরিচয় দিয়েছেন ঃ

মিছে ভাই জাতির বিচার, আচার ব্যাভার
মিছেরে এই দুনিয়াদারী।

. . . . . .

অরে নাই ভেদাভেদ বর্ণ বিভেদ,
কিছু প্রভেদ, কাছে তাঁরি।
মশা কয়, ধোকায় পড়ি বোকা হয়ে,
করি আমরা মারামারি॥

এই গানের মর্মবাণী লালনের গানকেও মনে পড়িয়ে দেয় ঃ

জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি।

মীর সংসারের অনিত্যতা, তার শূন্য পরিণাম, মনের বিমর্ষতা ও মানব জাতির জাত-বিচারের অসারতার কথা যেমন

বলেছেন তেমনি ঈশ্বরের রহস্যময়তার কথাও তুলে ধরেছেন। সর্বব্যাপী পরমসত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি সর্বত্রই অনুভব করেছেন ঃ

ভাব মন তাঁরই চরণ কর স্মরণ
যার নামেতে আগুণ জ্বলে।
যিনি এই আকাশ পাতাল, হস্তী দাঁতাল,
কুড়ের চাল আর ঝাড় জঙ্গলে।
তিনি আবার সিংহ ইঁদুর বিড়াল কুকুর,
দেবতা-ঠাকুর, মানুষের দেলে॥

এই গানের মধ্যে কুষ্টিয়া অঞ্চল সহ বেশ কয়েকটি স্থান-নাম ও কতিপয় গুণিলোকের জন্মস্থান ও কর্ম-স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ঃ

যিনি তোর লাহিনীপাড়ায়, ছেঁউড়ে কয়ায়,
চাপড়া সাঁওতায় চরবড়ুলে।

৮৮ সংখ্যক এই দীর্ঘ গানটিতে কাঙাল হরিনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।[১৯] মশাররফ এখানে শেষের ভণিতায় হরিনাথকে (ফিকিরচাঁদ) গুরু বলেও বর্ণনা করেছেন ঃ

ফিকির চাঁদ ফকীর হয়ে, যাচ্ছে কয়ে,
তাইতে মশা গুণগুণালে॥

সে যাই হোক, নানা জনের প্রভাব বা অনুকরণ সত্ত্বেও 'সঙ্গীতলহরী'তে মীরের কবিত্বশক্তির পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। এই গ্রন্থের বেশ কিছু গানে তাঁর আত্মনিষ্ঠ ভাবানুভূতির প্রগাঢ় আবেগও রূপায়িত হতে দেখা যায়। এদিক থেকে তাঁর অনেকগুলি গান আধুনিক গীতিকবিতার কাছাকাছি।

'সঙ্গীতলহরী'র সাহিত্যমূল্য যাই থাক, এর ভাষাভঙ্গি ও ভাববস্তুর জন্যে এটি সমকালের সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮৮৭ সালের বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগের সালতামামি প্রতিবেদনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এর প্রশংসা করে লেখেন ঃ

> Whatever Mir Mosharraf writes deserves attention .... the collection of his short poetical pieces may be ranked in point of style and language with those of the best Bengali poets of the day[২০]

অবশ্য এই প্রশংসার পাশাপাশি নিন্দাসূচক সমালোচনাও জোটে। মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'সুধাকর' পত্রিকায় (৯ চৈত্র ১২৯৬) 'মীর সাহেবের ধর্ম্মবিশ্বাস' শীর্ষক এক প্রবন্ধে 'সঙ্গীত লহরী'র ৮৫ সংখ্যক গানের প্রসঙ্গে মীরের উদার ধর্মমতের তীব্র ব্যঙ্গ করা হয়।[২১] শুধু তাই নয়, বাউলাঙ্গের পদে ব্যবহৃত 'মশা' ভণিতা সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ করে মন্তব্য করা হয় ঃ

পাঠক ! এ মানুষ বা গবাদি দংশনকারী ছোটখাট মশা নয়, ইনি ইসলাম ধর্ম্মে আঘাতকারী দ্বিহস্ত দ্বিপদ বিশিষ্ট মনুষ্যরূপ বৃহৎ মশা ওরফে মীর মশাররফ হোসেন।[২২]

মীর মশাররফের শেষ জীবনের অধিকাংশ কাব্য-কবিতাই ধর্মমূলক এবং গতানুগতিক পদ্যরচনা। পার্থিব বিষয়ক হলেও 'গৌরীসেতু'ও অকিঞ্চিৎকর রচনা। সেদিক থেকে 'সঙ্গীত লহরী' নিঃসন্দেহে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। আত্মভাব-ভাবনার বাণীরূপ দানে সামান্য হলেও এর মূল্য অনস্বীকার্য।

বাজীমাত

'বাজীমাত' মীর মশাররফ হোসেনের সমাজ-সমালোচনা মূলক পদ্যরচনা। এর প্রকাশকাল ১৫ কার্ত্তিক ১৩১৫ (ডিসেম্বর ১৯০৮)। বর্তমানে গ্রন্থটি দুস্প্রাপ্য। তবে 'বাজীমাত' সম্পর্কে মোহাম্মদ ইদরিস আলী 'বাংলা একাডেমী' পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র–চৈত্র ১৩৬৫) এর পরিচিতমূলক যে প্রবন্ধ রচনা করেন সেটিই কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত মশাররফ রচনা সম্ভার-এ গৃহীত হয়েছে।[২৩] ঐ প্রবন্ধের আলোচনা এবং উদ্ধৃত রচনাংশই আমাদের আলোচনার ভিত্তি।

'বাজীমাত' রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক সমাজচিত্র। একে গদ্যে রচিত নক্‌শা 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'র ধারাটির পদ্যরূপ বলা যায়। 'বস্তানী'র মতো এখানেও এক স্বেচ্ছাচারিণী জমিদার-নন্দিনী তথা জমিদার-পত্নী এবং তার কপট উমেদারের অনুগ্রহ ও নিগ্রহের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাস আছে ঃ

জীবন্ত বলের খেলা হয় দিনরাত।
ভরা কোটে হইতেছে কত কিস্তিমাত॥
বেচাল চালিয়া কেহ হয় কুপকাত।
তাহাদেরই এই ছবি নাম বাজীমাত॥
যদি খেলা জান ভাই খেল এক হাত।
ছুটিবে মনের ধাঁধা ঘুচিবে উৎপাত॥[২৪]

মোহাম্মদ ইদরিস আলী গ্রন্থটি প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

পুথির নামের সার্থকতা রেখে লেখক স্বীয় বক্তব্যকে 'দাবার চালে'র রূপে চৌদ্দ চালে ভাগ করেছেন; বিভিন্ন এই চালের পর 'বাজীমাত' করে তবে তার উপসংহার হয়েছে। অসংযত স্বভাব জমীদার-পত্নী, স্বার্থসাধনায় তৎপর আমলা পেয়াদা পাইক, ভাগ্যান্বেষী খল খায়ের খাহ ও উমেদার প্রভৃতি কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, হাতি, ঘোড়া, বড়ে রূপে ছকের উপর 'চালের তালে' দৌড়াদৌড়ি করছে।[২৫]

আবার 'বাজীমাত'কে আখ্যায়িকাধর্মী পদ্যরচনাও বলা যায়। কাব্যের মধ্যে সমাজ-জীবনের ঘটনা ও চিত্র একটি কাহিনীর আকারে পরিবেশিত হয়েছে। 'নিবেদন' অংশে লেখক লঙ্কার রাজা রাবণ ও মহারাণী মন্দোদরীর দাবা খেলার পৌরাণিক প্রসঙ্গ টেনে মূল কাহিনী বিবৃত করেছেন। 'রাণীর চালে রাজা মাতিয়া আপনাকে ভুলে

গেলেন' — এই কথা নিবেদন করে লেখক যে তাঁর গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়েরই শুধু আভাস দিলেন তাই নয়, সমাজ পরিচয়ও সেই সঙ্গে তুলে ধরেন। আমাদের সমাজে এই রকম 'রাণী'র দল আছেন যাঁরা 'বিবেচনাহীন আনন্দের' তাড়নায় খেলা জুড়ে দেন, আর তারই চালে নিজেকে ভুলে গিয়ে অনেকে মাত হয়ে পড়েন।

নন্দনগ্রামে সেরাজদ্দীর সঙ্গে স্বৈরিনী জমিদার-পত্নীর অসামাজিক সম্পর্ক যখন বেশ জমে উঠেছে, ঠিক তখনই কর্মচারীদের চক্রান্তে সেরাজদ্দী বিপদগ্রস্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঐ মহিলাটিকে ভুলতে না পেরে সেরাজদ্দী আত্মহত্যা করে—এই হল 'বাজীমাতে'র মূল আখ্যানাংশ।

রীতি প্রকরণে ও ভাব-ভাবনায় 'বাজীমাত' নিতান্ত গতানুগতিক রচনা। এর তৃতীয় ও চতুর্থ চাল ত্রিপদীতে এবং বাকী অংশ সম্পূর্ণই দ্বিপদী পয়ার ছন্দে রচিত। কাব্যসৌন্দর্য স্বল্পই প্রকাশিত। এই গ্রন্থ-রচনায় মশাররফের অমনোযোগিতার সাক্ষরও পাওয়া যায়। প্রথম দিকে যে চরিত্রের নাম সেরাজদ্দী, শেষের দিকে সে মনিরদ্দী নামে পরিচিত।[২৬]

এতে স্থূলরুচি ও অশ্লীলতারও পরিচয় আছে যা কখনো কখনো 'বস্তানী'কেও ছাড়িয়ে গেছে। হিন্দুবেশী মনিরদ্দীর সত্য পরিচয় উদ্ঘাটনের কৌশলে এই স্থূলতার প্রমাণ মেলে ঃ

চক্ষে পড়ে শরীরের কোন একস্থান
দেখে কহে নহে এ হিন্দুর সন্তান।[২৭]

অবশ্য এই ধরণের স্থূল রঙ্গরসিকতা সমকালের সাহিত্যেও দুর্লভ নয়। সেকালে ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ লেখকদের ব্যঙ্গ-রচনায় একই ধরণের স্থূল হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। মশাররফের এই রস-রচনায় যে স্থূলতা ধরা পড়েছে তা কল্পনাশ্রিত ছিল না, তা বাস্তব-সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত ছিল বলেই তিনি নৈতিক অধঃপতনের জীবনচিত্রকে এতটা নগ্নভাবে আঁকতে পেরেছেন।

যে সমাজ-চেতনা ও সমাজ-সংশোধনের প্রয়াস থেকে উনিশ শতকে আধুনিক রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক নক্শা জাতীয় রচনার সূত্রপাত হয় 'বাজীমাত' সেই ধরণের রচনা। তবে এই রচনার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল এই যে, মীর মশাররফ সেই সমাজচিত্রকে পদ্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। সুতরাং নক্শাশ্রেণীর রচনাসাহিত্যে 'বাজীমাত' অন্যতম সংযোজন।

(খ) ধর্মমূলক কাব্যকবিতা

মৌলুদ শরীফ

জীবনের শেষদিকে মীর মশাররফ হোসেন বাস্তব জীবন থেকে ক্রমে ধর্মানুরক্তির দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী সাহিত্য-জীবনেও অনুরূপ ধর্মানুরাগের পরিচয় আছে। তাই মশাররফের পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলি তথা অধিকাংশ কাব্য-কবিতাই ধর্মবিষয়ক রচনা। অবশ্য মুসলমানী পুঁথি-সাহিত্যের পাঠকদের

মনোরঞ্জনের জন্য[২৮] এবং কিছুটা ব্যবসায়িক বুদ্ধি[২৯] এই শ্রেণীর গ্রন্থ-রচনায় তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। এছাড়া তাৎকালিক সমাজ পরিবেশে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের নানা চিত্র দেখে তিনি মনে মনে হতাশ হয়ে পড়েন। এক ধরণের নিঃসঙ্গতাবোধ তাঁর মধ্যে কাজ করে। রূঢ় ও নগ্ন বাস্তবতার আঘাতে তিনি ক্রমে ক্লান্ত। তাই বয়ঃভারাক্রান্ত ও মানসিক অবলম্বনহীন লেখক শান্তিলাভের আশায় ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আশ্রয় ও সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। 'মৌলুদ শরীফ' যদিও তাঁর ঐশ্বর্য পর্বের রচনা, তবু এর মধ্য দিয়েই তিনি ধীরে ধীরে এই ধর্মের জগতে প্রবেশ করেন।

'মৌলুদ শরীফ' গদ্যে-পদ্যে রচিত হজরত মোহাম্মদের (সঃ) জীবন ও মাহাত্ম্য-বিষয়ক গ্রন্থ। প্রকাশকাল ২রা নভেম্বর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।[৩০] সমকালে গ্রন্থটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি সংস্করণেই লেখক নূতন নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করে গ্রন্থটির পরিবর্ধন করেছিলেন।[৩১] কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত 'মশাররফ রচনা সম্ভার'-এর তৃতীয় খণ্ডে গৃহীত হয়েছে এর চতুর্থ সংস্করণ।

'মৌলুদ শরীফে'র ভূমিকায় লেখক বলেছেন ঃ—

> এই মহাপুরুষের (হজরত মোহাম্মদ) জন্মবৃত্তান্ত প্রত্যেক মুসলমানের জ্ঞাত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সময় ও অবসরমত পবিত্র মিলাদ শরীফের আলোচনা করা সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।[৩২]

অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা ও গুণ-কীর্তনই এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। হজরত মোহাম্মদের (সঃ) উদ্দেশে যে দরুদ পাঠ করা হয় তা মূলতঃ আরবীতে লেখা। ভক্তিপ্রবণ সাধারণ বাঙালী মুসলমানের পক্ষে তার অর্থ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয় বলে তিনি বাংলা ভাষায় অনুরূপ দরুদ রচনা করে পাঠকদের উপহার দিতে চেয়েছেন। 'হামদ' অংশে তাই আরো জানিয়েছেন ঃ

করিয়াছি আকিঞ্চন, তাঁর জন্ম বিবরণ,
মনের আনন্দে শুনাইব।
সে পবিত্র মধুগীত মধুময় সুললিত
বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিব॥ (হামদ)

মুসলমানী বাংলায় বা 'পুঁথিসাহিত্যে' ইতিপূর্বে মৌলুদ শরীফ রচিত হয়নি তা নয়, কিন্তু সাধু বাংলায় মীরের এ গ্রন্থই সম্ভবত প্রথম।[৩৩]

'মৌলুদ শরীফে'র প্রথম অংশে রয়েছে 'হামদ' (খোদাতায়ালার গুণকীর্তন) এবং 'নাত' (রসুল-প্রশস্তি)। তারপর মূল মৌলুদ আরম্ভ হয়েছে। এই অংশে ক্রমান্বয়ে রসুল হজরত মোহাম্মদের (সঃ) জন্মকথা, 'পবিত্র মেয়ারাজ শরিফ'-এর কাহিনী, 'হজরতের ওফাত ও আক্কাসের বিবরণ' এবং পরিশেষে 'হজরত বেলালের আশ্চর্য প্রভুভক্তি (রসুলপ্রীতি) ও জীবনের শেষ' বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থটি মূলতঃ পদ্যে রচিত হলেও টীকা বা বিষয়ের ধারাভাষ্য বর্ণনায় গদ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন পুঁথিকারের ঢঙে প্রচলিত পয়ার ত্রিপদীতে এটি রচিত। বিষয় ও উপস্থাপনা দেখে মনে হয়, দেশীয় 'মিলাদ মহফিল' ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ মশাররফের ছিল। ভাব ও ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং সরল।

'হামদ' অংশে মীর মশাররফ ৭৬ টি শ্লোকে খোদাতায়ালার গুণকীর্তন করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বন্দনার সঙ্গে বাংলাদেশের বৈষ্ণবীয় ভাবনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। যেমন—

সর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞানময়, চিরকাল চিন্‌ময়
সত্ চিৎ আনন্দ অপার॥ (হামদ্)।

গতানুগতিক রচনা হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু পঙক্তি উল্লেখ করার মতো। যেমন—

ললাটে লিখেছ যাহা খণ্ডিবে না আর তাহা
তবু কাঁদি মনের আবেগে। (হাম্‌দ)।

পরবর্তী 'নাত' অংশে ৩২টি স্তবকে তিনি রসুলের নামমাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। রসুল হজরত মোহাম্মদের (সঃ) নাম ও গুণবর্ণনা করে তিনি লিখেছেন ঃ

তুমি হে এসলাম রবি; হবিবুল্লাহ শেষ নবী,
নত শিরে তোমায় সেবি; — মোহাম্মদ এয়া রসুলোল্লাহ॥
.....
দিও অন্তে পদাশ্রয়, ওহে নবী দয়াময়,
করযোড়ে কবি কয়; — মোহাম্মদ এয়া রসুলোল্লাহ। (নাত)

মীরের এই রসুল-প্রশস্তি বৈষ্ণবীয় নাম-কীর্তনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

এরপরেই মূল মৌলুদ আরম্ভ হয়েছে। হজরত মোহাম্মদের (সঃ) জন্মদিন পালন উপলক্ষে দরুদ পাঠ করবার রেওয়াজ মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশে রয়েছে। রসুলের সেই জন্মোৎসবে পঠিত বিষয়ই 'মৌলুদ শরীফ'। পয়ার ছন্দে বন্দনার প্রারম্ভিক অংশ এরূপ ঃ

জন্মিবার পূর্বে নাম হইয়াছে যাঁর।
এমন মর্য্যাদা বল হয়েছে কাহার ?

গ্রন্থের 'মেরাজ' অংশে ঈশ্বর এবং পয়গম্বরের পারস্পরিক প্রেম-অনুরাগ ফুটে উঠেছে। ভক্ত যেমন আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আল্লাহ তথা স্রষ্টাও তেমনি ভক্তের প্রতি প্রেমময়। আল্লাহ তাঁকে প্রেমের আকর্ষণে কাছে নিতে চান। তিনি ফেরেস্তা জিবরাইলকে নির্দেশ দিচ্ছেন হজরত (সঃ)কে সসম্মানে স্বর্গে নিয়ে আসবার জন্যে ঃ

যাও প্রিয় জিব্রাইল,
হবিব নিকটে যাও,।
নত শিরে স্থির ধীরে,
মোর হবিবে জাগাও।
সম্মানেতে জাগাইয়া
করিবেক নিবেদন,
প্রেম অনুরাগে তারে
করিব রে দরশন।

এইরূপ ভক্তকে প্রেম-অনুরাগে দর্শন দানের বিষয়টি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও আছে। অবশ্য ইসলাম ধর্মের সূফীদর্শনে ভক্ত ও ভগবানের (আশেক-মাশুক) প্রেম–অনুরাগের বিষয় আছে। মশাররফ হয়তো উভয় মতাদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

এই গ্রন্থের ঘটনা বর্ণনায় বা স্বর্গ নরকের বিশদ বিবরণে তিনি পুঁথিসাহিত্যকেই অনুসরণ করেছেন। পুঁথিকারদের মতোই তিনিও অবাধ কল্পনার ডানা মেলে বলেছেন ঃ

দেখি কবিত্বের ফল
দেখি কল্পনার বল,
দেখি শক্তি, কত শক্তি ধরে।

বাধাবন্ধহীন কল্পনাশক্তির দ্বারা স্বর্গ-নরকের বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনা কখনো কখনো রুচিশীলতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। যেমন– স্বর্গবাসী লোকের সুখ-সম্ভোগের একটি বিবরণ এরূপ ঃ –

অপূর্ব যুবতী নারী—
দাঁড়াইবে সারি সারি
মণিময় রত্ন আভরণে।

. . . . . .

মনের বাসনা যাহা
পূর্ণ হবে আগে তাহা
নিরাশার নাম মাত্র নাই।

অবশ্য আধুনিক পাঠক-মনের কাছে তা অশালীন বলে মনে হলেও সমকালের পুঁথির রুচি-শাসিত মুসলমান পাঠকের কাছে বেমানান ছিল না। কেননা স্থান ও কালভেদে রুচিরও পরিবর্তন স্বাভাবিক।

এই গ্রন্থে দু-এক জায়গায় বাংলা হরফে আরবী বা উর্দু দরুদও পাওয়া যায়। যেমন—আরবী দরুদ ঃ

হাবিবে রব্বেল আলামিন,
মসহুরণ ফেল আউয়ালিন–
মজকুরণ ফেল আলামিন,
সৈয়দে মোরসালিন,
খাতেমান্নাবিইন—
রসুলে রব্বেল আলামিন।[৩৪]

আবার উর্দু ভাষায় দরুদ ঃ

কোরবান হো প্যারে
মোহাম্মদ কে নাম পার,
সাদকে হো আলো পাকে,
রসুলে আঁনাম পার।[৩৫]

এইরূপ আরবী দরুদ সম্ভবত কোরাণ শরীফের অনুষঙ্গকে বজায় রাখবার জন্যেই লেখক ব্যবহার করেছেন আর উর্দু দরুদকে মাঝে মধ্যে এনে উর্দু-পন্থী বাঙালী মুসলমান পাঠকদের মনকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন। কেননা সেকালে এরূপ ব্যবহারের রেওয়াজ পুঁথিসাহিত্যে ছিল। তবে তাঁর সমগ্র গ্রন্থটি সাধু ভাষায় রচিত।

এই গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল বাংলা ভাষায় গজল রচনা। এর অনেকগুলি ছোট ছোট আকারের কবিতা বাংলা গজলের রূপ নিয়েছে। মশাররফের আগে বংলা ভাষায় আর কেউ গজল রচনা করেছিলেন কিনা জানা যায় না।[৩৬] দরুদ ও গজল হিসেবে এর কবিতাগুলির একটা আলাদা আবেদন তৈরী হয়েছিল বলে একসময় স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিভিন্ন সভাসমিতিতে বা পল্লী-বাংলার সাধারণের মুখে এটি গীত হত।[৩৭] এমনকি পরবর্তীকালের বাংলা গজল রচয়িতা, ইসলামধর্ম প্রচারক ও কবিসাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণাও যুগিয়েছিল।[৩৮] 'বিষাদসিন্ধু'র পরে এই 'মৌলুদ শরীফ'ই বহুল সংস্করণ ও ব্যাপক জনপ্রিয়তার গৌরব অর্জন করেছিল।

তবে এই জনসমাদরের পাশাপাশি সমকালে এর বিরূপ সমালোচনাও হয়েছিল। 'নবনূর' (শ্রাবণ ১৩১১) পত্রিকা 'মৌলুদ শরীফ'কে ''সাধারণ সাহিত্য রাজ্যের সীমার বহির্ভূত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত'' বলে চিহ্নিত করে এর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেনি। পত্রিকাটি প্রধানতঃ এর ভাষা ও ব্যাকরণ-দোষে দুষ্টতার অভিযোগ করেছে। এ ছাড়া শেষে সমালোচক অভিযোগ করে লিখেছেন ঃ

> পরিশেষে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, হজরত মহম্মদ (সঃ) 'প্রভু' ও 'মহাপ্রভু' শব্দে বিশেষিত হইলে তাঁহার পবিত্র নামের মর্যাদা কিছু বাড়ে কি? যীশুখৃষ্ট এবং জগদীশ্বরও প্রভু, মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যও মহাপ্রভু। আমরা জানি না, তাই কথাটি জিজ্ঞাসা করিলাম।[৩৯]

তবে সমালোচক মনে করেন, ''ধর্ম্মজ্ঞান লাভে কতকটা সহায়তা হইবে বলিয়া এই গ্রন্থের সুপ্রচার বাঞ্ছনীয়।''[৪০]

অবশ্য এ গ্রন্থের কতক বিষয় পাঠকদের ধর্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করলেও এর মধ্যে ধর্মের নামে এমন অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে যা প্রচলিত গালগল্প এবং তাতে, একালের সমালোচকের মতে, ধর্মের যথার্থ মহিমা পরিস্ফুট হয় নি।[৪১] বরং এতে ধর্মের চাইতে ধর্মাচারের কথাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

যাই হোক, এক সময় যেমন রামায়ণ মহাভারতকে বাংলায় অনুবাদ করে কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস বাঙালী পাঠকের কাছে এর রসবস্তু আস্বাদ্য করে তুলেছিলেন, অনেকটা ঠিক সেই রকমভাবে আরবী গ্রন্থে ও মিশ্রভাষারীতির পুঁথিসাহিত্যে আবদ্ধ বিষয়কে আধুনিক পাঠকের কাছে নতুন রীতিতে মীর মশাররফ তুলে ধরেন। এ কারণেই হয়তো প্রধানতঃ মুসলমান পাঠকের কাছে এর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। এদিক থেকে 'মৌলুদ শরীফে'র গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বিবি খোদেজার বিবাহ

ধর্মমূলক পরবর্তী কাব্য 'বিবি খোদেজার বিবাহ' (১৩১২/১৯০৫ খ্রীঃ)। মীর মশাররফ হোসেন এই কাব্যের 'বিজ্ঞাপন'[৪২] শীর্ষক ভূমিকায় বাঙালী মুসলমান পাঠকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করে জানিয়েছেন প্রথম দুটি শ্রেণীর অর্থাৎ মুসলমান সমাজের চৌদ্দ আনা পাঠক পদ্যাশ্রিত 'মুসলমানি বাঙ্গালা' বা বটতলার পুঁথির ভক্ত। অন্যরীতির কাব্য বা গদ্যগ্রন্থ তাঁদের অপছন্দ। তাঁদের ধারণা ছিল—'পদ্যে লিখিত না হইলে সে পুস্তক পুস্তকই নহে'। পক্ষান্তরে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকদের রুচি তুলনায় মার্জিত, পরিশীলিত; কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় নগন্য। তাই মশাররফ এখানে সচেতনভাবে সমাজের অধিকাংশ পাঠকের মনোরঞ্জনের কথা ভেবেই এই কাব্য রচনায় হাত দেন।

কাব্যের বিষয় সম্পর্কে মশাররফ 'নিবেদন' অংশে বলেছেন ঃ—

> মুসলমান জগতে 'বিবি খোদেজার' পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ বিবি খোদেজা সমগ্র মুসলমানের জননী আখ্যায় ভূষিতা হইয়াছেন। বিবি খোদেজাই হাজরত (হজরত) মহাম্মদ মস্তফার মাননীয়া প্রিয় সহধর্ম্মিনী। ইঁহারই কন্যারত্ন বিবি ফাতেমা জগৎ পুজ্য হাজরত এমাম হাসান ও এমাম হোসেনের জননী। সেই মহা মাননীয়া বিবি খোদেজা দেবীর বিবাহ ঘটনা লইয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইয়াছে।[৪৩]

মীর মশাররফ এই কাব্যে প্রধানত বিবি খোদেজার প্রেমময় রূপটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন। এতে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এবং বিবি খোদেজার দাম্পত্য সম্পর্কের পবিত্রতা, প্রণয় মাধুর্য এবং স্বামীর প্রতি বিবি খোদেজার শ্রদ্ধাভক্তি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মোহাম্মদের (সঃ) সহিষ্ণুতা, সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, আত্মত্যাগ, সৎকার্যের প্রতি প্রবণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি দিকগুলিও প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হয়েছে। সমগ্র বিষয়টি একটি কাহিনীর আকারে পরিবেশিত হয়েছে। সেদিক থেকে এটি আখ্যায়িকা কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। মোট সাতটি স্তবকে কাব্যটি বিভক্ত এবং পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

কাব্যের প্রথম স্তবকে বিবি খোদেজার স্বপ্নদর্শন এবং জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক সেই স্বপ্নের রহস্য ব্যাখ্যার কথা। সন্ন্যাসী বিবি খোদেজাকে জানান, তিনি ভাগ্যবতী; ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে জগৎ-পুজ্য কোরেশ বংশের সন্তান এবং ভাবীকালের রসুল হজরত মোহাম্মদের (সঃ) সঙ্গে তাঁর পরিণয় হবে। স্বপ্নের এই ব্যাখ্যায় তিনি পুলকিত হন এবং সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন।

দ্বিতীয় স্তবকে, হজরতের বিবাহ বিষয়ে তাঁর পিতৃব্য আবু তালেব ও পিতৃষ্বসা আত্কা বিবির মধ্যে আলোচনার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা আর্থিক অনটনের কথা ভেবে বিবাহ প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে কর্ম সন্ধানের কথা স্থির করেন।

তৃতীয় স্তবকে, বিবি খোদেজার বিপুল ব্যবসা বাণিজ্যের বিবরণ। তাঁর এই ব্যবসার কাজ দেখাশুনার জন্যে জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারীর প্রয়োজন। মোহাম্মদের কথা তাঁকে জানানো হয়। মোহাম্মদের সদগুণাবলী ও বিশ্বস্ততার কথা

শুনে খোদেজা তাঁকে দর্শন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

চতুর্থ স্তবকে, আপন গৃহে মোহাম্মদকে দেখে খোদেজার হৃদয়-চাঞ্চল্য দেখা দেয়। খোদেজা প্রসন্নচিত্তে তাঁকে বাণিজ্যের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ করেন। শ্যামদেশে মোহাম্মদের নেতৃত্বে বাণিজ্যদল যাত্রা করে। এদিকে পরগৃহে মোহাম্মদের চাকুরী গ্রহণ তাঁর অভিজাত্য-গর্বী আত্মীয় পরিজনদের অনেকেই পচ্ছন্দ করেননি।

পঞ্চম স্তবকে, বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও বাণিজ্যে প্রচুর লাভ করে মোহাম্মদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন। ষষ্ঠ স্তবকে, খোদেজার অনুরাগচিত্রের বর্ণনার পাশাপাশি কিছু অলৌকিক ঘটনার বিবরণও আছে; যেমন, প্রত্যাবর্তনকারী মোহাম্মদের মাথার উপর একখণ্ড মেঘের ছায়াদান প্রভৃতি। বাণিজ্যে সফল হয়ে মোহাম্মদ ফিরে এলে খোদেজার 'প্রেম অনুরাগে মন হইল চঞ্চল'।

সপ্তম স্তবকে, মোহাম্মদের সঙ্গে অনুরক্ত খোদেজার শুভ পরিণয় সাড়ম্বরে সম্পন্ন হওয়ার বিবরণ দিয়েই কাব্য সমাপ্ত হয়।

কাব্য হিসেবে 'বিবি খোদেজার বিবাহ'-এর শিল্পমূল্য অতি নগন্য। এ প্রসঙ্গে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা (৩ ডিসেম্বর ১৯০৫) যে মন্তব্য করে তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

> কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে আখ্যায়িকা অংশে এ গ্রন্থখানি অপ্রীতিকর নহে।[৪৪]

বাস্তবিকই কাব্যিক শিল্প-সৌন্দর্য্যের কোন পরিচয় এতে নেই—তবে এই কাব্যের মধ্যে একটি কাহিনীরসের আস্বাদ লাভ করা যায়। ইতিহাস অনুসরণের নিষ্ঠাও লেখকের মধ্যে নেই। তবে ইতিহাসের কাহিনীকে লেখক আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে একটি নবতর কাহিনীকাব্যরূপে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন।

হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভ

'হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভ' (শ্রাবণ ১৩১২/১৯০৫) মীর মশাররফের আর একটি ধর্মীয় কাহিনী কাব্য। গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মশাররফ 'পাঠকগণ সমীপে নিবেদন' শীর্ষক ভূমিকায় বলেছেন ঃ

> পরমপূজ্য হজরত মোহম্মদ মোস্তফা (সঃ)-র পবিত্র জীবনের সহিত যে সকল ঘটনার সংশ্রব আছে, তৎসমুদয় ক্রমে পাঠকগণকে উপহার দিব মনে করিয়াছি। . . . . ইহাতে ইসলাম ধর্ম্মের সত্যতার জীবন্ত ও জ্বলন্ত জ্যোতিঃ নবভাবে উদীত চালিত, রক্ষিত-পরীক্ষিত, আদৃত-সম্মানিত ও সম্মিলিত হইয়া, দিক্‌দিগন্তব্যাপী ধী-শক্তি সম্পন্ন মহাশক্তির আর্বিভাবে বহু অন্তরের বিঘোর অন্ধকার বিশদরূপে বিদূরিত করিয়া এক উপাদেয় ঘটনার অবতারণা করিয়াছে; সেই উপাদেয় ঘটনাই আজ পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিতেছি।[৪৫]

ইসলামী জগতের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রাঃ)। চরম ইসলাম-বিদ্বেষী ও মোহাম্মদ-এর শত্রু হজরত ওমর কিভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং মোহাম্মদের অন্যতম প্রিয় ভক্তে পরিণত হন তারই নাটকীয় ঘটনার বর্ণনা

এখানে রয়েছে। জীবনের প্রথমদিকে হজরত ওমরের ইসলাম ধর্মের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ, মোহাম্মদকে প্রাণনাশের চেষ্টা, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে বোন ও ভগ্নিপতির প্রতি প্রবল নির্যাতন এবং শেষে মোহাম্মদের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি বিমুগ্ধ ওমরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে বিবৃত হয়েছে। এ ছাড়া কাব্যের শেষে ইসলাম ধর্মের উন্নতিতে হজরত ওমরের কৃতিত্ব স্মরণ করে বর্তমান মুসলমান সমাজের দুর্দশার জন্য লেখকের আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। পুরো ঘটনা ও অন্যান্য বর্ণনা বিবৃত হয়েছে গতানুগতিক পয়ার ছন্দে। কাব্যিক সৌন্দর্য বলতে তেমন কিছু নেই। এমন কি স্থানে স্থানে ভাষা ও ছন্দের শৈথিল্যও রয়েছে যথেষ্ট। যেমন—

শুনি নাই কভু আজি শুনিলাম।
সুশীতল হল প্রাণ সত্য কহিলাম। (৪র্থ অংশ)

সমকালে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা (২৮ জানুয়ারী ১৯০৬) মীরের আরো দুটি ধর্মীয় কাব্যের সঙ্গে 'হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভ' গ্রন্থ সম্পর্কে যে মন্তব্য করে তা যথার্থ। পত্রিকাটি লেখে ঃ—

> নিরক্ষর মুসলমানগণ যেন অনায়াসে গ্রন্থের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই মীর সাহেবের গ্রন্থগুলি সাদাসিধা কথায় লিখিত। সুতরাং এ সকল পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন।[৪৬]

সুতরাং 'পদ্যপ্রিয়' সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশ্যে রচিত 'হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভ' বাংলা কাহিনী-কাব্যের ধারায় আরেকটি সংযোজন হলেও কাব্য হিসেবে অকিঞ্চিৎকর রচনা।

হজরত বেলালের জীবনী

'হজরত বেলালের জীবনী' (আশ্বিন, ১৩১২) একটি ক্ষুদ্রাকার জীবনীমূলক কাহিনীকাব্য। এই কাব্যের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন একাধারে হজরত বেলালের জীবনকথা এবং তাঁর জীবনের মহৎ আদর্শ সামনে রেখে কিছু শিক্ষামূলক বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

'বিজ্ঞাপন' শীর্ষক ভূমিকায় লেখক বলেছেন— 'হজরত বেলালের জীবনী প্রকাশ হইল।'[৪৭] অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জীবনকথা বর্ণনা করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। এর পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন যে— "হজরত বেলালের জীবনীতে অনেক শিক্ষাপ্রদ কথা আছে।" এই 'শিক্ষাপ্রদ' বিষয়গুলি কী তা ব্যাখ্যা করে আরো জানিয়েছেন—

> অশিক্ষিত বর্ব্বর ব্যক্তির মনেও যে ঈশ্বর-প্রেম, জ্বলন্তরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া মাতওয়ারা করিয়া তুলে, তাহার দৃষ্টান্ত হজরত বেলাল। সত্য-পথ প্রদর্শক মহামাননীয় পয়গম্বর হজরত রসুল মকবুল (সঃ) প্রতি কিরূপ ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা দেখাইতে হয়, তাহার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তই হজরত বেলাল।[৪৮]

নিগ্রো ক্রীতদাস হজরত বেলাল ইসলামধর্মে দীক্ষিত হলে তাঁর পৌত্তলিক প্রভু তাঁকে প্রায়ই অমানুষিক

অত্যাচার, নির্যাতন করতেন। হজরত আবুবকর তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। ক্রমে হজরত বেলাল হজরত মোহাম্মদের (সঃ) ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে তাঁর প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। তিনিই আবার মুসলমান জগতের প্রথম মোয়াজ্জীন বলে খ্যাতি লাভ করেন। ইসলামের প্রথম যুগের এই বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জীবনাদর্শই এই কাব্যের মূল বিষয়।

সমগ্র আখ্যায়িকাটি পয়ার ছন্দে রচিত। কাব্যের কাহিনীটিকে লেখক দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। 'হজরত বেলাল' নামক প্রথমভাগে রয়েছে ক্রীতদাস বেলালের প্রতি পৌত্তলিক প্রভুর নিদারুণ অত্যাচারের কথা, হজরত আবু বকরের সাহায্যে দাসত্ব-মুক্তি এবং হজরত মোহাম্মদের (সঃ) নৈকট্য-লাভ। দ্বিতীয় ভাগ 'হজরত বেলালের আশ্চর্য প্রভুভক্তি ও জীবনশেষ'-এ রয়েছে হজরত মোহাম্মদের (সঃ) মৃত্যুতে শোকার্ত হজরত বেলালের অর্ধোন্মাদের মতো দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ এবং পরিশেষে মদিনায় এসে আজান-ধ্বনি দিতে দিতে প্রাণ ত্যাগ।

মোহাম্মদ রসুলুল্লা যেই উচ্চারণ।
ফাটিল কলেজা বেলালে তখন॥
হইল না হায়! আজানের শেষ।
রসুলুল্লা নামে জীবনের শেষ॥

'হজরত বেলালের জীবনী' কাব্যটি সম্পর্কে ডঃ কাজী আবদুল মান্নান যথার্থই বলেছেন— "শিল্পসৃষ্টির চেয়ে হজরত বেলালের সহিষ্ণুতা এবং ধর্মনিষ্ঠা চিত্রিত করার সচেতন প্রয়াস কাব্যের সর্বত্র সুপরিস্ফুট।"[৪৯] আসলে "ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ এতৎ পাঠে উপকৃত"[৫০] হওয়ার মধ্যেই এই ধরনের গ্রন্থরচনার সার্থকতা নিহিত। এই উদ্দেশ্য সাধনে লেখক মশাররফ অনেকটা সফল।

হজরত আমীর হামজার ধর্ম্ম-জীবন লাভ

'হজরত আমীর হামজার ধর্ম্ম-জীবন লাভ' (কার্ত্তিক ১৩১২/১০ নভেম্বর ১৯০৫) পূর্বের দুটি কাব্যের মতোই ক্ষুদ্রাকার ধর্মীয় কাহিনীকাব্য।

হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর আপন পিতৃব্য মহাবীর হজরত আমীর হামজা কিভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন তার ঘটনা বর্ণনাই এই কাব্যের মূল উপজীব্য।

এই কাব্যের কাহিনীতে আছে অলিদ, আবু জেহেল প্রভৃতি মূর্তি-পূজক কোরেশরা নিরাকার ঈশ্বরভক্ত হজরত মোহাম্মদ (সঃ)কে বিনা কারণে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং শেষে শারীরিক নির্যাতন করেন। এ কথা শুনে হজরত মোহাম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজা আবু জেহেলকে আক্রমণ করে প্রতিশোধ নেন। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (সঃ) প্রতিশোধ গ্রহণের বদলে তাদের ক্ষমা করার কথা জানান এবং তাঁকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা, এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বাণী তাঁর হৃদয়কে আপ্লুত করলে তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। এতে মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি হয়। ঈর্ষান্বিত ও শঙ্কিত কোরেশরা মোহাম্মদকে বধ করবার জন্যে আবার ষড়যন্ত্র

করতে থাকে। এই বর্ণনার মধ্যেই কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছে।

এই কাব্যের কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করার মতো। যেমন ঃ–

চিত্তক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞান উজ্জ্বল আলোকে।
বিদ্যুৎ জিনিয়া যেই হৃদে না ঝলকে॥
সেই মূঢ়মতি চক্ষে সে নূরের কণা।
পড়িতে কি পারে হায়! মিছেরে বাসনা॥

এই কাব্যের ক্ষেত্রেও 'ঢাকা প্রকাশ' (২৮ জানুয়ারী, ১৯০৬) পত্রিকার ভাষায় বলা যায়– "ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ এতৎ পাঠে উপকৃত হইবেন।"[৫১]

মদিনার গৌরব

'মদিনার গৌরব' (১৩১৩ বঙ্গাব্দ/১৯০৬ খ্রীঃ) ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগের বিশেষতঃ হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর কালের ঘটনা নিয়ে রচিত একটি কাহিনী-কাব্য।

এই কাব্যরচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে "প্রিয় পাঠকগণ সমীপে লেখকের নিবেদন" শীর্ষক ভূমিকায় মীর মশাররফ লিখেছেন ঃ

> পরম কারুণিক খোদাতায়ালার আদেশে হজরত মোহাম্মদ মস্তফা (সঃ) মক্কা নগর হইতে পবিত্র মদিনা শরিফে যে হেজরত করেন, সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই 'মদিনার গৌরব' লিখিত হইল। হেজরতের সন তারিখ এসলাম জগতে হিজরী সন পরিচয়ে অতি প্রসিদ্ধ ভাবে হইয়া আসিতেছে। হেজরতের কারণ কি ? এবং মদিনাবাসিগণ নিকট হজরত কিরূপ গৌরবান্বিতভাবে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাই 'মদিনার গৌরব'।[৫২]

দ্বিপদী পয়ার ছন্দে রচিত 'মদিনার গৌরব' কাব্যটি চৌদ্দ সর্গে বিভক্ত। মদিনা নগরের গৌরবের কারণ ইসলামী দুনিয়ার প্রাণ-পুরুষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (সঃ)। ইসলাম ধর্ম প্রচার করার কারণে মক্কাবাসী বিশেষত কোরেশরা হজরত মোহাম্মদ ও তাঁর অনুচরদের প্রতি নানা নির্যাতন করত। কোরেশদের অত্যাচারে মোহাম্মদ অনুচরসহ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত (দেশান্তর গমন) করেন। মদিনাবাসী তাঁর এই দুর্দিনে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। মদিনায় অবস্থানকালে তাঁর জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ এ কাব্যে আছে। তিনি তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও মদিনাবাসীদের সহায়তায় এক নূতন শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে মদিনায় ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া এখানে আগমনের পর ইসলামধর্ম বিশেষ শক্তি সঞ্চয় ও প্রসার লাভ করে। মদিনার সেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্মরণ করে কাব্যের শেষে লেখক এও উল্লেখ করেছেন যে, এখানেই মোহাম্মদ (সঃ) হজরত আয়েশা (রাঃ)কে বিবাহ করেন এবং হজরত আলীর সঙ্গে কন্যা ফাতেমার বিবাহ দেন। এই হচ্ছে 'মদিনার গৌরব'-এর মূল বিষয়।

'মদিনার গৌরব'ও অন্যান্য ধর্মীয় কাব্যগুলির মতোই গতানুগতিক। তবে আগের কাব্যগুলির তুলনায় এখানে অপেক্ষাকৃত কাব্য-সৌন্দর্যের ছাপ আছে। দু একটি পঙক্তি উল্লেখযোগ্য।

যেমন— অন্তরের অন্ধকার গিয়াছে অন্তর। (১ম সর্গ)।

অথবা— চর্ম্ম বর্ম্মে আঁটা দেহ অতি দীর্ঘকায়,
লোহিত বরণ আঁখি রক্তজবা প্রায়। (১০ম সর্গ)

অবশ্য রচনা-শৈথিল্যের নিদর্শনও যথেষ্ট আছে। আবার এখানে কাব্যের মূল বিষয় নিরাভরণ গদ্যভঙ্গিকে আশ্রয় করেই সাধারণ পাঠকদের তৃপ্ত করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাব্যের অংশ-বিশেষ উল্লেখ করা যায় ঃ

নগর বেড়িয়া আছে তব শত্রুগণ,
যাইতে দিব না একা প্রহরী সাজিয়া,
এই আমি আসিতেছি সজ্জিত হইয়া। (১০ম সর্গ)।

মোশ্লেম বীরত্ব

মীর মশাররফ হোসেনের 'মোস্লেম বীরত্ব'ও (২০ জুলাই, ১৯০৭) ধর্মীয় আখ্যানমূলক কাব্য। এই কাব্যে হজরত মোহাম্মদের (সঃ) মদিনা অবস্থানকালে বদর, ওহোদ ও খায়বরের যুদ্ধে মুসলমানরা যে প্রবল শৌর্য ও বীরত্বের পরিচয় দেন তারই আবেগময় বর্ণনা রয়েছে। মশাররফের মৃত্যুর পর প্রকাশিত (৫ কার্তিক ১৩২১) দ্বিতীয় সংস্করণে 'বিজ্ঞাপন' শীর্ষক ভূমিকায় স্বত্বাধিকারিগণ লেখেন ঃ

> 'মোশ্লেম বীরত্ব' পুস্তকখানিও তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। মোশ্লেম জাতি যে অন্যায়রূপে করে তরবারি ধারণ করে নাই – অন্যায়, অত্যাচার করিয়া মোশ্লেম ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই, কেবলমাত্র সত্যধর্ম্মের জ্বলন্ত জ্যোতি প্রভাবে যে সমস্ত স্থানে বিজয়ী হইয়াছে—তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ প্রচার করিয়াছেন।[৫৩]

বস্তুত মদিনাবাসী মুসলমানদের জয়গাথা রচনা করাই ছিল লেখকের মূল উদ্দেশ্য।

'মোশ্লেম বীরত্ব' কাব্য 'বদরের যুদ্ধ', 'ওহোদের যুদ্ধ' এবং 'খায়বরের যুদ্ধ' নামে তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি ভাগ আবার কতকগুলি 'সোপান' (সর্গ)-এ বিভক্ত। 'বদরের যুদ্ধে' দশটি এবং 'ওহোদের যুদ্ধে' নয়টি সোপান আছে— অবশ্য 'খায়বরের যুদ্ধ' অংশে কোন সর্গ-বিভাগ নেই। সমগ্র কাব্যটি আদ্যোপান্ত পয়ার ছন্দে রচিত—মাঝে মধ্যে গদ্যেও বর্ণনা রয়েছে। লেখকের 'ঐতিহাসিক মনোভঙ্গী এবং এর অন্তরালবর্তী ধর্মীয় আবেগের প্রশংসা'[৫৪] করা গেলেও কাব্য-সৌন্দর্যের পরিচয় কিছু নেই। অনেকক্ষেত্রে গদ্যের ঢঙে ঘটনা বর্ণনা ধর্মপ্রাণ পাঠককে মুগ্ধ করলেও কাব্যরসিকের মনকে তৃপ্ত করতে পারেনা। যেমন—

তোমারই হিতের জন্যে আর বলিতেছি,
আমার দুহিতা-রত্ন তোমায় দিতেছি। (ওহোদের যুদ্ধ/২য় সোপান)

অথবা, খৃষ্টের ছয়শত তেইস সনের—
নভেম্বর মাসে এল খবর যুদ্ধের। (বদরের যুদ্ধ/৫ম সোপান)

এই কাব্যে লেখকের শিল্প-নৈপুণ্যের ছাপ না মিললেও লেখকের নিজস্ব মনোভাবের কিছু পরিচয় মাঝে মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামীণ পরিবেশে লালিত মশাররফ জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যেন তাঁরই কথা।

যেমন— বিষম জঙ্গলময় হ'ক জন্মস্থান,
কিবা অতি ভয়ঙ্কর সদৃশ শ্মশান।
.....
পবিত্রতা গুণে তার নাহিক তুলনা
জন্মস্থান বিনে শান্তি কোথায় হয় না।
(ওহোদের যুদ্ধ/৮ম সোপান)

পরাধীনতার গ্লানি-লাঞ্ছিত জাতির স্বাধীনতার অভাববোধকে লেখক মানুষের জীবনে অকল্যাণকর হিসেবে গণ্য করেছেন।

যে জাতি মৃত্যু মনে স্বাধীনতা ভাব।
দাসত্ব-শৃঙ্খল পরে হয়েছে অভাব।
সে জাতি মানুষ নহে পশুর সমান,
সে জাতির কোন কালে হবে না কল্যাণ। (বদরের যুদ্ধ/৬ষ্ঠ সোপান)

'মোস্লেম বীরত্ব' মীরের উদ্দেশ্য-সিদ্ধ শিল্প-সাধনার নিদর্শনমাত্র।

বিবিধ রচনা

মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা

মীর মশাররফ হোসেন সাহিত্য-সাধনার পাশাপাশি মুসলমান সমাজের শিক্ষার সমস্যার কথা ভেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্য-পুস্তক জাতীয় গ্রন্থও রচনা করেন। 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' এই পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীর রচনা। এটি তিনটি ভাগে তিনটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা'র– (১) প্রথম ভাগ ১৩১০ সালে (১৯০৩ খ্রীঃ), (২) প্রথম ভাগের প্রথম অংশ ১৩১৩ সালে এবং (৩) দ্বিতীয় ভাগ ১৩১৪ সালে (১৯০৮ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। অবশ্য দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশের কথা' জানা গেলেও পুস্তিকাটি পাওয়া যায়নি।

শিশুদের উপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় ইতিপূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি লেখকেরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষতঃ বিদ্যাগাসরের 'বর্ণ পরিচয়' আজও সমান জনপ্রিয়। মীরের এই পাঠ্যপুস্তক সেই ধারারই অন্যতম সংযোজন।

উনিশ শতকের শেষে পশ্চাদপদ মুসলমানরা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-দীক্ষায় তখনও আগ্রহী হয়ে ওঠেননি। সেকালের প্রচলিত শিশু-পাঠ্য গ্রন্থে ইসলামী-ধর্মশিক্ষা না থাকাতে তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। উপরন্তু সেই পাঠ্যপুস্তকগুলিতে খ্রীষ্টানী ও হিন্দুয়ানী ভাবের প্রাধান্য ছিল বলে তাঁদের অভিযোগ। আবদুল লতিফ প্রমুখ সমাজ-নেতাদের চিন্তা-চেতনায় এবং সমকালীন মুসলিম পত্র-পত্রিকায় এই মনোভাব ফুটে ওঠে।[২] সমকালীন গতানুগতিক এই শিক্ষা, মানসিকতা ও যুগধর্মের চাহিদার কথা বিবেচনা করেই মীর মশাররফ মুসলমান বালক বালিকাদের জন্যে রচনা করলেন "মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা।" মশাররফ তাঁর গ্রন্থের প্রথম ভাগের 'বিজ্ঞাপনে' বলেন—

> বঙ্গে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার পুস্তক যথানিয়মে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আমি যে এই ১ম শিক্ষা-পুস্তক প্রকাশ করিতেছি অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে।[৩]

কিন্তু তিনি কারণটি আর বলেননি। তবে পুস্তক-পাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি ইসলামী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেই তা রচনা করেন। অবশ্য তখন এ ধরনের গ্রন্থ-রচনায় কার্যকরী হয়েছিল তাঁর অর্থোপার্জনের তাগিদও।

পুস্তকটির প্রথম ভাগে পাঁচটি 'পাঠ' বা অধ্যায় এবং শেষে একটি 'প্রশ্ন-উত্তর' অংশ আছে। পাঠগুলি হল – 'মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার মহিমা ও গুণকীর্তন', 'পয়গম্বরের কথা', 'খোদাতায়ালার কোদরত', 'উপদেশ', 'উত্তম-বালক' এবং শেষে 'প্রশ্ন-উত্তর'। সমগ্র পাঠে সাধু গদ্যে অথচ সহজ সরলভাবে ইসলাম ধর্মের নীতি ও মানুষের চারিত্রিক সদ্‌গুণাবলীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বাক্যগুলি ছোট ছোট। ধর্মীয় বিষয়ের কারণে স্বাভাবিকভাবেই এতে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার বেশি হয়েছে।

প্রথম ভাগ সমকালে বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল বলে এবং "সকল স্থান হইতেই ইহার বর্ণপরিচয় বানান ইত্যাদির সর্ব্ব প্রথম অংশ"[৪]-এর জন্যে অনুরোধ এলে তিনি 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা'র প্রথম ভাগের প্রথম অংশ রচনা করেন। এই অংশে মোট বারটি 'পাঠ' আছে।[৫] এতে বর্ণপরিচয়, বানান, গণনা,

সাতটি বারের নাম, বাংলা ও আরবী মাসের নাম প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। এখানে 'ব' বর্ণটি সম্পর্কে পাদটিকায় বলা হয়েছে— "চলিত বঙ্গভাষায় ব অক্ষরের আকারের কোন ভিন্ন ভেদ নাই। ব্যবহারের কোন প্রচলিত সূত্র নাই, সুতরাং এক ব লিখিত হইল।"[৬]

প্রথম ভাগের প্রথম অংশের সমাপ্তি-পাদটীকায় 'দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশ সম্পর্কে লেখক বলেছিলেন—

> খোদাতালার মরজি হইলে দ্বিতীয় ভাগ মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষায় নব প্রচলিত কিণ্ডার গার্টেন প্রণালী অনুসারে শিক্ষা সম্বন্ধে নিয়মাদি চিত্রসমূহ সন্নিবেশিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।[৭]

কিন্তু গ্রন্থটির 'দ্বিতীয় ভাগ' পাওয়া না যাওয়ায় লেখকের ওই অভিপ্রেত নূতন প্রণালীর শিক্ষা-পদ্ধতির বিবরণ আমরা আর জানতে পারি না।

'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' গ্রন্থটি রচনার পেছনে মীর মশাররফের স্বাতন্ত্র্য-বাদী চিন্তা-চেতনা ও ব্যবসায়িক বুদ্ধি কাজ করেছিল। তিনি প্রধানতঃ স্ব-সমাজের উপযোগী পাঠ্য-পুস্তকের ঘাটতি পূরণ করতে গিয়েই এই গ্রন্থ রচনা করেন। এতে উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তা যথার্থ সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি। ধর্মীয় উপদেশ কোমলমতি শিশুদের কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। পাঠ্যপুস্তক শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাত্যহিক জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে ক্রমে শিক্ষার গভীর জগতে প্রবেশ করবে। সে রকমটি এখানে হয়নি। আসলে এ ধরনের গ্রন্থ রচনায় যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন মীর মশাররফের তা ছিল না। সে কারণে গ্রন্থটি সমকালে জনপ্রিয় হলেও পরবর্তীকালে আর স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। আর পাঁচটি পাঠ্যপুস্তকের মতোই গতানুগতিকতার চোরাবালিতে মুখ লুকিয়ে থেকে গেছে। তবে তাঁর কৃতিত্ব এই যে তাঁকে অনুসরণ করে অনেকেই এই ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাছাড়া এই পুস্তক-রচনার মধ্য দিয়ে লেখকের সমাজ-হিতৈষণার মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এটি সাহিত্য-রচনার পর্যায়ভুক্ত না হলেও লেখকের মন মানসিকতা বিশ্লেষণে সহায়ক হবে বলে এর একটি স্বতন্ত্র মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য।

ঈদের খোতবা

'ঈদের খোতবা' ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহার আরবী খোতবার 'বাংলা ও উর্দু ভাষায়' পদ্যানুবাদ। পুস্তিকাটি ১৩১৬ সালে (১৯০৯ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়।[৮]

খোত্‌বা অর্থ বক্তৃতা বা ধর্মোপদেশ দান। বিশেষতঃ জুম্মা ও দুই ঈদের নামাজের সময় আরবীতে লিখিত নির্দিষ্ট কিছু বয়ান ধর্মগুরুরা পাঠ করে থাকেন। এটিই খোত্‌বা। আজ অব্‌দি মুসলমান সমাজে সেই নিয়ম চলে আসছে। অনেক সময় অধিকাংশ বাঙালী মুসলমান ভক্তদের এর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম না করে কেবল শ্রবণ করতে হয়। মীর মশাররফ সেই বিষয়টি উপলব্ধি করে আরবি খোত্‌বাকে বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি জানান ঃ

> মাতৃভাষায় খোত্‌বার ভাব, প্রকৃত অর্থ, উপদেশ শুনিয়া বুঝিতে পারিলে—মনের মলিনতা দূর হইয়া আরও আনন্দিত হইবেন। ধর্ম্মভাবে দ্বিগুণতর ভক্তি বৃদ্ধির সহিত শক্তি জন্মিবে। এই সকল

ভাবিয়াই এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছিলাম। . . . . সমাজের উপকার সাধন জন্যই যথাসাধ্য পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ঈদের খোতবা বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম।[৯]

এটি গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত পদ্যানুবাদ। বোঝা যায়, এই অনুবাদ কর্মের মধ্যে দিয়ে লেখক শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাদপদ বাঙালী মুসলমান সমাজের কল্যাণ সাধনের কথাই বেশি বিবেচনা করেছেন। মীর মানসের ধর্ম-ভাবনা ও সমাজ-হিতৈষণা এই রচনার মধ্যে প্রকাশিত।

উপদেশ

ক্ষুদ্রাকার নীতিকথামূলক পদ্য-পুস্তিকাই হল 'উপদেশ'। লেখক মীর মশাররফ রচনাটিকে "হজরত লোকমান তদীয় পুত্রকে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ"[১০] বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি কোন্ গ্রন্থ থেকে এটি অনুবাদ করেন সেকথা উল্লেখ করেন নি। পুস্তিকাটি 'লাহিনীপাড়া-কুষ্টিয়ায়' ১৩০৯ সালে রচিত এবং ১৩১২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রাক্-ইসলামী যুগে আরব দেশে লোকমান (যিনি লোকমান হাকিম নামে বেশি পরিচিত) নামে একজন বিশিষ্ট নিগ্রো জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নামে বহু নীতিকথামূলক উপদেশ আরব ও আফ্রিকায় প্রচলিত ছিল। এমনকি ক্রমে বাংলাদেশেও সেই নীতিবাক্যগুলি ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কোরআনেও তাঁর নামে একটি সুরা (অধ্যায়) আছে যেখানে তাঁকে একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ও বিশিষ্ট মনীষী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে পুত্রের প্রতি তাঁর কতিপয় উপদেশের কথাও লিপিবদ্ধ আছে। তবে মীরের " 'উপদেশ' পুস্তিকায় বর্ণিত উপদেশ-মালার সংখ্যা অনেক বেশি এবং কোরানের বর্ণনার তুলনায় কিছু বিস্তৃত।"[১১]

চিরাচরিত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত এই পদ্যবন্ধে কাব্যিক গুণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। যেমন—

পরিবার পরিজন প্রতি চাহিও না।
কর্কশ নীরসভাবে কথা কহিও না॥
কোন কার্য্য করা'ও না অতিথি দ্বারায়।
জানিও মনের ভাব কথায় কথায়॥[১২]

অবশ্য কোথাও কোথাও অলঙ্কার প্রয়োগ লক্ষ করার মতো। যেমন,—

অন্তরের কথা যেন না যায় অন্তর[১৩]

মূলতঃ লোকশিক্ষার উদ্দেশেই পুস্তিকাটি রচিত। সেখানে লেখকের সাহিত্যিক অভিপ্রায় কার্যকরী ছিল না। তবে মশাররফের কৃতিত্ব এই যে, তিনি কোরানে বর্ণিত স্বল্পসংখ্যক নীতিবাক্যগুলি ছাড়াও লোকসমাজে প্রচলিত লোকমানের উপদেশ বাক্যগুলি সংগ্রহ করে আপন ভাষাভঙ্গিতে রূপ দিয়ে বাংলাভাষী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র ঃ উপন্যাস

১. মীর মশাররফ হোসেন, রত্নবতী, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, মশাররফ রচনা সম্ভার, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃ. ৪৫

২. ঐ, পৃ. ৪৭

৩. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ সং, ২য় মুদ্রণ, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৩, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩

৪. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৯৬, পৃ. ২৭

৫. সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৬. সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩-১৭২

রূপকথামূলক ঃ রামগতি ন্যায়রত্ন—রোমাবতী, ১৮৬২
রামসদয় ভট্টাচার্য—অদ্ভুত উপন্যাস, ১৮৬১
হরিনাথ মজুমদার—বিজয় বসন্ত ১৮৫৯ (১৭৮১)
কেদারনাথ দত্ত—প্রিয়ম্বদ ১৮৫৫
দ্বারকানাথ রায়—সুশীল মন্ত্রী ১৮৫৬ ইত্যাদি

অনুবাদমূলক ঃ সেকান্দারনামা, হাতেম-তাই ইত্যাদি ফার্সী কাহিনী, হোমারের ইলিয়াড-এর প্রথমাংশ, মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্ট, ভার্জিলের ঈনিড। এ ছাড়া ঃ—

পাদরি জন রবিনসন—রবিনসন ক্রুশোর জীবনচরিত ১৮৫২
রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন—সত্য চন্দ্রোদয় ১৮৫৫
কৃষ্ণকমল — পল ও ভার্জিনিয়া
অজ্ঞাত — অপূর্ব কারাবাস (Lady of the Lake) ১৮৭১

৭. শান্তনু কায়সার, তৃতীয় মীর, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, পৃ. ১

৮. মশাররফ রচনা সম্ভার, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫

৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্বর্ণকুমারী দেবী ও মীর মশাররফ হোসেন' সাহিত্যসাধক চরিত মালা, ২য় খণ্ড, (ষষ্ঠ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৭৭), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭৭, পৃ. ৩৭

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), ৭ম সং ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৫; পৃ. ৭৩

সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

আশরাফ সিদ্দিকী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ ১৩৬৩, ঢাকা, পৃ. ১৯

আবদুল লতিফ চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, সিলেট, ১৯৫২

উল্লেখ, মুনীর চৌধুরী, মীরমানস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ. ৬

১০. E.M. Forster ফরাসী সমালোচক Abel Chevalley'র কথা উদ্ধৃত করে এই কথা লিখেছেন। দ্রষ্টব্য, Aspects of the Novel, England, Penguine Books, 1970, P-13

১১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, মুক্তধারা, ভারতে ১ম সং, ১৯৭১, পৃ. ১৯৫

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্য রচনা, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫; পৃ. ৩২

কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ১৯৯০, পৃ. ১৭৬

সিরাজুদ্দীন আমেদ, মীর মশররফ হোসেন, নিউদিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৪; পৃ. ২০

আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ১০১

১২. ক্ষেত্রগুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০

১৩. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

১৪. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

১৫. Ian Watt, The rise of the Novel, Great Britain, Penguin Books, 1976, P. 23

১৬. Hudson, An Introduction to the study of Literature, Ludhiana, Lyal Book Depot, 1968; P. 139

১৭. রশীদ আল-ফারুকী, বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, কলকাতা, রত্না প্রকাশন, জানুয়ারী ১৯৮৪; পৃ. ১৩৫

সেলিম জাহাঙ্গীর, মীর মশাররফ হোসেন ঃ জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ ৮৩

১৮. মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ১৪

১৯. M.H. Abrams, A Glossary of Literary terms, Calcutta, Macmillan Co. of India, 1978, P. 225

২০. মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স, ১৩৮৪, পৃ. ১২১

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারততীর্থ, গীতাঞ্জলি, ১০৬ নং কবিতা,

২২. John Halperin, The Theory of the Novel, New York, Oup. 1974, P. 6

২৩. Ibid, P. 7-8

২৪. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮

২৫. কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), মশাররফ রচনা-সম্ভার, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০; ভূমিকা, পৃ দশ।

২৬. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬২

২৭. মীর মশাররফ হোসেন, 'অষ্টমবারের বিজ্ঞাপন', মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খন্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. পাঁচ।

২৮. ঐ , পৃ. – দুই-তিন

২৯. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

৩০. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বিষাদসিন্ধু' (প্রবন্ধ), মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদসিন্ধু, ঢাকা, প্রতীক প্রকাশনা, ১৯৯১, পৃ. ৭

৩১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'বিষাদসিন্ধু' (প্রবন্ধ), মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদসিন্ধু, পৃ. ২৩

৩২. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

৩৩. রমাপ্রসাদ দে, 'মীর মশাররফ হোসেন ঃ মৌখিক মহাকাব্যের অনুসৃতি' (প্রবন্ধ), ডঃ অরুণ সান্যাল সম্পাদিত, প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস, কলিকাতা, ওয়েষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃ. ৪৯

৩৪. কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৫, পৃ. ১৪৭-৪৮

৩৫. ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে হোসেনের নাম 'হুসাইন', মাবিয়ার নাম মুয়াবিয়া এবং এজিদের নাম ইয়াজিদ—-এভাবে উল্লেখিত আছে। আমরা 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থে বর্ণিত হোসেন, মাবিয়া এবং এজিদ নামগুলিই ব্যবহার করেছি।

৩৬. ফিলিপ. কে. হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি অ্যারাব্স, জয়ন্ত সিং প্রভৃতি কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ. ২০০

৩৭. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন্স, হাবিব আহসান অনূদিত, কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯২, পৃ. ৫১

ফিলিপ. কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

৩৮. হিট্টি, পৃ. ২১২

৩৯. Encyclopaedia of Islam - Ed. by B. Lewis & Others, London, Luzac & Co.; 1971, Vol-III; P-242

৪০. সৈয়দ আমীর আলী , পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

৪১. Encyclopaedia of Islam, Vol-III, P-241-42

এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন্‌স, অনুবাদকের প্রদত্ত তথ্য, পৃ. ৬৩১

৪২. হিট্টি, পৃ. ২১২

সৈয়দ আমীর আলী , পৃ. ৬৯

Encyclopaedia of Islam, Vol-III, P.-242

৪৩. মাসউদী, ৫ম খন্ড, পৃ. ২—৩

অনুবাদক কর্তৃক উদ্ধৃত, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, পৃ. ৬৩১

৪৪. হিট্টি, পৃ. ২১২

সৈয়দ আমীর আলী , পৃ. ৬৯

৪৫. হিট্টি, পৃ. ২১২

৪৬. সৈয়দ আমীর আলী , পৃ. ৬৯

৪৭. ম্যুর, দি ক্যালিফেট; উদ্ধৃত, ডঃ ওসমান গণী, উমাইয়া খেলাফত, কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫, পৃ. ১১

৪৮. জিয়াদ ছিলেন মুয়াবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ানের অবৈধ পুত্র। সেজন্য কোন নাম উল্লেখ না করে তাঁকে কেবল 'ইবন আবিহ' বা 'তার পিতার পুত্র' বলে অভিহিত করা হত। আমীর আলী তাই 'জারজ সন্তান' বলে উল্লেখ করেছেন।

সৈয়দ আমীর আলী , পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

৪৯. Encyclopaedia of Islam, Vol-III, P-608

সৈয়দ আমীর আলী , পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

ডঃ ওসমান গণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৫০. সৈয়দ আমীর আলী , পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৫১. এন্সাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, এ. হাউসমা এবং আন্যান্য সম্পাদিত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৬২

উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৫২. সৈয়দ আমীর আলী , পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৫৩. ঐ, পৃ. ৮২-৮৩

৫৪. হিট্টি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২-১৩

Encyclopaedia of Islam, Vol-III, Ed. B. Lewis & Others, P.-610

৫৫. Encyclopedia of Islam, Vol-III, P.-609-610

৫৬. ডঃ ওসমান গণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৫৭. Encyclopaedia of Islam, Vol-III, P.-611

৫৮. হোসেনের দেহ ও খন্ডিত মস্তক সমাধিস্থ করা নিয়ে নানা মত আছে।

দ্রষ্টব্য ঃ Encyclopaedia of Islam, Vol-III, P.-612

৫৯. সৈয়দ আমীর আলী , পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

হিট্টি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪

ডঃ ওসমান গণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৬০. একটি বর্ণনায়-হাসানের ৬০ থেকে ৯০টি স্ত্রী ছিল বলে উল্লেখ আছে।

দ্রষ্টব্য, Encyclopaedia of Islam, Vol-III, P.-242

অন্যত্র দেখা যায়, তিনি প্রায় ১০০টি পর্যন্ত বিবাহ করেন ও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটান। দ্রষ্টব্য, হিট্টি, পৃ. ২১২

৬১. Encyclopaedia of Islam, Vol-III, P.-242

৬২. মীর মশাররফ হোসেন, বিষাদসিন্ধু, আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত, কলিকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃ. ৬

৬৩. ঐ , পৃ. ২৬৮

৬৪. Enclopaedia of Islam, Vol-III, P.-611

৬৫. Do, p.- 611

৬৬. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

৬৭. বিষাদসিন্ধু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৬৮. ঐ , পৃ. ২৮

৬৯. Encyclopaedia of Islam, Vol-III, p.-608.

৭০. হিট্টি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

৭১. বিষাদসিন্ধু, পৃ. ১১০

৭২. William Muir, Caliphate : its rise, decline, and fall, Ed. by T.H. Weir, Edinburgh, John Grant, 1915, p.-310.

৭৩. Encyclopaedia of Islam Vol-IV, p.-508-9 (Ed.A.Houstsma & others)

উল্লেখ, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

হিট্টি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬

৭৪. খলিফা হজরত আলী হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-দুহিতা ফাতেমার (রা) মৃত্যুর পর হানিফা গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করেন। এই মহিলার গর্ভজাত সন্তান হলেন মহম্মদ। মায়ের গোত্র অনুসারে তাঁকে মহম্মদ আল হানাফিয়া বা মহম্মদ আলহানিফ বলা হত।

সূত্র ঃ ক. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

খ. Encyclopaedia of Islam. Vol-III, p-88 (Ed. A. Houtsma and others).

উল্লেখ, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৭৫. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৭৬. ঐ , পৃ. ৮৭-৯০

৭৭. The Encyclopaedia of Islam, Vol-III, p.-612-13.

৭৮. এই ধরনের ইংরেজিতে লেখা প্রথম গ্রন্থ Lewis Pelly রচিত Miracle Play ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

৭৯. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫০-৫১

৮০. কাজী আবদুল মান্নান, মশাররফ রচনা সম্ভার, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. তেইশ-সাতাশ।

৮১. আমার জীবনী, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১-১২, ৩২৮-৩৩২, ৩৩৯-৩৪৫

গাজীমিয়াঁর বস্তানী, ১৮শ নথি, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯১

৮২. The Encyclopaedia of Islam, Vol-III, P.-612-613

৮৩. হিট্টি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

৮৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

৮৫. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৮৬. রশীদ আল ফারুকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

৮৭. আবদুল লতিফ চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ১২

৮৮. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

৮৯. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২৬৭

৯০. আবদুল আজীজ আল-আমান (সম্পাদিত), বিষাদসিন্ধু, ভূমিকা, পৃ. চৌদ্দ।

৯১. সিরাজুদ্দিন আমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৯২. হরনাথ পাল, মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু (প্রবন্ধ), মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদসিন্ধু, পৃ. ১০।

৯৩. ক্ষেত্রগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

৯৪. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৯৫. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৯৬. মীর মশাররফ হোসেন, মুখবন্ধ, বিষাদসিন্ধু, মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. তিন।

৯৭. কাজী আবদুল ওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৯৮. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্লাসিক ও রোমান্টিক (প্রবন্ধ), সাহিত্য ও পাঠক, কলিকাতা, এস. মুখার্জ্জি, ৫ম সং, ১৯৭০, পৃ. ২৬২

৯৯. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

১০০. X.L. Kennedy, Literature, 5th edition, New York, Harper Collins Publishers, 1991, p.-213-214.

১০১. ক্ষেত্রগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

১০২. ঐ, পৃ. ১৩২

১০৩. আজহারউদ্দীন খান, বিলুপ্ত হৃদয়, কলিকাতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, ১৩৭২, পৃ. ১৩

১০৪. রশীদ আলফারুকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

১০৫. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

১০৬. X.L. Kennedy, op, cit., p-215.

১০৭. মুহম্মদ আবদুল হাই, 'বিষাদসিন্ধু' (প্রবন্ধ), মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদসিন্ধু, পৃ. ১৪

১০৮. রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র। অজিতকুমার ঘোষ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), 'মধুসূদন রচনাবলী', কলিকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃ. ৩৩০

১০৯. মশাররফ সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০

১১০. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪-৮৫

১১১. কাজী আবদুল ওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

১১২. রমাপ্রসাদ দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

১১৩. ঐ , পৃ. ৫১

১১৪. আবদুল লতিফ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১১৫. রমাপ্রসাদ দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

১১৬. ঐ , পৃ. ৫৬

১১৭. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১১৮. ঐ , পৃ. ৪৮

১১৯. রশীদ আল ফারুকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯

১২০. বিষাদসিন্ধু, আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত, পৃ. ৩৯

১২১. ঐ , পৃ. ৫-৬

১২২. ঐ , পৃ. ১৮

১২৩. ঐ , পৃ. ৩৬-৩৭

১২৪. ঐ , পৃ. ১৪৯

১২৫. ঐ , পৃ. ২৩৬

১২৬. মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সঙ্গে মশাররফের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তা তাঁর 'গাজীমিয়ার বস্তানী'তে এর উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে 'মেঘনাদবধে'র যে জীর্ণ

কপিটি পাওয়া যায় তার প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠার মার্জিনেই অপ্রচলিত ও দুরূহ তৎসম শব্দের অর্থ তিনি স্বহস্তে লিখে রেখেছেন।

১২৭. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, 'বিষাদসিন্ধু' (প্রবন্ধ), মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদসিন্ধু, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, পৃ. ৩৫

১২৮. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

১২৯. ঐ , পৃ. ৫০

১৩০. ক্ষেত্রগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

১৩১. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

আবু হেনা মুস্তাফা কামাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১৩২. মীরের পিতামহ ইবরাহিম হোসেনের দুই বিবাহ। অবশ্য প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর এই বিবাহ, কিন্তু পারিবারিক অশান্তি ছিল। মীরের পিতা মোয়াজ্জেম হোসেনের দুই স্ত্রী – হামিদননেসা ও দৌলতননেসা। এ ক্ষেত্রেও দুজনে সপত্নী ছিলেন না বটে, কিন্তু দৌলতন্নেসা সপত্নীর জ্বালা সহ্য করেছিলেন। এখানে সপত্নীর ভূমিকায় ছিল পিতার রক্ষিতা রূপসী। এছাড়া মীরের দুই শ্বশুরের—মুনসী নাদের হোসেন এবং শেখ সদরুদ্দীর—দুটি করে পত্নী-ছিল। মশাররফেরও দুই স্ত্রী—আজিজন্নেসা ও বিবি কুলসুম।

১৩৩. বিষাদসিন্ধু, আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত, পৃ. ২৫

১৩৪. ঐ , মহরম পর্ব, সপ্তম প্রবাহ, পৃ. ২৫

১৩৫. ঐ , মহরম পর্ব, সপ্তম প্রবাহ, পৃ. ২৫-২৬

১৩৬. ঐ , মহরম পর্ব, ত্রয়োদশ-প্রবাহ, পৃ. ৪৭

১৩৭. ঐ , মহরম পর্ব, ত্রয়োদশ-প্রবাহ, পৃ. ৪৬

১৩৮. ঐ , মহরম পর্ব, ত্রয়োদশ-প্রবাহ, পৃ. ৪৮

১৩৯. ঐ , মহরম পর্ব, ত্রয়োদশ-প্রবাহ, পৃ. ৪৮

১৪০. ঐ , মহরম পর্ব, সপ্তদশ প্রবাহ, পৃ. ৬৯

১৪১. ঐ , ভূমিকা, পৃ. সতের

১৪২. ঐ , মহরমপর্ব, তৃতীয় প্রবাহ, পৃ. ১২

১৪৩. কাজী আবদুল ওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

১৪৪. বিষাদসিন্ধু, মহরমপর্ব, দ্বাদশ প্রবাহ, পৃ. ৪৪

১৪৫. বিষাদসিন্ধু, মহরমপর্ব, দ্বাদশ প্রবাহ, পৃ. ৪৪

১৪৬. ঐ , এজিদবধ পর্ব, প্রথম প্রবাহ, পৃ. ২৫৪

১৪৭. ঐ , পৃ. ২৫৪

১৪৮. ঐ , পৃ. ২৫৬

১৪৯. ঐ , উদ্ধার পর্ব, চতুর্থ প্রবাহ, পৃ. ১৫১

"কবিকল্পনার সীমা পর্যন্ত যাইতে হঠাৎ কোন কারণে বাধা পড়িলে মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এমনি কঠিন বন্ধন, এমনি দৃঢ় শাসন যে কল্পনা-কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের খাতিরে নানাদিক লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে। হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ভগবান! সমাজের মূর্খতা দূর কর। কু-সংস্কার তিমির সদ্-জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রতিভায় বিনাশ কর। আর সহ্য হয় না। যে পথে যাই, সেই পথেই বাধা। সে পথের সীমা পর্যন্ত যাইতে মনের গতিরোধ তাহাতে জাতীয় কবিগণেরও বিভীষিকাময় বর্ণনায় বাধা জন্মায়, চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়, কিন্তু তাঁহারাও যে কবি, তাঁহাদের যে কল্পনাশক্তির বিশেষ শক্তি ছিল, সমাজ তাহা মনে করেন না।"

১৫০. বিষাদসিন্ধু, মহরমপর্ব, চতুর্দশ প্রবাহ, পৃ. ৫৩

১৫১. কাজী আবদুল ওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

১৫২. 'বিষাদসিন্ধু'র মহরম পর্বের অষ্টাদশ প্রবাহ থেকে উদ্ধার পর্বের প্রথম প্রবাহ পর্যন্ত জয়নাব সম্পর্কে লেখক নীরব। দ্বিতীয় প্রবাহে যখন বন্দিনী অবস্থায় এজিদের সম্মুখে তাকে আনা হয়েছে— তখন তার সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল প্রায় নিঃশেষিত। অতঃপর আবার জয়নাবের আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসের একেবারে শেষে— এজিদবধ পর্বের তৃতীয় প্রবাহে।

১৫৩. কাজী আবদুল ওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

১৫৪. সমকালে 'বিষাদসিন্ধু'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে এরূপ কতকগুলি পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য লেখার একটি তালিকা দেয়া হল ঃ

১. বঙ্গবাসী— ২৭শে বৈশাখ, ১২৯২ সাল

২. গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা— ১১ই জ্যৈষ্ঠ এবং ১৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২

৩. সময়— ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ ও ফাল্গুন ১২৯৩

৪. চারুবার্ত্তা— ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২

৫. সুলভ সমাচার— ১৯ বৈশাখ, ১২৯৩

৬. ঢাকা প্রকাশ— ৪আশ্বিন,১২৯৩

৭. ভারতী– ফাল্গুন ১২৯৩

৮. ভারতী ও বালক– মাঘ, ১২৯৩

৯. The Englishman--- May 4, 1885

১০. The Statesman and Friend of India--- May 31, 1885

এছাড়া বেঙ্গল লাইব্রেরীর বার্ষিক রিপোর্টে লাইব্রেরীয়ান হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য ঃ

১১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ্– ১৮৮৮ খ্রীঃ

১২. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ্–১৮৯১ খ্রীঃ

১৩. কায়কোবাদ কর্তৃক তাঁর 'মহরমশরিফ' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখিত সমালোচনা।

১৫৫. মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে 'বিষাদসিন্ধু', পৃ. ৪

১৫৬. ঐ, পৃ. ২

১৫৭. ঐ, পৃ. ৩

১৫৮. ঐ, পৃ. ২

১৫৯. ঐ, পৃ. ৩

১৬০. ঐ, পৃ. ৪

১৬১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১৬২. শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৯

উদ্ধৃত, আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

১৬৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৮৮৭

উদ্ধৃত, মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদসিন্ধু, পৃ. ৫

১৬৪. কায়কোবাদ, মহরমশরিফ, ঢাকা, ১৩৪০, ভূমিকা, পৃ. ১৪-১৫

উদ্ধৃত, সেলিম জাহাঙ্গীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩

১৬৫. কায়কোবাদ, মহরমশরিফ, দ্বিতীয় সং, ঢাকা, ১৩৫৬, ভূমিকা, কৈফিয়ৎ অংশ, পৃ. ২

১৬৬. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

১৬৭. কাজী আবদুল ওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

১৬৮. কাজী মোতাহার হোসেন, 'মোহাম্মদ নজিবর রহমানের আনোয়ারা' (প্রবন্ধ), বাংলা সাহিত্যের সম্পদ,

ঢাকা, ১৯৫৬, পৃ. ৩৩-৩৪

১৬৯. আলী আহমদ (সংকলিত), বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৬০৭

১৭০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

১৭১. আজহারউদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

১৭২. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১৭৩. হাসান আজিজুল হক, 'মানুষের মুখ ঃ বিষাদসিন্ধু' (প্রবন্ধ), মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদসিন্ধু, পৃ. ৬৬-৬৭

১৭৪. আজহারউদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১৭৫. কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), মশাররফ রচনা-সম্ভার, ১ম খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. ৪০

১৭৬. মশাররফ রচনা-সম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০৮

১৭৭. মূলগ্রন্থে পঞ্চদশ তরঙ্গের পর আবার একাদশ তরঙ্গ থেকে তরঙ্গ গণনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এটি ছাপার ভুলের জন্যেই ঘটেছে। এর ফলে সর্বশেষ তরঙ্গটি 'সপ্তত্রিংশ তরঙ্গ' বলে উল্লেখিত হয়েছে। কাজেই এ হিসেবে ৩৭টি তরঙ্গ হয়। কিন্তু কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত মশাররফ রচনা সম্ভার-এর প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত সমস্ত তরঙ্গ হিসেব করলে সর্বমোট বিয়াল্লিশটি হয়।

১৭৮. মীর মশাররফ হোসেন, উদাসীন পথিকের মনের কথা, মুখবন্ধ, মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৭৪

১৭৯. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১৮০. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৮

আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

১৮১. মীর মশাররফ হোসেন, উদাসীন পথিকের মনের কথা, এ.কে.এম. শামসুল ইসলাম সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ. বার।

উল্লেখ, পৃথ্বীলা নাজনীন, আত্মজীবনীমূলক রচনা ঃ মীর মশাররফ হোসেন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৫২

১৮২. মশাররফের আত্মজীবনী 'আমার জীবনী' থেকে তাঁর পিতার বিবাহের তারিখ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হিসাব করা হয়েছে এবং 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় তাঁর পিতার বিবাহের এক বছর আগের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে একটি ইংরেজি দৈনিকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের কোন সংখ্যায় কেনীর উল্লেখ আছে।

১৮৩. ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত 'হজরত বেলালের জীবনী' (১৯০৫) গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের শেষ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা ঃ সমকালের দর্পণে, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ৭৫

১৮৪. ঐ , পৃ. ১৫৮

১৮৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১৮৬. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

১৮৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন রচনা সংগ্রহ, বিষ্ণুবসু সম্পাদিত, কলিকাতা, কমলা সাহিত্য ভবন, ১৩৮৫, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. চব্বিশ

১৮৮. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১

১৮৯. সিরাজুদ্দীন আমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১৯০. ক্ষেত্রগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

১৯১. শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'জীবনী ও আত্মজীবনী' (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

১৯২. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

১৯৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. পঁচিশ

১৯৪. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

১৯৫. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা— সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৫৮

১৯৬. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

১৯৭. আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

১৯৮. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮১

১৯৯. ঐ , পৃ. ৩৮১

২০০. ঐ , পৃ. ৪০৯

২০১. ঐ , পৃ. ৩৯৩

২০২. ঐ , পৃ. ৫৩৫

২০৩. ঐ , পৃ. ৫৩৯

২০৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

২০৫. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৭

২০৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২২

২০৭. ঐ , ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭

২০৮. আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

২০৯. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

২১০. ঐ , পৃ. ৩৮৬-৩৮৭

২১১. ঐ , পৃ. ৩৯৪-৩৯৫

২১২. ঐ , পৃ. ৩৯৭

২১৩. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

২১৪. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২১

২১৫. ঐ , পৃ. ৪২৪

২১৬. ঐ , পৃ. ৪৭৫

২১৭. ঐ , পৃ. ৪৮৩

২১৮. ঐ , পৃ. ৪৮৩-৪৮৪

২১৯. ঐ , পৃ. ৪৪১

২২০. ঐ , পৃ. ৪২৪

২২১. ঐ , পৃ. ৫৪৯

২২২. ঐ , পৃ. ৫৪২

২২৩. ঐ , পৃ. ৪৬২-৬৩

২২৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

২২৫. 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'র প্রকাশকাল নিয়ে বিভ্রান্তির জন্য দায়ী অনেকটা লেখক নিজেই। 'আমার জীবনী' গ্রন্থে মশাররফ হোসেন বলেছেন— '১৩০৫ সালে বস্তানী প্রকাশ হইয়াছে'। (মশাররফ রচনাসম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৫)। আবার 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে তিনি জানাচ্ছেন— "কুলসুম বিবির কথা কার্য্যবিবরণ যাহা ১৩০৬ সালে গাজীমিয়াঁর বস্তানী মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে . . ."। (মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬)। 'বস্তানী'তে কোন প্রকাশকালের উল্লেখ নেই,তবে প্রকাশকের 'বিজ্ঞাপন' –এ তারিখ দেওয়া আছে ১৫ আশ্বিন ১৩০৬। এ হিসেবে ইংরেজী তারিখ পাওয়া যায় ১লা অক্টোবর ১৮৯৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই তারিখটিকেই উল্লেখ করেছেন। (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১)। কিন্তু

Calcutta Gazettee (31 October 1900) পত্রিকায় এ গ্রন্থের প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে ৪ এপ্রিল ১৯০০। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ সূত্রে আলী আহমদ সংকলিত 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী'তেও উল্লেখ রয়েছে, ১৩০৬ (১৯০০)। প্রথম সংস্করণের একটি খণ্ড লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে বলে জানিয়েছেন মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (মীর মশাররফের গদ্যরচনা, পৃ. ১০৯)। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

২২৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬

২২৭. ঐ , ৩য় খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. তেইশ

২২৮. ঐ , ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭

২২৯. ঐ , ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭

আবার অন্যত্র ঃ "'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে গাজীমিয়াঁ আমাকে 'ভেড়াকান্ত' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গাজীমিয়াঁর চক্ষে আমি 'ভেড়াকান্ত' বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। বিবি কুলসুম 'বউ' আখ্যায় সম্বোধিতা ও পরিচিতা হইয়াছেন। পাঠকগণ স্থির করিয়া লইবেন ভেড়াকান্ত আমি আর 'বউ' কুলসুমবিবি" (পৃ. ৪১৭)।

২৩০. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭

২৩১. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, পৃ. ৬০২

২৩২. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, পৃ. ৭৭

২৩৩. মশাররফ রচনা-সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪

২৩৪. ঐ , ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৫

২৩৫. ঐ , ৩য় খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. আট

২৩৬. মীর মশাররফ হোসেন, গাজী মিয়াঁর বস্তানী, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, ভূমিকা, পৃ. ১৫-২৭

২৩৭. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

২৩৮. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩

২৩৯. ঐ , ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭

২৪০. ঐ , ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭-৪৪৫

২৪১. আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯ ও ২৮৪-২৮৫

২৪২. ডঃ আশাররফ সিদ্দিকী (সম্পাদিত), গাজীমিয়াঁর বস্তানী, পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ. ২১-২৭

২৪৩. ঐ , পৃ. ২৩

দাগাদারীর সঙ্গে আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর চরিত্রগত কোন সাদৃশ্য ছিল এমন কোন তথ্য, ইউসফজয়ীর জীবনী থেকে পাওয়া যায় না। তবে ইউসফজয়ী রাহাতননেসার আত্মীয় এবং কর্মচারী ছিলেন। তিনি এবং মীর মশাররফ হোসেন একই সময়ে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার এস্টেটের দুই অংশের ম্যানেজার ছিলেন।

দ্রষ্টব্য ঃ চরিতাভিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৫, পৃ. ২৬

২৪৪. ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী (সম্পাদিত), গাজীমিয়াঁর বস্তানী, পৃ. ২১-২৭

২৪৫. শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, 'প্রদীপ' (মাসিক পত্রিকা), পৌষ, ১৩০৮
উদ্ধৃত, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, গ্রন্থ প্রসঙ্গ, পৃ. তের।

২৪৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

২৪৭. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

২৪৮. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

২৪৯. আবদুল লতিফ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
উদ্ধৃত, আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

২৫০. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

২৫১. রশীদ আল ফারুকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯

২৫২. ক্ষেত্রগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

২৫৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭

২৫৪. ঐ , পৃ. ১৪৩

২৫৫. ঐ , পৃ. ১৪৪

২৫৬. ঐ , পৃ. ৩৭০

২৫৭. মীর মশাররফ হোসেন, গাজীমিয়াঁর বস্তানী, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ভূমিকা, পৃ. বার-তের।
উল্লেখ, পৃথ্বীলা নজনীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

২৫৮. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

২৫৯. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫২ - ১৫৩

২৬০. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

২৬১. ক্ষেত্রগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

২৬২. বস্তুত মীরের আত্মজীবনীমূলক রচনা চারখানি — 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯১), 'গাজীমিয়াঁর

বস্তানী' (১৮৯৯), 'আমার জীবনী' (১৯০৮–১৯১০) এবং 'বিবি কুলসুম' (১৯১০)। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় বর্ণিত হয়েছে শৈশব জীবন, 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে কর্মজীবন, 'আমার জীবনী'তে কৈশোর জীবন এবং 'বিবি কুলসুম'– এ দাম্পত্য জীবন।

২৬৩. ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৯৫; পৃ. ৩৯১

২৬৪. ক্ষেত্রগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮

২৬৫. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

২৬৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩

২৬৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৮০; পৃ. ৭০

২৬৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

২৬৯. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

২৭০. M. H. Abrams, op. cit, p - 21

২৭১. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. পনেরো

২৭২. ঐ , পৃ. ২৭৭

২৭৩. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

২৭৪. শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

২৭৫. Hudson, op. cit, p - 145

২৭৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫

২৭৭. ঐ , ৩য় খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. তের-আঠার

২৭৮. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
রশীদ আল ফারুকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯

২৭৯. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

২৮০. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫

২৮১. ঐ , পৃ. ১৮৯

২৮২. ঐ , পৃ. ৩৫৪ - ৩৫৫

২৮৩. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

২৮৪. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩০

২৮৫. ঐ , পৃ. ৩৪

২৮৬. অনেকগুলি চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রেই ক্রমাগত এই অসঙ্গতি ঘটেছে। যেমন — কখনো কটা লাহিড়ী হয়ে গিয়েছেন মাথাপাগলা লাহিড়ী কখনো মাথাপাগলা বসু বা মাথাপাগলা রায়। আলকাতরা স্যান্যাল বেড়ে হয়ে গিয়েছেন আলকাতরা মাখা ঘরভাঙ্গা স্যান্যাল আবার পরক্ষণে ঘরভাঙ্গা ঘোষ। কটকটে বাবুর

নাম কোথাও ফুটফুটে বাবু, আবার কোথাও বা ফিটফাট বাবু। অরাজকপুরের পুলিশ কর্মকর্তা তেছমার খাঁ কোন কোন জায়গায় হাতপাতা থানার দারোগা বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

২৮৭. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৮

২৮৮. ঐ , পৃ. ৩৪৬

২৮৯. ঐ , পৃ. ৩৮৩ - ৩৮৪

২৯০. ঐ , পৃ. ৩১৫

২৯১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫- ৭৬

২৯২. মশাররফ রচনা সম্ভার, দ্বিতীয় খণ্ডে 'তহমিনা' উপন্যাসের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদই কেবল সংকলিত হয়েছে। পৃ. ৫২৩ – ৫৪২

আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর "মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা" গ্রন্থে চারটি পরিচ্ছেদের বিবরণ দিয়েছেন (পৃ. ১৬৭)। অধ্যাপক আলী আহমদের সৌজন্যে এর ১৬৬ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপির একটি মাইক্রোফিল্ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। দ্রঃ বাংলা গ্রন্থপঞ্জী, পৃ. ৬০৭

২৯৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৮ -৩৯

২৯৪. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, পৃ. ১৬৯

২৯৫. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, পৃ. ৩২৪

২৯৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. ত্রিশ।

২৯৭. ঐ , পৃ. ৫৫৭

২৯৮. ঐ , গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. তেত্রিশ।

২৯৯. ঐ , গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. তেত্রিশ।

৩০০. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. দশ।

এবং সেলিম জাহাঙ্গীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭

৩০১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৩০২. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা; পৃ. এগার।

৩০৩. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন (জীবনী গ্রন্থমালা), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৬৯

৩০৪. আলী আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৬

৩০৫. আবুল আহসান চৌধুরী; মীর মশাররফ হোসেন, পৃ. ৭০

৩০৬. ঐ , পৃ. ৬৯–৭০

৩০৭. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, পৃ. ১৬৬

৩০৮. ঐ , পৃ. ১৬৬ – ১৬৭

তথ্যসূত্র ঃ নাটক

১. প্রথম সংস্করণের একটি কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি কপি রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে বলে মুনীর চৌধুরী জানিয়েছেন (মীর মানস, পৃ. ২৯)।

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় সং, কলিকাতা, ১৩৭৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১০

ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৩, পৃ. ১৬৭

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, মীর মশাররফ হোসেন রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক বিষ্ণু বসু, কলিকাতা, ১৯৭৮, ভূমিকাংশ, পৃ. পনের

৪. মুনীর চৌধুরী, মীর-মানস, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, বাংলা-একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ. ৩৩

৫. শান্তনু কায়সার, তৃতীয় মীর, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ১৭৩

৬. শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩

৭. সোমপ্রকাশ, ১৪ ফাল্গুন ১২৭৯, ১৫ সংখ্যা।
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা ঃ সমকালের দর্পণে, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ১৩৭

৮. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. সতের।

৯. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১০. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ভারতে ১ম সং., কলিকাতা, মুক্তধারা, ১৯৭১, পৃ.১৯৭

১১. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা (১৮৬০-১৯৬৫) নওগাঁ, রাজশাহী, নর্থবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭০, পৃ. ৭৭

১২. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

১৩. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

১৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

১৫. মশাররফ রচনা সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩

১৬. 'বসন্তকুমারী নাটকে'র প্রথম অঙ্ক প্রথম রঙ্গভূমিতে রাজা বীরেন্দ্র মন্ত্রী বৈশম্পায়নকে কখনো 'আপনি' কখনো 'তুমি' বলেছেন তেমনি দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম রঙ্গভূমিতে শরৎকুমার নরেন্দ্রের সঙ্গে সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহারে একই অসঙ্গতি দেখা যায়। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম রঙ্গভূমিতে রানী রেবতী রাজা বীরেন্দ্রকে কখনো 'আপনি' কখনো 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছে। তৃতীয় অঙ্ক প্রথম রঙ্গভূমিতে বসন্তকুমারী নরেন্দ্রকে সম্বোধনে যুগপৎ 'আপনি' ও 'তুমি' ব্যবহার করেছে।

১৭. মশাররফ রচনা সম্ভার,১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬

১৮. মোহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক), ৭ম সং, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৫, পৃ. ২৯৬

১৯. ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ৭ম সং, ১৩৮৬, পৃ. ৯৮

২০. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

২১. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

২২. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭

২৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. ১১

২৪. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

২৫. কোন কোন গ্রন্থে মশাররফ হোসেনের এ নাটকটির নাম আধুনিক বানানে লিখিত হয়েছে 'জমিদার দর্পণ'। কিন্তু ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় 'জমীদার দর্পণ' বানান (ক্রমিক নং ১৩৭৬) পরিলক্ষিত হয় বলে আবদুল কাইউম সাহেব জানিয়েছেন। রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, পৃ. ৬১

২৬. মশাররফের সমকালে কোন রঙ্গমঞ্চে 'জমীদার দপণ' অভিনীত হয়নি। তবে 'বসন্তকুমারী নাটকে'র মতো 'জমীদার দর্পণ'ও কুষ্টিয়া কিংবা তাঁর বাড়ী লাহিনীপাড়ায় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় (ডিসেম্বর ১৮৭২ খ্রী.) বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। (মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র, ১৮৪৭-১৯০৫, ২য় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৭, পৃ. ১৭৪)। এ ছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে জানা যায়, 'জমীদার দর্পণ' হাতে লিখে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছিল (শামসুজ্জামান খান, বাংলা নাটকে সমাজ ও জীবন, সচিত্র সন্ধানী, হালখাতা সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৮৮, পৃ. ৫৫)। ১৯৭৩ খ্রী নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় 'জমীদার দর্পণে'র সাড়ম্বর অভিনয় হয়। (বিষাদ সিন্ধু, আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত, কলিকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, ভূমিকা, পৃ. একুশ) ১৯৮৩ তে ঢাকায় এই নাটকের নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, মে-২০, ১৯৮৩)।

২৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'দীনবন্ধু মিত্র' (প্রবন্ধ), বঙ্কিম রচনাবলী, প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ, কলিকাতা, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৩, পৃ. ১১৩১

২৮. আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত, বিষাদসিন্ধু কলিকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃ. ২৮৭

২৯. সোমপ্রকাশ, ৭ জৈষ্ঠ ১২৮০/১৯মে ১৮৯৩।

উল্লেখ, আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ১৮৬

৩০. মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী, ৫নং পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১২৭-২৮
উল্লেখ, আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, পৃ. ১৮৬

৩১. বিসাদসিন্ধু, আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত, পৃ. ২৮৬

৩২. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, তৃতীয় সং, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৪১৬

৩৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮০
উদ্ধৃত, বিষাদসিন্ধু, পূর্বোক্ত, পৃ. চব্বিশ

৩৪. জমীদার দর্পণ, আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি. নভেম্বর ১৯৮৯, ভূমিকা, পৃ. ২২

৩৫. অক্ষয়কুমার দত্ত, 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন' (প্রবন্ধ, এপ্রিল, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ), উচ্চমাধ্যমিক বাংলা সংকলন, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, জুন ১৯৯৬, পৃ. ৩

৩৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের কৃষক (প্রবন্ধ), বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭২

৩৭. বাঙালী পল্লী সমাজের দুর্দশা নিয়ে রচিত প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩) কলকাতার কেরানী জীবনের বাস্তব দৃশ্যাঙ্কিত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের 'কেরানী দর্পণ' (১৮৭৪), সরকারী খেতাব লোভী এক জমিদারের চিত্রাঙ্কিত প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল দর্পণ' (১২৯১) এবং দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের দুখানা নাটক – চা-কুলীদের উপর চা-কুঠী শ্বেতাঙ্গ কর্তাদের অত্যাচার নিয়ে 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫) ও জেলের কয়েদীদের উপর অত্যাচার নিয়ে রচিত 'জেলদর্পণ' (১৮৭৫) নাটক প্রভৃতি।

৩৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮০।
উদ্ধৃত, বিষাদসিন্ধু, ভূমিকা, পৃ. চব্বিশ

৩৯. শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ২য় পর্যায়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃ. ৪১৮

৪০. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, ৭ম সং, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা.লি., আগষ্ট ১৯৮৫, পৃ. ১২৫

৪১. শ্রীভূদেব চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৮

৪২. অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৪৩. শ্রীভূদেব চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৮

৪৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

৪৫. জমীদার দর্পণ, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ. ১৯

৪৬. বিষাদসিন্ধু, পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ. একুশ

৪৭. ধ্রুবগুপ্ত, 'কেন মীর মশাররফ হোসেন' (প্রবন্ধ), অনুষ্টুপ (ত্রৈমাসিক পত্রিকা), উনত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৯২

৪৮. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮
আজহারউদ্দীন খান, বিলুপ্ত হৃদয়, কলিকাতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, ১৩৭২, পৃ. ৪
মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

৪৯. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৫০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০।
উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা ঃ সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৮
তুলনীয়, আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

৫১. কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. ১৩
তুলনীয়, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক), পৃ. ২৯৬

৫২. অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

৫৩. সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬

৫৪. মধুসূদন রচনাবলী, সব্যসাচী রায় সম্পাদিত, কলিকাতা, কামিনী প্রকাশালয়, ১৩৯৯, পৃ. ২৭৯

৫৫. মধুসূদন রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬

৫৬. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

৫৭. জমীদার দর্পণ, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ. ১৩

৫৮. গীতা মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা, কলকাতা, কে.পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোং, ১৯৮১, পৃ. ৭১

৫৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. আঠার

৬০. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল এর প্রকাশকাল উল্লেখ করেছেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।
দ্রষ্টব্য ঃ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, জমীদার দর্পণ, ভূমিকা, পৃ. ৬

কিন্তু মীর মশাররফের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর ৩ নং খাতায় উল্লেখ আছে— "১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে 'এর উপায় কি' ?" প্রহসন প্রকাশ হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, পৃ. ২০২। ২৪ ফাল্গুন ১২৮০ 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় 'অতি সত্বর প্রকাশ-হইবে' বলে এর বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল।

৬১. দ্বিতীয় সংস্করণও বহুদিন দুস্প্রাপ্য ছিল। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর আনিসুজ্জামান আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে এই দ্বিতীয় সংস্করণের একটি কপি সংগ্রহ করে আনেন। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সাহিত্য সমিতি কর্তৃক ডঃ আনিসুজ্জামানের ভূমিকাসহ 'এর উপায় কি ?' পুনর্মুদ্রিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণটিই কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত মশাররফ রচনা সম্ভার (১ম খণ্ড সেপ্টেম্বর ১৯৭৬)-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুদ্রিত হয়।

৬২. মীর মশাররফ হোসেন, 'লিখকের কয়েকটি কথা', এর উপায় কি ?, মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩

৬৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫

৬৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ৪র্থ মুদ্রণ, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, আগষ্ট ১৯৮৩, পৃ. ৫৬

৬৫. ঐ , পৃ. ৪৩

৬৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু (প্রবন্ধ), দ্রষ্টব্য, ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ ও সনৎ কুমার মিত্র সম্পাদিত, লোকরহস্য, কলিকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ. ২১

৬৭. রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল, কলিকাতা, সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৮, পৃ. ৭৭-৭৮

৬৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্বর্ণকুমারীদেবী, মীর মশাররফ হোসেন', সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ষষ্ঠ সং, কলিকাতা, ১৩৭৭, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮

৬৯. Nicoll, The Theatre and Dramatic theory, p-87

৭০. Oxford companion to the theatre, উদ্ধৃত, অমিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের রূপরীতি ও আঙ্গিক, ২য় মুদ্রণ, কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৭

৭১. বান্ধব (পত্রিকা), ঢাকা, আশ্বিন ১২৮৩, পৃ. ২২০
উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৭২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ. পনের

৭৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. ২৬-২৭

৭৪. কাজী আবদুল মান্নান, মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. ২৬

৭৫. শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

৭৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬

৭৭. ঐ , পৃ. ৩৬

৭৮. ক. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রবন্ধবিচিত্রা, ঢাকা, জুলাই ১৯৬৭, পৃ. ৯০

খ. ড. কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. দশ। এবং মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. একত্রিশ

গ. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (সম্পাদিত), জমীদার-দর্পণ, ভূমিকা, পৃ. ৮

ঘ. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, পৃ. ২২১

মশাররফের 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র (১৮৯৯) শেষ প্রচ্ছদে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন অংশে 'টালা অভিনয়'-এর উল্লেখ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় 'টালা অভিনয়' ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কুষ্টিয়া থেকে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ডঃ কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত মশাররফ রচনা সম্ভার ২য় খণ্ডে 'হাফেজে' প্রকাশিত 'টালা অভিনয়' সংকলিত হয়েছে।

৭৯. ক. সেলিম জাহাঙ্গীর, মীর মশাররফ হোসেন ঃ জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২৫২

খ. শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৮০. ক. কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত) মশাররফ রচনা সম্ভারের দ্বিতীয় খণ্ডে 'অসম্পূর্ণ রচনা' বলে (দ্রষ্টব্যঃ গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. একত্রিশ) উল্লেখ করলেও 'পঞ্চম খণ্ডে' 'সম্পূর্ণ আকারেই' রচিত বলে উল্লেখ করেছেন (ভূমিকা, পৃ. পনের)।

খ. আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

৮১. হাফেজ, মে-জুন ১৮৯৭, পৃ. ২০১

উদ্ধৃত, আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১-২২২

৮২. ক. Calcutta Review, Vol. 105, October, 1897, p-391-94

খ. Sufia Ahmed, Muslim community in Bengal, 1884-1912, Dacca, 1974, p-201-202

উল্লেখ, আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, তথ্যনির্দেশ, পৃ. ২৮৮

গ. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, (আধুনিক যুগ, ৩য় খণ্ড) ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব. ১৯৯৬, পৃ. ৭৭-৭৮

৮৩. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, পৃ. ২২২

৮৪. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, 'প্রবন্ধ বিচিত্রা' (ঢাকা, জুলাই ১৯৬৭), পৃ. ৯০

৮৫. মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৩

৮৬. ঐ , পৃ. ৫৪৫

৮৭. ঐ , পৃ. ৫৪৫

৮৮. ঐ , পৃ. ৫৪৭

৮৯. ঐ , পৃ. ৫৪৯

৯০. ঐ , পৃ. ৫৫৩

৯১. ঐ , পৃ. ৫৫৩

তথ্যসূত্র ঃ প্রবন্ধ-ইতিহাস

১. ডঃ অধীর দে, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, ২য় সং, কলিকাতা, উজজ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৬, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ষষ্ঠ সং ১৩৭৭, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০

৩. মীর মশাররফ হোসেন, গো-জীবন, মশাররফ রচনা সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৩

৪. ঐ , পৃ. ৩১১

৫. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ-শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০-৫১

৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯

৭. ঐ , পৃ. ৩১৫-১৬

৮. ঐ , পৃ. ৩১৯-২০

৯. ঐ , পৃ. ৩২৯

১০. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, মুক্তধারা, ১৯৭১, পৃ. ২০১

১১. ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৫, পৃ. ৬৯৭
রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ১৫২-৫৩

১২. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা— সমকালের দর্পণে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

১৩. ঐ , পৃ. ১৪৩

১৪. ঐ , পৃ. ৩৪১

১৫. ঐ , পৃ. ৩৬৭

১৬. ঐ , পৃ. ৩৫৫

১৭. ঐ , পৃ. ৩৫৬

১৮. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪

১৯. আখবারে এসলামীয়া, ৬ষ্ঠ ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১২৯৬

উদ্ধৃত, সেলিম জাহাঙ্গীর, মীর মশাররফ হোসেন ঃ জীবন ও সহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২৪০

২০. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা— সমকালের দর্পণে, পৃ. ৭১-৭২

২১. 'সুধাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৩ কার্ত্তিক (৮ নভেম্বর ১৮৮৯)। প্রথম সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম; পরবর্তীকালে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। এটি দু বছরের বেশি কাল জীবিত ছিল।

২২. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা— সমকালের দর্পণে, পৃ. ৭২

২৩. আখবারে এসলামীয়া, পৌষ, ১২৯৬

উদ্ধৃত, আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ২৫০

২৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫

২৫. মুনীর চৌধুরী, মীর-মানস, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ. ১৯

২৬. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীনা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৫৩

২৭. শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়), কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ. ৪০৭

২৮. মশাররফ রচনা-সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, ৪র্থ খণ্ড, গ্রন্থ-প্রসঙ্গ, পৃ. গ

২৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৩০. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯০৮ খ্রীঃ, ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা- ৫৫৫, পৃ. ২২

উদ্ধৃত, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, আলী আহমদ সংকলিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৬০৪

৩১. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৪

৩২. কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), মশাররফ রচনা সম্ভার, ৪র্থ খণ্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. গ—ঘ

৩৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৫, পৃ. ৭৩,৭৬

৩৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

৩৫. মশাররফ রচনা-সম্ভার, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬

৩৬. ঐ, পৃ. ৫৬-৫৭

৩৭. ঐ, পৃ. ১০০

৩৮. "স্বদেশী আন্দোলনে কুলসুম বিবি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। আন্দোলনকারিদিগের দুই তিনজন ব্যতীত সকলের ঘরের সন্ধান করিয়া বলিতেন যে ইহাদের এরূপ ঝকমারী কেন? ঘরে তন্ডুল নাস্তি, ওদিকে ধনকুবের অদ্বিতীয় রাজশক্তি সম্পন্ন ব্রিটিশ জাতি, বিদ্যা-বুদ্ধিতে জগত শ্রেষ্ঠ। সভ্যতায় জগতে সর্ব্বজাতির আদর্শ, এবং অগ্রণী বিচার ক্ষেত্রে স্থির ধীর। এমন নিরপেক্ষ রাজার অসন্তোষের কারণ— বিরক্তির কারণ করিয়া লাভ কি হইবে? দিদিমণীরা সভাসমিতি করিয়া হাতের বলয় এবং অন্য অন্য অলঙ্কার পর্যন্ত খুলিয়া দিয়া দেশ উদ্ধার করিতেছেন। . . . সেই হইতে আমি কোন সভা সমিতিতে যাইনাই। কারণ কুলসুম বিবির কথাটা আমার মনে লাগিয়াছিল।

মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২

৩৯. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭

৪০. পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে 'হিতকরী' প্রথম প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৯৭ সালে (এপ্রিল, ১৮৯০)। প্রথম দিকে এটি কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া এবং পরবর্তীকালে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকায় প্রধান সম্পাদকের নাম থাকত না, তবে আনেকের ধারণা মীর মশাররফ এটি সম্পাদনা করতেন। মাঝখানে কিছুকাল এর প্রকাশ বন্ধ ছিল। নতুনরূপে আবার ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন ও এস. কে. এম. মহম্মদ রওসন আলীর যুগ্ম সম্পাদনায় পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকা বের হয়। মীর মশাররফ এই পত্রিকার মুখ্য লেখক ছিলেন।

৪১. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭-১৩৮

৪২. ঐ, পৃ. ১৩৮-১৪৭

৪৩. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমাদের শিক্ষা' (প্রবন্ধ), কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ১৯৯০; পৃ. ৩৪০

৪৪. ঐ , পৃ. ৩৪০

৪৫. মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭০

৪৬. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪

৪৭. মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৪

৪৮. ঐ , পৃ. ৫৬৫

৪৯. ঐ , পৃ. ৫৬৫

৫০. ঐ , পৃ. ৫৬৫

তথ্যসূত্র ঃ জীবনী-আত্মজীবনী

১. মুনীর চৌধুরী, মীর-মানস, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮ পৃ. ১১৩-১১৪

২. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত) 'মশাররফ সাহিত্যে শিল্পী-মানস ঃ দেশ, কাল ও সমাজ', মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ভূমিকা, পৃ. ছিয়ানব্বই।
এবং ডঃ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৩৯৭

৩. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২

৪. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬

৫. ঐ , পৃ. ৯

৬. মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৩৪৮, ভূমিকা, পৃ. চৌদ্দ।

৭. ঐ , পৃ. চৌদ্দ।

৮. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮

৯. ঐ , পৃ. ১৭৭

১০. ঐ , পৃ. ২৪৪

১১. সোমেন্দ্রনাথ বসু, বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী, ২য় সং, কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মার্চ, ১৯৯৩, পৃ. ২

১২. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮ -১১৯

১৩. ঐ , পৃ. ১৪৩

১৪. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭

১৫. ঐ , পৃ. ৯

১৬. শান্তনু কায়সার, তৃতীয় মীর, ঢাকা, বাংলা একাডেমী,ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪, পৃ. ১৪৩

১৭. দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), আমার জীবনী, ভূমিকা, পৃ. ষোল।

১৮. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

১৯. 'আমার জীবনী' দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ. ৭১

২০. ঐ , পৃ. ১১০

২১. ঐ , পৃ. ৬৯ - ৭০

২২. ঐ , পৃ. ৭৫

২৩. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্যরচনা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, আগষ্ট ১৯৭৫, পৃ. ১৩৪–১৩৬

২৪. 'আমার জীবনী' দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ. ৭৮

২৫. ঐ , পৃ. ১২১

২৬. ঐ , পৃ. ১৫৯

২৭. ঐ , পৃ. ২৪৫

২৮. ঐ , পৃ. ১৭৪

২৯. ঐ , পৃ. ৯৪

৩০. ঐ , পৃ. ২২৩

৩১. ঐ , পৃ. ২৩৮

৩২. ঐ , পৃ. ৯৪

৩৩. ঐ , পৃ. ৬৫

৩৪. ঐ , পৃ. ৭ - ৮

৩৫. ঐ , পৃ. ৫৯ - ৬৩

৩৬. ঐ , পৃ. ২৭২ - ২৭৮

৩৭. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯, ৩৭৬

৩৮. ঐ , পৃ. ৩৬৪

৩৯. ঐ , পৃ. ৩৬৭

৪০. ঐ , পৃ. ৩৯৮

৪১. ঐ , পৃ. ৪৮৩

৪২. ঐ, পৃ. ৫৫২

৪৩. ঐ, পৃ. ৪৫৪

৪৪. ঐ, পৃ. ৪৪৫

৪৫. ঐ, পৃ. ৪৪৫

৪৬. ঐ, পৃ. ৪৪৫

৪৭. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬ -৯৭

৪৮. মুহম্মদ আবদুল হাই, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, বিবি কুলসুম, পৃ. ৯৩
উদ্ধৃত, পৃথ্বীলা নাজনীন, আত্মজীবনীমূলক রচনা : মীর মশাররফ হোসেন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ১১৫

তথ্যসূত্র ঃ কাব্য কবিতা

১. শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ৭ম সং, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, আশ্বিন ১৩৯৫, পৃ. ২৯৭

২. ঐ, পৃ. ২৯৮

৩. ঐ, পৃ. ৩০৩

৪. ঐ, পৃ. ৩৮৮

৫. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন (জীবনী গ্রন্থমালা), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১০৩

৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), ৭ম সং, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, পৌষ ১৩৯৫, পৃ. ২৫১-৫২

৭. প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী 'বসন্তকুমারী নাটক' মীরের তৃতীয় রচনা। কিন্তু এ গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লিখেছেন— "আমার অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বসন্তকুমারী প্রস্ফুটিত হইল।" 'গৌরীসেতু' (২০ জানুয়ারী ১৮৭৩) এবং 'বসন্তকুমারী নাটকে'র প্রকাশকালের (২ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩) ব্যবধান মাত্র তেরোদিনের। সম্ভবতঃ 'বসন্তকুমারী নাটক' পূর্বে রচিত হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল 'গৌরী সেতু'র পর। এছাড়া 'গৌরীসেতু' প্রকাশে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন বলে হয়তো একে রচনা হিসেবে প্রথম দিকে গণ্য করেন নি।

৮. মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, ডঃ কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড ঢাকা, বাংলা-একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৬৯-৭৩

৯. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. ৬

১০. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৫৫

১১. প্রথমে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে আরও অনেকে এ সমালোচনাটি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমালোচনাটি অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক রচিত এবং বর্তমানে তা অক্ষয়চন্দ্র সরকার গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। দ্রষ্টব্য ঃ রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা–সমকালের দর্পণে, পৃ. ৫৬

১২. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৫

১৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, মীর মশাররফ হোসেন রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), সম্পাদক ডঃ বিষ্ণুবসু, কলকাতা, কমলা সাহিত্য ভবন, ১৯৭৮, ভূমিকাংশ, পৃ. পনের-ষোল।

১৪. 'সঙ্গীত লহরী'তে মোট ৯১টি গান সংকলিত হয়। কিন্তু আসলে এতে গানের সংখ্যা ৮৮টি। তিনটি গান একাধিকবার ছাপা হয়েছে। এই গ্রন্থের ৪৮ ও ৬৭, ৪৬ ও ৬৮ এবং ৪৯ ও ৬৯ নং গান অভিন্ন।

১৫. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯-৯০, ৪৫২, ৪৫৭

১৬. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ২২৯

১৭. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭

১৮. পারিজাত মজুমদার, মীর মশাররফ হোসেন ও তাঁর বাউল গান, কলকাতা, জাগরী, ১৩৯৭, পৃ. ৪৯

১৯. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৫-৬৬৯

২০. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, পৃ. ৬৮

২১. ঐ, পৃ. ৬৯

২২. ঐ, পৃ. ৬৯

২৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ আটাশ-সাতান্ন।

২৪. ঐ, ঐ, পৃ. আটাশ।

২৫. ঐ, ঐ, পৃ. আটাশ।

২৬. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, মুক্তধারা, নভেম্বর ১৯৭১, পৃ. ২১৮

২৭. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ঊনচল্লিশ।

২৮. মীর মশাররফ হোসেন, বিজ্ঞাপন, বিবি খোদেজার বিবাহ, মশাররফ রচনা সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৩

২৯. মীর মশাররফ হোসেন 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "পুস্তক বিক্রয়ে প্রতিদিন গড়ে ৪ টাকা আয় হইতে লাগিল।" মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭। আর এক জায়গায় কুলসুমের জবানীতে লিখেছেনঃ "টাকা পয়সারও আমদানী দেখিনা – আমার কেতাব বিক্রীর টাকা না হইলে তোমার অবস্থা যে কি হইত ঈশ্বর জানেন।" পৃ. ৪৪৮

৩০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যসাধক চরিত মালা'য় ২য় খণ্ডে (পৃ. ৪৩) 'মৌলুদ শরীফের' প্রকাশকাল উল্লেখ করেছেন ১৯০৩। ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে (পৃ. ২১৪) এর প্রকাশকাল উল্লেখ করেছেন ১৯০৫। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান তাঁর 'মশাররফ রচনা সম্ভার' ৩য় খণ্ডে (ভূমিকা, পৃ. বিশ) দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, এটি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে না হলেও ঐ বছরই প্রকাশিত হয়। আবুল আহসান চৌধুরী (মীর মশাররফ হোসেন স্মারকপত্র, কুষ্টিয়া ১৯৭৭, পৃ. ১০) এর প্রকাশকাল নির্দেশ করেছেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু কেউই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে 'মৌলুদ শরীফ'-এর প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়েছে, ২রা নভেম্বর ১৮৯৪। (সূত্রঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ২৬১৯, পৃ. ১৬-১৭) এই বিশ্বস্তসূত্র ধরে আমরা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দকেই 'মৌলুদশরীফে'র প্রকাশকাল বলে ধরে নিতে পারি।

৩১. 'মৌলুদ শরীফে'র প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা যেখানে ছিল ৬০, সেখানে চতুর্থ সংস্করণে (১৬ নভেম্বর ১৯১২/অগ্রহায়ণ ১৩১৯) তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪ + ২১৬ + ৬৭ পৃষ্ঠাতে।

৩২. মীর মশাররফ হোসেন, মৌলুদশরীফ, ভূমিকা, মশাররফ রচনা সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৪, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮।

৩৩. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, পৃ. ৭৯

৩৪. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১০

৩৫. ঐ, ঐ, পৃ. ৪২১

৩৬. ঐ, ঐ, ভূমিকা, পৃ. বিশ।

৩৭. মোহাম্মদ ইদরিশ আলী, মৌলুদ শরীফ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, (মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৯), পৃ. ৭৮

৩৮. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. উনিশ-বিশ।

৩৯. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৬৬-৬৭

৪০. ঐ, পৃ. ১৬৭

৪১. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), মশাররফ রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. বিশ।

৪২. মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৩-৫৭৪

৪৩. ঐ, পৃ. ৫৭৬

৪৪. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, পৃ. ২৭৮

৪৫. মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৩

৪৬. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, পৃ. ২০৪

৪৭. মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২২

৪৮. ঐ, ঐ, পৃ. ৭২২

৪৯. ঐ, ঐ, ভূমিকা, পৃ. তেতাল্লিশ

৫০. ঢাকা প্রকাশ, ২৮ শে জানুয়ারী, ১৯০৬,

রত্নবতী থেকে অগ্নীবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ২০৪

৫১. ঐ, পৃ. ২০৪

৫২. মশাররফ রচনা সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৪২

৫৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৪০

৫৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

তথ্যসূত্র ঃ বিবিধ রচনা

১. আলী আহমদ সংকলিত, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৬০৩
বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা, ২৯৯, পৃ. ১১

২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০-১২৪, ও ১৫০-১৫১

৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৯০

৪. ঐ, পৃ. ৫২৮

৫. এই অংশে 'দ্বাদশ পাঠ' পর্যন্ত উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আছে দশটি পাঠ। সম্ভবতঃ লেখকের অনবধানতাবশতঃ মাঝখানে পাঠের ক্রমগুলি ঠিকমতো উল্লেখিত হয়নি। কেননা এতে সপ্তম ও একাদশ পাঠ নেই।

৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩০

৭. ঐ , পৃ. ৫৩৬

৮. আলী আহমদ সংকলিত, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৬০৪

৯. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ২৬৬

১০. মশাররফ রচনা সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭০৯

১১. ঐ , ভূমিকা, পৃ. একচল্লিশ।

১২. ঐ , পৃ. ৭১৫

১৩. ঐ , পৃ. ৭১৪

পঞ্চম অধ্যায়
মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যরীতির বিশ্লেষণ

বাংলা গদ্যের পটভূমি

মীর মশাররফ হোসেন যখন বাংলা গদ্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তখন গদ্যের একটি আদল তৈরি হয়ে গেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনাই হয় এই গদ্য-চর্চার মাধ্যমে। উনিশ শতকের শুরুতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর হাতে আধুনিক গদ্য-চর্চার সূচনা। তখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কে বলা যেতে পারে গদ্যের প্রস্তুতিকাল।[১]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-গোষ্ঠী সাধু গদ্যরীতির ব্যবহার করলেও যথার্থ ছাঁদটি তাঁরা তখনও আয়ত্ত করতে পারেননি। তাই তাঁদের কেউ সংস্কৃতরীতি, কেউ ফারসী-রীতি, কেউ বা ইংরেজি ধরণের অন্বয় অনুসরণ করেছিলেন – কেউ কেউ আবার মুখের সাধারণ কথাকেও ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।[২] অর্থাৎ এক কথায় তাঁরা গদ্যরচনার পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই এগিয়েছেন। তবে তাঁরা বাংলা গদ্যকে বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসেবে প্রস্তুত করেছিলেন। রামমোহন রায় গদ্যকে যুক্তিতে, তর্কে, চিন্তায় সজ্জিত করে আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযোগী করে তুললেন। তাঁর রচনায় সাহিত্যরস ছিল না, তবে তাঁর ভাষা ছিল বক্তব্যের উপযোগী ও প্রাঞ্জল। বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকাও গদ্যের পুষ্টি সাধনে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন থেকে শুরু করে সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিকপত্রিকা, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি প্রতিনিধিস্থানীয় পাত্রিকাকে আশ্রয় করে বাংলা গদ্য ক্রমশঃ সরল হতে থাকে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন– "সাময়িকপত্রের আগে বা সমকালে রচিত বাংলা গদ্যের জড়তা ঘোচেনি, কিন্তু সাময়িকপত্রে ব্যবহৃত গদ্যের চাল অনেকটা স্বাভাবিক ও সহজ হয়েছিল।"[৩] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য একটি সার্থক সাহিত্যিক রূপ লাভ করে। তাঁর পূর্বে বিভিন্ন ধরণের একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হওয়ার কারণে রচিত হতো দীর্ঘ বাক্য। ফলে ভাবের বিরুদ্ধতা এবং বাক্যের ভারসাম্যহীনতার জন্য রচনা নিতান্ত কর্কশ এবং লালিত্যহীন হত। বিদ্যাসাগর আনলেন লালিত্য ও কমনীয়তা। তিনি বাংলা গদ্যে যতি সন্নিবেশ করে, পদবন্ধে ভাগ করে এবং সুললিত শব্দ বিন্যাস করে তথ্যের ভাষাকে রসের ভাষায় পরিণত করেন।[৪] তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষাকে সুসংহত করে তাকে সহজগতি এবং কার্যকুশলতা দিয়েছেন।[৫] উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন'-এর পর বাংলা গদ্যে সংস্কৃতানুসারী সাধুরীতি অনুসারে গদ্যচর্চা হতে থাকে। বিদ্যাসাগর সেই সাধুগদ্যের ছাঁদ তৈরি করে দেন। কিন্তু এ সময়েই প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগরীয় রীতি গ্রহণ না করে প্রচলিত ভাষার কাছাকাছি একটি রীতিতে যথাক্রমে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' রচনা করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালে' চলিত ভাষার আদলে বাংলা গদ্যে যে নতুন ভঙ্গির প্রবর্তন করলেন তাতে দেখা গেল সাধুভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের বদলে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশি শব্দের বহুল প্রয়োগ, সমসবদ্ধ পদের পরিবর্জন এবং কথ্যভাষায় ব্যবহৃত ফারসী শব্দ ও ইডিয়মের যথেচ্ছ প্রয়োগ। অবশ্য পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ নিজেও এ রীতি অনুসরণ করেননি। তাই দেখা যাবে তিনি একই বাক্যে সাধু ও চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন।[৬] কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' একেবারে কথ্যভাষার আদলে রচিত। এতে কলকাতার আঞ্চলিক ভাষার ছাপ লক্ষ করা যায়। তবে

'আলালের ঘরের দুলাল-এর মতো এ বইয়ে আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে সাধু ভাষার মিশ্রণ নেই। এ ভাষার প্রধান গুণ সাবলীলতা ও সরসতা। এর পর বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষার গদ্যকে বিষয়, ভাব ও রসের বাহন করে তুললেন। লিখিত ভাষা ও মনের ভাষার দূরত্ব কমে এল। পরবর্তীকালে বাংলা গদ্য রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথচৌধুরীর হাতে আরো পরিশীলিত হয়ে বিচিত্রমুখী ও পরিণত রূপলাভ করে। গদ্যভাষার এই ভাঙ্গাচোরার খেলা আজও চলেছে। আমাদের আলোচ্য মীর মশাররফ হোসেন বঙ্কিমচন্দ্রের কালেই আবির্ভূত হন। তিনি সেকালের রীতি অনুসারেই গদ্য-চর্চা করেছেন এবং নিজস্ব ভঙ্গি ও স্বকীয়তার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সেকালে অনেক পণ্ডিতদের[৭] ধারণা হয়েছিল যে মুসলমান লেখকগণ মিশ্রভাষারীতি ছাড়া বিশুদ্ধ বাংলা বা সাধু বাংলায় সাহিত্যচর্চা করতে অক্ষম। মীর মশাররফ এ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে শুদ্ধ বাংলা গদ্যচর্চায় কৃতিত্ব দেখান। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, মুসলমান লেখকদের মধ্যে তাঁর পূর্বে কয়েকজন গদ্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেও তাঁদের গদ্য 'মহৎ শিল্পের বাহন হবার যোগ্য হয়ে ওঠেনি'।[৮]

মীর মশাররফের দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলা গদ্যের এই পরিপ্রেক্ষিতে মীর যখন গদ্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তখন বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য বাংলাভাষাকে ভাবপ্রকাশের স্থিতিস্থাপকতা এনে দিয়েছে। যদিও বাঙালী মুসলমানদের বাংলা গদ্য রচনার জড়তা তখনও কাটেনি, মীর কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর লক্ষ স্থির করে নিয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী সাহিত্যচর্চা বাংলা গদ্যভাষাকে অবলম্বন করেই হবে। বাংলা গদ্যভাষা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল দ্বিধাহীন এবং স্বচ্ছ। এ ছাড়া তিনি সাহিত্যে এই ভাষা ব্যবহারের বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে আমরা তাঁর কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই। সেগুলি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সাহায্য করবে। আমরা আগেই বাংলায় সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে বাঙালী মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করেছি। বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের দ্বিধা ছিল। মশাররফ কিন্তু তখন স্পষ্টভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রতি পক্ষপাত দেখান। 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

> ১. বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশ-ভাষা বা মাতৃভাষা 'বাংলা'। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে। . . . ইস্তক ঘরকন্নার কার্য্য নাগাএদ রাজসংশ্রবী যাবতীয় কার্য্যে বঙ্গবাসী মুসলমানদের বাংলা ভাষার প্রয়োজন।[৯]

'রত্নবতী' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন ঃ

> ২. ভাষাসঙ্গতি ও গল্পের বুনন যতদূর পরিয়াছি, সামঞ্জস্য রাখিতে ত্রুটি করি নাই।[১০]

'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থে মহরম পর্বের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

> ৩. . . . মহরমের মূল ঘটনাটি বঙ্গভাষাপ্রিয় প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদসিন্ধু' মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল। বিজ্ঞমণ্ডলী ইহাতে যদি কোন প্রকার দোষ বিবেচনা করেন, সদয়ভাবে মার্জ্জনা করিবেন।[১১]

'বিষাদসিন্ধু'র প্রথম পর্ব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমালোচকরা এর ভাষা নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এর জবাবেই তিনি জানান—

> ৪. বিষাদসিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মুর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর

কিছুই নহে, পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্বে বাঙলা ভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে। (উদ্ধারপর্ব, চতুর্থ প্রবাহ)।[১২]

এখানে উদ্ধৃত ১ নং উক্তি থেকে বোঝা যায় সেকালে বাঙালী মুসলমান সমাজ মাতৃভাষার প্রশ্নে বাংলা না উর্দুকে গ্রহণ করবেন তা নিয়ে টানাপোড়েনে ছিলেন। মশাররফ তখন নির্দ্বিধায় বাংলাকেই সাহিত্যচর্চার বাহন করার পক্ষপাতী ছিলেন। ২নং উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর প্রথম গদ্যরচনা 'রত্নবতী' থেকেই তিনি সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ৩নং মন্তব্যে তিনি জাতীয় শব্দ বলতে বস্তুত আরবী ফারসী শব্দকেই বুঝিয়েছেন। এই তৃতীয় এবং ৪নং মন্তব্যে তিনি সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের বিষয়ে তাঁর মত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আসলে তিনি তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত তৎসম শব্দনির্ভর গদ্যভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য শব্দ ছাড়া বেশি আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারে তাঁর অনীহা ছিল। কেননা উনিশ শতকে বাংলাদেশে হিন্দু সাহিত্যিকগণ বাংলা গদ্যে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারকে 'অসাহিত্যিক কাজ' বলে নিন্দে করতেন। তখন সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশংসা প্রয়োজন ছিল। তাঁরাই বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার জন্য মুসলমান লেখকদের বেশি উৎসাহ দিয়েছিলেন।[১৩] অবশ্য সামাজিক ও শাস্ত্রীয় কারণে তিনি আরবী ফারসী ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবু এই ভাষার প্রশ্নে তাঁকে সমসাময়িক মুসলমান সমালোচকের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। এ সব ক্ষেত্রে মীর মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি উনিশ শতকের প্রবহমান গদ্যশৈলীর নির্মাণে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হওয়াকেই গৌরবের বিবেচনা করতেন। সমকালীন 'মুসলমানী' শব্দ স্রোতের গড্ডলিকা প্রবাহে অনর্থক অবগাহনে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। অবশ্য আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারে তাঁর কোন অশ্রদ্ধা ছিল না, কেবল তিনি অনর্থক কোন বিদেশি শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না।[১৪] বরং তৎকালীন বাংলা ভাষা সাহিত্যের যে মূল প্রবাহ তারই সঙ্গে নিজেকে অন্বিত করে রাখতে চেয়েছিলেন।

মীর মশাররফের গদ্যরীতি

মীরের প্রধান প্রধান গদ্য রচনাগুলিকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্যে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। যেমন–

১. উপন্যাস ও আত্মজীবনীমূলক রচনা
২. প্রবন্ধ জাতীয় রচনা
৩. নাটক ও প্রহসন জাতীয় রচনা

১. উপন্যাস ও আত্মজীবনীমূলক রচনা

রত্নবতী

'রত্নবতী'র কাহিনী ও সংলাপ – উভয়ই পুরোপুরি সাধুগদ্যরীতিতে রচিত। এর ভাষা তৎসম শব্দ-নির্ভর গদ্য। তবে সেকালের প্রেক্ষাপটে এর গদ্যভাষা যথেষ্ট প্রাঞ্জল এবং প্রসাদগুণ-মণ্ডিত। মীরের প্রথম রচনা হলেও সাধুচলিতে কোন মিশ্রণ-দোষ এতে নেই। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায় ঃ

এদিকে সূর্য্য অস্ত হইল। নিশানাথ সহচরগণে বেষ্টিত হইয়া জনগণের মনোরঞ্জন করিতে করিতে

> পূর্বদিক হইতে উদিত হইলেন। ভূপতি সমস্ত রাত্রি চঞ্চলভাবে জাগিয়া কাটাইলেন। নিদ্রা মহারাজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার নেত্রাসনে উপবেশন করিলেন না। (২য় পরিচ্ছেদ)।

উদ্ধৃত অংশ থেকে 'রত্নবতী'র গদ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ১. তৎসম শব্দবহুল ভাষার প্রয়োগ, ২. অসমাপিকা ক্রিয়াপদযোগে বাক্য দীর্ঘায়িত, অথচ বাক্য সরল, ৩. অলঙ্কার প্রয়োগে গদ্যকে সৌন্দর্যভূষিত করবার প্রবণতা এবং ৪. সমাজবদ্ধ পদের ব্যবহার। এই গ্রন্থের ভাষার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, হয়তো এর বিষয় ও পরিবেশের কারণে এতে একটিও আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। সম্ভবতঃ এ কারণেই 'ক্যালকাটা রিভিউ' মন্তব্য করেছিল যে, কোন অমুসলমান লেখক মুসলমানী ছদ্মনামে গ্রন্থটি রচনা করেন।[১৫]

'রত্নবতী' গ্রন্থের গদ্যে স্ত্রী-লিঙ্গের বিশেষণে বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন—চতুরা সহচরী, ইচ্ছানুবর্ত্তিনী কিঙ্করী প্রভৃতি। সংস্কৃত রীতির সম্বোধনের বিভক্তিও ব্যবহার করেছেন। যেমন — মিত্র, প্রভো, বৎসে ইত্যাদি। "মিত্র! বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন ধনীরা বিজ্ঞলোকের ন্যায় নিত্য চিত্তসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন না"[১৬] (পৃ.৫০)। "বৎস! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি" (পৃ. ৬৪)। "প্রভো ! এখন উপায় কি দেখিতেছ" (পৃ. ৭৩)।

আলাপচারিতার ঢঙে পাঠকদের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করে নিয়ে কাহিনী উপস্থাপন কৌশল এতে অনুসৃত হয়েছে। যেমন—

> পাঠক মহাশয় ! রাজকুমার সুকুমার রত্নপুরের কারাগারে থাকুক, আসুন আমরা মন্ত্রিপুত্র সুমন্তের অন্বেষণ করি। তিনি কোথায় ? আসুন, দেখিতে পাইবেন। (২য় পরিচ্ছেদ)।

চরিত্রের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের উপযোগী হয়েছে এ গদ্য। ঘটনার পরিস্থিতি বোঝাতে তিনি গদ্যকে কাব্যিক ও ব্যঞ্জনাময় করে তুলতেও সক্ষম হয়েছেন। এই উপাখ্যানের রাজকুমার সুকুমারের আসন্ন বিপদের মুহূর্তকে লেখক এভাবেই বর্ণনা করেছেন,—

> এই সময় দিননাথ অস্তাচলে গমন করিলেন। দিকসকল যেন ভূপতিপুত্রের ভাবী দুঃখেই মলিনা হইল। নির্ব্বোধ রাজপুত্র দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া রজনীর অন্তকাল মুহুর্মুহুঃ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। (প্রথম পরিচ্ছেদ)।

এই উপাখ্যানে যমক, উপমা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষার সৌন্দর্য দানও করেছেন। যেমন—

যমক — মহারাজ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অন্তরের চিন্তা অন্তর করুন। (পৃ. ৭৪)।

উপমা — উভয়ের চিত্তে জলধিতরঙ্গের ন্যায় প্রণয়-হিল্লোল বহিতে লাগিল।

সমাসোক্তি — কুমুদিনী কান্ত বিরহে মলিনী হইয়া সলিলে ডুবিল। (পৃ. ৭৫)।

চিত্রকল্প নির্মাণেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন—

> শশিসীমন্তিনী যামিনী রাজপুত্রের ভাবী দুঃখে দুঃখিনী হইয়া গমন সময়ে বিহগকুলের কলরবই ক্রন্দন এবং শিশির পতনচ্ছলেই যেন অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। (১ম পরিচ্ছেদ)।

'রত্নবতী'র ভূমিকায় মশাররফ ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে যে সচেতন ছিলেন তা জানিয়েছেন এবং তার সদ্ব্যবহার যে তিনি করতে পেরেছেন তার প্রমাণও এতে আছে। এ কারণে সেকালে অনেক সমালোচক এর বিষয়বস্তু বা কাহিনী-নির্মাণের তেমন প্রশংসা না করলেও ভাষার সৌন্দর্য বিষয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। 'ঢাকা প্রকাশ' এর ভাষাকে যেমন অতি সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ[১৭] বলে বর্ণনা করেছে, তেমনি 'রহস্য সন্দর্ভ' মন্তব্য করে – "ইহার রচনা কোন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতের বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।"[১৮] এমন কি একালের সমালোচকগণও এর রচনাগুণের প্রশংসা করেছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "এর ভাষাভঙ্গিমা পরিচ্ছন্ন সাধু রীতিকেই অনুসরণ করেছে। প্রায় কোথাও জড়তা বা অনভ্যস্ততা নেই।"[১৯] বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে ডঃ কাজী আবদুল মান্নান বলেন, "মশাররফ হোসেনের প্রতিভার চমৎকারিত্ব এই যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও তাঁর প্রথম গ্রন্থেই বলিষ্ঠ এবং সুললিত ভাষা ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।"[২০] সুতরাং দেখা যায়, 'রত্নবতী' প্রথম রচনা হলেও এর গদ্যরীতি ও ভাষাভঙ্গিমায় মশাররফ দক্ষতা দেখিয়েছেন। এরই আরো বিকশিত রূপ লক্ষ করা যাবে 'বিষাদসিন্ধু'তে।

বিষাদসিন্ধু

'বিষাদসিন্ধু'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর ভাষা। এই ভাষায় বিদ্যাসাগরী ও বঙ্কিমী প্রভাব[২১] লক্ষ করা গেলেও সচেতন পাঠক 'বিষাদসিন্ধু'র ভাষাশৈলীতে মীরের অনন্যতা আবিষ্কার করতে পারবেন।

'বিষাদসিন্ধু' সাধু গদ্যভাষায় রচিত। সবই সাধুরীতির দীর্ঘ ক্রিয়াপদ। অধিকাংশ শব্দ তৎসম। তবে তৎসম শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য নেই। এমনকি পূর্ববর্তী 'রত্নবতী' গ্রন্থের তুলনায় এতে তৎসম শব্দের হার অনেক কম। আবার তৎসম শব্দের প্রাধান্যের তুলনায় আরবী ফারসী শব্দের সংখ্যা অতি নগন্য। জনৈক সমালোচক জানিয়েছেন, 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থে আনুমানিক একলক্ষ শব্দ রয়েছে, এর মধ্যে দুই শতেরও কম আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (পুনরুক্তি ছাড়া)।[২২] তাও যে তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা ব্যবহার করেছেন এমন নয়। নেহাৎ শাস্ত্র ও সমাজের অনুশাসনের দিকে তাকিয়ে তা করেছেন। এছাড়া বিষয়, পরিস্থিতি ও পাত্রভেদে কখনো কখনো লোক-ব্যবহারের প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সাধুসম্মত গদ্য বাক্যের সচলগতিকে তিনি অক্ষুন্ন রেখেছেন।

শব্দ প্রয়োগের চরিত্রটি বুঝতে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

> ঈশ্বর-প্রণয়ী এব্রাহিম, – যাঁহাকে ঈশ্বরদ্রোহী রাজা নমরূদ প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া সত্য প্রেমিকের প্রাণসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যে অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী হইয়া জগজ্জনের চক্ষে ধাঁধা দিয়াছিল—দয়াময়ের কৃপায় সে প্রজ্জ্বলিত গগনস্পর্শী অগ্নি এব্রাহিমচক্ষে বিকশিত কমলদলে সজ্জিত উপবন, অগ্নিশিখা সুগন্ধযুক্ত স্নিগ্ধকর গোলাপমালা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, — সে সত্য বিশ্বাসী মহাঋষি আজ কারবালা ক্ষেত্রে সমাগত। (উদ্ধার পর্ব ঃ ৪র্থ প্রবাহ)।

উদ্ধৃত অংশটি একটি দীর্ঘ প্রলম্বিত জটিল বাক্য। একাধিক উপবাক্য যোগে বাক্যটি গঠিত। সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারও রয়েছে যথেষ্ট। বেশীর ভাগই তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ বেহেশতবাসী পয়গম্বরের ভাবমূর্তি ও পরিবেশ প্রকাশ করতে আরবী ফারসী শব্দ প্রয়োগের অবকাশই ছিল বেশি। কিন্তু লেখক তা করেননি।

অবশ্য আরবী ফারসী শব্দযুক্ত বাক্যও তিনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু খুব স্বল্পক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে কখনো কখনো বন্ধনীর ভেতরে কোন কোন বিদেশী শব্দের অর্থ লিখে দিয়েছেন। যেমন, —

> হাসান সন্ধ্যাকালীন উপাসনা সমাধা করিয়া তস্‌বি (জপমালা) হস্তে উপাসনা মন্দিরের সম্মুখে পদচালনা করিয়া ঈশ্বরের নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় একজন ফকির জাতীয় প্রথানুসারে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ফকিরের মলিন বেশ, শত গ্রন্থিযুক্ত পিরহান, মলিন বস্ত্রে শির আবৃত, গলায় প্রস্তরের তস্‌বি, হস্তে কাষ্ঠযষ্টি। হাসানের কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বৃদ্ধ বলিলেন, 'প্রভো! আমি একটি পর্বতের উপর বসিয়া ছিলাম। দেখি যে, একজন কাসেদ আসিতেছে, হঠাৎ ঈশ্বরের নাম করিয়া সেই কাসেদ ভূতলে পতিত হইল।' (মহরম পর্ব ঃ সপ্তম প্রবাহ)।

এখানে তস্‌বি, ফকির, সির, পিরহান, কাসেদ — পাঁচটি আরবী ফারসী শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে।

'বিষাদসিন্ধু'তে তদ্ভব শব্দের ব্যবহারও প্রচুর দেখা যায়। এমন কি কথ্যভাষার শব্দও প্রয়োগ করেছেন — কখনো বর্ণনায়, কখনো কথোপকথনে। যেমন বর্ণনার একটি অংশ ঃ

> এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইল। চক্ষের বাঁধা ছুটিয়া গেল। প্রাণ চমকিয়া উঠিল। (মহরমপর্ব ঃ ২৩শ প্রবাহ, পৃ. ৯৭)।

সংলাপের একটি অংশ ঃ

> সে কথা আর কি বলিব। আমার কপাল মন্দ, আমার চক্ষে পড়িবে কেন ? সারাটি দিন আর এই রাত্রির এক প্রহর পর্যন্ত কত গলি-পথ, কত বড় রাস্তার দোধারী ঘরের কোণের আড়ালের মধ্যে, কত ভাঙ্গা বাড়ীর বাহিরে ভিতরে, কত স্থান খুঁজিলাম। আমার এ পোড়া অদৃষ্টে তাহা ঘটিবে কেন ? (মহরমপর্ব ঃ ২৩শ প্রবাহ)।

'বিষাদসিন্ধু'তে বাক্য গঠন প্রক্রিয়ায় লেখক বৈচিত্র্যের অনুসারী। এই বাক্য নির্মাণে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—

প্রথমত, গদ্যে বাক্যের কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়াপদের অবস্থানের রীতিটিকেই তিনি প্রধানভাবে আশ্রয় করেছেন। রীতি বিচারে তাই এটি সরল গদ্য রীতি।[৩৩] ভাষা সুললিত এবং প্রাঞ্জল। এই সরলরীতির বাক্যেই তিনি ধ্বনি-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন—

> রোগীর পথ্য লইয়া জয়নাব সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জায়েদা আড়নয়নে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মায়মুনাও হাসনেবানুর সাড়া পাইয়া আস্তে আস্তে গৃহ ত্যাগ করিল। (মহরমপর্ব ঃ ১৫শ প্রবাহ)।

আবার কখনো ক্রিয়াপদ উহ্য রেখে বাক্যের রূপ পরিবর্তন করে চিত্রগুণ সৃষ্টিতেও সক্ষম। যেমন—

> যুদ্ধকাণ্ড বড়ই কঠিন। সামান্য বিবেচনার ত্রুটিতে সর্বস্ব বিনাশ। লক্ষ প্রাণীর প্রাণ মুহূর্তে ধ্বংস ?

বড়ই কঠিন ব্যাপার! দামেস্ক রাজ্যের যে সময় উপস্থিত, এ সময় যুদ্ধ করাই অন্যায়। (এজিদবধ পর্ব ঃ ১ম প্রবাহ)।

এছাড়াও কখনো অসমাপিকা ক্রিয়াপদের উপস্থাপনার কৌশলও গদ্যকে গতি ও প্রাণ দান করেছে।

প্রশ্নবোধক বাক্যকে পর পর সাজিয়ে একটি চিত্রকে জীবন্ত ও চলমান করে তোলা মশাররফের একটি প্রিয় বিষয়। সমগ্র 'বিষাদসিন্ধু'তে এই রীতি ছড়িয়ে আছে। একটি দৃষ্টান্ত,

সীমার নাই ? আমার চিরহিতৈষী সীমার নাই ? মহাবীর সীমার ইহজগতে নাই ? হায় ! যে বীরের পদভরে কারবালা প্রান্তর কাঁপিয়াছে, যাহার অস্ত্রের তেজে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, হোসেন-শির দামেস্কে আসিয়াছে, সেই সীমার নাই ? কে তাহার প্রাণ হরণ করিল ? (উদ্ধার পর্ব ঃ ২০শ প্রবাহ)।

সম্বোধন করে বলা 'বিষাদসিন্ধু'র ভাষাশৈলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সম্বোধনে কৌতূহলের যেমন প্রকাশ আছে, তেমনি আছে নাটকীয় গতিবেগ ও দ্যোতনা সৃষ্টির ক্ষমতা। উপন্যাসের চরিত্রের উদ্দেশ্যে লেখকের বক্তব্য। যেমন,

সীমার! এ শিরে তোমার আবশ্যক কি ? হোসেন তোমার কি করিয়াছিল ? তুমি ত আর জয়নাবের রূপে মোহিত হইয়াছিলে না ? (উদ্ধার পর্ব ঃ ২য় প্রবাহ)।

'বিষাদসিন্ধু'তে মীর উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে যেমন কথা বলেন তেমনি পাঠককেও তাঁর সঙ্গী করে নেন। পাঠককে সম্বোধন করে ঘটনাটি তার সামনে শুধু দৃশ্যমান করে তোলেন না, পাঠককেও সেই ঘটনার সাক্ষী করে তোলেন। পাঠককে সম্বোধন করে বলার এই রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হোমারের ইলিয়াদেও এই রীতি দেখা যায়।[২৪] সমকালে বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে পাঠককে সম্বোধন করে কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে মীর প্রচলিত রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন, এজিদ বধ পর্বের প্রথম প্রবাহে এজিদের পরাজয়ের একটি দৃশ্যে পাঠকদের জানাচ্ছেন ঃ

পাঠক! চুপি চুপি কথা আর কিছু নহে, আমাদের জানা কথা– গত কথা, যুদ্ধের বিবরণ এবং এজিদের পলায়ন, এই সংবাদ।

চলুন, অন্যদিকে যাওয়া যাক। শুনিতেছেন ? শুনিতে পাইতেছেন ? স্ত্রী-কণ্ঠ। বুঝিতে পারিতেছেন ? কি কথা, একটু অগ্রসর হইয়া শুনুন।

কোন কোন সময় এই গ্রন্থে ক্ষুদ্র বাক্য থেকে ক্রমশঃ দীর্ঘ বাক্য পর পর গ্রথিত করে ভাবনা, কল্পনা কিংবা অনুভূতি প্রকাশ করবার পদ্ধতি লেখক অবলম্বন করেছেন।

আশা মিটিবার নহে। মানুষের মনের আশা পূর্ণ হইবার নহে। ঘটনার সূত্রপাত হইতে শেষ পর্যন্ত অনেকের মনে অনেক প্রকারের আশার সঞ্চার হয়। আশার কুহকে মাতিয়া, অনেকে পথে অপথে ছুটিয়া বেড়ায়। (এজিদ বধপর্ব ঃ ৪র্থ প্রবাহ)।

অথবা,

রে পথিক! রে পাষানহৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ ? (উদ্ধার পর্ব ঃ ২য় প্রবাহ)।

'বিষাদসিন্ধু'তে ধ্বনিঝঙ্কৃত, গতিশীল এবং ছন্দোময় বাক্যে যুদ্ধের মেজাজ, যোদ্ধার রণোন্মত্ততা এবং ঘটনার দ্রুততা পরিস্ফুট হয়েছে। এক্ষেত্রে বাক্যগুলি ছোট ছোট। এজিদের প্রতিপক্ষ জনৈক গাজী রহমানের কথোপকথনে সেই সুরেলা ধ্বনিঝঙ্কার ঃ

> ভ্রাতৃগণ! চিন্তা কি ? সাজ সমরে! বন্ধুগণ ! সাজ সমরে – বাজাও ডঙ্কা, – উড়াও নিশান, – ধর তরবারি – ভাঙ্গ শিশির – মার এজিদ্ – চল নগরে – দাও আগুন, পুড়ুক দামেস্ক। (উদ্ধার পর্ব ঃ ২৬শ প্রবাহ)।

মীর মশাররফ জীবনের ছোট বড় প্রতিটি ঘটনার ওপর সমান মনোযোগ অর্পণ করেন, কথা বলেন অনেকটা জায়গা জুড়ে। মীরের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার বাক্যরচনা পদ্ধতিকে জনৈক সমালোচক পারাতাক্সিস রীতি বলেছেন।[২৫] এই রীতিতে পৃথক পৃথক বক্তব্য পর পর বিন্যস্ত হয়। 'বিষাদসিন্ধু'র একটি দৃষ্টান্ত ঃ

> ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ, ব্যাধির শেষ, শত্রুর শেষ থাকিলে ভবিষ্যতে মহাবিপদ। (মহরম পর্ব ঃ ১২শ প্রবাহ)।

এখানে 'শেষ' শব্দটির একবার প্রয়োগ থাকলেও চলত। কিন্তু শব্দটিকে লেখক বার বার ফিরিয়ে এনে ঋণ, অগ্নি, ব্যাধি ও শত্রু সকলকেই পৃথকত্ব ও গুরুত্ব দিয়েছেন।

সুষম যতি-বিন্যাস গদ্যের মূল ধর্ম নয়। কিন্তু গদ্যে দেখা যায় ঃ

> In prose the rhythmic pattern is much less marked. Rhyme and metre are not used, though alliteration frequently in, but rhythm is present to a greater or lesser degree.[২৬]

তাছাড়া,

> Prose rhythm is a matter of Emphasis, it is putting the important words where they sound important. It is a matter of coherence; it is putting the right idea in the right place.[২৭]

বলা বাহুল্য, এই ছন্দোবদ্ধ গদ্যের উত্থান-পতনের মধ্যে প্রতিভাসিত। যদিও তার কোন পরিমাপ বা সুনিয়মিততা নেই। প্রকৃতপক্ষে তাই, অনিয়মই গদ্যের ছন্দস্পন্দ।[২৮] মশাররফ 'বিষাদসিন্ধু'র গদ্যে অসমমাত্রিক বিন্যাসে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। একটি উদাহরণই যথেষ্ট ঃ

> উভয় দলই উষা-দেবীর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। ক্রমে প্রদীপ্ত দীপশিখার তেজ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল— ঘোর অন্ধকারে তরলতা প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাতবায়ুর সহিত ক্ষণস্থায়ী উষাদেবী ধবল বসনে ঘোমটা টানিয়া, পূর্বদিক হইতে রজনীদেবীকে সরাইয়া সরাইয়া দিনমণির আগমন-পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। উভয় দলই পরস্পরের চক্ষে পড়িল। (উদ্ধার পর্ব ঃ ১১শ প্রবাহ)।

'বিষাদসিন্ধু'তেও মশাররফ বিশেষণ ও ক্রিয়াপদে স্ত্রীলিঙ্গের বিভক্তি ব্যবহার করেছেন। যেমন – 'হাসনেবানু হাসানের প্রধানা স্ত্রী সকলের মাননীয়া' (বিষাদসিন্ধু, পৃ. ২৫), 'জায়েদা যেন স্বামীর বন্দিনী। প্রাণবিনাশিনী বলিয়া অপরাধিনী' (পৃ.৭২), 'জায়েদা রজতাসনে আসীনা, মায়মুনা কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ঠা।' (পৃ. ৭২) প্রভৃতি।

এ গ্রন্থে মীরের বাগ্‌ভঙ্গিমাও প্রশংসনীয়। ভাবপ্রকাশ করতে অনুপ্রাস, যমক, উপমা, রূপক, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের আশ্রয় নিয়েছেন এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন –

যমক — জীবনই মানুষের একমাত্র জীবন। (মহরমপর্ব ঃ ১৫শ প্রবাহ, পৃ. ১৩০)।

রূপক — এজিদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেল। (উদ্ধারপর্ব ঃ ৩০ প্রবাহ, পৃ. ২৪৬)।

ব্যতিরেক — প্রস্ফূটিত গোলাপদল বিনিন্দিত জয়নাবের সুকোমল বদন মণ্ডলের আভা . . .। (মহরম পর্বঃ ৬ষ্ঠ প্রবাহ, পৃ. ২১)।

সমাসোক্তি — স্বার্থপ্রসবিনী গর্ভবতী আশা যতদিন সন্তান প্রসব না করে, ততদিন আশাজীবী লোকের প্রশংসিত মানসাকাশে ইষ্টচন্দ্রের উদয় হয় না। (মহরম পর্ব ঃ ২৩শ প্রবাহ, পৃ. ৮৭)।

চিত্রকল্প নির্মাণেও তাঁর পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য। 'বিষাদসিন্ধু'র সমগ্র কাহিনীর পরিণাম-জ্ঞাপক বর্ণনায় এর পরিচয় আছে।

> এখন আর সূর্য নাই। পশ্চিম গগনে মাত্র লোহিত আভা আছে। সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা খুলিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। (এজিদবধপর্ব ঃ ৫ম প্রবাহ, পৃ. ২৭৯)।

অবশ্য মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যরচনায় কখনো কখনো একই শব্দের বহু ব্যাখ্যানির্ভর সমান্তরাল গঠনের বাক্যরচনা মনে হয় গদ্যের পক্ষে ভার হয়ে উঠেছে। তার স্বাভাবিক গতিময়তা ও সৌন্দর্য যেন তাতে ক্ষুন্ন হয়। যেমন, উদ্ধার পর্বের ২১শ পরিচ্ছেদের প্রথমে দুরাশা শব্দটিকে একাধিক উপমানের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন।

তবু 'বিষাদসিন্ধু'র এই ভাষা সম্পদের জন্যেই গ্রন্থটি সমকালে সাহিত্যিকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। 'চারুবার্ত্তা' লিখেছিল ঃ

> ইনি যেরূপ বিশুদ্ধ ও সুমধুর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন অনেক শিক্ষিত হিন্দু তেমন লিখিতে পারেন না।[২৯]

'বঙ্গবাসী'ও (২৭ বৈশাখ ১২৯২) মন্তব্য করে ঃ

> যেরূপ সুন্দর, সুললিত, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় গ্রন্থখানি রচিত, তাহাতে হোসেন সাহেবকে বাহাদুর বলিতে হয়।[৩০]

সুলভ সমাচার, ঢাকা প্রকাশ, ভারতী[৩১] প্রভৃতি পত্রিকাও অনুরূপ মত ব্যক্ত করে এর ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করেন। 'বিষাদসিন্ধু'র ভাষা প্রসঙ্গে গদ্যশিল্পী মীরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একালের সমালোচক ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্যটি করেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

> মীর সাহেব একজন সার্থক গদ্যশিল্পী। আজ থেকে এক'শ বছর আগে তিনি গদ্যবাহনকে আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী চালনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বীররস, করুণরস, শৃঙ্গাররস, ভয়ানকরস–

সবেতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার। পরম্পরিত বাক্যরচনায় ও তার সমতা রক্ষায় মীর সাহেবের নৈপুণ্য অবশ্য স্বীকার্য। বিবরণাত্মক গদ্য, আবেগপূর্ণ গদ্য, যুক্তিপূর্ণ গদ্য ও গূঢ় মনোভাব প্রকাশক গদ্য রচনায় মীর সাহেবের কৃতিত্ব . . . অনায়াস লক্ষণীয়।[৩২]

উদাসীন পথিকের মনের কথা

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র গদ্যরীতি 'বিষাদসিন্ধু'র গদ্যের মতো উজ্জ্বল ও অলংকারময় নয়। এর কাহিনীর বুনন যেমন শিথিল তেমনি এর ভাষাভঙ্গিও অনেকটা সরল হয়ে এসেছে। 'রত্নবতী' এবং 'বিষাদসিন্ধু'র ভাষা ছিল আলঙ্কারিক। সেখানে তিনি তৎসম শব্দবহুল বিশুদ্ধ বাক্য রচনা করেছেন। আলঙ্কারিক রীতি প্রয়োগ করে ভাষাকে আবেগ প্রকাশের বাহন করে তুলেছেন। কিন্তু 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় দেখতে পাই তাঁর গদ্যে পূর্বের গুরু গম্ভীরভাব অনেকটা সরে গিয়ে হয়ে উঠেছে অনেক সরল এবং আন্তরিক। এখানে তৎসম শব্দের ব্যবহার কমেছে, যদিও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ খুব বেশি হয়নি। বিশেষত যেখানে সাধুরীতির গদ্যে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া আরবী ফারসী শব্দও কম। কথ্য ভাষাভঙ্গি এবং সেইসূত্রে কিছু আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

তৎসম শব্দ-কেন্দ্রিক তাঁর রচনাভঙ্গির মধ্যেও অপরূপ মোহনীয়তা অনুভব করা যায়। একটি দৃষ্টান্ত ঃ

> কালিগঙ্গার পশ্চিমপারেও ঐ রূপ আলো, ঐ প্রকার বিকট রব, – মাঝে মাঝে ভয়ানক চিৎকার, – দেখিতে দেখিতে কালিগঙ্গার পশ্চিমতট আলোক মালায় পরিশোভিত হইল–জলে স্থলে জ্বলন্ত মশালের শিখা অধো উর্দ্ধভাবে প্রভাতবায়ুর প্রতিঘাতে হেলিতে দুলিতে লাগিল। চমৎকার দৃশ্য!! সে সুদৃশ্য বেশীক্ষণ থাকিল না। ঊষাদেবী পূর্ব্বদিক হইতে দুহাতে অন্ধকার সরাইয়া চারিদিক পরিষ্কার করিয়া দিলেন। (দ্বাদশ-তরঙ্গ/ মশাররফ রচনাসম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৭-৪৪৮)।

এ রকম তৎসম শব্দ-নির্ভর গদ্য 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় খুব বেশি নেই। তদ্ভব শব্দের আশ্রয়ে ও সহজ সরল মৌখিক ভাষায় লেখা গদ্যেরই প্রাধান্য। যদিও সমগ্র গ্রন্থটি সাধু ভাষায় লিখিত।

আঞ্চলিক ভাষার কিছু শব্দ এই গদ্যে ব্যবহৃত হয়েছে যা সাধারণতঃ সাহিত্যিক ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যেমন 'বাঁধা'র স্থানে 'বান্দা', 'অন্ধকার' স্থানে 'আন্ধার', কাঁদা স্থানে 'কান্দা' প্রভৃতি। মনে হয় উপভাষার শব্দ তাঁর শ্রবণ ও বাচন থেকে তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। এর ফলে আলংকারিক গদ্যভাষায় রচিত সাহিত্যের তুলনায় তাঁর এই সব লেখায় লোকজীবনের ভাষার জীবন্ত স্পর্শ পাওয়া যায়। সাহিত্যিক নির্মাণ হিসেবে তাঁর গদ্যের শ্রী যত গুরুত্বপূর্ণই হোক এই শ্রেণীর গদ্যের ভাষার প্রাণধর্মে এ ধরণের সাহিত্যিক রচনাগুলি সজীব হয়ে উঠেছে। এই প্রবণতা তাঁর পরবর্তী রচনা 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী' ও আত্মজীবনীমূলক রচনা দুটিতেও লক্ষ করা যায়। জনৈক সমালোচনক একে 'পূর্ববঙ্গীয় লক্ষণ' বলেছেন।[৩৩] মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল একে 'বাধক্যজনিত কারণ' ও লেখকের 'অমনোযোগিতা'র ফল বলে মনে করেছেন।[৩৪] আমাদের মনে হয়, কথোপকথনে এই আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগও চরিত্রগুলির বিশেষত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন—

> কালুর মা হরনাথের পদতলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে বাবা! আমার ঐ একটী ছেলে। বড় দুঃখে ওকে বড় করেছি। ভিক্ষা করে,—নিজে পেটে না খেয়ে বাবাকে খাওয়াইয়ে মানুষ করিছি। ওর বয়স যখন সাড়ে চার বছর সেই সময় ওর বাপ মারা গেছে। আরে আল্লা! সে কথা না আমার মনে গাঁথা আছে। হায়! হায়! এখনও কল্‌জে ফেটে যায়, এই সাহেবই তার হাত, পা টানা দিয়ে গাছে বেঁধে মার দিয়েছিলেন। তাতেই সারা। যে বিছানায় পলো, আর উঠে বসলোনা। আর ধানের ভাত মুখে গেল না। পেট দিয়ে থানা থানা রক্ত পড়ে মাস খানেক ভুগে ভুগে যেখানকার লোক সেইখানে চলে গেল। দুট মুখের কথা কয়ে দেলসা দেয়, এমন লোক দুনিয়ায় আমার কেউ ছিল না।" (অষ্টম তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮)।

অথবা,

> প্রথম প্রজা॥ ভায়া। যা হবার হয়েছে। এখন দেখে শুনে, ভুগে পাকা না হয়ে থাকি, একটুকু যেন শক্ত হয়েছি। আর এ কয়েক দিনে দেখলেম অনেক শুনলেমও অনেক। ধাঁদা কেটে গিয়েছে। নীলকর সাহেবরা যে আমাদের রাজা নয় সে জ্ঞানটা ভালই জন্মেছে। ভায়া রাজার ভাবই ভিন্ন। (৩০শ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৯)।

বাক্যগঠন সাধু গদ্যে। তবে এক্ষেত্রেও তিনি বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। একই অনুচ্ছেদে তিনি কখন দীর্ঘ জটিল বাক্য আবার কখন ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করেছেন। এইভাবে তাঁর বক্তব্য বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে গদ্যকে নানা ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। একটি উদাহরণ দিলে তাঁর গদ্যের এই তরঙ্গায়িত রূপটি পরিষ্কার হবে। যেমন–

> যে জামাই শত হস্ত ব্যবধান থাকিতে সেলামের উপর সেলাম বাজাইয়া শ্বশুরের নিকট ভক্তি প্রকাশ করিত, স্নেহ আকর্ষণের আকর্ষণী ফেলিয়া শ্বশুরের মনকে শতহস্ত দূর হইতে টানিয়া লইত, আজ সেই জামাই স্বয়ং তরবারী হস্তে বুক ফুলাইয়া চক্ষু উল্টাইয়া সজোরে দণ্ডায়মান। চাকরের হস্তে বন্দুক। সেলাম আলায়কুমের নামও মুখে নাই। ইহার পর দেবীপ্রসাদের ঐ কথা। জামাইবাবু এখন পর্য্যন্ত কিন্তু নীরব। আজ কে কাহার অভ্যর্থনা করে। আজ কে মীর সাহেবকে মান্য করে? সর্দ্দার, লাঠিয়াল এবং অন্য অন্য আরও অনেক হাত সেখানে ছিল, কিন্তু মীর সাহেবকে সেলাম বাজাইতে আজ কোন হাতই উপরে উঠিল না। (২৫শ তরঙ্গ/১ম খণ্ড পৃ.৫৫৩)।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে "যে জামাই .... দণ্ডায়মান" এই দীর্ঘ জটিল বাক্য যেমন রয়েছে তেমনি তারপরেই "চাকরের হস্তে বন্দুক। .... মান্য করে ?" এইগুলি ছোট ছোট বাক্যও রয়েছে। আবার পরক্ষণেই "সর্দ্দার ... উঠিলনা" দীর্ঘ বাক্যটি দিয়ে অনুচ্ছেদ শেষ করা হয়েছে। এইভাবে তিনি একই অনুচ্ছেদে নানা বাক্য গঠনে যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তেমনি গদ্যের মধ্যে একটা ছন্দের দোলা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

'রত্নবতী' ও 'বিষাদসিন্ধু'র মতো 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়ও স্ত্রীলিঙ্গের ক্রিয়া বা বিশেষণে বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'রত্নবতী' এবং 'বিষাদসিন্ধু'র মতো এ গ্রন্থেও মশাররফ পাঠকদের সম্বোধন করে আলাপচারিতার ঢঙে কথোপকথন, নাটকীয় কৌতূহল তৈরি করে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও পরবর্তী ঘটনার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করেছেন। যেমন—

> পাঠক! আগন্তুক নূতন লোক নহেন। আপনাদের পূর্ব্ব পরিচিত ম্যাজিষ্ট্রেট। (দ্বাদশ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮)।

অথবা,

> পাঠক! বিরক্ত হইবেন না। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া পথিকের মনের কথা শুনিয়া যাইবেন। (পঞ্চদশ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ.৪৬৫)।

অথবা,

> পাঠক! প্যারীসুন্দরীর প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইয়া অন্য কথা আরম্ভ হইল। (চতুর্দশ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯)।

এই গ্রন্থে মীরের গদ্য সহজ সরল অথচ কখনো কখনো তার মধ্যে সঙ্গীতময়তা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা বেশ অনুভব করা যায়। পরিবেশ-সৃষ্টিতে সেই ভাষাও বেশ মানানসই হয়ে উঠেছে। যেমন—

> শয্যা হইতে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতবায়ু জানালার খড়খড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার রেসমী বসন সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দোলিত পাখার ঝালর মৃদু মৃদু নড়িতেছে। (ষষ্ঠ তরঙ্গ)।

এই ভাষার মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত মাঝে মাঝে অনুরণিত হয়েছে। এই ধারাই পরবর্তীকালে 'গাজীমিয়ার বস্তানী'তে তীক্ষ্ণ ও সার্থকতামণ্ডিত হয়। যেমন—

> সকল কাজেই ব্যস্ততা, হৃদয়েও বল বেশি নাই। নিজের ঘর সামাল না করিয়া পরের ঘরে আগুন দিতে খুব পটু। ধরিতে গেলে কোন শক্তিই তোমাদের নাই। কিন্তু লম্ফে ঝম্ফে খুব মজবুত। (৩২শ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, ৫৭১)।

অথবা,

> নানা পথে, নানা ভাবে, নানা আকারে, যে যে প্রকারে সুবিধা সুযোগ পাইল, প্রাণ লইয়া কুঠীমুখে ছুটিল। ছুটিল কি ? পালাইল। (২৮শ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৮)।

প্রাঞ্জলভাবে আলংকারিক ভাষা প্রয়োগেও তাঁর নৈপুণ্য অতুলনীয়। সাধারণ বক্তব্যও যেন ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে ওঠে। যেমন—

> নৌকা গৌরীর জলে, গা ভাসাইয়া বায়ু সহযোগে স্রোত অতিক্রম করিয়া উজান ছুটিয়া চলিল। মীর সাহেব জলে ভাসিলেন। চিরকালের মত জলে ভাসিলেন। (১৫শ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩)।

উপমা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগে এবং চিত্রকল্প নির্মাণের মধ্যে দিয়েও তাঁর দক্ষতা লক্ষ করা যায়। কয়েকটি উদাহরণেই সেই পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন—

উপমা কমলমুখীর কমলদলসদৃশ মুখমণ্ডলের সুখবোধ স্থানে বার বার চুম্বন করিলেন। (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৯)।

রূপক বিপদসাগরের একমাত্র কাণ্ডারীই নগদ অর্থ বা ভূসম্পত্তি। (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪-৯৫)।

সমাসোক্তি শুকতারা মলিনভাবে নিজ গম্য পথে মিটি মিটি চাহিয়া যাইতে লাগিল। (১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪)।

চিত্রকল্প মশালের আলো মলিন হইয়া মুখে ছাই মাখিয়া নিবিয়া গেল। (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯-৯০)।

গাজীমিয়াঁর বস্তানী

মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যচর্চার এক নতুন রূপ পাওয়া গেল 'গাজীমিয়ার বস্তানী'তে। তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ বিশেষত 'রত্নবতী' ও বিষাদসিন্ধু' থেকে এই গ্রন্থের ভাষার একটা স্পষ্ট তফাৎ তৈরি হয়ে গেছে। আগে তাঁর ভাষায় সাধুরীতির যে ব্যবহার ছিল তা মূলত গুরু-গম্ভীর এবং দৈনন্দিন জীবনের ঊর্দ্ধে সাহিত্যিক আদর্শলোকে তার স্থান। কিন্তু 'বস্তানী'র ভাষা শুধু সরল সাধুভাষায় রচিত নয়, কথোপকথনের ভাষায় আছে মূলতঃ কথ্যরীতির প্রয়োগ। এ ভাষা প্রাত্যহিক জীবনের চলমানতা ও ভাব-ভাবনাকে রূপদানে সমর্থ হয়েছে। হয়তো এ কারণে জনৈক সমালোচক বলেন-– "চলতি গদ্যের ক্ষেত্রে যে গ্রন্থটি মীর মশাররফ হোসেনকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করে রাখবে তা হচ্ছে 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'।"[৩৫]

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে প্রচলিত আরবী, ফারসী, ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন দরখাস্ত, মঞ্জুর, উকিল, মোক্তার, আমলা ইত্যাদি আরবী ফারসী শব্দ এবং কোর্ট, পুলিশ, ইন্সপেক্টার, জজ, ডিসমিস ইত্যাদি ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়—

১. দশ হাজারী লোকও হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে – সদরআলা, জজ, ডিপুটী, মুনসীফ, উকীল, বড় বড় পায়াদার হাকিমের ঘরেও পর্দ্দার ব্যবহার অতি কম। (১ম নথি/ ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০-১১)।

২. সেরী পোর্ট, সেম্পীন-ক্লারেট, লিমনেড, সোডা ঠাণ্ডা জলে ঠাণ্ডা করিতে ডজন ডজন ডুবিয়ে রাখা হইয়াছে। খানসামা, আরদালী, দরবান, বেয়ারাও আয়া – বয়দিগকে দস্তুরমত পাগড়ি, চাপরাস, পেটি বাঁধিয়া – নুতন উর্দ্দী পরিয়া আপন আপন কাজ-কর্ম্ম করিতে হুকুম হইয়াছে। (৩য় নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪)।

এছাড়া এদেশের হিন্দী উর্দু ভাষার কিছু শব্দ ও বাচন-ভঙ্গির প্রয়োগ এতে দেখা যায়। যেমন – বেগম সাহেবার 'মনের কথা'র একাংশ এরূপ ঃ

হা বদ্‌বখত! বদ্‌বখত কম নছিব। জালেম! বেওফা কমিন, কমজাত, নিমক হারাম। (ষষ্ঠ নথি/ ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮)।

আসলে সেকালের একটি প্রবণতার রূপচিত্রণ ঘটাতে এ ধরণের ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করতে হয়েছে। কেননা উনিশ শতকে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর লোকের মধ্যে উর্দুর ব্যবহার ছিল।

পূর্বেই বলেছি, 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে সাধু ভাষা ব্যবহৃত হলেও সংলাপের ক্ষেত্রে কথ্যরীতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সে কারণে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেছিলেন, 'বস্তানী' 'মফঃস্বলের ভাষায়' লিখিত।[৩৬] যেমন – সোনাবিবি ও

বউ-এর কথোপকথনের একটি অংশ এরূপ ঃ

বউ। – সে কি কথা। বোধ হয়, তিনি খুব চাপা।

সোনা। – চাপা নয়, খুব হাবা।

বউ। – সেও ভাল। তার দুঃখ সে প্রকাশ কর্ত্তে পারে না, গুমরে গুমরে মরতে থাকে, সে যে ভারি জ্বালা। তিনি দেখতে শুনতে খুব ভাল শুনেছি।

সোনা। – দেখতে খুব ফরসা, শুনতে কিছুই নয়। কাপড় চোপড় পরিয়ে বসিয়ে রাখ, ঠিক যেন একটা মাটির পুতুল। আচ্ছা বউ, আর একটা কথা মনে হলো, – বলবে কিনা ?

বউ। – যা বলার কথা, তা অবশ্য বলবো। কখনই মিছে বলবো না। যে কথা বলতে পারবো না অথচ শুনে অবশ্যই বলবো, এ কথার উত্তর আমি জানি, বলবো না– বলতে পারি না। মিছে কথার ধার ধারি না। (অষ্টাদশ নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০০)।

এরূপ চলতি ভাষার ব্যবহার করে মীর মশাররফ তাঁর পূর্বের রচনাগুলির গদ্যভাষা থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, বঙ্কিম-যুগে থেকেও তিনি এই চলিত ভাষা ব্যবহারের দিকে এগোতে পেরেছেন এটি তাঁর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করতে একই অর্থবোধক বিচিত্র শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি বাক্যগঠন করেছেন। যেমন –

বড় মানুষের মন বড় ভয়ানক। কাজের সময় তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জান, কাজ ফুরালে পিটটান। অধিকন্তু লবেজান, হয়রান, পেরেসান, আন্‌চান। মেজাজ খারাপ। (চতুর্থ নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১)।

এই রকম অনুপ্রাস-ধ্বনিত শব্দ-প্রয়োগের মধ্যদিয়ে তিনি যেমন ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য প্রকাশ করেন, তেমনি তৈরী হয়ে যায় ছোট ছোট উপবাক্য। বাক্যও গতিশীল হয়ে ওঠে। আর একটি উদাহরণ—

প্রথম ঝুপঝাপ, তারপরে টুপটাপ, তারপরে চুপচাপ— তারপরেই কাপকাপ, ঘোপঘাপ, তারপর ধরাধরি, ঝক্‌মারি, সর্ব্বশেষে দাগাদারী। (অষ্টাদশ নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০১)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "ঈশ্বরগুপ্ত Realist এবং ঈশ্বরচন্দ্র Satirist।"[৩৭] 'গাজীমিয়ার বস্তানী'র লেখক মীর মশাররফ সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। কেননা মীর এখানে সেকালের সমাজের কুৎসিৎ রূপকে যেমন এঁকেছেন তেমনি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাতে জর্জরিত করে সমাজ সংশোধনের চেষ্টাও করেছেন। এক্ষেত্রে 'বস্তানী'র ভাষা রঙ্গব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা প্রকাশে সমর্থ হয়েছে। অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ একান্ত নিভৃতে বেগম সাহেবার যে স্তুতি করেছেন তাতে লেখকের ব্যঙ্গ গোপন থাকেনি ঃ

ধন্য ধন্য! সাধ্য নাই এরূপ শিক্ষায় এরূপ ব্যবহারে কোন মুসলমান মাথা তুলিয়া দুটি কথা আপনার বিরুদ্ধে বলতে পারে ? ধন্য ধন্য মেহমুডেন লেডী! এত উন্নত! ধন্য ধন্য পাড়াগাঁয়ের পর্দ্দানসীন জানানা। এত উন্নত! (তৃতীয় নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮)।

আবার সোনাবিবি ও মনিবিবির লোকেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সময় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে লেখকের তীব্র ব্যঙ্গোক্তিও দেখা যায়। যেমন—

> . . . মণিবিবির পক্ষের লোকেরা পুলিসের সম্মুখে দিনে দুপোরে ডাকাতি করিল। পুলিস নিবারণ করা দূরে থাকুক, বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, চক্ষেই যেন দৃষ্টি হইল না, কথাও সরিল না। ধন্য বিচার! ধন্য শান্তিরক্ষা! ধন্যরে পুলিস! ধন্যরে হাকিমের হুকুম। (অষ্টম নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২)

এইভাবে 'বস্তানী'তে নানা স্থলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তাঁর ভাষা ভঙ্গিরও পার্থক্য সূচিত হয়ে গেছে। পূর্বের 'অলঙ্কৃত শোভনতা'র বদলে দেখা গেছে নিরলঙ্কৃত বাচ্যতা। জনৈক সমালোচক তাই বলেছেন,

> এক প্রান্তে সাধুরীতির সুশৃঙ্খল বিন্যাসে প্রদীপ্ত 'বিষাদসিন্ধু', অন্যপ্রান্তে চলিতরীতির বিচক্ষণ সচলতায় 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'। উভয় রীতিতেই তিনি সমভাবে সফলকাম ছিলেন। 'বিষাদসিন্ধু'তে নিরূপিত ও সুশৃঙ্খল অন্বয় বন্ধনে একটি আবেগময় ভাষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছে। আবার 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে চটুল কথকতায় সাধারণ জীবনের উজ্জীবন ঘটেছে।[৩৮]

অবশ্য এই প্রশংসার পাশাপাশি সেকালে 'বস্তানী'র ভাষার সমালোচনাও হয়েছিল। 'ক্যালকাটা গেজেট' লেখকের বাংলা ভাষায় দখলের প্রশংসা করেও লিখেছিল ঃ

> The writer though a Muhammedan writes Bengali with ease and possess a wonderful command over the vocabulary of the language. But his style is nevertheless ungrammatical and marked by East Bengalism and an absence of literary grace.[৩৯]

কিন্তু এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঠিকই বলেছেন,

> তৎকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধা বিঘ্ন ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মসারফ হোসেন যে সাহিত্যশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।[৪০]

আমাদের বিবেচনায় 'বস্তানী'তে মশাররফ কথ্যভাষাকে যেভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অন্যান্য ভাব প্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন তা কোথাও কৃত্রিম হয় নি। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের গদ্যরীতির ভঙ্গিতে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। সেদিক থেকে 'বস্তানী'র গদ্যভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার জীবনী

মীর মশাররফ হোসেন 'আমার জীবনী'র "মাননীয় পাঠকগণ সমীপে" অংশে এর ভাষা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমার জীবনী অতি সরল ভাষায় লিখিত হইবে।" এবং মুসলমান সমাজে প্রচলিত শব্দসমূহ "যেমন প্রচলিত আছে, সেই রূপই প্রকাশ করিব"।[৪১] বলাই বাহুল্য মীরের এই সচেতনতার ফলস্বরূপ দেখা যায়, এর ভাষা সাবলীল ও গতিময়। পূর্বের 'বিষাদসিন্ধু'র শাব্দিক পরিবেশে ছিল ধ্বনি গাম্ভীর্য এবং গুরু গম্ভীর ভাব। কোথাও কোথাও তরল ধ্বনিযুক্ত সুললিত

শব্দের দ্বারা হালকা পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস থাকলেও 'বিষাদসিন্ধু'তে যেন স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে পাঠকের একটা আড়াল থেকেই যায়। কিন্তু এই আত্মজীবনীতে তা হয়নি।[৪২] আটপৌরে জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি আটপৌরে পরিচিত শব্দই ব্যবহার করেছেন। ভাষাও হয়েছে অনাড়ম্বর ও আড়ষ্টতাহীন। সাধুভাষায় রচিত হয়েও গদ্যভঙ্গি হয়েছে সরল। প্রয়োজন অনুযায়ী বেশ কিছু আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারও তিনি করেছেন। বিষয় ও ভাবের পরিবর্তন অনুযায়ী তাঁর গদ্যভঙ্গিরও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

'আমার জীবনী'র ভাষা সাধু গদ্যরীতির হয়েও চলিত রীতির আমেজ মাখা। বাক্যগুলিও ছোট ছোট। বর্ণনা ভঙ্গি সহজ অথচ গতিশীল। যেমন—

> মাষ্টারবাবু কেবল ইংরেজী পড়াইতেন। গান গাইতে জানিতেন। শিক্ষিত গায়ক ছিলেন। গলাটাও মিষ্টি ছিল। বাঙ্গালা টপ্পা গান অনেক জানিতেন। পণ্ডিত মহাশয় কিছুই নহে। আমাদের মধ্যেই নহেন। নবাবের বাটী হইতে স্কুল আধ ক্রোশের কিছু কম। স্কুল ঘরেই তাঁহাদের বাসা। স্কুল ঘর বৃহৎ আটচালা। পাকা সান পেটা। চারদিকে পাকা গাথনির দেয়াল, চুনকাম করা। উপরে উলুখড়ের ভাল ছাউনি। ঘরটি যেমনি বৃহৎ, তেমনি পরিষ্কার।[৪৩]

আবার আবেগ অনুভূতি প্রকাশেও এর গদ্য উপযোগী হয়ে উঠেছে। এই গদ্য যেমন চিত্রধর্মী তেমনি কাব্যময়। তৎসম শব্দকে তিনি সেখানে বেশি আশ্রয় করেছেন। কিন্তু গীতল ভাষাভঙ্গিতে তা সচল ও চিত্তাকর্ষক। যেমন—

> ক্ষণকাল পরে চক্ষুর আবরণ খুলিল, চক্ষে চক্ষে মিলিল—চার চক্ষু একত্র হইল, চিনিলাম। হৃদয়ে অঙ্কিত ছায়া, নিঃসন্দেহে যাহা ভাবিতাম তাহা ভাবিয়া লইলাম। দর্পণ মধ্যস্থিত যুবতীর চক্ষু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোর লাল হইয়াছে। সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইয়া শ্যামজ্যোতি মাঝে মাঝে চমক মারিতেছে। সেই ঈষৎ লোহিত অধর ওষ্ঠে হাসি নাই। বিস্ফারিত জোড়া ভুরুযুক্ত চক্ষে আনন্দের চিহ্ন নাই। . . . প্রতীমাঘরের দেবীদিগের চক্ষু ভাব যেরূপ, স্থির ধীর। এও সেই প্রকার। আমি আমার হৃদয় প্রতিমা দেখিতেছি।[৪৪]

এইভাবে কখনো ঘটনা বর্ণনায়, কখনো দৃশ্যবর্ণনায় আবার কখনো আত্মগত ভাব পরিবেশনায় এর গদ্যভঙ্গি বেশ মানানসই হয়ে উঠেছে। ক্রমশ আধুনিক গদ্যভঙ্গির দিকে বিবর্তিত হয়েছে। সে কারণে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেন—"এর ভাষা আধুনিক, চিত্রধর্মী ও জীবন-ঘনিষ্ঠ।"[৪৫]

পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির মতো 'আমার জীবনী'তেও পাঠককে সম্বোধন করে কথোপকথন বা উপস্থাপন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন —"এই পর্য্যন্তই কথা শেষ। প্রিয় পাঠকগণ। . . .।", "পাঠক! সেই মহাতাপস সাহ সৈয়দ সাদুল্লার পৌত্র সাহ সৈয়দ মীর কুতবুল্লা।", "পাঠক! সে সময়ের কথা . . . .।", "প্রিয় পাঠক গণ ! আমি কে ? প্রকাশ্য সম্পর্কে আমি কাহার কে, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলেন। এইক্ষণ স্থির ধীরভাবে আমার জন্মবৃত্তান্ত শুনুন।"[৪৬] প্রভৃতি। এ ছাড়া এ গ্রন্থে কথক মাতামহীর বলবার ভঙ্গিটিও লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি।

এ গ্রন্থে লেখক অলঙ্কার প্রয়োগেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। উপমা, রূপক, সন্দেহ প্রভৃতি অলঙ্কার তিনি মাঝে মধ্যে ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো সেই উপমানের বস্তুগুলিও সাদামাটা গ্রাম্য জগত থেকে চয়ন করা। যেমন—

উপমা ঃ মুখখানা গোলগাল গাড়ীর চাকার মত।[৪৭]

উৎপ্রেক্ষা ঃ স্বামী যেন একটা গাবগাছের ভূত।

অথবা, পতি প্রাণধন যেন গুবরে পোকা।[৪৮]

সন্দেহ ঃ গৌরী কি মানুষ ? না দেবী ?[৪৯]

অবশ্য এই রচনার কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিষয় বা বাক্যের পুনরুক্তি লক্ষ করা যায়। এটি যে কোন সচেতন গদ্য শিল্পীর পক্ষেই অনভিপ্রেত। তবু বলা যায়, 'আমার জীবনী'তে লেখকের গদ্যশৈলীর বিবর্তন ঘটেছে এবং "... বর্ণনার কৌশলে যতটা কলামণ্ডিত হতে পেরেছে ততটাই আমাদের চিত্ত জয় করেছে।"[৫০] তাই এর গদ্যভঙ্গি সেকালের প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী রাখে।

বিবি কুলসুম

'বিবি কুলসুম'-এর ভাষা বেশ সুখপাঠ্য। সরল সাধু ভাষায় রচিত। 'আমার জীবনী'র মতো ভাষা এখানে সহজ এবং প্রাঞ্জল। এখানকার ভাষাও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। কখনো আবেগময় কাব্যিকভাষা, কখনো নাটকীয় ভাব-প্রকাশক গদ্যভাষা আবার কখনো বা যথার্থ বর্ণনার ভাষা। বর্ণনার ভাষায় সাধুভাষার আদল থাকলেও আটপৌরে চলতি ভাষারই আবেশ মাখানো। একটি উদাহরণ দেওয়া যায় ঃ

> সেই হইতে আমি কোন সভা সমিতিতে যাই নাই। কারণ কুলসুম বিবির কথাটা আমার লাগিয়াছিল। যাহাদের ঘরে তণ্ডুল নাই তাহাদের আবার সভা সমিতি কি ? পেটের চিন্তায় যে পাগল যেমন তেমন লোক নহে। . . . দুবেলা উপহাসের হাঁড়ী মাথায় বহিয়া পেট পোড়াইয়া দেশের উন্নতি, দেশের হিত সাধন সভায় যাইয়া কৃত্রিম ভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভা সমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত নই।[৫১]

এখানকার ভাষা সাধু হলেও সহজ এবং মৌখিক ভাষারই কাছাকাছি। আবার তিনি আবেগ মণ্ডিত গভীর অনুভূতি প্রকাশ করতে তাঁর গদ্যকে উপযোগী করে তুলেছেন। সেখানে কখনো কখনো তাঁর নিজস্ব ঢঙে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বাক্য-পরম্পরা সাজিয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। এ রীতি 'বিষাদসিন্ধু'তেও দেখা গেছে। যেমন—

> আমি আমার চক্ষে আমার ধারণায়, আমার বিবেচনায় যে অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি,—আমার বহু কালের যত্নের ধন, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্টে, বহু যন্ত্রনা যাতনা—গঞ্জনা, আত্মীয় স্বজনের বাক্যবাণ সহ্য করিয়া আমার চক্ষে অমূল্য ধন, রত্ন মাণিক যাহাই বলি, — সংগ্রহ করিয়াছিলাম, আজ ৪০ বৎসর পরে তাহা হারাইয়াছি।
>
> কে হরিয়া লইল ?—না স্ব ইচ্ছায় চলিয়া গেল ?— না কেহ কোনরূপ কুহক জাল বিস্তার করিয়া, আবরণের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি না ?
>
> হরিবার সাধ্য কাহারও নাই। সর্ব্বশক্তিধর — দয়াময় জগদীশ্বর ভিন্ন তাহাকে হরিবার শক্তি এ জগতে কাহারও নাই। তাই কি সত্য?— মন যে মানেনা, মন যে তাহা বলে না।[৫২]

হৃদয়-বিস্তারী অনন্ত আবেগ প্রকাশে বাক্যও এখানে দীর্ঘ। আবার কখনো হ্রস্ব।

'আমার জীবনী'তে মীরের প্রথম প্রণয়ের বর্ণনা ছিল আবেগমণ্ডিত। এখানেও তিনি পুনরায় বিবি কুলসুমের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ও প্রণয় উপস্থাপিত করেছেন বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে। এই বর্ণনা যেমন নাটকীয় তেমনি এই গদ্য সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতি প্রকাশেও সক্ষম। যেমন—

> আমাদের গ্রামের দক্ষিণে মাঝিদিগের পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে। ফাল্গুন মাস—বাতাসও একটানা। আগুন লাগিয়া আগুন গ্রামময় হইয়া উঠিয়াছে ..... কত লোক আর্ত্তনাদ করিয়া দৌড়িয়াছে, আগুনের তাড়না তাহার পর দুইটা ঘোড়ার তাড়ায় প্রাণের ভয়ে হতাশ হইয়া ছুটিয়াছে। আমাকে রক্ষা কর বাঁচাও বলিতেছে, দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল।
>
> সেই যে দেখিলাম—দেখিলাম, চিনিলাম, পূর্বে দেখিয়াছি, আজ ঘটনাক্রমে দেখিলাম। ঘরপোড়া আগুন দেখিতে না গেলে দেখিতাম না, ঘোড়ায় তাড়া না করিলে আমার বক্ষের মাঝে মাথা লুটাইত না। অভয় দান করিলাম। বক্ষে বক্ষে স্পর্শ হইল। সে সুখে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। ... প্রশস্ত স্বর্ণকান্তি মাঠ! সর্ব্বকুলে আচ্ছাদিত হইয়া যেন সোনার মাঠ বলিয়া প্রতীত হইতেছে- — সোনার বাঙ্গলায় সোনার মাঠ আশ্চর্য্য কি ?[৫৩]

এই গদ্য সহজ সরল অথচ সূক্ষ্ম ভাবাবেগ প্রকাশের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

মশাররফ আত্মজীবনীমূলক রচনা দুটির পূর্বে কাব্য কবিতা রচনায় হাত দেন। কাব্য-চর্চায় তাঁর সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি যে প্রকৃতপক্ষে গদ্যশিল্পীই তা 'বিষাদসিন্ধু', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ও 'বস্তানী'র পর এই আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলিতে আর একবার প্রমাণিত হল।

উপন্যাস ও আত্মজীবনীমূলক রচনায় মীর মশাররফের গদ্যের বিবর্তন ঘটেছে বলা যায়। তাঁর প্রথম গদ্যরচনা 'রত্নবতী'তে আশ্রয় ছিল শুধুই সাধু রীতির গদ্য। সেখানকার ভাষা ছিল তৎসম শব্দবহুল। 'বিষাদসিন্ধু'তে সাধুরীতির কাব্যিক ভাষা। ভাষা গুরুগম্ভীর ও আলঙ্কারিক। তবে তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের ব্যবহার বেশ দেখা দিতে শুরু করেছে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র গদ্যে বাইরে সাধুর ছাঁদ কিন্তু ভেতরে ভেতরে যেন কথ্যরীতির বাচনভঙ্গি। 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে বর্ণনা সাধুভাষার কিন্তু কথোপকথন একেবারে চলিতের। এর সঙ্গে এখানকার গদ্যে তিনি এনেছেন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রকাশের উপযোগী কলাকৌশল ও ভাষারীতি। এরপরেই আত্মজীবনীমূলক রচনা দুটিতে সাধুভাষার রীতি গৃহীত হলেও এর অভ্যন্তরে চলিত ঘরোয়া কথাবার্তার রেশই অনুভূত হয়। সুতরাং এই রচনাগুলিতে মীরের গদ্যচর্চার বিবর্তনে লক্ষ করা যায়, লেখক ক্রমশঃ সাধু গদ্য থেকে চলিতের দিকে, গুরুগম্ভীর ভাষা থেকে সহজ সরল গদ্যভঙ্গির দিকে যাত্রা করেছেন এবং বিষয় পরিস্ফুটনে ও ভাবপ্রকাশে সাফল্য লাভ করেছেন।

প্রবন্ধ জাতীয় রচনা

গো-জীবন

মীর মশাররফ হোসেনের 'গো-জীবন' প্রবন্ধটি সাধুভাষায় রচিত। ভাষা যুক্তিনির্ভর ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। 'বিষাদসিন্ধু'র প্রায় সমকালে রচিত হলেও বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ভিন্নতার কারণে 'গো-জীবনে'র ভাষায় সেই প্রবাহ ও বৈশিষ্ট্য নেই। প্রবন্ধের

উপযোগী এর ভাষায় তেমন সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতার অভাব। তবে লেখকের নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠায় এই গদ্য বাহন হয়েছে।

মীরের গদ্যবাক্যে যেমন সুবোধ্যতার দাবি প্রতিষ্ঠিত, তেমনি অনুভূতি সঞ্চারের প্রয়াসও গৌণ নয়। তাঁর এই প্রবন্ধের গদ্য সহজ সরল মসৃণতার সঙ্গে হৃদয়ের উষ্ণ উত্তাপে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।[৫৪] যেমন—

> এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক–সংসার কার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গি যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?[৫৫]

'গোজীবন' নীরস তর্কবিতর্কমূলক প্রবন্ধ হওয়া সত্ত্বেও লেখক মাঝে মধ্যে ব্যঙ্গ কৌতুক ও শ্লেষ বিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে এখানকার গদ্যও সরস বাক্‌ভঙ্গির বাহন হয়েছে। একটি অংশ উদ্ধৃত করা যায় ঃ

> এখন পাত্র হইয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম! খাই গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পচা বিল কি পাতকুয়ার জল। বায়ু সেবন করি ঝাড় জঙ্গলের, পাট ক্ষেত্রের, না হয় ধানের মাঠের। থাকি খড়ো ঘরে। চলাফেরা করি সেঁতসেঁতে ভিজে মাটি জল কাদার উপরে। শরীরের গঠন ও আয়তন তেমনি। অস্থি, পেশীশক্তিও তথৈবচ। সাহসের ত কথাই নাই। পাকযন্ত্রের অগ্নির তেজ, ধারণা ও ক্ষমতার কথা আর কি বলিব। . . . দুগ্রাস বেশী গলাধ করিলেই পেট ফাঁপিয়া প্রাণ আইঢাই করিতে থাকে।[৫৬]

এই ব্যঙ্গ কৌতুকের পাশাপাশি মীরের গদ্যও সরলতার দিকে এগিয়ে গেছে। সাধুরীতির গদ্য হয়েও যেন কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির প্রবাহ এর অভ্যন্তরে বিচরণ করেছে। এর ফলে এখানকার ভাষা অনেক সহজ সরল ও কথোপকথনের ভাষার উপযোগী হয়ে উঠেছে।

তবে কখনো কখনো 'পাঠক' সম্বোধনে বৈঠকীরীতি অবলম্বিত হওয়ায় এবং প্রশ্নবোধক বাক্যের মাধ্যমে বক্তব্যকে বার বার এগিয়ে নিয়ে যাবার মীরের পরিচিত কৌশল গৃহীত হওয়ায় এই ধরণের বিতর্কমূলক প্রবন্ধের পক্ষে বেমানান হয়েছে। এছাড়া তিনি শব্দ ব্যবহারের প্রাচীন রীতি অনুসারে আঙ্কিক চিহ্ন দিয়ে শব্দদ্বিত্ব বুঝিয়েছেন, যেমন – 'ন্যায় চক্ষে তন্ন ২ করিয়া দেখিয়া' (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১), 'তাহারা গোজীবনের কোন ২ প্রস্তাবের, কোন ২ শব্দে' (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭) ইত্যাদি। রামমোহনের গদ্যে এ রীতি দেখা গেলেও বিদ্যাসাগরে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও ততদিনে গদ্যকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বঙ্কিমের রচনার পরবর্তীকালে রচিত 'গো-জীবনে' এ রীতি কাম্য নয়। হয়তো এ কারণেই 'গো-জীবন'-এর ভাষার সমালোচনা করে সে কালের জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন—গ্রন্থটি "ছন্দপতন, কর্কশ ইত্যাদি দোষে পূর্ণ রহিয়াছে।"[৫৭]

তবু স্বীকার করতেই হয় যে, মীর মশাররফ তাঁর 'গো-জীবন'-এ গদ্যকে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা, তর্ক বিতর্ক ও গভীর আবেগ-অনুভূতির বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

নাটক ও প্রহসনজাতীয় রচনা

বসন্তকুমারী নাটক

উপন্যাস ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনার থেকে নাটক ও প্রহসনে ব্যবহৃত ভাষা ও রচনারীতি আলাদা। নাটকের প্রাণ হচ্ছে সংলাপ। এই সংলাপ রচনার উপরেই অনেকটা নির্ভর করে নাটকের সাফল্য। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর প্রথম রচনা 'রত্নবতী'র পরেই 'বসন্তকুমারী নাটক' ও 'জমীদার দর্পণ' নাটক রচনা করেন ও সংলাপ রচনায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

'রত্নবতীর' মতো উপাখ্যানে তিনি গুরু গম্ভীর সাধুভাষা ব্যবহার করেছিলেন। অথচ তার পরের গদ্যগ্রন্থ এবং প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী নাটকে' চলিতভাষা রীতির সংলাপ রচনা করে বেশ দক্ষতার পরিচয় দেন। এতে তৎসম শব্দ-সংখ্যা কম এবং ক্রিয়াপদ চলিত। তবে রাজা মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের মুখের ভাষা চলিত হলেও তৎসম শব্দপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করেছেন। লেখক ভাষা ব্যবহারের তারতম্য বিষয়েও সচেতন ছিলেন। ঘটনা, পরিবেশ ও চরিত্রানুযায়ী সংলাপের ভাষা ব্যবহার করায় চরিত্রগুলিও বাস্তবোচিত ও সজীব হয়েছে। সেই ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য থেকেই আমাদের বুঝে নিতে সুবিধে হয় কে কোন্ শ্রেণীর চরিত্র। যেমন – রাজা যখন 'পুষ্পোদ্যান'-এ প্রকৃতির শোভা বর্ণনা করছেন তখন তাঁর বাগ্‌ভঙ্গি চলতি হলেও শব্দগুলি তৎসম এবং সম্বোধনও সংস্কৃত রীতি অনুসারী।

> বৎস্য! দেখ দেখি, এই বসন্তকালে উদ্যানস্থ সরোবরে কমলমালা কেমন ভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত হয়ে নয়নের প্রীতি সাধন করছে। পুষ্পের মধু গন্ধে উদ্যান কেমন আমোদিত হয়েছে।[৫৮]

অবশ্য পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এই রাজারও সংলাপে পরিবর্তন হয়েছে। রানী রেবতীর মান ভাঙ্গাতে তাঁর প্রেমিক-হৃদয় যেমন আর পাঁচ জনের থেকে আলাদা নয়, তেমনি ভাষাও হয়েছে সহজ এবং তদ্ভব-প্রধান। যেমন–

> প্রিয়ে! তোমার পায় ধরি, ক্ষমা কর, আমি যদি আগে জানতুম যে, এতদূর পর্য্যন্ত যাবে, তাহলে পত্র নেওয়া দূরে থাক্ ছুঁতুমও না। পায় ধরি – নেও, আর মনে ব্যথা দিও না।[৫৯]

রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের পাশাপাশি সাধারণ প্রজা, গ্রাম্যনারী ও কৃষকদের ভাষার তফাৎ সূচিত হয়ে গেছে। এই সমস্ত নিম্নশ্রেণীর মানুষের সংলাপ যে কতটা মাটির কাছাকাছি তা দুটি উদাহরণ থেকেই অনুধাবন করা যাবে। দুই গ্রাম্য নারীর কথোপকথনের অংশ ঃ

সরমা। দিদি। কাঞ্চনের ত কিছু হয় নাই ?
বিমলা। (মস্তক বক্র করিয়া) হয়েছে।
সরমা। ক মাস হলো ?
বিমলা। এই সেদিন সাধ খেয়েছে।
সরমা। ও মা সেদিনের মেয়ে, দেখতে দেখতে ছেলের মা হতে গেল।
বিমলা। এ কালে ছুঁড়ী বুড়ী কিছুই চেনা যায় না। আর এক কথা শুনেছ ?[৬০]

আবার দুই প্রজার সংলাপের অংশ ঃ

> ১ম প্রজা।– বলি ও বেয়াই! রাজা বেটা বুড়োকালে বিয়ে কোরে একেবারে যাচ্ছে তাই হয়ে গেছে। রাত দিন অন্তঃপুরেই থাকে; আর ক'দিন আসবো, প্রত্যহই আসছি যাচ্ছি, একদিনও বেরোয় না, তা বিচার কোরবে কি ? যেতে আসতে পায়ের নলা ছিঁড়ে গেল। . . . ?
>
> ২য় প্রজা।– ওহে ! তুমি বুঝতে পারোনি, রাজা কি সাধে ও রকম হয়েছেন ? রাজা বুড়ো, রানী কাঁচা, একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে, কাজেই পাগল হয়েছেন। বুড়ো বয়েসে বিয়ে কল্লে সকলেরই ঐ দশা হয়; তুমিও ত কিছু কিছু বুঝো।[৬১]

কোথাও কোথাও বৃত্তি অনুসারে চরিত্রের মুখে হিন্দি বাচন-ভঙ্গি বাংলা অক্ষরে লেখা হয়েছে। যেমন, নগরপালের কথোপকথন–

> নগর।– চোপরাও। মহারাজকা হুকুম।

অথবা– আর দেরি করণে নেহি সাক্‌তা।[৬২]

অবশ্য চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী সংলাপ ব্যবহারে লেখকের সাফল্য সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতার ছাপও থেকে গেছে। রাজা বীরেন্দ্রের দীর্ঘ সংলাপে রেবতীর রূপ বর্ণনায় সংস্কৃত বর্ণনা রীতিকে তিনি যেন অনুসরণ করেছেন। কোন কোন শব্দরূপে পদ্যরূপের ব্যবহার করেছেন। এ রকম ক্ষেত্রে সংলাপ হিসেবে তা দুর্বলই বলা যায়। যেমন—

> . . . . এই নয়নের ঈর্ষাতে কুরঙ্গিনী যে বনবাসিনী হয়েছে, তা কে না জানে ? এই দন্তের আভা হেরে সে দামিনী অভিমানিনী হয়ে কাদম্বিনীর আশ্রয় লয়েছে, তবু তোমার মৃদু হাসিতে দন্তরাজী ক্ষণে ক্ষণে হেরে সময় সময় ক্ষণপ্রভা রূপে দেখা দিচ্ছে, দেখা দিয়েও ত স্থির নাই।[৬৩]

আবার কোথাও কোথাও সাধু-চলিতের মিশ্রণ-দোষও থেকে গেছে। যেমন—

> রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সকলি চলিয়া গিয়াছে; (মেঘমালাকে সঙ্কেতে ডাকিয়া মৃদু মৃদু স্বরে) বসন্তের হাবভাব দেখে আমার বড়ই সন্দেহ হয়েছে।[৬৪]

এখানে ক্রিয়াপদে সাধু চলিতের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। অবশ্য এই ধরণের ত্রুটি সমকালের নাট্যকার দীনবন্ধুর নাটকের সংলাপেও ছিল।

এই সব সামান্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে নাটকটির সংলাপ রচনায় মীর মশাররফ দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরনীয়, 'সোমপ্রকাশ' (১৪ ফাল্গুন ১২৭৯, ১৫ সংখ্যা) পত্রিকা মন্তব্য করে যে, নাটকটি সাধু বাংলা ভাষায় রচিত এবং চলতি বাংলায় লিখলে 'মুসলমান বলিয়া' ধরা পড়ে যেতেন।[৬৫] কিন্তু এই মন্তব্য সমীচীন নয়। কেননা নাটকটির বন্ধনীর মধ্যেকার নাট্যকারের নির্দেশ অংশগুলি ছাড়া সংলাপ আদ্যোপান্ত চলিত ভাষায় রচিত এবং তা সার্থকভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেন– "His drama Basanta Kurmari Natak if not well conceived, is well written."[৬৬] আনিসুজ্জামানও তাই বলেছেন, "সংলাপ-রচনায় কাঁচা হাতের ছাপ নেই।"[৬৭]

সুতরাং দেখা যায়, 'বসন্তকুমারী নাটক' তাঁর প্রথম নাটক হওয়া সত্ত্বেও নাটকে চলিত ভাষার সংলাপ ব্যবহার করেছেন এবং সাফল্যলাভও করেছেন। তাঁর এই স্বকীয় গদ্যভাষা-ভঙ্গিই পরবর্তী নাটক 'জমীদার দর্পণে' আরো পরিণত রূপ লাভ করে।

জমীদার দর্পণ

'বসন্তকুমারী নাটকে'র তুলনায় 'জমীদার দর্পণে'র ভাষা ও সংলাপ আরো বলিষ্ঠ হয়েছে। 'বসন্তকুমারী'র মত দীর্ঘ সংলাপ এখানে পরিত্যক্ত হয়েছে। কথোপকথন আরো স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ হয়েছে এবং নাট্যক্রিয়া পরিস্ফুট করতে স্বল্প-দৈর্ঘ্যের সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া 'জমীদার দর্পণে' যতিচিহ্নের আরো সুষ্ঠু ব্যবহার হওয়ায় সংলাপের ভাষা হয়ে উঠেছে মাধুর্যপূর্ণ ও উপাদেয়। ভাষা সহজ এবং চরিত্র ও ঘটনার প্রকৃতি অনুযায়ী ও কথ্যরীতি আশ্রিত। আদালতের দৃশ্যের সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এই নাটকের সংলাপ চলিত ভাষায় রচিত। পরিবেশ ও চরিত্রের নাটকীয় ক্রিয়া পরিস্ফুটনে মশাররফ তৈরি করে নিয়েছেন একটি স্থিতিস্থাপক ভাষারীতি। ফলে একই পরিবেশে সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে দুই ভিন্ন চরিত্রের সংলাপে যেমন পার্থক্য ঘটেছে তেমনি একই চরিত্রের দুই ভিন্ন পরিবেশেও তাঁদের কথোপকথনে পার্থক্য সূচিত হয়ে গেছে।

'জমীদার দর্পণ' নাটকে চরিত্রের শ্রেণী, সামাজিক মর্যাদা ও পরিবেশগত কারণে এই বিভিন্ন ভাষাভঙ্গি প্রযুক্ত হয়েছে। এগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া যায়, যেমন ঃ ক. উচ্চ অভিজাত মধ্যবিত্ত ও সামন্তশ্রেণীর ভাষা, খ. নিম্নশ্রেণীর গ্রামীণ প্রজা, পাইক-বরকন্দাজ প্রভৃতি সাধারণ মানুষের ভাষা এবং (গ) উচ্চশিক্ষিত সমাজের এলিট শ্রেণী বা ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির ব্যবহৃত ভাষা।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত চরিত্রগুলি হল জমিদার হায়ওয়ান আলী, মোসাহেবদল, সিরাজআলী, উকিল, মোক্তার। এদের ভাষা তৎসম-তদ্ভব সম্পৃক্ত এবং ভদ্রজনের ব্যবহৃত মার্জিত মৌখিক ভাষা। যেমন–হায়ওয়ান আলীর উক্তি ঃ–

> হায়। জামাল! আবুকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ্।– সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা কর্ত্তে হয় করবো। এখন দেউড়িতে নে যা।[৬৮]

এখানে 'নে' ব্যবহৃত হয়েছে 'নিয়ে' পদের বদলে। চলিত কথ্যরীতি অনুসারে 'করতে' স্থলে 'কর্ত্তে'র রূপ লক্ষ করা যায়। এ রকম দৃষ্টান্ত নাটকে আরো আছে। যেমন–'চল্লেম' (চললাম), কচ্ছে (করছে) প্রভৃতি। এছাড়া সেকালে সামন্তপ্রভু ও উচ্চবিত্তের লোকেরা নিজেদের আভিজাত্য প্রকাশ করতে মাঝে মধ্যে আরবী, ফারসী, উর্দু মিশ্রিত ভাষা ভঙ্গি ব্যবহার করতেন। হায়ওয়ান আলী তাঁর দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে তাঁর চাকরদের তিনি হুকুম করছেন এই ভাষায়। যেমন–

> পাঁচ আদমী যাও, আবুকে পাকাড় লাও, আবি লাও।[৬৯]

এমনকি জমিদারের চাকর জামালও একই রীতিতে তার নিজের গুরুত্ব বোঝাতে এবং ভীতি প্রদর্শন করতে আবু মোল্লাকে বলে ওঠে ঃ

> তেরা বাত সে বায়ঠেগা ?[৭০]

এই নাটকের নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের সংলাপ রচনায় মীর মশাররফ সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ইতর শ্রেণীর চরিত্রের ভাষাই তাদের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। এদের ভাষা অমার্জিত, গ্রাম্য ও কৃত্রিমতাবর্জিত। খুব সহজ সরলভাবে তারা আপন বক্তব্য পেশ করেছে। তাদের ভাষা যেমন স্বাভাবিক তেমনি নাট্যোপযোগী। আঞ্চলিক কথ্যভাষার ঢঙ-এ দুই চাষার কথোপকথন গ্রামীণ পরিবেশকে জীবন্ত করে তুলেছে। যেমন, আবু মোল্লার স্ত্রী নুরন্নেহারের মৃত্যুর খবর শুনে প্রথম চাষা ও দ্বিতীয় চাষার সংলাপ ঃ

> দ্বি, চা। মামুজি, কি নকমে মাল্লে ?
>
> প্র, চা। আমি কি দেখ্‌তে গিছি ?
>
> দ্বি, চা। বুঝিছি, বুঝিছি ও ব্যাটা বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের বেলা আমাগোর বাড়ীর পাছ কানাচে ঘুরেই বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়। পাছ দুয়োর দিয়ে বাড়ীর মদ্দিও আসে, বেটার চাল-চলন বড় খারাপ। মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন পাড়ার জোলা বড় হ্যাকমত করে বলেছ্যাল। উনি তো তার মেয়েকে দেখে বাড়ীর সামনেই ঘোরেন, সে বল্লো হুজুর দিনে মুনিব বলে মানবো, নাত্তিরে অজায়গায় দেখলি আর হাকিম বলে ন্যাত কর্ব্বো না।[১১]

এই ভাষা একেবারে বাস্তবতা ঘেঁষা।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার ও হাকিমদের অত্যাচারের কাছে নিজেদের অসহায়তার কথা আমিরণ নুরন্নেহারকে খুব সহজ ভাষায় জানিয়েছে ঃ

> মাটির হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি কর্ব্বে ? তার নামে তো আর সাএবদের কাছে নালীস কর্ত্তে পার্ব্বে না ? নালীস কল্লে এই হবে, একদিন তোমার ভিটেয় পুকুর করে দেবে। জমীদারের সঙ্গে কার কথা ? সে কি না কর্ত্তে পারে ?[১২]

কপট হরিদাস বৈরাগী আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকালে সহজ চলতি ভাষায় আপন বক্তব্য পেশ করেছে। সেই সঙ্গে তার ভণ্ডামির স্বরূপটিও উন্মোচিত হয়ে গেছে। জজের প্রশ্নের উত্তরে সে নিরীহ ও অসহায় প্রজা আবু মোল্লার সম্পর্কে বলে ঃ

> হুজুর। একদিন আমি ভিক্ষে কর্ত্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম। ফাঁকি দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে; শেষে ঝোলাটা পায়ে পড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা বড় ফেরেববাজ। ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে মল। রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ।[১৩]

এই ভাষাভঙ্গিই চিনিয়ে দেয় চরিত্রটি কোন্ শ্রেণীর।

আবার লেখক ইংরেজ জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি চরিত্রগুলির ভাষা-ভঙ্গিও আলাদা রূপ দিয়েছেন। বাস্তবতা বজায় রাখতে এবং চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে তিনি তাদের মুখে হিন্দি-উর্দু মিশ্রিত ভাঙা ভাঙা বাংলা ব্যবহার করেছেন। এতে চরিত্রগুলি যেমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তেমনি সংলাপও সরস হয়েছ। যেমন—
আসামীকে জজের প্রশ্ন ঃ

> নেই, নেই হাম টুমকো জুরী করে গা, টোমারা ক্যা নাম ?[১৪]

অথবা, ব্যারিষ্টারের কথোপকথন ঃ-

ব্যারি। মোল্লার জরু কি করে মরেছে, টুমি তার কিছু জানে ?

জিতু। জানবে না ক্যা ? আবুই মারতে মারতে একেবারে খুন করেছে।

ব্যারি। আবু কেঁও মারা ?[৭৫]

এরাই আবার কখনো কখনো শুধুই ইংরেজি অথবা ইংরেজি বাংলা মিশ্রিত সংলাপ ব্যবহার করেছেন।

দেখা যায় মশাররফ চরিত্রের শ্রেণীগত পরিচয় বজায় রাখতে সংলাপ রচনায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। সে কারণে অজিতকুমার ঘোষ মন্তব্য করেন— "নাটকের সংলাপ আঞ্চলিক নহে বটে, কিন্তু চরিত্রানুযায়ী, বাস্তবধর্মী ও নাট্যরসাত্মক।"[৭৬] মন্তব্যটি যথার্থই। তবে ভাষার আঞ্চলিকতার প্রশ্নে জনৈক আধুনিক গবেষক জানিয়েছেন,— এই নাটকে "কুষ্টিয়া-ফরিদপুর এলাকার এইসব আঞ্চলিক বুলি মশাররফ ব্যবহার করেছেন।"[৭৭]

অন্যান্য রচনার মতো 'জমীদার দর্পণে'ও মীর মশাররফ অলঙ্কার ও বেশ কিছু প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন। নাটকের সংলাপে এই প্রয়োগ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ও সুপ্রযুক্ত হয়েছে বলা যায়। যেমন —

উৎপ্রেক্ষা ঃ আবু মোল্লা নব কার্ত্তিক (১ম/১ম)

প্রবাদ-প্রবচন ঃ (ক) পাকা আম দাঁড় কাকে খায়। (১ম/১ম)

(খ) চাষার হাতে গোলাপ ফুল। (১ম/১ম)

(গ) কাকের উপর কামানের আওয়াজ। (১ম/২য়)

(ঘ) রাজা বাদী, উত্তর না দি। (১ম/২য়)

(ঙ) কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোর শঙ্করা। (২য়/২য়)

আবার কখনো চরিত্রের বাস্তবতা পরিস্ফুট করতে সংলাপে গ্রাম্য ছড়া, শ্লোক ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন —

(ক) সীতা নাড়ে অঙ্গুলি, বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে না পারি নর বানরের কথা। (১ম/৩য়)

(খ) যখন দেখে আঁটা আঁটি
তখন কেঁদে কেটে ভেজায় মাটী। (২য়/২য়)

সুতরাং 'জমীদার দর্পণে'র ভাষাভঙ্গিতে লেখকের যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ লক্ষ্ করা যায়। সেকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' (ভাদ্র ১২৮০) পত্রিকায় এই নাটকের ভাষাভঙ্গির প্রশাংসায় লিখেছিলেন ঃ

এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা, এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।[৭৮]

মুনীর চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের জের টেনে মন্তব্য করেন ঃ —

নাটকের সংলাপ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট হয়না, চরিত্র ও ঘটনার মর্মানুযায়ী বিচিত্রমুখী হলেই তা নাটকীয় অর্থে বিশিষ্টতা লাভ করে।[৭৯]

এই নাটকের সংলাপ এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়েছে। অর্থাৎ এর ভাষা যেমন "বিশুদ্ধ বাঙ্গালা" তেমনি সংলাপ চরিত্র ও ঘটনা অনুযায়ী বিচিত্রমুখী। সে কারণে অধিকাংশ সমালোচকই 'জমীদার দর্পণে'র সংলাপের প্রশংসা করেছেন। আনিসুজ্জামানও বলেছেন, "চরিত্রচিত্রণ ও সংলাপে কিছু দক্ষতা আছে।"[৮০] সুতরাং 'জমীদার দর্পণে'র ভাষা ও সংলাপে নাট্যকারের নৈপুণ্যের ছাপ স্পষ্ট।

এর উপায় কি ?

"এর উপায় কি ?" প্রহসনটিতে ব্যবহৃত হয়েছে কথ্য ভাষারীতি। এর আগের দুটি নাটকের তুলনায় এই ভাষারীতি আরো স্পষ্ট এবং পরিণত। বিষয়বস্তুর ভিন্নতার কারণে এর ভাষাভঙ্গিও অনেকটা অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত। ধনী-অভিজাত-শিক্ষিত বাবুদের স্খলন, বারবণিতার শঠতা ও প্রগল্‌ভতা, গৃহবধূর মর্মন্তুদ হাহাকার, ইয়ার-বন্ধুদের ঠাট্টা-মস্করা প্রভৃতি প্রকাশে এর ভাষা যথার্থ বাহন হয়ে উঠেছে। বাস্তবতার খাতিরে এতে লেখক এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করেছেন (যেমন – - মাগ্, মাগী, ভাতার, বেশ্যা, রাণ্ডী, বাঞ্চৎ প্রভৃতি) যা সাহিত্যে সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। সে কারণে তখন 'বান্ধব' পত্রিকা এর ভাষার বিরূপ সমালোচনাও করেছিল।[৮১] কিন্তু উনিশ শতকের অনেক নাটক-প্রহসন-নক্‌শা জাতীয় রচনায় সেকালের লেখকগণ অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

'এর উপায় কি ?'তে ব্যবহৃত সংলাপও পরিবেশ, পরিস্থিতি ও চরিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী। যেমন, বারবিলাসিনী নয়নতারার সঙ্গে রাধাকান্ত বাবুর কথোপকথন ঃ

> বাঁচা গেল, সাতখানা লেপ গায়ে দাও যেখানে ফাঁক পাবে সেইখানেই শীত সেঁদবে। আগুন জ্বেলে দাও গায়ের উপরকার চামই গরম হবে। মা সুরেশ্বরী পেটে পড়লে অন্তরে বাহিরে, ভিতরে, উপরে যেন একেবারে বেলাতী কম্বলে মোড়ান হয়। বৌ ! আর এক গ্লাস দাও।[৮২]

আবার বারাঙ্গনা নয়নতারা যখন একজন পুরুষকে সঙ্গ দেয় তখন অন্য পুরুষের টের পাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিলে সে খুব সহজভাবে নিজস্বভঙ্গিতেই বলে ওঠে ঃ

> পেলেই কি, আমি ত ঘরের মাগ নই যে ভয় করে ডরিয়ে চলব। এত কি ? আসে লক্ষ্মী, যার বালাই। আমি ওর জন্যে একেবারে পাগল কিনা ? সরে এস।[৮৩]

নয়নতারার আচরণে যেমন কপটতা, ছলনা ও দেহ-ব্যবসায়ের প্রবৃত্তি কাজ করেছে তেমনি তার ভাষা-ভঙ্গিমাও তার উপযুক্ত বাহন হয়েছে।

গৃহবধূ রাধাকান্তবাবুর স্ত্রী মুক্তকেশীর আবেগময় কাতরোক্তি প্রকাশে ভাষা যোগ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে ঃ

> সৈ মনের কথা বলি। মনে ২ আঁচ করি যে, আজ একখানা কর্ব্ব, আবার ভাবি যে, আজ না হয় কাল কর্‌ব, এই ভাবতে ২ হঠাৎ একদিন তাঁর মুখখানি নজরে পড়লো সকলই ভুলে যাই। হাসি মুখে দুট কথা শুন্‌লে, আর আগের ভাব কিছুই মনে থাকে না।[৮৪]

এই সংলাপে '২' সংখ্যা চিহ্ন দিয়ে শব্দদ্বিত্ব বোঝানো হয়েছে। অবশ্য এই রীতি মশাররফের অন্যান্য রচনাতেও দেখা গেছে।

সুতরাং দেখা যায়, কখনো চরিত্রের প্রকৃতি বোঝাতে কখনো বা পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তুলতে বিভিন্ন ভাষাভঙ্গি ও সংলাপ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ সংলাপ এই প্রহসনের দুর্বলতাই প্রকাশ করে। তবে সার্বিক বিচারে 'এর উপায় কি ?'র সংলাপ রচনাতেও মীর মশাররফ হোসেনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

১. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ১৯৯০, পৃ. ১১৯

২. শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৯৫, পৃ. ২৯২

৩. ঐ, পৃ. ২৯৬

৪. ঐ, পৃ. ৩১০

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিদ্যাসাগর রচিত' (প্রবন্ধ), রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, একাদশ খন্ড ঃ প্রবন্ধ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৩৩১

৬. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে গদ্য, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ৬৫

৭. Calcutta Review, 1870, Vol. L-99
উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা – সমকালের দর্পণে, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ৫৪

৮. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

৯. ঐ, পৃ. ৩৪০

১০. মশাররফ রচনা সম্ভার, ডঃ কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭

১১. মশাররফ রচনা সম্ভার, ডঃ কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, ২য় খন্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. তিন

১২. বিষাদসিন্ধু, আবদুল আজীজ আল্-আমান সম্পাদিত, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃ. ১৫১

১৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খন্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. নয়-দশ

১৪. আফসার আহমদ, 'মশাররফ হোসেনের গদ্য—'বিষাদসিন্ধু' (প্রবন্ধ), মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে 'বিষাদসিন্ধু', মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, ঢাকা, প্রতীক প্রকাশনা, ১৯৯১, পৃ. ১০১-১০২

১৫. পূর্বে উল্লেখিত ৭ নং সূত্র

১৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খন্ড, পৃ. ৫০। এর পরের উদ্ধৃতিগুলিও ঐ খন্ডেরই অন্তর্ভুক্ত।

১৭. ঢাকা প্রকাশ, ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৬৯
রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৩

১৮. রহস্য সন্দর্ভ, ১৮৭০ খ্রীঃ, পর্ব ৫/৫৪ খন্ড, পৃ. ৯৫-৯৬
রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৩

১৯. ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, মীর মশাররফ হোসেন রচনা সংগ্রহ (১ম খন্ড), ডঃ বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, কলকাতা, কমলা সাহিত্য ভবন, ১৯৭৮, পৃ. পনর

২০. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

২১. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বিষাদসিন্ধু' (প্রবন্ধ), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'বিষাদসিন্ধু' (প্রবন্ধ), মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে 'বিষাদসিন্ধু', পৃ. ৮, ২৪

২২. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্যরচনা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫, পৃ. ১১৬

২৩. কান্তি গুপ্ত, উনিশ শতকের শেষার্ধবর্তী বাংলা গদ্যের রূপ-রীতি (১৮৫০–১৯০০), কলকাতা, ইন্দুপ্রভা, ১৯৮৪, পৃ. ১০৭–১০৮

২৪. রমাপ্রসাদ দে, মীর মশাররফ হোসেন ঃ মৌখিক মহাকাব্যের অনুসৃতি (প্রবন্ধ), ডঃ অরুণ সান্যাল সম্পাদিত, প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ওয়েষ্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃ. ৫১

২৫. ঐ, পৃ. ৫৩

২৬. Read, Herbert, English Prose Style, London, 1963, page-59
উদ্ধৃত, ডঃ নবেন্দু সেন, গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭১, পৃ. ২৭৪

২৭. Wimsatt, Johnson's Prose Style: Whatley's Elements of Rhetoric, 1828, p. 8
উদ্ধৃত, ডঃ নবেন্দু সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

২৮. ডঃ নবেন্দু সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

২৯. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৪৮

৩০. মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে 'বিষাদসিন্ধু', পৃ. ৪

৩১. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৪৯-১৫০

৩২. ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বাতায়ণ, কলিকাতা, সাহিত্য বিহার, ১৯৮৭, পৃ. ২০৬

৩৩. Calcutta Gazettee, Appendix, 31 October, 1900 : 'mark of East Bengalism'.

৩৪. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

৩৫. সৈয়দ আলী আহসান, ভূমিকা, গাজীমিয়াঁর বস্তানী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. আট

৩৬. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রদীপ, পৌষ ১৩০৮, পৃ. ৩৯-৪০
উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

৩৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র কবিতা সংগ্রহ, কলকাতা, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন, ১৯৯৫, ভূমিকাংশ, পৃ. ২৮

৩৮. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৫, পৃ. ৭৬

৩৯. Calcutta Gazette, 31 October, 1900,
উদ্ধৃত, মুনীর চৌধুরী, মীর-মানস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ. ১১১

৪০. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

৪১. মশাররফ রচনা সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ৫ম খন্ড, পৃ. ৬

৪২. সিরাজুদ্দীন আমেদ, মীর মশাররফ হোসেন, নতুন দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৪, পৃ. ৬৪

৪৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৩২, ২৩৮-৩৯

৪৪. ঐ , পৃ. ৩০৮

৪৫. শামসুজ্জামান খান, নানাপ্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৬

৪৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খন্ড, পৃ. ১২, ১৮, ৭৩

৪৭. ঐ , পৃ. ২৮৭

৪৮. ঐ , পৃ. ৩০২, ৩০৩

৪৯. ঐ , পৃ. ৭১

৫০. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

৫১. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৫২-৪৫৩

৫২. ঐ , পৃ. ৩৭১

৫৩. ঐ , পৃ. ৪০০–৪০১

৫৪. কান্তি গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৫৫. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১৯

৫৬. ঐ , পৃ. ৩০৪

৫৭. শেখ আবদুস সোবহান, 'আর নীরব থাকা গেল না' (প্রবন্ধ), 'আখবারে এসলামীয়া' (পত্রিকা), পৌষ ১২৯৬, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ৭৪

৫৮. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খন্ড, পৃ. ১১৮

৫৯. ঐ , পৃ. ১৬০

৬০. ঐ , পৃ. ১৩১

৬১. ঐ , পৃ. ১৩৫-৩৬

৬২. ঐ , পৃ. ১৭৮-৭৯

৬৩. ঐ , পৃ. ১৪২

৬৪. ঐ , পৃ. ১২৮

৬৫. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৬-৩৭

৬৬. ঐ , পৃ. ৫৯

৬৭. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, মুক্তধারা, নভেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১৯৭

৬৮. 'জমীদার দর্পণ', বিষাদসিন্ধু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬

৬৯. ঐ , পৃ. ২৯২

৭০. ঐ , পৃ. ২৯৩

৭১. ঐ , পৃ. ৩০৫

৭২. ঐ , পৃ. ২৯৭

৭৩. ঐ , পৃ. ৩০৯–১০

৭৪. ঐ , পৃ. ৩০৮

৭৫. ঐ , পৃ. ৩০৯

৭৬. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স, ১৯৮৫, পৃ. ১২৫

৭৭. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৯

৭৮. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৮

৭৯. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৮০. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৯

৮১. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

৮২. মশাররফ রচনা-সম্ভার, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৯

৮৩. ঐ , পৃ. ২৬৭

৮৪. ঐ , পৃ. ২৭২–৭৩

উপসংহার

১

আমরা মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিল উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসের ফল তিনি কতটা আত্মস্থ করতে পেরেছেন এবং তাঁর সাহিত্যে তা কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা। সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে আমরা এই আলোচনা করেছি।

আলোচনায় আমরা **প্রথম অধ্যায়ে** দেখাতে চেয়েছি বাংলাদেশের নবজাগরণের প্রভাব হিন্দুসমাজ যেভাবে আত্মসাৎ করে সে সময় জীবনের জড়তা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছিল মুসলমান সমাজ প্রথমদিকে তা করে উঠতে পারেনি। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালী মুসলমান সমাজ শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি – এই চারটি দিক থেকেই পিছিয়ে পড়েছিল। ওয়াকিল আহমদ বলেছেন, ১৮৩৭ থেকে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের পতনের কাল।[১] ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই ফারসীর বদলে ইংরেজি সরকারী ভাষা হিসেবে চালু হয়। মুসলমান সমাজ সেই সময় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করে শিক্ষা ও চাকুরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ আবদুল লতিফের 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটী'র প্রতিষ্ঠা হলে ও পরে সৈয়দ আমীর আলীর মতো নেতাদের আবির্ভাবে ও প্রচেষ্টায় মুসলমান সমাজের পূর্বেকার গোঁড়ামি ধীরে ধীরে দূর হয়। তারা ক্রমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সম্বন্ধে মনোভাবের পরিবর্তন হয়। শিক্ষার হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের উন্নতি দেখা দেয়। তারা সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করে। এইভাবে দেখা যায়, উনিশ শতকটি হয়ে ওঠে বাঙালী মুসলমান সমাজের পতন ও পুনর্জাগরণের কাহিনী।

বাঙালী মুসলমান সমাজের সচেতন অংশ যখন তাঁদের জড়ত্ব কাটিয়ে আধুনিক সাহিত্য-চর্চায় এগিয়ে এলেন তখন তাঁদের সামনে ছিল ভাষা সমস্যা। বাংলা ভাষা শিক্ষা গ্রহণ ও সেই ভাষায় সাহিত্য-চর্চাতেই প্রথমদিকে তাঁদের আপত্তি ছিল। বাংলা-উর্দু দ্বন্দ্বে কালক্ষেপ করেছিলেন দীর্ঘদিন। এই দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কিভাবে ধীরে ধীরে তাঁরা বাংলা সাহিত্য-চর্চায় এগিয়ে এলেন সেকথা আমরা বলেছি **দ্বিতীয় অধ্যায়ে**। সেই সঙ্গে মীরের সাহিত্যিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে তাঁর পূর্বের ও সমকালের মুসলমান সাহিত্যিকগণ কী ধরণের সাহিত্য চর্চা করেছেন তার একটি চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

মুসলমান সাহিত্যকারেরা বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতে এগিয়ে এলেও প্রথমদিকে 'মুসলমানি বাংলা'কে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। আরবী-ফারসী-উর্দু-তুর্কি প্রভৃতি ভাষা মেশানো বাংলায় – আনিসুজ্জামান যাকে 'মিশ্রভাষারীতি' বলেছেন[২] – সেই ভাষারীতিতে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ক্রমে তাও কাটিয়ে উঠে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। আবার মুসলমান লেখকদের অনেকে প্রবন্ধ, ইতিহাস জাতীয় লেখার পক্ষপাতী হলেও রস-সাহিত্য রচনার বিরোধী ছিলেন। কাব্য-নাটক-উপন্যাস-ছোটগল্প রচনা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন অনেকটা ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে। কিন্তু সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ক্রমে অপসৃত হল। তাঁরা রসসাহিত্য চর্চায় উৎসাহী হলেন।

উনিশ শতকে প্রাক্-মশাররফ মুসলমান সাহিত্যিকদের অধিকাংশই ছিলেন মিশ্রভাষারীতির কবিসাহিত্যিক। তাঁরা বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যভাষায় সাহিত্যচর্চা করেননি। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন সাহিত্যিক গদ্যচর্চায় এগিয়ে আসেন তাঁরাও তেমন সাফল্য দেখাতে পারেননি। তাঁদের সব গ্রন্থই ছিল গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত রচনা। তাঁদের গদ্যভাষাও ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। সাহিত্যিক সিদ্ধিও ছিল অনায়ত্ত। অন্যদিকে মশাররফের সমকালে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য ও

খ্যাতিমান মুসলমান সাহিত্যিকারদের আবির্ভাব ঘটেছিল, যেমন — কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী প্রভৃতি। কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি রচিত হয়েছে মশাররফের জীবৎকালের একেবারে শেষের দিকে। সুতরাং দেখা যায়, মশাররফের সমকালে সাহিত্য-সাধনায় কৃতিত্বের বিচারে তাঁকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারেননি। মীর মশাররফ হোসেনই প্রথম সাহিত্যিক যিনি মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি কাটিয়ে উঠে রসসাহিত্য তথা আধুনিক সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা সাহিত্যকার মশাররফের ব্যক্তি জীবনের কথা আলোচনা করেছি। সাহিত্য রচনা করে যে মানুষ আমরা এই অধ্যায়ে তাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। তাঁর সমকালীন পরিবেশ, জীবনকথা, তাঁর বেড়ে ওঠা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব, সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পিছনের প্রেরণা — এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কাব্যরচনার মধ্যে কাজ করে যে কবি-ব্যক্তিত্ব এই অধ্যায়ে আমরা তা বুঝতে চেষ্টা করেছি।

মীর মশাররফ হোসেন নব জাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহর থেকে অনেক দূরে গ্রামীণ পরিবেশে থেকে সাহিত্য-চর্চা করেছেন। জমিদার বংশের সন্তান হয়েও জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে। তবু এই সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন।

মীর মশাররফের মধ্যে যুগপৎ প্রথানুগত্য ও নবীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। নানা বিষয়ে দ্বিধান্বিত চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর মধ্যে। তিনি নারীর স্বাধীনতা চান অথচ সে সম্বন্ধে কোন দৃঢ় মত প্রকাশ করেননি। দেশের স্বাধীনতা কামনা করেও ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর অনাগ্রহ নেই। নারীশিক্ষা চান, কিন্তু নারীর আধুনিক শিক্ষায় তাঁর দ্বিধা। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তিনি বরাবর আকাঙ্ক্ষা করেছেন। এই রকম দোলাচল মনোভাবের মধ্যে থেকেও তিনি আধুনিকতার প্রতি তাঁর মনের টান দেখিয়েছেন।

বাঙালী মুসলমান সমাজের পুঁথি সাহিত্যের রুচি-শাসিত মনকে একালের উপযোগী করে তুলতে তিনি আধুনিক সাহিত্যচর্চায় প্রেরণা অনুভব করেছেন। লেখনী চালনা করেছেন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ইতিহাস, জীবনী-আত্মজীবনী, কাব্য-কবিতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে তাঁর সাহিত্যরচনার একটি পরিচায়িকা যুক্ত করেছি।

উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ-ইতিহাস, জীবনী-আত্মজীবনী, কাব্য-কবিতা — প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় মীর মশাররফের অবদান কতখানি এবং তাঁর এই সমস্ত রচনার সাহিত্যিক মূল্যই বা কী তার একটি বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ আমরা করেছি **চতুর্থ অধ্যায়ে**।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তখন উন্মেষ পর্ব চলছে। মশাররফের আগে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরে দুলাল' লিখেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করলেও মীরের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯) প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের মাত্র দু'খানি উপন্যাস — 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুন্ডলা' প্রকাশিত হয়েছে। বলতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের পাশাপাশিই মীরও উপন্যাস রচনা করে গেছেন। মীরের আগে নামমাত্র কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক, যেমন — শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, শেখ আজিমুদ্দীন, মুন্সী নামদার প্রভৃতি — গদ্য-আখ্যান রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস রচনায় মুসলমান লেখকদের মধ্যে প্রথম সার্থক শিল্পী মীর মশাররফ হোসেনই। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী'র গদ্যভাষা দেখেই সমকালীন পত্রপত্রিকা সন্দেহ করেছিল যে, এটি কোন হিন্দু লেখকের রচনা কিনা।[৩] তাঁর 'বিষাদসিন্ধু'তে পরিবেশন করলেন ধর্মীয় কাহিনীর আবরণে মানবীয় জীবনরস। তা হয়ে উঠল একালের গ্রন্থ। আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন।

সেকালে বাংলা নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়কে বাঙালী মুসলমান সমাজ সুনজরে দেখতেন না। তাঁরা একে

'পাপানুষ্ঠানের প্রশস্ত দ্বার স্বরূপ'[৪] বলে এর চর্চা থেকে বহু যোজন দূরে ছিলেন। এর মধ্যে থেকেও মীরের পূর্বের দু'জন মুসলমান নাট্যকারের কথা – মহম্মদ আবদুল করিম ও কাদের আলীর – জানা গেলেও তাঁরা কেবল ঐতিহাসিক কারণেই উল্লেখযোগ্য। নাট্যসাহিত্যে তাঁরা তেমন সাড়া জাগাতে পারেননি। ততদিনে বাংলা নাটক বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি নাট্যকারেরা নাটক রচনা করেছেন। সেই সময় মীর মাত্র কয়েকখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করে নাট্যসাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছেন। অতীতচারিতা ও কাল্পনিকতা থেকে সরে এসে তিনি বাস্তব জীবনমুখী নাটক 'জমীদার দর্পণ' রচনা করলেন যা আজও প্রাসঙ্গিক। 'জমীদার দর্পণ'-এর পাশাপাশি সমকালীন সমাজ সমস্যার রূপায়ণ লক্ষ করা গেল 'এর উপায় কি?' প্রহসনে।

মীর মশাররফ খুব বেশি প্রবন্ধ রচনা না করলেও এদিকেও তাঁর অবদান আছে। তাঁর 'গো-জীবন' প্রবন্ধটির বিষয় আজও প্রাসঙ্গিক। স্বসমাজের মানসিকতার ঊর্দ্ধে উঠে তিনি যেভাবে আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন তাতে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রখর যুক্তিবাদী মনের পরিচয় মেলে। এখানেও তাঁকে আধুনিক-মনস্ক মানুষ বলেই মনে হয়। কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি নয় – যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করবার যে মানসিকতা তা একালের ধর্ম। এখানেই তিনি নবজাগরণের বার্তাবাহক। তাঁর 'সৎপ্রসঙ্গ' ও 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধেও মীরের এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাই।

ব্যক্তির যে আত্মসচেতনতা, আধুনিক যুগের আগে তার উন্মোচন ঘটেনি। সেই আত্মবোধ একেবারে সম্পূর্ণতই আধুনিক যুগের জিনিস। মধ্যযুগের সাহিত্যে কবির আত্মপরিচয় রচনার চেষ্টার মধ্যে সত্যিকারের একালের আত্মজীবনী রচনার বীজানুসন্ধান করা বৃথা মাত্র। আমরা লক্ষ করেছি, এই আত্মসচেতনতার বোধ থেকেই মীর রচনা করলেন দুটি আত্মজীবনীমূলক রচনা – 'আমার জীবনী' এবং 'বিবি কুলসুম'।

মীর মশাররফ শেষ জীবনে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এই রচনাগুলিকে মীরের ভালো লেখা বলা যায়না। তবে প্রথাবদ্ধ হলেও বাংলা আখ্যানকাব্যের ধারায় এগুলি এক সময়ে পাঠকদের বিশেষত সাধারণ মুসলমান পাঠকদের মনের খোরাক মিটিয়েছে। এ ধরণের রচনার সার্থকতা সেখানেই।

বাংলা ভাষা ও গদ্যরীতিতে মীর মশাররফ হোসেনের কৃতিত্ব কতখানি তা অনুধাবন করবার জন্যে আমরা ভাষা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এবং তাঁর প্রধান প্রধান গদ্য রচনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি **পঞ্চম অধ্যায়ে**।

উনিশ শতকে বাংলা ভাষা শিক্ষা গ্রহণে ও সাহিত্যচর্চায় বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যে একটা অনীহার মনোভাব ছিল। শিক্ষা সচেতন বাঙালী মুসলমানরা ক্রমে এই ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে। তাঁদের মধ্যে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু – এ নিয়ে বিতর্কও চলেছিল দীর্ঘদিন। এ বিষয়টিও আমরা লক্ষ করেছি। এই আবহাওয়ার মধ্যে থেকেই মীর মশাররফ বাংলা ভাষা চর্চায় এগিয়ে আসেন। এ বিষয়ে প্রথম থেকেই তার মনোভাব ছিল স্পষ্ট। তিনি নির্দ্বিধায় বাংলা ভাষাকেই তাঁর সাহিত্যচর্চার বাহন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বাংলা ভাষা-বিরোধীদের তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনাও করেন।[৫] বাংলা ভাষায় তাঁর দখল যে ভাল ছিল তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে সেকালের বিভিন্ন সমালোচকদের প্রশংসায়।[৬]

মীর মশাররফ গদ্য ও পদ্য – উভয় রীতিতে সাহিত্য-চর্চা করলেও তিনি ছিলেন মূলতঃ গদ্যশিল্পী। আমরা তাঁর গদ্যকে তিন ধরণের রচনার নিরিখে আলোচনা করেছি। এক. উপন্যাসের গদ্য, দুই. নাটক-প্রহসনের সংলাপধর্মী গদ্য এবং তিন. প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় যুক্তিধর্মী গদ্য। উপন্যাসের গদ্যে যেমন তৎসম শব্দবহুল সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন (যেমন – রত্নবতী, বিষাদসিন্ধু), তেমনি পরবর্তীতে ভাষা হয়েছে সরল কথ্য ভাষা (যেমন উদাসীন

পথিকের মনের কথা, গাজীমিয়াঁর বস্তানী)। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাসের গদ্যভাষায় একটা বিবর্তন আমরা লক্ষ করেছি। অনুরূপ বিবর্তন নাটকের সংলাপের ভাষাতেও লক্ষিত হয়। 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে তিনি ভাষাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বাহন করে নিতে পেরেছিলেন। নাটকে চরিত্র, পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় সংলাপ রচনায়ও তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধের ভাষা হয়েছে তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিজালের বাহন। দেখা যায়, গদ্যশৈলীতে তাঁর নৈপুণ্যও কম নয়। সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ হোসেন।

২

মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন বাংলার নবজাগরণের যুগের সাহিত্যকার। তিনি সেকালের রেনেসাঁসেরই সৃষ্ট মানুষ। রেনেসাঁসের দুর্বলতা ও দ্বিধা তাঁর মধ্যে থেকে গেছে। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে রেনেসাঁসের প্রভাব পড়েছিল কিন্তু সে প্রভাব সর্বাত্মক হয়নি। বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের মনই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর ফলে যে বিশেষত্বগুলি দেখা দেয় তার মূল ধর্ম হল মানবমুখিনতা এবং পার্থিব চেতনা। এরই ফলে এই মাটির মানুষ এবং মুখের ভাষা গুরুত্ব পায়। ফলে এতদিনকার যা ছিল ধর্মীয় পুস্তকের ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ কিংবা যা ছিল ধর্মীয়তার প্রভাববদ্ধ সেই বিষয় এখন সাধারণের বোধ্য মুখের ভাষায় লেখা হল। মীর মশাররফ একদিকে ঐশ্লামিক কাহিনীকথাকে বাংলাভাষার মাধ্যমে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করলেন। এর জন্য তাঁকে দোষারোপ করা হয়েছিল। আরবী ভাষাকে কোথাও কোথাও বাংলায় আনবার ফলে তিনি দোষের ভাগী হয়েছিলেন। তবু এ হল তাঁর সেই যুগোত্থিত নব্যচিন্তার চেতনা যা তাঁকে এ রকম গল্পকথা ভাষা সাহিত্যে রচনা করতে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকবে। এর মাধ্যমে তিনি ধর্মীয় চিন্তা প্রচার করেননি। বরং তাঁর লিখিত সমস্ত কাহিনীর মূল বৈশিষ্ট্য মানবরস পরিবেশন। তিনি নিশ্চয় অলৌকিকতার প্রভাব মুক্ত নন কিন্তু তবু 'বিষাদসিন্ধু'র পাঠের পর আমাদের চিত্ত যে কারুণ্যে আলোড়িত হয় তার মধ্যে আমরা এক কাব্যরস আস্বাদনের তৃপ্তি পাই। তাঁর গঠনশিল্পে এজিদ হয়ে পড়ে 'বিষাদসিন্ধু'র নায়ক চরিত্র। এ তাঁর নবচেতনার ফসল।

মীর মশাররফের লেখা যদি লক্ষ করি তাহলে একটা জিনিস দেখতে পাই। তিনি 'রত্নবতী' দিয়ে সাহিত্য রচনা শুরু করেন। এটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য – প্রথমত, এই গ্রন্থে তিনি বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশের শক্তি আয়ত্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি নিজে গল্পগ্রন্থন করবার ক্ষমতা আবিষ্কার করেছেন। তৃতীয়ত, তিনি প্রচলিত একটি রূপকথার গল্পকে উপন্যাসের ছাঁদে ফেলে বলবার কাজ করেছেন। লক্ষ করবার বিষয় সেদিন বাংলা উপন্যাসগুলি ইংরেজি উপন্যাসের আদলে রচিত হচ্ছিল। বঙ্কিম ছিলেন বাংলার স্কট। ইংরেজি উপন্যাসের প্রকাশরীতি অনুসরণ করে উপন্যাস লেখা হচ্ছিল। নব্যযুগের শিক্ষিত বাঙালী প্রথমে ইংরেজিতে বই লিখেছিলেন। কিন্তু পরে বাংলায় লেখেন। ইংরেজি ভাষা এবং রচনারীতি থেকে মশাররফ প্রথম থেকেই দূরে ছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে সেদিনকার ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ পুরোপুরি প্রতিফলিত হতে পারেনি। তবু সমকালীন বাংলা সাহিত্যপাঠে তার মাধ্যমে যুগচেতনা অনেক পরিমাণে ব্যাপ্ত হতে পেরেছিল।

মীর মশাররফের রচনার ধারাকে একদিক থেকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে 'রত্নবতী', 'বসন্তকুমারী', 'বিষাদসিন্ধু' অন্যদিকে রাখতে পারি 'জমীদার দর্পণ', 'এর উপায় কি?', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী', 'গো জীবন'। এই দুই শ্রেণীর রচনার প্রথম ধারাটি প্রচলিত গল্পকথার ধারা, দ্বিতীয়টি তাঁর নিজের সৃজন। বলা

যেতে পারে মীর মশাররফের সাহিত্যজীবন এই দুই ধারার মধ্যে দোলাচল। এমন নয় যে তিনি প্রথম ধারা থেকে দ্বিতীয় ধারায় এসেছেন। 'রত্নবতী'র পর 'বসন্তকুমারী নাটক' তারপর 'জমীদার দর্পণ', 'এর উপায় কি?' এরপর আবার 'বিষাদসিন্ধু'। তারপর 'গোজীবন' 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'। এখানে যদিও কোথাও কোথাও ধর্মীয় কাহিনী নিয়েছেন তবে বেশি জোর দিয়েছেন কাহিনীরস পরিবেশনের উপর। সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্যের মূলে ঢুকে পড়ে জমিদার-প্রজাদের সম্পর্ক নিয়ে লিখছেন – 'জমীদার দর্পণ'-এর মতো সীরিয়াস রচনা। ক্রমে তিনি সমাজকে সমালোচনা করতে ছদ্মবেশ ধারণ করে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কটাক্ষ নিয়ে লিখছেন "গাজীমিয়াঁর বস্তানী"। এর আগে তিনি যুক্তির আশ্রয় নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে লিখলেন 'গো-জীবন'। এ সবকিছুরই মূলে মানবতাবাদ ও যুক্তিশীলতা – যা রেনেসাঁসেরই ধর্ম। 'আমার জীবনী' ও 'বিবি কুলসুমের' বিষয় মানুষ। যে মানুষের কথা রেনেসাঁসেরই লক্ষণ।

এমন ভাবা স্বাভাবিক যে, 'জমীদার দর্পণ' তাঁর সাহিত্য জীবনের একটা Landmark এবং তিনি যে ধরণের বাস্তবতাকে এই 'জমীদার দর্পণে' প্রতিফলিত করেছেন, যে ধরণের সমাজবোধ এবং শিল্পবোধ এই রচনায় দেখিয়েছেন, যে মানবিকতা এই শিল্পের জন্ম দিয়েছে, সেই বোধের দর্পণে তাঁর পরবর্তী রচনাগুলি নিয়ন্ত্রিত হলে ভালো হত। তাহলে বোঝা যেত তিনি একশ্রেণীর সাহিত্যকর্ম থেকে অন্যধারায় অন্য চেতনার রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। অথচ তা হয়নি। আমরা দেখতে পাই, তিনি 'জমীদার দর্পণ' রচনার পরই লিখলেন 'বিষাদসিন্ধু'। অর্থাৎ সমকালীন জীবনের বাস্তবতা, প্রখর বাস্তবচেতনা ও জীবনবোধ থেকে অতীত ধর্ম ইতিহাসের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। এমন নয় যে, তিনি মধুসূদনের মতো এই ধর্মীয় ইতিহাসের নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই মনে হয় খুব সচেতনভাবে তিনি সমকালীন জীবনের চেতনা বা রেনেসাঁসের প্রখর প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হননি। তাহলে এভাবে অতীত ঐতিহ্যের বর্ণনা করতেন না। তার আত্মবিশ্লেষণ করে তাকে আধুনিক চেতনায় মার্জিত করে তুলতেন। অথচ তা হয়নি। এর কারণ মশাররফের চেতনার মধ্যেই নিশ্চয় কোনো দ্বিধার কেন্দ্র ছিল। যা তাঁকে সমকালীন জগতের ভিতর থেকে সরিয়ে অন্যত্র ইতিহাসের পরিবেশে নিঃশ্বাস নিতে প্রাণিত করেছিল। সেই দ্বিধার ফলে তিনি সমকালীন বাস্তবতা থেকে ইতিহাসের অভিমুখে সরে গেলেন। তবে একটা জিনিস লক্ষ করা যায় তাহল এই যে, তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' ধর্মকাব্য নয় – তা একালের মানুষের কাছে মানবরস পরিবেশনের কাব্য। ধর্মকথার তুলনায় তা অধিক পরিমাণে মানব জীবনকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে তিনি জয়নাবের রূপতৃষ্ণাকে এই রচনার মূল পরিচালিকা শক্তি হিসেবে দেখাতেন না। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে তিনি হয়তো হাসান হোসেনের প্রতি অনুগত বোধ করতে পারেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে ধর্মের চেয়ে রূপতৃষ্ণাকে তিনি উপন্যাসের মূল কেন্দ্ররূপে দেখিয়েছেন। এইখানেই দেখতে পাই তার জীবনমুখিনতা। এইখানেই মশাররফের শক্তি এবং দুর্বলতা। কারণ এইভাবে কারবালার কাহিনীকে দেখানোতে তিনি প্রেম বা মানবিক জীবনকে এই উপন্যাসের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আবার 'জমীদার দর্পণে'র মতো জ্বলন্ত জীবনচেতনা থেকে সরে গিয়ে তিনি অতীতচারিতার মধ্যে তাঁর সীমাবদ্ধতা ব্যক্ত করেছেন। আর এইখানেই আমাদের মনে হয় মশাররফের সাহিত্যের মূল ধর্ম নিহিত। তিনি সেযুগের সীমাবদ্ধ রেনেসাঁসের আরো সীমাবদ্ধ প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিল্পী। হিন্দু সমাজ যেভাবে রেনেসাঁসের ধর্মকে আত্মসাৎ করেছিল মুসলমান সমাজ সেভাবে তাকে আত্মস্থ করতে পারেনি। হয়তো বা চায়নি। সেই কারণে সেই সমাজে সর্বস্তরে নবজাগ্রত মানব চেতনার প্রতিফলন ঘটতে পারেনি। মশাররফের সাহিত্যের মধ্যে এই সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন ঘটেছে।

যদি রেনেসাঁসের প্রভাব লেখকের মনে গভীরভাবে দাগ কাটত তাহলে তিনি নারীচরিত্র অঙ্কনে কিছুদূর প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতেন। তাতে সেই নারী চরিত্রগুলি মধ্যযুগের গতানুগতিক জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

আধুনিককালের স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত চরিত্রে পরিণতি লাভ করতে পারত। তাঁর সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'র বেগম সাহেবা চরিত্রে। এই চরিত্রটির ক্ষেত্রে আধুনিক জীবনের ভোগবাদকে অবলম্বন করবার ভূমিকা তিনি তৈরি করেই রেখেছিলেন কিন্তু দেখা গেল চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় নীতিশাসিত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে তিনি তাঁর এই চরিত্রটিকে আধুনিকতার ঔজ্জ্বল্যে বিভাসিত করতে পারলেন না। বরং প্রত্যেক মুহূর্তেই লেখক তাঁর ভোগ বাসনাময় জীবনকে সমালোচনার ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিদ্ধ করে গেলেন। এইখানেই বুঝতে পারা যায় নবজাগরণের ভাববৃত্তকে স্পর্শ করতে চাইলেও তার কেন্দ্রে তিনি প্রবেশলাভ করতে পারেননি। তাঁর সামনে দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। মধুসূদনের রাবণ চরিত্র বা বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক নারীচরিত্রের জীবনতৃষ্ণা। বঙ্কিমচন্দ্র যতদূর পর্যন্ত নারীর ভোগাকাঙ্ক্ষা অঙ্কিত করতে পারলেন (তাঁর চরিত্রেরাও নীতিশাসিত) মশাররফের লেখায় সেই জীবনের অঙ্গীকার ফুটে উঠল না।

আবার অন্যদিকে মশাররফ নিজে জমিদার শ্রেণীর মানুষ অথচ তিনি সেই জমিদার শ্রেণীর মানুষের জীবনের দূর্বলতা দেখিয়েছেন 'জমীদার দর্পণে'। নব চেতনার দ্বারা যদি তাঁর চেতনা মার্জিত না হত তাহলে তিনি তাঁর পিতার চরিত্রকে কেনীর সহকারী হিসেবে বর্ণনা করতে পারতেন না। দীনবন্ধু নিমচাঁদের মধ্যে দেখিয়েছেন তার যন্ত্রণার মূলে আছে তার চেতনা। দীনবন্ধুর মতো শিল্পী মনের অধিকারী তাঁকে বলা যায় কিনা জানিনা। তবু তিনিও প্রায় একইভাবে নিজের পিতার চরিত্রকে ইংরেজ শ্রেণীর অনুগত হিসেবে দেখিয়েছেন। নিজের শ্রেণীর মানুষের চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন। অথচ তাঁর স্পষ্ট সমর্থন ছিল প্রজাদের দিকে।

এই ভাবে বলা যায় এক ধরণের বাস্তব চেতনা, যুক্তিবাদ এবং মানবিকতা তাঁর লেখার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার তারই সঙ্গে কিছু দ্বিধাও জড়িয়ে থাকে তাঁর লেখায়। আমরা এই লেখায় তাঁর সেই শক্তি ও দ্বিধার কেন্দ্রটিকে অনুধাবন করতেই চেষ্টা করেছি। তাঁর জীবন ও রচনাবলীকে সেই দিক থেকেই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১ম খন্ড, ১৯৮৩, পৃ. ৪৩

২. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, মুক্তধারা, নভেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১০৮

৩. Calcutta Review, 1870, Vol. L-99
রহস্য সন্দর্ভ, ১৮৭০ খ্রী., পর্ব ৫/৫৪ খণ্ড, পৃ. ৯৫–৯৬
উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা – সমকালের দর্পণে, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ৫৪

৪. ইসলাম প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০, পৃ. ২৮৫
উদ্ধৃত, ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৭

৫. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমাদের শিক্ষা' (প্রবন্ধ),
উদ্ধৃত, কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ১৯৯০, পৃ. ৩৪০

৬. ক. বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০, খ. বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০, গ. সুলভ সমাচার, ১৯ বৈশাখ ১২৯৩, ঘ. ঢাকা প্রকাশ, ৪ আশ্বিন ১২৯৩, ঙ. ভারতী, ফাল্গুন ১২৯৩। ইত্যাদি
উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮, ১৩৫, ১৪৯, ১৫০

গ্রন্থপঞ্জি

মূলগ্রন্থ

হোসেন, মীর মশাররফ — আমার জীবনী, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৩৮৪।

গাজীমিয়াঁর বস্তানী, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৮২।

জমীদার দর্পণ, ডঃ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, নভেম্বর, ১৯৮৯।

বিষাদসিন্ধু, আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩।

মশাররফ রচনা-সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।
১ম খণ্ড - ১৯৭৬,
২য় খণ্ড- ১৯৮০,
৩য় খণ্ড - ১৯৮৪,
৪র্থ খণ্ড - ১৯৮৪
এবং ৫ম খণ্ড - ১৯৮৫।

মীর মশাররফ হোসেন রচনা সংগ্রহ, বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, কলিকাতা, কমলা সাহিত্য ভবন, ১৩৮৫।

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

আউয়াল, মোহাম্মদ আব্দুল — মীর মশাররফের গদ্যরচনা, ঢাকা, বাংলা-একাডেমী, ১৩৮২।

আনিসুজ্জামান — মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, মুক্তধারা, ১৯৭১।

স্বরূপের সন্ধানে, কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৯৯।

আবদুল মান্নান, কাজী — আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক কর্‌পোরেশন, ১৯৯০।

আমেদ, সিরাজুদ্দীন — মীর মশাররফ হোসেন, নতুন দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৪।

আল ফারুকী, রশীদ — বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, কলকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৮৪।

মুসলিম-মানস ঃ সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া, কলকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৮১।

আলী, স্যার সৈয়দ আমীর — এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ স্যারাসিন্‌স্, হাবিব আহসান অনূদিত, কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯২।

দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম, ডঃ রশীদুল আলম অনূদিত, কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, মার্চ ১৯৯৪।

আলী, সৈয়দ মুর্তাজা	প্রবন্ধ বিচিত্রা, ঢাকা, ১৩৭৪।
আহমদ, আলী	বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
আহমদ, ওয়াকিল	উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১ম খণ্ড — ১৯৮৩, ২য় খণ্ড — ১৯৮৩।
আহ্‌মদ, মুজফ্‌ফর	সমকালের কথা, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, মে ১৯৮৯।
ইসলাম, আজহার	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, আধুনিক যুগ, ঢাকা, ১৩৭৬।
	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯২।
ইসলাম, ডঃ নজরুল	বাংলা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, কলিকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯২।
	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০২।
উমর, বদরুদ্দীন	পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, জিয়াদ আলি সম্পাঃ, কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭১।
	সংস্কৃতির সংকট, ঢাকা, ১৯৭৪।
কবিরাজ, নরহরি	স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা, কলিকাতা, ১৯৫৭।
কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল	রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা – সমকালের দর্পণে, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।
ঐ , (সম্পাদিত)	মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে 'বিষাদ সিন্ধু', ঢাকা, প্রতীক প্রকাশনা, ১৯৯১।
কায়কোবাদ	'মহরম শরীফ' বা আত্মবিসর্জন কাব্য, ঢাকা, ইউনিভার্সাল প্রেস, ১৩৫৬।
কায়সার, শান্তনু	তৃতীয় মীর, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।
খান, আজহারউদ্দীন	বিলুপ্ত হৃদয়, কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৭২।
খান, মুহিউদ্দীন (অনুবাদসহ কোরান শরীফ)	তফসীরে মা-আরেফুল কোরআন, দেওবন্দ, উত্তর প্রদেশ, বাংলা ইসলামিক একাডেমি, সংখ্যা - ৭।
খান, শামসুজ্জামান	নানা প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৩৯০।
গণী, ডঃ ওসমান	উমাইয়া খেলাফত, কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫।
গুপ্ত, কান্তি	উনিশ শতকের শেষার্ধবর্তী বাংলা গদ্যের রূপ-রীতি (১৮৫০-১৯০০), কলকাতা, ইন্দুপ্রভা, ১৯৮৪।
গুপ্ত, ক্ষেত্র	বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ২য় খন্ড, ১৯৯৪।
ঘোষ, অজিতকুমার	বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্‌লিশার্স, ১৯৮৫।
ঘোষ, অমিতকুমার	বাংলা নাটকের রূপরীতি ও আঙ্গিক, কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮।
ঘোষ, জ্যোতির্ময়	প্রবহমান বাংলার মুখ, কলকাতা, নবচলন্তিকা, মে ১৯৯৬।
ঘোষ, বিনয়	বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৩৯১।
	বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলিকাতা, ১৯৬৮।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র (সম্পাদিত) — ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের কবিতাসংগ্রহ, কলকাতা, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন, ১৯৯৫।

বঙ্কিম রচনাবলী, প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ, কলিকাতা, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৩।

লোকরহস্য, ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ ও সনৎ কুমার মিত্র সম্পাদিত, কলিকাতা, সাহিত্যপ্রকাশ, ১৩৮০।

চৌধুরী, আবদুল লতিফ — মীর মশাররফ হোসেন, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

চৌধুরী, আবুল আহসান, — মীর মশাররফ হোসেন (জীবনী গ্রন্থমালা), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজ-চিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

চৌধুরী, প্রমথ — প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, ডিসেম্বর, ২০০০।

চৌধুরী, মুনীর — মীর-মানস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮।

চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী — মুসলিম বাংলার মনীষা, ৩য় সং, ঢাকা, ১৩৯৩।

চৌধুরী, শ্রীভূদেব — বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ২য় পর্যায়, কলিকাতা, দে'জ পাব্‌লিশিং, ১৯৯৫।

বাংলা-সাহিত্যের নবজাগরণ ও রামমোহন, কলিকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৩৮৪।

ছফা, আহমদ — বাঙালী মুসলমানের মন, কলকাতা, মিরান্দা, ১৩৯৫।

জাহাঙ্গীর, সেলিম — মীর মশাররফ হোসেন ঃ জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ — রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১১শ খণ্ড ঃ প্রবন্ধ, ১৩৬৮ এবং ১৩শ খণ্ড।

তালিব, অধ্যাপক মুহম্মদ আবু (সম্পাদিত) — রাজা রামমোহন রায়ের 'তুহ্‌ফা'/উপহার 'তুহ্‌ফাত-উল-মুআহ্‌হিদীন', মালদা, আদর্শ পুস্তকালায়, জানুয়ারী ১৯৯৫।

ত্রিপাঠী, অমলেশ — 'ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি', কলকাতা, আনন্দ পাব্‌লিশার্স, জুলাই ১৯৯৬।

দত্ত, মাইকেল মধুসূদন — মধুসূদন রচনাবলী, অজিতকুমার ঘোষ ও অন্যান্য সম্পাদিত, কলিকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩।

মধুসূদন রচনাবলী, সব্যসাচী রায় সম্পাদিত, কলিকাতা, কামিনী প্রকাশালয়, ১৩৯৯।

দাশগুপ্ত, সুরজিৎ — ভারতবর্ষ ও ইসলাম, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, মে ১৯৯১।

দাস, সজনীকান্ত — বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, জুন ১৯৭৫।

দে, অমলেন্দু — বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।

দে, ডঃ অধীর — আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, কলিকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১ম খণ্ড, ১৯৯৬।

নাজনীন, পৃথীলা — আত্মজীবনীমূলক রচনা ঃ মীর মশাররফ হোসেন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার — পুরাতন বাংলা নাটক সঙ্কলন, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, আশ্বিন ১৩৮২।

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ৩য় সং, ১৩৭৮ এবং ৭ম সং, ১৩৯৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ — বাংলা সাময়িকপত্র, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২য় খণ্ড, ১৩৯৫।

সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২য় খণ্ড, ১৩৭৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার — বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৯৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ — বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল — কাঙাল হরিনাথ, কলকাতা, সমতট প্রকাশন, ১৯৯৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ — বাংলা নাটক ও লোক সংস্কৃতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৩।

বসু, রাজনারায়ণ — সেকাল আর একাল, কলিকাতা, সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৮।

বসু, সোমেন্দ্রনাথ — বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী, ২য় সং, কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনিস্টিটিউট, ১৯৯৩।

বসু, স্বপন — গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৭।

বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫।

বাগল, যোগেশচন্দ্র — মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলকাতা, ১৩৭৯।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ — বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় সং, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৪।

ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র — সাহিত্য ও পাঠক, কলিকাতা, এস. মুখার্জ্জী, ৫ম সং, ১৯৭০।

মওদুদ, আবদুল — ওহাবী আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৬৯।

মজিরউদ্দিন, মুহম্মদ — বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা (১৮৬০-১৯৬৫), নওগাঁ, রাজশাহী, নর্থবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭০।

মজুমদার, পারিজাত — মীর মশাররফ হোসেন ও তাঁর বাউল গান, কলকাতা, জাগরী, ১৩৯৭।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র — বাংলাদেশের ইতিহাস, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৯৯ (১ম খণ্ড– ১৯৯৮, ২য় খণ্ড– ১৯৯৮, ৩য় খণ্ড– ১৯৯৯ এবং ৪র্থ খণ্ড– ২০০০)।

মল্লিক, কুমুদনাথ — নদীয়া কাহিনী, মোহিত রায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৯৩।

মামুন, মুনতাসীর — উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িক পত্র (১৮৪৭-১৯০৫), ২য় খণ্ড ঃ ১ম ও ২য় পর্ব, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

মুখোপাধ্যায়, ডঃ অরুণকুমার — সাহিত্য বাতায়ণ, কলিকাতা, সাহিত্যবিহার, ১৯৮৭।

মুখোপাধ্যায়, গীতা — বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা, কলকাতা, কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোং, ১৯৮১।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার — রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৭৯।

মোমেনীন, আমিরুল	বাংলা একাডেমী পত্রিকা — সূচীপত্র (১৩৬৩ - ১৪০০), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ১৯৯৫।
রায়চৌধুরী, সুবীর	হেনরি ডিরোজিও ঃ তাঁর জীবন ও সময়, নয়া দিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৩।
রায়, রাজা রামমোহন	রামমোহন রচনাবলী, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, কলিকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩।
রায়, সুপ্রকাশ	ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলিকাতা, এন.বি.এ. ব্রাদার্স, ১৯৯৬।
	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭০।
লেভী, রুবেন	সোস্যাল স্ট্রাকচার অব্ ইসলাম, ডঃ গোলাম রসুল অনূদিত, কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫।
শাস্ত্রী, শিবনাথ	আত্মচরিত, কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মার্চ ১৯৮৩।
	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৮৩।
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, সত্যজিৎ চৌধুরী ইত্যাদি সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১।
শেখর, সৌমিত্র	গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ, কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫।
সরকার, সুশোভন	বাংলার রেনেসাঁস, কলকাতা, দীপায়ন, ১৩৯৭।
সান্যাল, ডঃ অরুণ (সম্পাদিত)	প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১।
সেনগুপ্ত, সুখময়	বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাঙ্গালীর শিক্ষাচিন্তা (১৮৩৫–১৯০৬), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, মার্চ ১৯৮৫।
সেন, জলধর	কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২০।
সেন, দীনেশচন্দ্র	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, (১ম খণ্ড - – ১৯৯১, ২য় খণ্ড — ১৯৯১)।
সেন, ডঃ নবেন্দু	গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭১।
সেন, ডঃ সুকুমার	ইসলামি বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০০।
	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, (২য় খণ্ড — ১৪০৫, ৩য় খণ্ড — ১৪০৩, ৪র্থ খণ্ড — ১৯৯৬)।
	বাংলা সাহিত্যে গদ্য, কলকাতা, ১ম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৮।
হক, খোন্দকার সিরাজুল	মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ঃ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৪।
হক, মোহাম্মদ আজিজুল	বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।
হক, মোহাম্মদ এনামুল	মনীষা মঞ্জুষা, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৬।

হক, হাসান আজিজুল — কথাসাহিত্যের কথকতা, কলকাতা, একুশে, ১৯৮৯।

হাই, মুহম্মদ আবদুল ও সৈয়দ আলী আহসান — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৫।

হান্টার, উইলিয়াম — দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স, আব্‌দুল মওদূদ অনূদিত, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬।

হাসান, জাহিরুল — উর্দুভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, পাণ্ডুলিপি, ১৯৯৪।

হাসান, ডঃ বদরুল — উনিশ শতক ঃ নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস, কালকাতা, জগৎমাতা পাবলিশার্স, ১৯৯০।

হিট্টি, ফিলিপ. কে. — হিস্ট্রি অব দি অ্যারাব্‌স, জয়ন্ত সিং প্রভৃতি কর্তৃক অনূদিত, কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Abrams, M. H. — A Glossary of Literary terms, Calcutta, Macmillan Co. of India, 1978.

Bose, Nimai Sadhan — The Indian awakening and Bengal, Calcutta, 1969.

Chandra, Bipan — Modern India, NCERT, New Delhi, 1984.

Chatterjee, Suniti Kumar — The Origin and Development of the Bengali Language, London, 1970.

De, Amalendu — Roots of Separatism in Nineteenth Century Bengal, Calcutta, Ratna Prakashan, 1974.

Donzel, E. Van & Others (Edited) — The Encyclopaedia of Islam, Vol-IV, Leiden, E.J. Brill, 1978.

Forster, E. M. — Aspects of the Novel, England, Penguin Books, 1970.

Gibb, H.A.R. & Others (Edited) — The Encyclopaedia of Islam, Vol-I, London, Luzac & Co., 1960.

Halperin, John — The Theory of the Novel, New York, Oup., 1974.

Hudson — An Introduction to the Study of Literature, Ludhiana, Lyal Book Depot, 1968.

Kennedy, X. L. — Literature, New York, Harper Collins, 1991.

Lahiri, Pradip Kumar — Bengali Muslim thought : 1818-1947, Calcutta, K.P. Bagahi & Co., 1991.

Lewis, B. & others (Edited) — Encyclopaedia of Islam, London, Luzac & Co., Vol-III, 1971.

Majumder, Ramesh Chandra — Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century, Calcutta, 1950.

Muir, William — Caliphate : its rise, decline, and fall, Ed. by T. H. Weir, Edinburg, John Grant, 1915.

Mukherjee, Amitava — Reform and Regeneration in Bengal (1774 - 1823), Calcutta, 1968.

Sarkar, Susobhan — On the Bengal Renaissance, Calcutta, Papyrus, 1979.

Sen, Amit — Notes on Bengal Renaissance, Calcutta, 1975.
Watt, Ian — The rise of the Novel, Great Britain, Penguin Books, 1976.

পত্রপত্রিকা

অনুষ্টুপ (কলকাতা)	১৯৯৪ (২৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)
কাফেলা (কলকাতা)	বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৯৪
পশ্চিমবঙ্গ (কলকাতা)	১৪০৩ (রামমোহন সংখ্যা)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (কলকাতা)	১৯২০
বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা)	১৩৬৩, ১৩৬৫
মাহেনও (ঢাকা)	আগষ্ট, ১৯৫২
সওগাত (কলকাতা)	আষাঢ়, ১৩৫৪
সচিত্র সন্ধানী (ঢাকা)	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯

[illegible] Bengal University
Library
[illegible]